বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী • কলিকাতা-১২

বিদ্যাসাগর

स जीवति मनो यस्य मननेन हि जीवति ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শ্রীচরণকমলেষু

॥ চিত্র-সূচী ॥

১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে রামমোহন আবির্ভূত হন। নূতন উষার স্বর্ণদ্বারে তিনিই প্রথম ভারত-পথিক। রামমোহনের জীবনে বাঙালির সমাজ-চেতনা উদ্বুদ্ধ মাত্র হইয়াছিল, উহার বিকাশ বা ব্যাপ্তি হয় নাই। অনাগত কালকে তিনি বাঙালির গৃহ-প্রাঙ্গণ অবধি আগাইয়া নিয়া আসিলেন; শঙ্খধ্বনি তুলিয়া তিনি জাতিকে তীর্থ-পরিক্রমায় আহ্বান করিয়া গেলেন এবং জানাইয়া গেলেন, মহাকালের তীর্থযাত্রার পথ কুসুমে আস্তীর্ণ নয়, দুঃখ ও ত্যাগে সে পথ বন্ধুর। কিন্তু সেই সঙ্গে রামমোহন ইহাও বলিয়া গেলেন যে, এই পথ ছাড়া অন্য পন্থা নাই, এবং এই পথে চলা ভিন্ন বাঙালির তথা ভারতবাসীর অন্য পথ নাই।

রামমোহনের আবির্ভাবের প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে আসিলেন বিদ্যাসাগর। প্রায় নিরন্ন অথচ এক স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মণের ঘরে বিদ্যাসাগরের জন্ম। কিন্তু দারিদ্র্য তাঁহাকে এমন একটি নিরহঙ্কার অভিমান ও আত্মসংযম দিয়াছিল যাহা বিদ্যাসাগরকে উপনিষদোক্ত "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো" মহিমায় সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া ভাস্বর ও স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল। চতুষ্পার্শ্বের কোলাহলের ভিতর রহিয়াও বিদ্যাসাগরের সত্তা ছিল নিস্তব্ধ ও ধ্যানমগ্ন। কুৎসিত পরিবেশের মধ্যে তাঁহার চিত্ত ছিল নির্মল ও জ্যোতির্ময়। প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষেত্রে অজস্র মানুষের সংস্পর্শে আসিয়াও তিনি ছিলেন একক ও নিঃসঙ্গ। পৃথিবীর মতোই অগ্নিগর্ভ মানসিক তেজ সংযমের কঠিন আবরণে আবৃত রাখিয়া সহৃদয়তার কোমলতায় নিজেকে তিনি প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন।

বাংলার নব-জাগৃতির এক বিশাল পটভূমিকায় বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। বিপ্লব যখন জাতির প্রাণশক্তিকে সর্বতোভাবে নাড়া দিয়া তাহাতে এক অদম্য গতিশীলতার সঞ্চার করিতেছিল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জাতির সেই নবযৌবনের সৃষ্টি। বাঙালির জীবনে নবজাগরণের দ্বিতীয় তরঙ্গ লইয়া আসিয়াছিলেন

তিনি। ইতিহাসে তাঁহার জন্য কয়েকটি ভূমিকা নির্দিষ্ট ছিল—শিক্ষা-সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার, সমাজ-সংস্কার, অর্থনৈতিক উদ্যম এবং সাহিত্য-নির্মাণ। ইহার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। সমাজ-সংস্কারে, দয়ায় এবং তেজস্বিতায় তিনি বিশিষ্ট ছিলেন। কিন্তু ইহাই বিদ্যাসাগরের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। সমগ্র বাঙালি জাতির সত্তাকে তিনি নিজের সত্তার মধ্যে অনুভব করিয়াছেন, বাঙালিয়ানার অনুভূতি তাঁহার মনুষ্যত্ববোধের তীব্রতায় পরিস্ফুট হইতে পারিয়াছিল। অভদ্র ইংরেজ সাহেবের মুখের সামনে চটিজুতা-শুদ্ধ পা তুলিয়া ধরা, চটিজুতা খুলিয়া যাদুঘরে প্রবেশে আপত্তি এবং "এই চটিজুতা যে কোন রাজা-মহারাজার মুখের উপর তুলিয়া ধরিতে পারি"—এই মনোভাব তাঁহার হইয়াছিল নিজেকে বাঙালি জাতির সঙ্গে একাত্ম করিয়া বোধ করিবার ফলে। জ্ঞান ও কর্মের, বোধ ও ব্যবহারের ঐক্য ও অভিন্নতা সেই পুরুষসিংহকে তাই নিজস্ব জীবনের ক্ষুদ্র সীমা হইতে বৃহত্তম সমাজ-জীবনের অনন্ত পরিধির মধ্যে সেদিন টানিয়া আনিয়াছিল।

বিদ্যাসাগরের হৃদয়বত্তা এবং সংগ্রামী জীবনের পরিচয় দিয়াছেন শ্রীমণি বাগচি তাঁহার এই গ্রন্থে। ইহা শুধু বিদ্যাসাগরের জীবনী নহে, ইহা তাঁহার সমকালীন সমাজ-মানসের ইতিহাসও বটে এবং ইহাই এই নূতন জীবনী-গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাসাগরের চিন্তা, ধ্যান-ধারণা আলোচনা করিতে গিয়া লেখক তাঁহার যুগকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিজীবনের পটভূমিতে রহিয়াছে উনিশ শতকের ভাব ও কর্ম বিপ্লবের ইতিহাস এবং সে ইতিহাসে রহিয়াছে বিশেষভাবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দান। সেই ইতিহাসের গর্ভ হইতেই একে একে জন্ম লইয়াছিলেন সে যুগের যুগ-নায়কবৃন্দ। ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক ঊনবিংশ শতকের প্রত্যেক পথিকই পরিশ্রম করিয়াছেন, চিন্তা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের লেখক তাই তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবন ও সাধনার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়াছেন বিদ্যাসাগরের জীবন ও সাধনাকে। তথ্যের সঙ্গে আছে ঐতিহাসিক নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। বিস্মৃতপ্রায় একটি যুগ ও জীবনকে যতদূর সম্ভব জনশ্রুতি ও কিম্বদন্তী হইতে উদ্ধার করিয়া, লেখক আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। একটি মানুষের জীবনের

ইতিহাস কিভাবে সমগ্র যুগের চিত্তবিকাশের ইতিহাস হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই নিরুচ্ছ্বসিত বর্ণনা আছে এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায়। বিদ্যাসাগরের এইরূপ একখানি জীবন-চরিতের প্রয়োজন ছিল।

শতাব্দীকাল পরে আজ বাঙালি জাতির সম্মুখে আবার মনুষ্যত্বের সঙ্কট দেখা দিয়াছে। বিদ্যাসাগর ছিলেন সাধারণ মানুষ। তাঁহার সমগ্র জীবন এই সাধারণ মানুষ লইয়াই কাটিয়াছে, সাধারণ মানুষের সাধারণ কল্যাণই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। আজ এই ধরণের লোকের অভাব ঘটিয়াছে। তখন ছিল বিধবার অশ্রু, আজ আমাদের সমস্ত আড়ম্বরের অন্তরালে সাধারণ বাঙালির ঘরে ঘরে কুমারী কন্যাদের ব্যর্থ জীবনের দৈন্য। কে কান পাতিয়া শুনিবে তাহা? তখন ছিল অর্থনৈতিক প্রয়াসে সাধারণ বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করিবার দিন, আজ রাস্তা জুড়িয়া অহরহ চলিতেছে ভুখা মিছিল। তখন ছিল জাতির গর্বে সমুন্নত একজোড়া তালতলার চটি, আজ জুতার ঠোক্কর খাওয়াটা সাধারণ বাঙালি আবশ্যিক বলিয়া অভ্যাস করিয়াছে। জীবনের সত্য মূল্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কঠিনকে আমরা আজ ভালোবাসি না। বলিতে পারি না—
"সত্য যে কঠিন। কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা।"

কঠিন সত্যের স্বরূপ বিদ্যাসাগরের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। নিজের অস্তিত্বে বজ্রের তেজ সঞ্চয় করিয়াছিলেন সেই ব্রাহ্মণ। দধীচির উপাখ্যান আমাদের ছেলেবেলায় পড়িয়াছি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই তো একালের দধীচি। দধীচির অস্থি দিয়া বজ্র তৈরি হইয়াছিল; বিদ্যাসাগরের অনুসৃত জীবনই তো বজ্রাহরণের সাধনা। প্রস্তুত-গ্রন্থে আমরা বিদ্যাসাগরের এই জীবন্ত সত্তাকেই অনুভব করি। এক বিচিত্র ব্যক্তিত্বের মহৎ বিকাশের সুন্দর ও স্বচ্ছ ইতিহাস এই বই। আন্তরিকতায় ইহা ভাস্বর, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ। বিদ্যাসাগরের দীর্ঘ একাত্তর বছরের সংঘাত-বহুল কর্মমুখর জীবনের সকল দিক শ্রীমণি বাগচি অতি নিপুণভাবে আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

কলিকাতা
২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭

নির্মলকুমার ঘোষ

॥ এই লেখকের ॥

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
ছোটদের ছত্রপতি
ছোটদের বিবেকানন্দ
লীলা-কম্ব
নিবেদিতা
ছোটদের সিপাহী বিদ্রোহ
SISTER NIVEDITA

সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র
ছোটদের অরবিন্দ
ছোটদের গৌতম বুদ্ধ
মহাচীনে শ্রীনেহরু
নিবেদিতা-নৈবেদ্য

কামালপাশা
ছোটদের বার্ণার্ড শ
কাজলরেখা
গৌতম বুদ্ধ
নানাসাহেব
সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস
OUR BUDDHA

॥ পরবর্তী বই ॥

রামমোহন
পলাশির পরে
মানুষের আত্মকথা

বিদ্যাসাগর

প্রথম খণ্ড

জীবনী
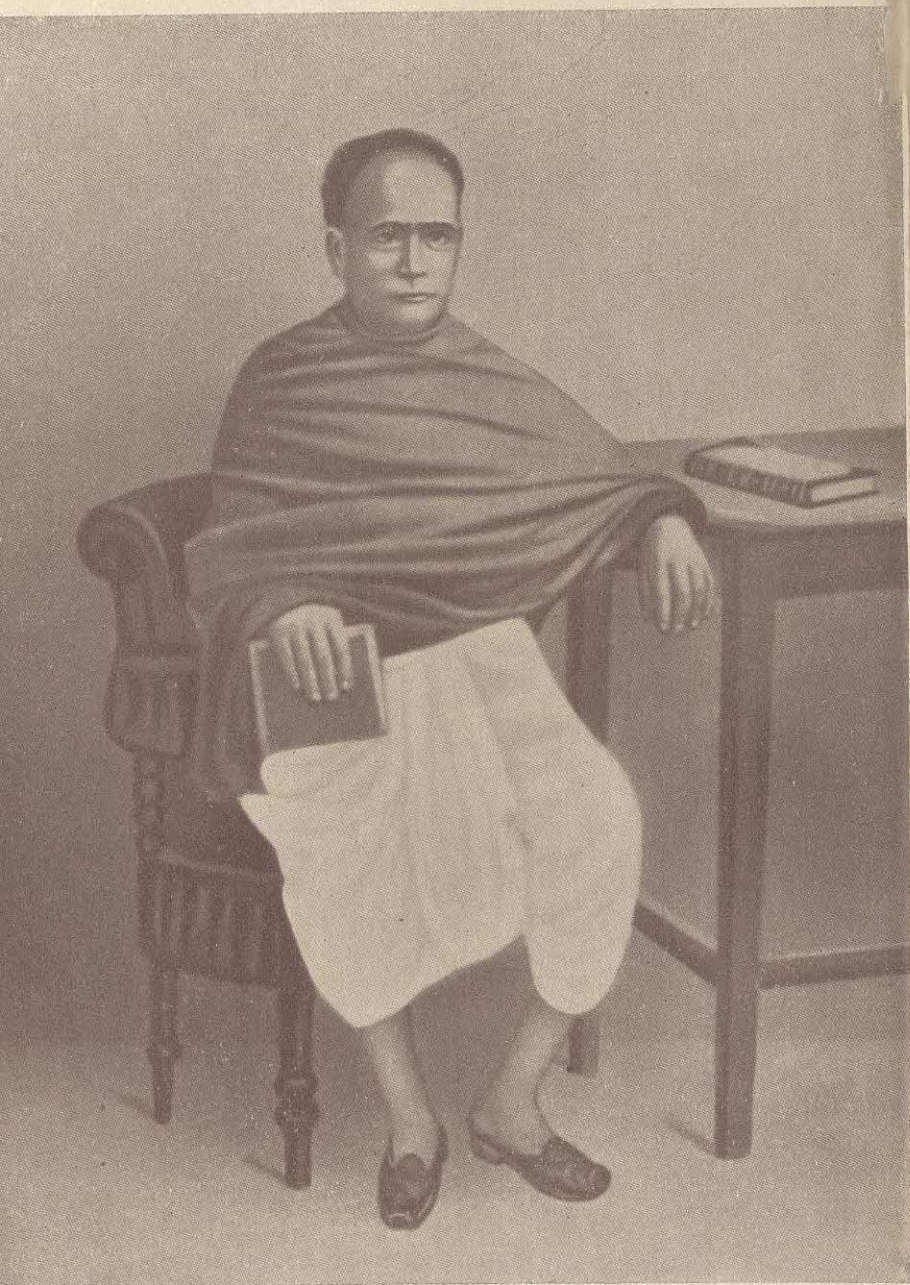
॥ এক ॥

বড়বাজারের দয়েহাটা।

ভাগবতচরণ সিংহীর প্রকাণ্ড বাড়ি। বাড়ির কাছেই আর্মানি গির্জা।

সেই গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। রাত দুটো। কলকাতা শহরে তখন নিশুতি রাত। সিংহী বাড়ির একতলার ছোট্ট একটি ঘরে সামান্য একটি বিছানায় শুয়ে এক দরিদ্র শীর্ণদেহ ব্রাহ্মণ; পাশে অকাতরে ঘুমিয়ে তাঁর ন'বছরের ছেলে। খর্ব, শীর্ণ, প্রকাণ্ড মাথা। শয্যার এক প্রান্তে সুবিন্যস্ত ভাবে সাজানো কয়েকখানি সংস্কৃত বই।

দুটো বাজল। ব্রাহ্মণ ঘুম থেকে উঠলেন। রেড়ির তেলের প্রদীপটি জ্বালালেন খুব সন্তর্পণে। তারপর ছেলের গায়ে হাত দিয়ে ডাকেন—এই ওঠ্, পড়তে বস্।

পিতার সেই কঠিন আদেশে মুহূর্তমধ্যে পুত্রের গাঢ় নিদ্রা ভেঙে যায়। ঘুম থেকে উঠে চোখে-মুখে একটু জল দিয়ে নিদ্রার জড়িমা দূর করে নিয়ে শুরু হয় অধ্যয়ন। প্রদীপের নিষ্কম্প শিখার মতই একাগ্রচিত্ত বালকের শুরু হয় অনুচ্চস্বরে অধ্যয়ন। বাকী রাত এতেই কেটে যায়।

রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে চরাচর যখন ঘুমে অচেতন, কলকাতা শহর যখন নিঝুম ও নীরব, সেই সময়ে দয়েহাটার সিংহীবাড়ির সেই স্বল্পালোকিত ক্ষুদ্র কক্ষে পিতার পাশে বসে ন'বছরের একটি ছেলে নিবিষ্ট মনে পাঠ তৈরি করছে—এমন অদ্ভুত দৃশ্য কেউ কোন দিন কল্পনা করতে পারে? কিন্তু কল্পনা যা করা যায় না, তাইত ঘটে মহাপুরুষদের জীবনে।

ছেলে পড়ছে:

> বিদ্বত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।
> স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে॥

অতি বিশুদ্ধ বাগ্-ভঙ্গী, উচ্চারণে এতটুকু জড়তা নেই। পিতা বলেন—চাণক্যের এই শ্লোকটা শুধু মুখস্থ নয়, একেবারে মনের মধ্যে গেঁথে রাখবি—বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে। বুঝলি? বিদ্বান্ লোকের আদর সর্বত্র। ছেলে নীরবে ঘাড় নাড়ে। পিতা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন অধ্যয়নরত কিশোর পুত্রকে আর মনে মনে ভাবেন—তাঁর এই পুত্রের বিদ্যার খ্যাতিতে সারা বাংলাদেশ ছেয়ে গেছে; পুত্র হয়েছে কৃতবিদ্য, সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পণ্ডিতের বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে তাঁর এই পুত্র।

পুত্রের অধ্যয়ন আর পিতার ভাবনা-চিন্তার ভেতর দিয়ে রাত শেষ হয়ে যায়।

চাকর-বাকর লোকজনের কলরবে আবার মুখর হয়ে ওঠে দয়েহাটার সিংহীবাড়ি। ঘুমন্ত শহর ওঠে জেগে।

এই পিতা—ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই কিশোর—তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ঈশ্বরচন্দ্রই আমাদের বিদ্যাসাগর।

হুগলী জেলার বনমালীপুর।

কোম্পানীর আমলের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

এই গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায়েরা পুরুষানুক্রমে পণ্ডিত।

পাণ্ডিত্য ও ব্রাহ্মণোচিত নিষ্ঠার জন্যে এঁরা খুব বিখ্যাত।

ভুবনেশ্বর তর্কালঙ্কারের পাঁচ ছেলে। নৃসিংহরাম, গঙ্গাধর, রামজয়, পঞ্চানন ও রামচরণ।

একান্নবর্তী সংসার। কিন্তু কালক্রমে ফাটল ধরল সেই সংসারে। সেই ছিদ্রপথ দিয়ে এল গৃহ-বিচ্ছেদ। রামজয়ের স্থান হয় না ভাইদের সংসারে। মহাতেজী তিনি। বিদ্যায় ছিলেন তর্কভূষণ, চরিত্রেও তেমনি। মনের তেজ যেন ঠিকরে বেরুত কথাবার্তায়। কিন্তু রোজগার তেমন নেই, তাই দাদাদের সংসারে তাঁকে সপরিবারে সহ্য করতে হতো নানা অবমাননা। দু'মুঠো ভাতের জন্যে এতো ক্লেশ! এ সংসারে আর নয়—এই বলে একদিন রামজয় হলেন গৃহত্যাগী। ভাইদের সংসারে রেখে গেলেন পত্নী দুর্গাদেবী আর ছটি নাবালক ছেলেমেয়ে। বড়টির নাম ঠাকুরদাস।

রাঢ়বঙ্গের অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত তাঁরই মেয়ে দুর্গাদেবী। স্বামী নিরুদ্দেশ হবার পর দুর্গাদেবী নানান গঞ্জনা সহ্য করেও রইলেন কিছু দিন শ্বশুরবাড়ির ভিটেয়। কিন্তু যন্ত্রণা যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করল, তখন নাবালক ছেলেমেয়েদের হাত ধরে দুর্গাদেবী এলেন তাঁর বাপের বাড়ি বীরসিংহ গ্রামে। কন্যাগতপ্রাণ বৃদ্ধ তর্কসিদ্ধান্ত বহু সমাদরে গ্রহণ করলেন তাদের, পরমযত্নে লালন-পালন করতে লাগলেন দৌহিত্র সন্তানদের। দুর্গাদেবী ভাবলেন এবার বোধ হয় নিরুদ্বেগে তাঁর দিনগুলো যাবে। কিন্তু তাঁর অদৃষ্ট তখন মন্দ। বনমালীপুর থেকে এলেন বীরসিংহ গ্রামে—হুগলী থেকে মেদিনীপুরে, কিন্তু বিরূপ ভাগ্য সেখানেও তাঁকে অনুসরণ করল। একে স্বামী নিরুদ্দেশ, তার ওপর এই সব নাবালক ছেলেমেয়ের মানুষ করার ভার তাঁর ওপর। বাপ-মা বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন, কন্যার ভাগ্য-বিপর্যয়ে তাঁদের অন্তর স্বভাবতই স্নেহে উদ্বেল হয়ে উঠল। কিন্তু করবেন কি, সংসারে তাঁরাও যে পরাধীন। ছেলে ও ছেলের বৌ-র ওপর সংসারের সকল ভার। তারা দুর্গাদেবী ও তাঁর অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে ক'টিকে গলগ্রহ বলেই মনে করল। কাজেই ভ্রাতৃবধূর অনুগ্রহের পাত্রী হয়ে দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগের সীমা রইল না দুর্গাদেবীর। মুখটি বুজে সবই তিনি সহ্য করেন। কিন্তু ছোটখাট ঘটনা উপলক্ষ করে নিত্য অপ্রীতিকর কলহের অবতারণা হতে লাগল সেই সংসারে। যখন সহ্যের বাইরে যেত তখনই তিনি বাবাকে সব কথা জানাতেন। কিন্তু তর্কসিদ্ধান্ত এর কোন সুসিদ্ধান্তই করতে পারতেন না—পুত্র ও পুত্রবধূর অধীন তিনি। তাঁর কর্তৃত্ব অচল, আদেশ অর্থহীন। কিছুদিন কাটল এইভাবে। দুর্গাদেবী বুঝলেন বাপের ভাত খাওয়া তাঁর বরাতে নেই। যে-আশা নিয়ে বনমালীপুরের শ্বশুরের ভিটা ছেড়ে বীরসিংহগ্রামে বাপের বাড়ি তিনি এসেছিলেন, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার তিক্ত অভিজ্ঞতার পর দুর্গাদেবী বুঝলেন সে-আশা দুরাশা মাত্র। শেষে অবস্থা চরমে উঠল। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের মেয়ে, নাবালক ছেলেমেয়ে ক'টির হাত ধরে সত্যিই একদিন রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন।

একদিন তিনি বাবাকে বললেন—বাবা, আর তো এখানে থাকা চলেনা।

—তাই তো দেখছি মা, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন বৃদ্ধ তর্কসিদ্ধান্ত।

—জামাইটার কোন খোঁজও হলোনা, কি যে আছে মেয়েটার বরাতে, বলেন তর্কসিদ্ধান্ত-জায়া।

—আমি আলাদা থাকব বাবা, তুমি ঐখানটায় একটা চালাঘর তুলে দাও, দুর্গাদেবী বলেন।

—তা না হয় দিলাম, কিন্তু তোর চলবে কি করে, একটা পেট তো নয়, বললেন তর্কসিদ্ধান্ত।

—চরখায় সুতো কাটব।

এই ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারী বিদ্যাসাগরের পিতামহী।

আর তাঁর নিরুদ্দিষ্ট স্বামী, রামজয় তর্কভূষণ বিদ্যাসাগরের পিতামহ।

এঁদেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বরচিত শৈশব-চরিতে বিদ্যাসাগর তাঁর পারিবারিক কাহিনী এই ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন:

"প্রপিতামহদেব ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পাঁচ সন্তান। জ্যেষ্ঠ নৃসিংহরাম, মধ্যম গঙ্গাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম রামচরণ। তৃতীয় রামজয় তর্কভূষণ আমার পিতামহ। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের দেহত্যাগের পর, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সংসারে কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। সামান্য বিষয় উপলক্ষে, তাঁহাদের সহিত রামজয় তর্কভূষণের কথান্তর উপস্থিত হইয়া, ক্রমে বিলক্ষণ মনান্তর ঘটিয়া উঠিল। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া এককালে দেশত্যাগী হইলেন।

"বীরসিংহ গ্রামে উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে এক অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ এই উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গা-দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। দুর্গাদেবীর গর্ভে তর্কভূষণ মহাশয়ের দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ কালিদাস; জ্যেষ্ঠা মঙ্গলা, মধ্যমা কমলা, তৃতীয়া গোবিন্দ মণি, চতুর্থী অন্নপূর্ণা। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জনক।

"রামজয় তর্কভূষণ দেশত্যাগী হইলেন। দুর্গাদেবী পুত্রকন্যা লইয়া বনমালী-পুরের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে দুর্গাদেবীর লাঞ্ছনাভোগ ও তদীয় পুত্র কন্যাদের উপর কর্তৃপক্ষের অযত্ন ও অনাদর, এতদূর

পর্যন্ত হইয়া উঠিল যে, দুর্গাদেবীকে পুত্রদ্বয় ও কন্যাচতুষ্টয় লইয়া পিত্রালয় যাইতে হইল। কতিপয় দিবস অতি সমাদরে অতিবাহিত হইল। দুর্গাদেবীর পিতা, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এজন্য সংসারের কর্তৃত্ব তদীয় পুত্র রামসুন্দর বিদ্যাভূষণের হস্তে ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই, পুত্র কন্যা লইয়া, পিত্রালয়ে কালযাপন করা দুর্গাদেবীর পক্ষে বিলক্ষণ অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্যা তাঁহার উপর অতিশয় বিরূপ। অবশেষে দুর্গাদেবীকে পুত্রকন্যা লইয়া পিত্রালয় হইতে বহির্গত হইতে হইল। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় সাতিশয় ক্ষুদ্ধ ও দুঃখিত হইলেন এবং স্বীয় বাটীর অনতিদূরে এক কুটির নির্মিত করিয়া দিলেন। দুর্গাদেবী পুত্রকন্যা লইয়া, সেই কুটীরে অবস্থান ও অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

"ঐ সময়ে, টেকুয়া ও চরকায় সুতা কাটিয়া. সেই সুতা বেচিয়া অনেক নিঃসহায় ও নিরুপায় স্ত্রীলোক আপনাদের দিন গুজরান করিতেন। দুর্গাদেবী সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন···তথাপি তাঁহাদের ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। এই সময়ে জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম ১৪।১৫ বৎসর। তিনি মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া, উপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।"

পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে পৌত্র লিখেছেন: "তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোনও অংশে, কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনও প্রকারে, অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি, সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার প্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই।"

পরে আমরা দেখতে পাব, যে-কথা বিদ্যাসাগর তাঁর পিতামহ সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁর সম্বন্ধেও সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। পিতামহের প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি।

সে আজকের কথা নয় ঠাকুরদাস যখন কলকাতায় আসেন।

পৌরুষের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন ঠাকুরদাস। এই পৌরুষ তিনি পেয়েছিলেন

উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা রামজয় তর্কভূষণের কাছ থেকে। বিদ্যাসাগরেও জীবনেও আমরা দেখতে পাই যে পিতা ও পিতামহের এই তেজস্বিতা নিয়েই তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। এই অনমনীয় তেজস্বিতাই সাগর-চরিত্রের মূল ভিত্তি। আশৈশব দুঃখের সঙ্গে ঠাকুরদাসের পরিচয়। মায়ের অসাধারণ মনোবল ঠাকুরদাস পেয়েছিলেন, তাই না যে বয়সে ছেলেদের বিদ্যার্জনের সময়, ক্রীড়া কৌতুকে দিন কাটাবার সময়, সেই কিশোর বয়সে ঠাকুরদাস মায়ের দুঃখ লাঘব করবার জন্যে, ছোট ছোট ভাই-বোনগুলিকে মানুষ করবার জন্যে, সংসারের দায় নিলেন নিজের মাথায়। এলেন কলকাতায় চাকরীর খোঁজে। এই অসাধারণ চরিত্র পিতার সম্পর্কে বিদ্যাসাগর নিজে লিখেছেন:

"তিনি মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া, উপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। সভারাম বাচস্পতি নামে আমাদের এক সন্নিহিত জ্ঞাতি কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। ঠাকুরদাস, এই সন্নিহিত জ্ঞাতির আবাসে উপস্থিত হইয়া, আত্মপরিচয় দিলেন এবং কি জন্য আসিয়াছেন, অশ্রুপূর্ণলোচনে তাহা ব্যক্ত করিয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার পুত্র জগমোহন ন্যায়ালঙ্কার সাতিশয় দয়া ও সবিশেষ সৌজন্য প্রদর্শনপূর্বক, ঠাকুরদাসকে আশ্রয় প্রদান করিলেন।"

নিরুদ্দিষ্ট পিতার পুত্র ঠাকুরদাস শৈশবে বিশেষ লেখাপড়া শিখবার সুযোগ পান নি। সে আক্ষেপ তিনি তাঁর পুত্রের ভেতর দিয়ে চরিতার্থ করেছিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্ম, আশৈশব সংস্কৃতের অনুরাগী ঠাকুরদাস সংস্কৃত পড়বার জন্যে খুব ব্যগ্র ছিলেন। বনমালীপুরে ও তারপরে বীরসিংহে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের বেশী তিনি অগ্রসর হতে পারেন নি। তাই কলকাতায় এসে ন্যায়ালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে পড়ার ইচ্ছে তাঁর খুবই হয়েছিল, কিন্তু যখনই বীরসিংহ গ্রামের পর্ণকুটীরে আশ্রয়হীনা মায়ের কথা, ছোট ছোট ভাইবোনগুলির কথা ঠাকুরদাসের মনে হতো, তখনই তাঁর সে ইচ্ছা শূন্যে মিলিয়ে যেত। অবশেষে ঠিক করলেন তাড়াতাড়ি উপার্জনক্ষম হবার মত কিছু শিখবেন তিনি।

তখনকার দিনে মোটামুটি ইংরেজি জানলে, ইংরেজ ব্যবসায়ীদের আফিসে কাজের সুবিধা হতো। ঠাকুরদাস তাই সাব্যস্ত করলেন সংস্কৃত নয়,

ইংরেজি শিখবেন তিনি। কিন্তু কোথায়, কার কাছে? ইস্কুল তো নেই, আর থাকলেও তাঁর মত সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র বালকের পক্ষে ইংরেজি স্কুলে পড়া বড় সহজ কথা ছিল না। খুলে বললেন তিনি সব কথা তাঁর আশ্রয়দাতা ন্যায়ালঙ্কার মশাইকে। ন্যায়ালঙ্কারের জানাশুনা একজন লোক কাজ-চলা গোছের ইংরেজি জানতেন। তিনি একজন জাহাজের সরকার। তাঁর অনুরোধে সেই সরকার মশাই ঠাকুরদাসকে ইংরেজি পড়াতে রাজী হলেন। ঠাকুরদাস হাতে যেন স্বর্গ পেলেন। ভদ্রলোকের জাহাজ দেখা-শুনার কাজ ছিল, দিনের বেলায় পড়াবার সময় নেই। তিনি তাই ঠাকুরদাসকে সন্ধ্যার পর তাঁর বাসায় যেতে বললেন। সেই থেকে ঠাকুরদাস প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাঁর কাছে গিয়ে ইংরেজি পড়তে আরম্ভ করলেন। দুঃখিনী মায়ের দুঃখ দূর করার জন্যে ঠাকুরদাসের সে কী দুঃসাধ্য প্রয়াস!

পিতার জীবন-সংগ্রামের এই কাহিনী পুত্র বিদ্যাসাগর এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন: "ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে, সন্ধ্যার পরেই, উপরিলোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত। ঠাকুরদাস ইংরেজি পড়ার অনুরোধে যে সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না; যখন আসিতেন, তখন আর আহার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না; সুতরাং তাঁহাকে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত। এইরূপে নক্তন্তন আহারে বঞ্চিত হইয়া তিনি দিন দিন শীর্ণ ও দুর্বল হইতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমন শীর্ণ ও দুর্বল হইতেছ কেন? তিনি কি কারণে সেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে, অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহার পরিচয় দিলেন।"

সব কথা শুনে ভদ্রলোক তখন ঠাকুরদাসের অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই আশ্রয়দাতা ছিলেন জাতিতে শূদ্র, কাজেই তাঁর বাসায় ঠাকুরদাসকে নিজের হাতে রান্না করে খেতে হতো। এইভাবে ঠাকুরদাসের নির্বিঘ্নে দু'বেলা খাওয়া ও ইংরেজি পড়া চলতে লাগল। কিন্তু প্রতিকূল ভাগ্যের আঘাতে এ আশ্রয়ও তাঁর অদৃষ্টে বেশীদিন স্থায়ী হলো না। অবস্থা বিপর্যয়ে আশ্রয়দাতা ও আশ্রিত দু'জনেরই খুব কষ্ট উপস্থিত হলো। কোন দিন দু'মুঠো জুটতো বেলা দু'টো কি আড়াইটের সময়, কোন দিন সারা দিনই উপোস। কলকাতায় আসবার সময়ে ঠাকুরদাস একখানা পেতলের থালা ও একটা ছোট ঘটি সঙ্গে করে এনেছিলেন।

থালায় ভাত, ঘটিতে জল খেতেন। খাদ্যের অভাবে আকুঞ্চিত উদর— ঠাকুরদাস অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন যে থালাখানা বেচে দেবেন, তা'হলে অন্তত দিন দশবারো খাওয়া চলবে। যেদিন দিনের বেলায় আহারের যোগাড় না হবে, সেদিন থালাবেচার পয়সা থেকে এক পয়সার কিছু কিনে খাবেন—এই ঠিক করে তিনি কাঁসারির দোকানে গেলেন থালা বেচতে। বেচা হলো না—কোন দোকানদারই সেই অপরিচিত যুবকের কাছ থেকে পুরাণো থালা কিনতে চাইল না। বিষণ্ণ মনে ঠাকুরদাস বাসায় ফিরে এলেন।

ঠাকুরদাসের জীবনে এই সময়কার একদিনের একটি ঘটনা বিদ্যাসাগর অতি মর্মস্পর্শী ভাবে বর্ণনা করেছেন :

"একদিন, মধ্যাহ্ন সময়ে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহির্গত হইলেন এবং অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিপ্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া তিনি অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পাইলেন। ক্ষুধার যাতনা ভুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্যন্ত গিয়া, এত ক্লান্ত এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এত অভিভূত হইলেন যে, আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই, তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন? ঠাকুরদাস, তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি সাদর ও সস্নেহ বাক্যে, ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস যেরূপ ব্যগ্র হইয়া, মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাঠাকুর আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই? তিনি বলিলেন, না, মা আজ আমি, এখন পর্যন্ত, কিছুই খাই নাই। তখন, সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাবাঠাকুর জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর দই কিনিয়া আনিলেন এবং আরো মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন; পরে তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেদিন তোমার এইরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া

ফলার করিয়া যাইবে।...যে যে দিন, দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত, ঠাকুরদাস সেই সেই দিন, ঐ দয়াময়ীর আশ্বাসবাক্য অনুসারে তাঁহার দোকানে গিয়া, পেট ভরিয়া ফলার করিয়া আসিতেন।”

পিতার জীবনের এই ঘটনাটি পুত্রের জীবনে পরবর্তিকালে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং সেই থেকেই মেয়েদের ওপর বিদ্যাসাগরের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মায়। যে অশিক্ষিতা নারীর অযাচিত দাক্ষিণ্য তাঁর পিতাকে এই কলকাতা শহরে সেদিন অনাহার থেকে রক্ষা করেছিল, বিদ্যাসাগর তার ভেতর দিয়ে সমগ্র স্ত্রীজাতির মাতৃহৃদয়ের কোমলতার আস্বাদ পেয়েছিলেন বলেই, পরবর্তী কালে তিনি তাদের উন্নতিকল্পে নিজের প্রতিভা ও সামর্থ্য নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর কাছে ঘটনাটি তুচ্ছ বা সামান্য বলে মনে হয়নি, কেননা এর ভেতর দিয়েই বিদ্যাসাগরের কাছে নারীর মাতৃহৃদয়ের নিঃস্বার্থ করুণার পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছিল। তাই তিনি তাঁর স্বরচিত জীবন-চরিতে এই অখ্যাত অজ্ঞাত নারীকে অমর করে গেছেন। কতখানি সংবেদনশীলচিত্ত হলে পিতার জীবনের এই ঘটনাটিকে এমনভাবে স্মরণীয় করে রাখা যায়, তা একমাত্র বিদ্যাসাগরের জীবনেই আমরা দেখতে পাই। জীবন-সংগ্রামে রত তাঁর পিতাকে অনাহার থেকে যে নারী বাঁচিয়েছিল, সেই নারীর প্রতি এবং তার ভেতর দিয়ে সমগ্র নারীজাতির স্নেহের প্রতি এই যে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন, এর তুলনা কোথায়?

তাই বুঝি বিদ্যাসাগর তাঁর অসম্পূর্ণ জীবনচরিতে এই ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন: “পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারক উপাখ্যান শুনিয়া আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই এরূপ দয়া প্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন না।”

দিন যায়। চাকরী আর হয় না। বীরসিংহের কুটীরে চরখার সুতো কেটে মা দিন কাটাচ্ছেন—এই কথা যখনই মনে হতো, ঠাকুরদাস তখনি অস্থির হয়ে উঠতেন। ক্ষুধার্ত, শীর্ণ ভাইবোনদের কথা মনে হয়, ঠাকুরদাস পাগল হয়ে যান। —কোন সুযোগে আমাকে কোথায় একটু কাজ করে দিন, একদিন বললেন

ঠাকুরদাস তাঁর আশ্রয়দাতাকে। সে কী আকুতি, সে কী আবেদন!—দেখুন আমার মা ভাই বোনের কথা যখন মনে হয়, তখন আর মুহূর্তের জন্য বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

মুখে কথা বলেন আর চোখের জলে বুক ভেসে যায় ঠাকুরদাসের। ভদ্রলোকের দয়া হলো।

কিছুদিন পরে ঠাকুরদাসের একটা চাকরী মিললো।

মাইনে মাসে দু'টাকা।

ঠাকুরদাসের আনন্দের সীমা নেই।

নিজে তেমনি কষ্ট করে থেকে মাইনের দু'টাকা বাড়িতে পাঠাতে লাগলেন।

দুর্গাদেবীর সংসারে লক্ষ্মীর পদসঞ্চার হলো।

ছেলের চাকরী হয়েছে, মায়ের আনন্দ; দাদার চাকরী হয়েছে ভাইবোনেরা আনন্দে দিশাহারা।

সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে চাকরী করতে লাগলেন ঠাকুরদাস। তাঁর সেই প্রাণঢালা শ্রমের মূল্যও তিনি পেলেন। তিন বছরের মধ্যে মাইনে বেড়ে হলো পাঁচ টাকা। বীরসিংহে দুর্গাদেবীর কুটীরে লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। অন্নকষ্ট আর নেই। নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর দায় তিনি বইতে পেরেছেন, তাঁর ঠাকুরদাস মানুষ হয়েছে, কলকাতায় পাঁচ টাকা মাইনের চাকরী করছে—এতেই তাঁর বুক ভরে ওঠে। তাঁর চরখা-কাটা সার্থক হয়েছে।

সৌভাগ্য যখন আসে তখন একলা আসেনা—এই প্রবাদ বাক্যকে সফল করে ঠিক এমনি সময়ে নিরুদ্দিষ্ট রামজয় একদিন বাড়ি ফিরলেন। পিতামহের এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনের কাহিনী পৌত্রের লেখনীতে এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে:

"দুই তিন বৎসরের পরেই ঠাকুরদাস মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জননীর ও ভাই-ভগিনীগুলির অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে কষ্ট দূর হইল। এই সময়ে পিতামহদেবও দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ বনমালীপুরে গিয়াছিলেন, তথায় স্ত্রীপুত্রকন্যা দেখিতে না পাইয়া, বীরসিংহে আসিয়া পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। সাত আট বৎসরের পর, তাঁহার সমাগমলাভে, সকলেই আহ্লাদসাগরে মগ্ন

হইলেন। শ্বশুরালয়ে, বা শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে, বাস করা তিনি অবমাননা জ্ঞান করিতেন ; এজন্য কিছুদিন পরেই, পরিবার লইয়া বনমালীপুরে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গাদেবীর মুখে ভ্রাতাদের আচরণের পরিচয় পাইয়া সে উদ্যম হইতে বিরত হইলেন, এবং নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক বীরসিংহে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। এইরূপে, বীরসিংহ গ্রামে আমাদের বাস হইয়াছিল।"

তারপর রামজয় এলেন কলকাতায়।

দীর্ঘকাল পরে পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎ। যে নাবালক ছেলে তিনি রেখে-গিয়েছিলেন, সে এখন শুধু প্রাপ্তবয়স্ক নয়, উপার্জনক্ষমও বটে। নিজের চোখে দেখলেন রামজয়, ঠাকুরদাসের কষ্টসহিষ্ণুতা আর কর্মে একাগ্র নিষ্ঠা। সন্তুষ্ট হলেন, আশীর্ব্বাদ করলেন ছেলেকে। কিন্তু এভাবে পরাশ্রয়ী হয়ে থাকলে তো চলবে না, রামজয় বললেন ঠাকুরদাসকে। উপায়? এইভাবে কষ্ট করে আছি বলেই তো বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারছি, বলেন ঠাকুরদাস। সেই সময়ে কলকাতার দয়েহাটায় থাকতেন ভাগবতচরণ সিংহ। উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ। সঙ্গতি-সম্পন্ন। তর্কভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচয় ছিল তাঁর। সিংহ মহাশয় যেমন দয়াশীল তেমন সদাশয় মানুষ। তিনি শ্রদ্ধা করতেন রামজয়কে। তাঁর কাছে সব কথা শুনে ভাগবতচরণ ঠাকুরদাসকে তাঁর বাড়িতেই থাকবার কথা বললেন। ঠাকুরদাস রাজী হলেন, দু'বেলা নিশ্চিন্তে খেতে পাবেন—এ যেন তাঁর পুনর্জন্ম। পুত্রকে ভাগবতচরণের আশ্রয়ে রেখে রামজয় দেশে ফিরলেন। সৌভাগ্যের ওপর সৌভাগ্য—সিংহ-মহাশয়ের চেষ্টায় ঠাকুরদাসের একটা ভাল চাকরী হলো। মাইনে আট টাকা। দুর্গাদেবীর আনন্দের সীমা রইল না। লক্ষীর ঘট স্থাপন করলেন তিনি বীরসিংহের কুঁড়েঘরে।

ঠাকুরদাসের বয়স তখন তেইশ-চব্বিশ বছর।

—জানো, ফিরলাম কেন? একদিন দুর্গাদেবীকে বললেন রামজয়।

—জানিনা তো।

—তীর্থে ঘুরতে ঘুরতে এক রাতে কেদার পাহাড়ে স্বপ্ন দেখলাম তোমরা বনমালীপুর ছেড়ে বীরসিংহ গ্রামে বাস করছ, তোমাদের কষ্টের একশেষ।

—তাই বুঝি চলে এলে ?

—না, স্বপ্নে আরো দেখলাম যে আমার বংশে এক শক্তিশালী অদ্ভুতকর্মা মহাপুরুষ জন্মাবে। সে আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। আমি ঠাকুরদাসের বিয়ে দেব। এখন তোমার ভাবনা কি ? কালিদাস উপায় করছে, ঠাকুরদাস উপায় করছে—মা-লক্ষ্মী প্রসন্ন, এখন একটি জ্যান্ত মা-লক্ষ্মীকে ঘরে আনতে হবে, কি বল ?

দুর্গাদেবী সায় দিলেন। দুজনে মিলে ছেলের জন্যে উপযুক্ত পাত্রীর খোঁজ করতে লাগলেন। গোঘাটের রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয় কন্যা ভগবতীর খবর পাওয়া গেল। রামজয় পাত্রী দেখতে গেলেন একদিন। পাতুলগ্রামে মেয়ের মামার বাড়ি। সেখানেই সে মানুষ। রামজয় পাতুল থেকে ফিরে এসে স্ত্রীকে বললেন, হ্যাঁ, ভগবতী বটে ; রূপে গুণে সত্যিই ভগবতী। অত্যন্ত সুলক্ষণা মেয়ে। আমি তর্কবাগীশের এই মেয়ের সঙ্গেই ঠাকুরদাসের বিয়ে ঠিক করে এলাম।

যেমন তেজস্বী তেমনি স্বাধীনচেতা পুরুষ রামজয়।

মাথা নীচু করে চলতে তিনি জানতেন না। কারো অনাদর উপেক্ষা মুখ বুজে সহ্য করতেন না।

এমন কি উপকার প্রত্যাশায় কারো কাছে হীনতা স্বীকার করতেন না তিনি। তেজস্বী, অথচ ছোট বড় সকলের সঙ্গে সমান সস্নেহ ব্যবহার।

আবার অত্যন্ত স্পষ্টবাদী মানুষ—মানুষের মন রেখে কথা বলতে জানতেন না। বীরসিংহের দুর্বাসাসদৃশ এই ব্রাহ্মণকে গ্রামের ভূ-স্বামী তাঁর বাস্তভিটার জমিটুকু নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর করে দিতে চাইলেন। এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে ? আত্মীয় স্বজনেরা অনুরোধ করল রামজয়কে জমিদারের এই দান নেবার জন্যে। কিন্তু অন্য প্রকৃতির মানুষ রামজয়। বললেন—কী, আমি নেব নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর আর আমার পুণ্যের ভাগ নিয়ে অহঙ্কার বাড়বে জমিদারের ? ব্রহ্মোত্তরের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন তিনি।

পিতামহের এই মানসিক বল সম্পর্কে পৌত্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"তিনি কখনো পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল।

তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপুত ও নৈমিত্তিক কর্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন।”

পিতামহের এই তেজস্বিতা, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, সত্যবাদিতা ও সরলতা পৌত্র বিদ্যাসাগর পুরোমাত্রায়ই পেয়েছিলেন।

যথাসময়ে ঠাকুরদাসের বিয়ে হলো।

রামজয় আবার তীর্থভ্রমণে বেরুলেন।

পুত্রবধূকে বরণ করে নেবার সময় দুর্গাদেবী শান্ত, নম্র, করুণায় স্নিগ্ধ ভগবতীর মুখের পানে তাকিয়ে বললেন—ভগবতীই বটে। পাত্রী নির্বাচনে রামজয় ভুল করেন নি।

কিছুদিন বাদে যখন ফিরলেন তখন পুত্রবধূ ভগবতী দেবী সন্তান-সম্ভবা।

কিন্তু এসে দেখলেন পুত্রকে গর্ভ ধারণ করে অবধি ছেলের বৌ পাগল। ঘোর উন্মাদ। দশ মাস ধরে কত চিকিৎসা চললো, কোন ফলই হলো না। রামজয় সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—ভয়ের কিছু নেই। ছেলে ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুত্রবধূ আরোগ্যলাভ করবে। জ্যোতিষী ভবানন্দ ভট্টাচার্যকে ডেকে আনা হলো। তিনি শুনে বললেন—মহাপুরুষের জন্মের সুলক্ষণ দেখেছি, উদ্বেগের কোন কারণ নেই।

তারপর ইতিহাসের এক মঙ্গল লগ্নে জন্মগ্রহণ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

তাঁর সেই জন্মক্ষণে ঘোষিত হল এক যুগ-সংক্রান্তি।

গরিমাময় আর এক যুগের যাত্রা হলো আরম্ভ।

॥ দুই ॥

ক্ষণজন্মা বিদ্যাসাগরের জন্ম হলো।

রামজয় পৌত্রের নাম রাখলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে দরিদ্র ঠাকুরদাসের কুটীরে একটু করে লক্ষ্মী-শ্রী দেখা দিল। বিদ্যাসাগর জন্মালেন মহাপুরুষের সকল সুলক্ষণ নিয়ে। সেই সব সুলক্ষণের মধ্যে একটি ছিল একগুঁয়েমি। প্রতিবেশীদের কাছে তিনি পয়মন্ত এবং সেই কারণেই প্রীতির পাত্র।

জন্ম হলো দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে এক কীর্তিধ্বজ এঁড়ে বাছুরের। সেদিন মঙ্গলবার। ঠাকুরদাস বাড়ি ছিলেন না। কোমরগঞ্জের হাটে গিয়েছিলেন। ফিরবার পথে বাপের সঙ্গে দেখা। রামজয় বললেন, ঠাকুরদাস, আজ আমাদের একটা এঁড়েবাছুর হয়েছে।

পিতার রহস্য পুত্র বুঝতে পারলেন না। বাড়িতে সেই সময়ে একটি পূর্ণগর্ভা গাভীও ছিল। পিতা-পুত্রে সত্বর বাড়িতে ফিরলেন। ঠাকুরদাস গোয়ালে গিয়ে দেখেন, বাছুর হয় নি। রামজয় তখন ঠাকুরদাসকে সূতিকাঘরের কাছে নিয়ে এলেন এবং সদ্যোজাত শিশুটিকে দেখিয়ে বললেন—এই সেই এঁড়ে। আমি বলে রাখছি ঠাকুরদাস—এ-ছেলে এঁড়ের মতই একগুঁয়ে হবে।

দীর্ঘদর্শী প্রবীণ রামজয় বোধ হয় শিশুর ললাট-লক্ষণ অথবা হাতের রেখা দেখে এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কিন্তু বাংলার ইতিহাসই যে তখন একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ছিল, রামজয় বা ঠাকুরদাস কেউ-ই তা জানতে পারেন নি। সেই পুরুষসিংহই তো জন্ম নিলেন বীরসিংহ গ্রামে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র হয়ে। জন্মালেন তিনি পলাশি যুদ্ধের তেষট্টি বছর বাদে।

স্বর্ণগর্ভা ভগবতী দেবীর গর্ভে জন্মালেন বিদ্যাসাগর। জন্মালেন নবজাতীয়তার বিগ্রহমূর্তি।

করুণাময়ী নারী ভগবতী দেবী। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

তর্কবাগীশ মশাই ছিলেন সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক। বাপের প্রকৃতি মেয়ে কিছুটা পেয়েছিলেন। কিন্তু পিতা উন্মাদগ্রস্ত হবার পর থেকে ভগবতী দেবী আশৈশব তাঁর মাতুলালয়ে মানুষ হয়েছিলেন। মামার বাড়ির পরিবেশ ছিল পরিচ্ছন্ন ও উদার। সেই আদর্শ হিন্দু গৃহের ক্রিয়াকলাপ, রীতিনীতি ও ভাবভক্তি ভগবতী দেবীর চরিত্রগঠনে বিশেষ সহায়তা করেছিল। পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ ছিলেন পাতুলের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। মেয়েদের নিয়ে গঙ্গাদেবী যখন বাপের বাড়ি এসে আশ্রয় নিলেন তখন বিদ্যাবাগীশ মশাই বেঁচে নেই। বড় ভাই রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ছোট বোন ও তার মেয়ে দুটিকে (লক্ষ্মী ও ভগবতী) পরম সমাদরে আশ্রয় দিলেন। মায়ের মাতুলালয়ের প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর তাঁর স্বরচিত জীবন-চরিতে লিখেছেন:

"অতিথির সেবা, অভ্যাগতের পরিচর্যা এই পরিবারে যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধাসহকারে সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ ঐ অঞ্চলের কোন পরিবার এ বিষয়ে এই পরিবারের ন্যায় প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ফল কথা এই, অন্ন প্রার্থনায় রাধামোহন বিদ্যাভূষণের দ্বারস্থ হইয়া কেহ কখনও প্রত্যাগত হইয়াছেন, ইহা কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে অবস্থার লোক হউক, লোকের সংখ্যা যতই হউক, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আবাসে আসিয়া সকলেই, পরম সমাদরে, অতিথি-সেবা ও অভ্যাগত-পরিচর্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও তদীয় পরিবারবর্গের নিকট আমরা অশেষ প্রকারে যে প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পরিশোধ হইতে পারে না। আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছিল, মাতৃদেবী পুত্র-কন্যা লইয়া মাতুলালয়ে যাইতেন, এবং এক যাত্রায়, ক্রমান্বয়ে পাঁচ ছয় মাস বাস করিতেন, কিন্তু একদিনের জন্যেও স্নেহ, যত্ন সমাদরের ত্রুটি হইত না। বস্তুতঃ ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয়ীর পুত্রকন্যাদের উপর এরূপ স্নেহপ্রদর্শন অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার।"

বিদ্যাসাগরের পিতা, পিতামহের কথা বলেছি, পিতামহীর কথাও বলেছি। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা কিংবা পিতামহ তাঁকে কোন সম্পত্তিই দিতে পারেন নি সত্য, কিন্তু এমন কিছু দিয়েছিলেন যার গুণে

উত্তরকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যায় বিদ্যার সাগর আর গুণে গুণের সাগর হয়েছিলেন। পিতা ও পিতামহের দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়ণতা, অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা, আত্মনির্ভরতা এবং নির্ভীকতা প্রভৃতি একাধিক সদ্‌গুণ তিনি লাভ করেছিলেন। আর তাঁর মায়ের কাছ থেকে তিনি কী পেয়েছিলেন?

বিদ্যাসাগরের মতন মাতৃসৌভাগ্য খুব কম সন্তানের ভাগ্যেই ঘটে। রবীন্দ্রনাথ সত্যই লিখেছেন: "বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে এই ভগবতী দেবী এক অসামান্য রমণী ছিলেন। ভগবতী দেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশীকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত।...দয়াবৃত্তি আরো অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোন প্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না।"

এমন দয়াবতী নারীর পুত্র হয়ে জন্মেছিলেন বলেই উত্তরকালে বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর হতে পেরেছিলেন। মায়ের এই অসামান্য ও উদার-চরিত্রই বিদ্যাসাগরকে অমন মাতৃভক্ত করে তুলেছিল। তাঁর শরীরের রক্তধারার সঙ্গে জননীর হৃদয়ের করুণার ধারা ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল বলেই বিদ্যাসাগর তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে প্রেরণা ও শক্তি ভগবতী দেবীর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁর এই কীর্তিমান পুত্রের অসামান্য হৃদয়বত্তা আদৌ কল্পনা করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনচরিতকার তাই লিখেছেন:

"তিনি জননীর নিকট জননীর মাতুলালয়ের দয়াদাক্ষিণ্য, পরদুঃখকাতরতা ও পরসেবার ভাব লাভ করিয়াছিলেন। সে গৃহে, যে দয়ার চিত্র দেখিয়া তিনি এবং তাঁহার জননী চিরমুগ্ধ ছিলেন এবং তিনি যাহা নিজে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার মনুষ্যত্বলাভের মূলমন্ত্র। সেই মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া তিনি দয়ার সাগরে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃমাতৃ-কুলের ঐ উভয়বিধ ভাব মিলিত হইয়া তাঁহাকে এক বিচিত্রভাবে গঠন করিয়াছিল...পিতার দিক হইতে পৌরুষ ভাবের তীক্ষ্ণ রেখা ও জননীর দিক হইতে দুঃখমোচন জন্য কোমলতার সুমিষ্ট ধারা পরস্পর মিলিত হইয়া দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর-চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে।"

বিদ্যাসাগরের জীবনে তাঁর মা ও বাবার প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট একথা তিনি নিজেই স্বীকার করে গেছেন। তাঁর নিজেরই উক্তি: "যদি

আমার দয়া থাকে ত মা'র নিকট হইতে পাইয়াছি, বুদ্ধি থাকে ত বাবার নিকট হইতে পাইয়াছি।" পিতার পৌরুষ ও মাতার কোমলতা—এই দুই উপাদানে গঠিত ঈশ্বরচন্দ্র।

সাগর-চরিত্র দাঁড়িয়ে আছে এই কোমলতাময় পৌরুষভূমির ওপর।

পিতৃকুলের ন্যায়নিষ্ঠা ও তেজস্বিতা আর মাতৃকুলের লোকসেবা ও করুণা—এই নিয়েই বিদ্যাসাগর।

দরিদ্রের সংসারে সৌভাগ্যের সূচনা করেই ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম।

এজন্যে তিনি সকলের স্নেহের পাত্র ছিলেন।

পরিজনবর্গ ও প্রতিবেশীর স্নেহের আধিক্য বালককে করে তুললো দুরন্ত।

ঠাকুরদাসের 'এঁড়ে বাছুরের' দুরন্তপণায় সময় সময় অনেকেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। বালক ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দুরন্তপনার ফলে প্রতিবেশীদের প্রীতির পাত্র ও অশান্তির হেতু হয়ে উঠেছিলেন।

একদিন মাঠের পাশ দিয়ে চলেছেন ঈশ্বর। দৃষ্টি পড়ল ধানশীষের ওপর। বায়ুভরে হিল্লোলিত সবুজ শ্যামল শীষ। খেতে লোভ হলো বালকের। তুললেন হাতের মুঠো করে কয়েকটা শীষ। চিবিয়ে খেলেন। গলায় আটকে গেল সুতীক্ষ্ণ সেই শীষ। কণ্ঠরুদ্ধ, প্রাণ সংশয় হয়ে ওঠে বালকের। পিতামহী গলায় আঙুল দিয়ে সেই শীষ টেনে বের করলেন। ঈশ্বরের জীবনরক্ষা হলো সে যাত্রায়। এমনি কত দুরন্তপনার কাহিনী তাঁর বাল্যজীবনের ইতিহাসে লেখা আছে।

রামজয়ের দৃষ্টি কিন্তু সর্বক্ষণের জন্যে পৌত্রের ওপর। পৌত্রকে দেখেন আর কেদার পাহাড়ে সেই স্বপ্নের কথা মনে হয়। ভাবেন, তীর্থস্থানের স্বপ্ন মিথ্যা হবার নয়।

—মহাপুরুষ যদি হবে তোমার নাতি, তবে এমন দুরন্ত কেন? কখনো কখনো জিজ্ঞাসা করতেন দুর্গাদেবী।

—ও কিছু না। সব মহাপুরুষই ছেলেবেলায় অমন একটু আধটু দস্যিপণা করেছেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা জান না? নিমাই পণ্ডিতের দৌরাত্ম্যে নদীয়ার লোক ত সেদিন অস্থির হয়েছিল। শচীমাতার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না।

—তা তোমার নাতি ত আর নিমাই পণ্ডিত হচ্ছে না, হেসে বলেন দুর্গাদেবী। দ্বারান্তরালে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভগবতী দেবী। যেন পুঞ্জীভূত করুণার প্রতিমা। মাধুর্যে গড়া। পুত্রবধূকে উদ্দেশ করে রামজয় বলেন—শুনলে বৌমা, তোমার শাশুড়ীর কথা? আমি বলে রাখলাম, এ ছেলে যদি বিদ্যের সাগর না হয়, তবে আমি পৈতে ফেলে দেব।

দুর্গাদেবী আর তর্ক করেন না। এমন সময়ে বৃহৎ মাথাটি দুলিয়ে, বামনাবতার সদৃশ ক্ষুদ্র শরীরটি নিয়ে, পৌত্র এসে দাঁড়ায় পিতামহ ও পিতামহীর মাঝখানে। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কলহ নিস্তব্ধ হয়। প্রসারিত হাত দুখানি দিয়ে পৌত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরেন রামজয়।

দেখতে দেখতে ঈশ্বরচন্দ্রের পাঁচ বছর বয়স হলো।

ছেলেবেলা থেকেই জেদি। বাড়ির সবাই, বিশেষ করে ঠাকুরদাস, 'এঁড়ে বাছুরটির' চরিত্রের এই বিশেষত্ব বুঝে চলতেন। পরবর্তীকালে এই জেদ দৃঢ়চিত্ততায় পরিণত হয়ে বিদ্যাসাগরের চরিত্রকে মহান করে তুলেছিল।

ঠাকুরদাস ছেলেকে পাঠশালায় ভর্তি করে দিলেন।

কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালা। আদর্শ গুরুমশাই কালীকান্ত। প্রহারপটু সনাতন সরকারের ঠিক উল্টো তিনি। বেতের চেয়ে স্নেহের শাসনই বেশী বুঝতেন। কালীকান্তের সৌজন্যে বীরসিংহের অনেকেই তাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন ঠাকুরদাস। আর সবচেয়ে অনুরাগী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। সেই কালীকান্তের পাঠশালায় বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনের আরম্ভ। পাঠশালার এই গুরুমশাইকে বিদ্যাসাগর চিরদিন মনে রেখেছিলেন। তাই পরবর্তীকালে তিনি বলেছিলেন, বস্তুতঃ পূজ্যপাদ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গুরুমহাশয়দলের আদর্শ ছিলেন।

হাতের লেখা ত নয় যেন মুক্তোর অক্ষর।

এমন সুন্দর ছিল ঈশ্বরের হাতের লেখা।

আর সব পড়ুয়াদের ডেকে সেই লেখা দেখিয়ে, গুরুমশাই বলতেন—তোরা সব কি হিজিবিজি লিখিস, আর ঈশ্বরের লেখা ছাখ্ তো—যেন মুক্তো।

শুধু কী হাতের লেখা? পড়ায় এমন চৌকস ছাত্র কালীকান্তের পাঠশালায় আর দ্বিতীয়টি ছিল না। বালকের বুদ্ধিমত্তা ও ধৃতিক্ষমতা দেখে কালীকান্ত

প্রায়ই বলতেন—এ ছেলে ভবিষ্যতে বড় লোক হবে। ছাত্র গুরুমশাইয়ের মন এমনই কেড়ে নিয়েছিল যে, তিনি তাকে প্রতিদিন কোলে করে নিয়ে বাড়িতে রেখে আসতেন। তাই না বিদ্যাসাগর তাঁর ছাত্রজীবনের গুরুর প্রতি আজীবন ভক্তিমান্ ছিলেন।

এক বছর পরে কঠিন অসুখ করল ঈশ্বরের। উদরাময় ও প্লীহাজ্বর। অতটুকু শরীরে অতবড় অসুখের ধকল সইবে কেন? ছ'মাস ভুগে শরীর হলো জীর্ণ-শীর্ণ। বীরসিংহ গ্রামে আরোগ্য লাভের আশা নেই দেখে ঈশ্বরচন্দ্রের মায়ের বড়মামা রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ঈশ্বরচন্দ্রের চিকিৎসার দায়ীত্ব নিলেন। পাতুলে নিয়ে এলেন ভগবতী ও ঈশ্বরচন্দ্রকে। রামগোপাল কবিরাজের চিকিৎসায় ছ'মাস বাদে ঈশ্বর আরোগ্যলাভ করে আগের স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন।

আবার নতুন করে পাঠশালায় পড়তে লাগলেন।

পাঠশালার পড়া চললো আট বছর বয়স পর্যন্ত। এই তিন বছর ঈশ্বরের মেধাশক্তি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও পরিশ্রম করবার ক্ষমতা দেখে গ্রাম্য, পাঠশালার গুরুমশাই বিস্মিত। তিনি যে কালীকান্তের প্রিয় ছাত্র ছিলেন তা নয়, কালীকান্তেরও খুব টান ছিল ঈশ্বরের ওপর। এই সময়ে একদিন তিনি ঠাকুরদাসকে বললেন—এখানকার পাঠশালায় যা শেখবার ঈশ্বর তো তা শিখেছে। ঈশ্বরের হাতের লেখা অতি সুন্দর। একে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ইংরেজি শেখালে ভাল হয়। ছেলে যেমন মেধাবী, এর স্মৃতিশক্তি যেমন প্রখর তাতে এ যা শিখবে তাতেই পারদর্শিতা দেখাতে পারবে। কালীকান্তের কথা শুনে ঠাকুরদাস ছেলেকে কলকাতায় আনাই স্থির করলেন।

ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে আসবেন জল্পনা-কল্পনা করেছেন ঠাকুরদাস, এমন সময় রামজয় তর্কভূষণের মৃত্যুতে গাঢ় শোকের ছায়া নামল বীরসিংহের বাঁড়ুয্যেদের কুটিরে। ছিয়াত্তর বছর বয়সে অতিসার রোগে ভুগে মারা গেলেন রামজয়। পৌত্রের ভবিষ্যতের সূচনা মাত্র দেখে গেলেন তিনি। বাপের মৃত্যুর খবর পেয়ে ঠাকুরদাস এলেন কলকাতা থেকে। যথাসাধ্য পিতার শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করলেন।

কার্তিক মাসের শেষ ভাগ।

আজ থেকে একশো আটাশ বছর আগের কথা।

পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরদাস চলেছেন কলকাতায়। সঙ্গে আছেন গুরুমশাই করালীকান্ত আর চাকর আনন্দরাম। তখন জলপথ বড় সুগম ছিল না। উলুবেড়ের নতুন খালও তখন কাটা হয়নি। আর "কলকাতা সবেমাত্র তার গ্রাম্য বেশ ছেড়ে আধুনিক নাগরিক রূপ ধারণ করছে।" গাঙের মাঝ দিয়ে নৌকো করে আসাও বিপজ্জনক ছিল। একে তো ঝড় তুফানের ভয়, তার ওপর জল-দস্যুদের উপদ্রব। কাজেই গৃহস্থরা বড় কেউ নৌকা করে আসত না। হাঁটা-পথেই তখন লোকে মেদিনীপুর থেকে কলকাতা আসত। ঠাকুরদাসও এলেন হাঁটাপথে।

শুভদিনে যাত্রা শুরু হলো। বালক ঈশ্বরচন্দ্র পিতামহীকে প্রণাম করলেন, মা-কে প্রণাম করলেন। আট বছরের ছেলে দূর বিদেশে পড়তে চলেছে—ওই কথা মনে করেই পুত্রকে জড়িয়ে ধরে ভগবতী দেবী কেঁদে ফেললেন। অবিরল সেই অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হলেন বিদ্যাসাগর। মাতৃভক্ত পুত্র, পুত্রবৎসলা জননীর কাছ থেকে এইভাবে সেদিন বিদায় নিয়েছিলেন। প্রতিবেশীদের কেউ কেউ দেখতে এল। রামজয়ের পৌত্র, বীরসিংহের দুরন্ত ছেলে ঈশ্বর চলেছেন বাপের হাত ধরে কলকাতায় লেখাপড়া করতে। সকলের শুভ ইচ্ছার ভেতর দিয়ে পথ করে ঠাকুরদাস যাত্রা করলেন 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলে। ইতিহাসের গর্ভেও অলক্ষ্যে উঠল একটা মৃদু আলোড়ন—বাংলার ইতিহাস যিনি গড়ে তুলবেন নিজের হাতে, সেই কিশোর বালক বাপের হাত ধরে পায়ে হেঁটে চললেন কলকাতায়। অবশ্য সারা পথ তাঁকে হেঁটে আসতে হয়নি। কখনো আনন্দরামের কোলে, কখনো ঠাকুরদাসের কাঁধে, কখন বা পদব্রজে—এইভাবে ঈশ্বরচন্দ্র দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন। তিন দিন দু'রাত লেগেছিল তাঁদের কলকাতায় আসতে। এর প্রথম রাত ঠাকুরদাস সদলবলে অতিবাহিত করেন পাতুলগ্রামে তাঁর মামাশ্বশুরের বাড়িতে, দ্বিতীয় রাত সন্ধিপুর গ্রামে এক আত্মীয় ব্রাহ্মণের বাড়িতে; তৃতীয় দিনে তাঁরা শেয়াখালা থেকে শালিমারের বাঁধা রাস্তা দিয়ে কলকাতায় এসে পৌছলেন। নবীনা মহানগরী সেদিন কী রূপ নিয়ে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের দৃষ্টিপথে এসে দাঁড়িয়েছিল তা শুধু অনুমান সাপেক্ষ, কেন না বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম কলকাতা-দেখার কোন বর্ণনাই রেখে যান নি। আর নতুন শহরে প্রথম পদার্পণ করে তাঁর মনের ভাবই বা কী হয়েছিল—তাও আজ আমাদের কল্পনার বিষয়মাত্র। তবে বিদ্যাসাগরের

এই প্রথম পদব্রজে কলকাতা আসার সঙ্গে একটি কাহিনীর উল্লেখ তাঁর প্রায় জীবনচরিতকারই করে গেছেন। বিদ্যাসাগরের শৈশবের অসাধারণত্বের ইঙ্গিত আছে এই কাহিনীটির মধ্যে। সে কাহিনী হলো পথের মাইল-ষ্টোন দেখে মুখে মুখে ইংরেজী এক-দুই তিন সংখ্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া। বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতা আসার ইতিহাসে এই সামান্য কাহিনীটির ব্যঞ্জনা অসাধারণ। কথিত আছে, বালক প্রথম মাইল-ষ্টোনখানি দেখে পরম কৌতূহল ভরে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বাবা, বাটনা-বাটা শিলের মতন এটা কি গা?

—এর নাম মাইল-ষ্টোন, ঠাকুরদাস ঈষৎ হেসে বললেন। আধক্রোশ অন্তর পোঁতা সেই মাইল-ষ্টোনের গায়ে উৎকীর্ণ ইংরেজী এক থেকে দশ অক্ষর পর্যন্ত বালক ঈশ্বরচন্দ্র নিজের উৎসাহেই শিখে ফেললেন। বোধ করি, গ্রাম্য গুরু-মশাই করালীকান্তকে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে অভিভূত করে থাকবে। তাই তিনি বালকের এই অদ্ভুত মেধা দেখে ঠাকুরদাসকে না বলে পারেন নি: ঈশ্বরের লেখাপড়ার ভাল বন্দোবস্ত করবেন। যদি বেঁচে থাকে, এ ছেলে মানুষ হবে। আজ এই ঘটনাটি ইতিহাসের গভীরতা নিয়েই আমাদের সামনে বিদ্যাসাগরের জীবনেতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই প্রতিভাত না হয়ে পারে না।

সন্ধ্যা হয় হয়।

খেয়াঘাটের নৌকো এসে ভিড়ল কলকাতার ঘাটে। জবচার্ণকের কলকতা। যাত্রীরা নামলেন। গন্তব্যস্থান কাছেই। বড়বাজারের দয়েহাটা। ভাগবত-চরণ সিংহের বাড়। এই ভাগবতচরণই একদিন তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন ঠাকুরদাসকে। সে আজ পঁচিশ বছর আগের কথা। ভাগবত বেঁচে নেই। তাঁর ছেলে জগদ্দুর্লভ তখন কর্তা। বয়স মাত্র পঁচিশ বছর। বড়বাজারে দয়েহাটা আজো আছে, কিন্তু কোথায় সেই ঐতিহাসিক সিংহ-বাড়ি—যে বাড়ির এক গৃহের কোণে প্রদীপ জ্বেলে বালক ঈশ্বরচন্দ্র লেখাপড়া করতেন?

সিংহ-বাড়িতে ঈশ্বরচন্দ্র শুধু আশ্রয়ই পাননি, স্নেহও পেয়েছিলেন অপর্যাপ্ত। পেয়েছিলেন মায়া-মমতা। যেটুকু না পেলে সম্ভবত তাঁর জীবন এমন স্নিগ্ধ

হয়ে উঠত না। এই মায়া-মমতা ও স্নেহের কেন্দ্রে ছিলেন রাইমণি—ভাগবত চরণের বিধবা মেয়ে। "রাইমণির এই মাতৃস্নেহের নির্ঝরিণী ধারায় অবগাহন করে, বালক ঈশ্বরচন্দ্র বড়বাজারে বাস করেও মানুষের মতন মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন।"

মস্ত বড় চকমিলান অট্টালিকা। জগদ্দুর্লভ বাবুর সংসারে লোক কিন্তু মাত্র কয়েকজন: গৃহিণী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁর স্বামী ও দুই পুত্র, এক বিধবা ভগ্নী ও তার একমাত্র ছেলে, গোপাল। ঠাকুরদাসকে জগদ্দুর্লভ খুড়োমশাই বলতেন। ঈশ্বর তাই গৃহকর্ত্তাকে দাদা এবং তাঁর বড়বোন ও ছোটবোনকে বড়দিদি ও ছোড়দিদি বলে ডাকতেন। বিধবা রাইমণি ছিলেন তাঁর ছোড়দি। সিংহ-পরিবারের সবাই ঠাকুরদাসের ছেলেকে আদরযত্ন করত এবং এইটুকু না পেলে বালকের নির্বাসিত জীবন কতখানি দুর্বিসহ হয়ে উঠত, তা সহজেই কল্পনা করা যায়। উদ্দাম চঞ্চল প্রকৃতি ছিল বালক ঈশ্বরচন্দ্রের। শৈশবের নানাবিধ দস্যিপণায় তিনি একাই মাতিয়ে রেখেছিলেন বীরসিংহ গ্রাম। এখন তাঁর কাছে খেলার নিত্য সঙ্গীরা কেউ নেই—নেই মা ও ঠাকুমা। কাজেই এ বয়সে এই পরিবেশ থেকে, বীরসিংহ থেকে একেবারে বড়বাজারের দয়েহাটা—বালক ঈশ্বরচন্দ্রের পক্ষে নির্বাসন ছাড়া আর কী! সেই নির্বাসনের বেদনা তিনি ভুলেছিলেন এই অনাত্মীয় ও অপরিচিত কায়স্থদের সংসারে। তাঁর জীবনের ইতিহাসে এই দয়েহাটার সিংহবাড়ি—বিশেষ করে সিংহবাড়ির বিধবা মেয়ে রাইমণি—অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। কেননা, এদের আদর-যত্নেই তিনি মা এবং ঠাকুমায়ের আদর-যত্নের অভাব বুঝতে পারেন নি। ঈশ্বরচন্দ্রের সামনে রাইমণি এসে দাঁড়ালেন মমতাময়ী মাতৃমূর্তিতে। একটি মাত্র ছেলে নিয়ে রাইমণি বিধবা। পুত্র গোপাল ঈশ্বরচন্দ্রেরই সমবয়সী। তাই বালক ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি রাইমণির স্নেহ ও আদর-যত্ন সমান ত ছিলই, বরং বেশী বললেও চলে। রাইমণির স্নেহের কথা বিদ্যাসাগরের চিরদিন মনে ছিল। স্বরচিত জীবন-চরিতে আবেগ-উদ্বেলিত হৃদয়ে বিদ্যাসাগর রাইমণির কথা এইভাবে লিখেছেন:

"কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিনকালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায়

সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে, আমায় ও গোপালে, রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ফলকথা এই স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সকল বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি, আমার হৃদয়-মন্দিরে, দেবীমূর্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উথাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না।"

বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় এলেন সেই বছর যে-বছরে রামমোহন রায় কলকাতায় চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ির বৈঠকখানায় প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্মসমাজ।

ছেলেকে নিয়ে ঠাকুরদাস যখন কলকাতায় এলেন তখন তাঁর মাইনে দশ টাকা। বিল-কালেক্টারের কাজ। খাটুনির অন্ত নেই। সকালে বেরিয়ে ফিরতেন দুপুরে আবার দুপুরে বেরিয়ে ফিরতেন রাত্রি এক প্রহরের সময়। সারা দিনরাতের মধ্যে বাপের সঙ্গ পেতেন ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র দু'একঘণ্টা। এই দশটাকা মাইনে আর সিংহ-বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়—এই সম্বল করেই পুত্রকে উচ্চশিক্ষা দেবার স্বপ্ন দেখতেন ঠাকুরদাস। স্বপ্ন নয়, দুরাকাঙ্ক্ষা। নিজের জীবন কেটেছে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে, তাই নিজের জীবনে যা তিনি চরিতার্থ করতে পারেন নি, পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে তাই চরিতার্থ করবার সংকল্প করেছেন—এর জন্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম স্বীকার করতেও প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ পরাঙ্মুখ হলেন না। কিন্তু কোথায় পড়াবেন? সিংহী-বাড়ির কাছেই শিবচরণ মল্লিকের বাড়ি। কলকাতার তখনকার দিনে নাম-করা সুবর্ণবণিক শিবু মল্লিক। তার সদর বাড়িতেই ছিল একটা পাঠশালা। একদিন জগদ্দুর্লভ বাবু ঠাকুরদাসকে বললেন, মল্লিকবাড়ির পাঠশালায় ঈশ্বরকে ভর্তি করে দিন না। ঐ পাঠশালার গুরুমশাই স্বরূপচন্দ্র দাস। ভালই পড়ান। আমার ভাগ্নেরা সেখানে পড়ে, শিবুবাবুর ছেলে ও ভাগ্নেরাও পড়ে। এখন ঐখানে মাস কতক পড়ুক না।

ঠাকুরদাস সম্মত হলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র স্বরূপচন্দ্রের পাঠশালায় ভর্তি হলেন।

অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ—এই তিন মাস তিনি এই পাঠশালাতেই পড়লেন। কালীকান্তের পর ঈশ্বরের দ্বিতীয় শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র। অতি নিপুণ শিক্ষক। মেধাবী ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র তিন মাসের মধ্যেই সেই পাঠশালার পাঠ শেষ করলেন। গুরুমশাই অবাক। অনেক ছাত্র তিনি পড়িয়েছেন, কই এমনটি তাঁর নজরে পড়েনি তো? ভাবেন, হবে না কেন, অমন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের ছেলে, তার ওপর বাপের অমন কড়া শাসন। এ তো বৃহস্পতি তুল্য বিদ্বান হবে দেখছি। ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনের প্রারম্ভে তাঁর দুই গুরুমহাশয়ই একই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কলকাতার পাঠশালার এই গুরুমহাশয় সম্পর্কে পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন: "পাঠশালার শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরসিংহের শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা, শিক্ষাদান বিষয়ে, বোধ হয়, অধিকতর নিপুণ ছিলেন।"

পাঠশালার পড়া তো শেষ হলো, এখন ছেলেকে কোথায় কি শেখাবেন—সংস্কৃত না ইংরেজি—এই রকম চিন্তা-ভাবনা যখন করছিলেন ঠাকুর দাস, তখন দৈবের দ্বিতীয় আঘাত নেমে এল বিদ্যাসাগরের জীবনে। একে ত গ্রাম থেকে শহরে এসেছেন, তার ওপর তখনকার কলকাতা শহর—যে কলকাতায় রাত্রিতে মশা আর দিনে মাছির অসহ্য উপদ্রব। কলের জল, ড্রেন, পরিচ্ছন্ন পথঘাট—এসব তখন কিছুই ছিল না। গ্রামাঞ্চল থেকে যারা আসত তাদের পেটের অসুখ অনিবার্য। মাস তিনেক বাদেই বালক ঈশ্বরচন্দ্রের পেটের অসুখ হলো। সেই অসুখ ক্রমে রক্তাতিসার রোগে দাঁড়াল। বালকের পক্ষে কঠিন ও মারাত্মক অসুখ। ঠাকুরদাস বিচলিত হলেন। ঈশ্বর-অন্ত প্রাণ দুর্গাদেবীর। পৌত্রের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন তিনি দেশ থেকে। দুর্গাদাস কবিরাজের চিকিৎসায় যখন অসুখের কোন উপশম হলো না, তখন তিনি পৌত্রকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরলেন। কলকাতায় সেবাযত্নের ত্রুটি ছিল না; পিতা নিজের হাতে পুত্রের মলমূত্র পরিষ্কার করতেন প্রসন্ন মনে। ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে ঠাকুরদাস তখন একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করেছেন, কাজেই পিতৃ-হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ

ও যত্ন ঢেলে দিয়ে তিনি তাকে সুস্থ করে তোলার জন্যে অতি মাত্রায় উদ্বিগ্ন ছিলেন। তারপর মা যখন বললেন, ঈশ্বরকে আমি দেশে নিয়ে যাই, তখন ঠাকুরদাস বুঝলেন, মায়ের কথাই ঠিক, শহর না ছাড়লে ছেলের অসুখ সারবে না।

তিন মাস পরে দেশে ফিরলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

বালকের সে কী আনন্দ। মনে হলো, যেন কতকাল বাদে বীরসিংহ গ্রামে ফিরলেন তিনি।

ওষুধ-বিষুধ বিশেষ কিছু খেতে হলো না, জলবায়ুর ও স্থানের পরিবর্তনে এবং সেই সঙ্গে মা, পিতামহী ও পাড়াপ্রতিবেশীদের স্নেহেই তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। "বাটীতে উপস্থিত হইয়া, বিনা চিকিৎসায়, সাত আট দিনেই, আমি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইলাম।"

বৈশাখ গিয়ে জ্যৈষ্ঠ এল।

ঠাকুরদাস এলেন ছেলেকে আবার কলকাতা নিয়ে যাবার জন্যে।

পুত্রের সময়ের এতটুকু অপব্যবহার পিতাকে স্বভাবতই পীড়িত করে তুলতো। তাঁরও তো দিন দিন বয়স হচ্ছে, শরীরের ভাল মন্দ কিছুই নিশ্চয় করে বলা যায় না, বেঁচে থাকতে থাকতে ছেলেকে মানুষ করে তোলার জন্যে ঠাকুরদাসের চিন্তা ও চেষ্টার অন্ত ছিল না। দুর্গাদেবী ও ভগবতী দেবী দুজনেই একবার আপত্তি তুললেন, কিন্তু ঠাকুরদাসের সংকল্প অটল। সময় নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড রৌদ্র মাথায় করেই পিতা-পুত্রে একদিন কলকাতা যাত্রা করলেন। সঙ্গে আনন্দরামকে নেবার কথা হয়েছিল। আত্ম-অভিমানে আঘাত লাগবে বলে ঈশ্বরচন্দ্র বলেছিলেন, তিনি একলাই পথ চলতে পারবেন। কিন্তু এই বাহাদুরি নিতে গিয়ে বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে সেদিন কী বিষম দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল, তার বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন। বীরসিংহ থেকে মায়ের মামাবাড়ি পাতুল পর্যন্ত ছ' ক্রোশ পথ ঈশ্বরচন্দ্র সহজেই চলে এলেন। সেদিনের মত পাতুলে বিশ্রাম করে পরের দিন ঠাকুরদাস রামনগরের পথ ধরলেন। তারকেশ্বরের কাছে এই রামনগরে থাকতেন ঠাকুরদাসের ছোট বোন অন্নপূর্ণা দেবী। কিন্তু তিন ক্রোশ পথ গিয়ে তিনি আর চলতে পারলেন না। পা টাটিয়ে ফুলে উঠল।

ঠাকুরদাসের ললাটে দুশ্চিন্তার রেখা আর তাঁদের মাথার ওপরে মধ্যাহ্ন সূর্য। চারদিকে গ্রীষ্মের দাবদাহ। বালকের পক্ষে জ্যৈষ্ঠের সেই খররৌদ্রে পথ চলা কতখানি কঠিন, ঠাকুরদাস তা সহজেই বুঝতে পারলেন। উপায় কি? যেতে ত হবেই। ছেলেকে ফুটি তরমুজের লোভ পর্যন্ত দেখালেন। বালক তরমুজের লোভে আরো দু'এক পা হাঁটল। এক মাঠের কাছে এসে পিতাপুত্রে ফুটি তরমুজ খেলেন। পেট ঠাণ্ডা হলো বটে, কিন্তু পা আর উঠল না। ঠাকুরদাসের ভীষণ রাগ হলো। বাবা মিছে বলেননি, এঁড়ে বাছুর—ব্যাটা সেই রকমই একগুঁয়ে। হাঁটতে পারবে না বলেছে ত আর হাঁটবেই না। তিনি যত বকেন, ঈশ্বর তত কাঁদেন—বাবা, আমি আর হাঁটতে পারব না; এই দেখ না পা ফুলে গেছে। রেগে ঠাকুরদাস ছেলেকে ফেলে নিজেই এগিয়ে যান। ছেলের কান্না শুনে মন গলে যায়, কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে আসেন। দুর্বল দেহ ঠাকুরদাস কাঁধে তুললেন ছেলেকে। কিন্তু আট বছরের ছেলেকে তিনি আর কতদূর নিয়ে যেতে পারেন। মাথার ওপর উত্তপ্ত সূর্য। পায়ের তলায় উত্তপ্ত বিস্তীর্ণ মেঠো পথ, কাঁধে আট বছরের ছেলেকে নিয়ে চলেছেন এক শীর্ণদেহ প্রৌঢ় পিতা—এ দৃশ্য কল্পনা করলেও শরীরে রোমাঞ্চ জাগে।

এইবার বিদ্যাসাগরের মুখেই সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনি:

"আমার এই অবস্থা দেখিয়া পিতৃদেব বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। আগের মাঠে ভাল তরমুজ পাওয়া যায়, শীঘ্র চলিয়া আইস, ঐখানে তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইব। এই বলিয়া তিনি লোভ প্রদর্শন করিলেন; এবং অনেক কষ্টে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে, তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। তরমুজ বড় মিষ্ট লাগিল। কিন্তু পা'র টাটানি কিছুই কমিল না। বরং খানিক বসিয়া থাকাতে, দাঁড়াইবার ক্ষমতা পর্যন্ত রহিল না। ফলতঃ আর এক পা চলিতে পারি, আমার সেরূপ ক্ষমতা রহিল না। পিতৃদেব অনেক ধমকাইলেন, এবং তবে তুই এই মাঠে একলা থাক, এই বলিয়া ভয় দেখাইবার নিমিত্ত আমায় ফেলিয়া খানিক দূর চলিয়া গেলেন। আমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। পিতৃদেব সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, কেন তুই লোক আনিতে দিলি না, এই বলিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়া দু'একটা থাবড়াও দিলেন। অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, পিতৃদেব আমাকে কাঁধে করিয়া লইয়া চলিলেন···খানিক

পরেই ক্লান্ত হইয়া, আমায় নামাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই ক্রোশ পথ যাইতে প্রায় দেড় প্রহর লাগিল।"

তিন দিনের দিন পিতাপুত্রে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন।

এলেন সেই একই আশ্রয়-স্থলে।

সেই দয়েহাটায় জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়ি।

যে-বাড়িতে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের জন্যে স্নেহের নীড় রচনা করে অপেক্ষা করছিলেন রাইমণি।

॥ চার ॥

—ছেলেকে ইংরেজি স্কুলে দাও—এখন ইংরেজি শিখলেই স্থবিধে।
—খবরদার ও কাজ করোনা—তাহলে ওকে আর খুঁজে পাবে না।
—টিকি ও পৈতে—দুই-ই ঘুচবে, ইংরেজি পড়লে নির্ঘাত খৃষ্টান হয়ে যাবে।
—ইংরেজি পড়ান বুঝি চাট্টিখানি কথা। মাইনে ত পাও মোটে দশ টাকা, তা
—আবার ছেলেকে ইংরেজি পড়ানর সখ কেন?
—বামুন পণ্ডিতের ছেলে, সংস্কৃত পাঠশালায় ভর্তি করে দাও। সংস্কৃতই শিখুক।
—পয়সা যখন নেই, তখন হেয়ার সাহেবের স্কুলেই দাও। মাইন দিতে হবে না। ইংরেজিও শিখবে। ছেলের হাতের লেখা ভাল, এখন যদি মোটামুটি চলনসই ইংরেজি শিখতে পারে আর জমাখরচ রাখার মত অঙ্কটা শেখে, তা'হলে একটা কাজ-কর্ম জুটে যাবে।
—সেই ভাল, মন থেকে সংস্কৃতের বাতিক মুছে ফেলে দাও, ওসব শিখে এখন কিছু হবে না। যে কালের যা হাওয়া, বুঝলে ঠাকুরদাস।
—সেকি হে, বামুন পণ্ডিতের ছেলে, টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করুক। তারপর দেশে গিয়ে নিজে একটা টোল চতুষ্পাঠী খুলে বসবে—সবাই বলবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের চতুষ্পাঠী—রামজয় তর্কভূষণের নাতির টোল। না, না, ঠাকুরদাস, ছেলেকে তুমি সংস্কৃতই পড়াও।

হিতার্থীদের এইসব কথা শোনেন আর ঠাকুরদাস ভাবেন ঐ রকম পণ্ডিত হয়ে বীরসিংহে একটা চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা করার কল্পনা একদিন তাঁরও ছিল। জীবনের আরম্ভে জীবন-সংগ্রামে রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সে-কল্পনা শূন্যে মিলিয়ে গেছে। নিষ্ঠুর দারিদ্র্য তাঁকে লেখাপড়া শিখবার অবকাশ দেয় নি, একেবারে সোজা ঠেলে দিয়েছে তাঁকে জীবিকার্জনের কণ্টকময় পথে। স্কুলে পর্যন্ত ইংরেজি শিখতে পারেন নি, শিখেছেন এক জাহাজের সরকারের কাছে—

দয়েহাটায় ভাগবতচরণ সিংহের বাড়ি

বীরসিংহে বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান

কয়েকটি টাকা উপায় করবার জন্যে। একথা ঠাকুরদাস ভোলেন নি। নিজের জীবন ত ব্যর্থই হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের জীবনকে তিনি নিজের মনের মত করে গড়ে তুলবেন—তার ভেতর দিয়েই তিনি চরিতার্থ করবেন তাঁর জীবনে শিক্ষার ব্যাপারে যত কিছু অচরিতার্থতা। চকিতে পিতার কথা মনে পড়ল—বংশে মহাপুরুষ জন্মেছে। সেই মহাপুরুষের ভাবী জীবন-গঠনে ঠাকুরদাস তাঁর সমস্ত যত্ন, সমস্ত শক্তি, সমস্ত মন নিয়োগ করলেন। ইতিহাসের পটে এই উজ্জ্বল সাগর-বিগ্রহের শিল্পী সেদিন ছিলেন ঠাকুরদাস, আর কেউ নয়। স্নেহ নয়, কঠোর শাসন দিয়ে তিনি সর্বদা ঘিরে রাখতেন বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে। হৃদয়ের কোন দুর্বল মুহূর্তে ঈশ্বরচন্দ্রকে মানুষ করার ব্যাপারে ঠাকুরদাসের শাসন-শৈথিল্য একদিনের জন্যেও দেখা যায় নি। সম্ভবত তিনি বুঝেছিলেন—এ ছেলে শুধু বীরসিংহ গ্রামের বাঁড়ুযোদের কুটীরে মহাপুরুষত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি, সারা বাংলা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে একদিন তাঁর এই শীর্ণকায় খর্বশরীর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। তাই তার চারদিকে তিনি তুলে দিয়েছিলেন কঠোর পিতৃ-শাসনের প্রাচীর। দুর্ভেদ্য সেই প্রাচীর বালককে সত্যই সেদিন রক্ষা করেছিল সমাজ-সংঘাতের বিক্ষুব্ধ, প্রচণ্ড এবং অপ্রতিরোধ্য আবর্ত থেকে। এই প্রাচীরটুকু যদি না থাকত, তাহলে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন কোন্ খাতে বইত, তা অনুমান করা শক্ত নয়।

হিতার্থীদের উপদেশ ও পরামর্শ সব শুনলেন ঠাকুরদাস।
দশ টাকার মাইনের চাকরী করে ছেলেকে কলকাতায় উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষা যে দেওয়া যাবে না, তিনি তা বিলক্ষণ জানতেন। ছেলে ইংরেজি শিখে উপার্জনক্ষম হবে, তাঁর দুঃখ ঘোচাবে, তার জন্যে তিনি ঈশ্বরকে কলকাতায় আনেন নি—এ কল্পনাও তিনি করেন নি। ঈশ্বর সংস্কৃতই শিখবে—এই সিদ্ধান্ত করলেন ঠাকুরদাস। পরে তিনি দেশে একটা টোল করে দেবেন।
কিন্তু কোথায় শিখবে—চতুষ্পাঠীতে না সংস্কৃত কলেজে ?
মধুসূদন বাচস্পতি তখন সংস্কৃত কলেজে পড়েন। তিনি বিদ্যাসাগরের মাতৃ-মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্য-পুত্র। বাচস্পতি ঠাকুরদাসকে এই সময়ে পরামর্শ দিলেন—সংস্কৃত কলেজে পড়লেই আপনি ঠিক যে রকম চান, আপনার ছেলের সংস্কৃত শিক্ষা ঠিক সেই রকম হবে। আর যদি ছেলেকে

জজ্-পণ্ডিত করতে চান, তারও বিলক্ষণ উপায় আছে। অতএব আমার বিবেচনায় ঈশ্বরকে চতুষ্পাঠী অপেক্ষা সংস্কৃত কলেজে পড়তে দেওয়াই উচিত। যা উচিত ঠাকুরদাস পুত্রের জন্যে তাই করলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রকে তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দিলেন। জি. টি. মার্শাল তখন এখানকার সম্পাদক।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের নিজের কথা এই: "বাচস্পতি মহাশয় এই বিষয় বিলক্ষণরূপে পিতৃদেবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। অনেক বিবেচনার পর বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থা অবলম্বনীয় স্থির হইল।" এই সম্পর্কে ঠাকুরদাস আরো একজনের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন—তিনি সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ।

প্রধানত এই দু'জনের উৎসাহ ও পরামর্শে ঠাকুরদাস ছেলেকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দিলেন। সেদিন জীবনের একটি প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পাদন করলেন বলে তিনি নিশ্চয়ই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

বাংলার সাংস্কৃতিক জাগরণের ইতিহাসেও এই দিনটি চিহ্নিত হয়ে থাকবার মতো। হিন্দু কলেজে পড়লে ঈশ্বরচন্দ্র হয়ত দ্বিতীয় মধুসূদন, কি কৃষ্ণমোহন অথবা রাজনারায়ণ হতেন, বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই হতেন না।

শুরু হলো সাগরের সেই বিস্ময়কর ছাত্রজীবন—যা অধ্যয়নের ইতিহাসে আজো প্রবাদের মত হয়ে আছে। তখন তাঁর বয়স ন' বছর। ন' বছরের ছেলে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে এই তাঁর প্রথম পরিচয়। কত দেশের কত ছাত্র সংস্কৃত কলেজে আর দিক্‌পাল কত সব অধ্যাপক। এ করালীকান্তের পাঠশালা নয়—এ একেবারে স্বতন্ত্র পরিবেশ। বালক ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু না হলেন বিস্মিত, না হলেন বিচলিত। বরং তাঁর চার-দিকে জ্ঞানের এই আবর্ত দেখে তিনি উৎসাহই বোধ করলেন। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ তৃতীয় শ্রেণীতে ব্যাকরণ পড়াতেন। তাঁর অধ্যাপনায় শুধু নিষ্ঠা আর পারদর্শিতাই ছিল না—ছিল আর একটি জিনিস যার জন্যে সকল ছাত্র তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতো। একেবারে ছেলের মতন স্নেহ করতেন ছাত্রদের তর্কবাগীশ। কত ছাত্রই তো পড়ে, কিন্তু প্রধান অধ্যাপকের চোখে ঈশ্বরচন্দ্রের মত এমন অধ্যবসায়ী, এমন মেধাবী ও অনুরাগী ছাত্র আর দু'টি সেদিন ছিল না।

বড়বাজার থেকে পটলডাঙ্গা—ঈশ্বর হেঁটেই পাড়ি দিতেন।

সঙ্গে থাকতেন বাচস্পতি। কলেজে ছেলেকে দেখবার অনেক লোকই ছিল, কিন্তু কলেজের বাইরে ছিলেন একজনই। তিনি ঠাকুরদাস। বড়বাজার থেকে পটলডাঙ্গা—এই পথে প্রতিদিন দু'বেলা তিনি ছিলেন তাঁর বালক-পুত্রের সঙ্গী। পাছে ছেলে অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে বিপথগামী হয়, এই আশঙ্কা সর্বক্ষণের জন্যে ঠাকুরদাসকে পুত্র সম্বন্ধে সচেতন রাখতো। তাই চারদিকের প্রমত্ত পরিবেশ থেকে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা ও যত্নের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রকে রক্ষণাবেক্ষণ করে চলতেন। পঁচিশ বছর আগে তিনি এই শহরে এসেছেন এবং তাঁর চোখের সামনেই এই পঁচিশ বছরে কলকাতার সমাজ-জীবনে কী দারুণ বিপ্লব-বন্যা নেমে এসেছে, ঠাকুরদাসের তা অজানা ছিল না। সেই সামাজিক বিপর্যয় থেকে ছেলেকে রক্ষা করার জন্যে ঠাকুরদাসের তাই উদ্বেগের অন্ত ছিল না।

ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনের একটি সুন্দর চিত্র রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন :

"ক্ষুদ্র একগুঁয়ে ছেলেটি মাথায় এক মস্ত ছাতা তুলিয়া তাঁহাদের বড়বাজারের বাসা হইতে পটলডাঙায় সংস্কৃত কলেজে যাত্রা করিতেন, লোকে মনে করিত, একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে। এই দুর্জয় বালকের শরীরটি খর্ব, শীর্ণ, মাথাটা প্রকাণ্ড—স্কুলের ছেলেরা সেইজন্য তাঁহাকে যশুরে কৈ ও তাহার অপভ্রংশে কশুরে জৈ বলিয়া ক্ষ্যাপাইত, তিনি তখন তোৎলা ছিলেন, রাগিয়া কথা বলিতে পারিতেন না।"

বিদ্যাসাগর যখন জন্মগ্রহণ করেন, বাংলার ইতিহাসে তখন যুগসন্ধিক্ষণ। মানসিক উদ্দীপ্তির যুগ। সেটা জ্ঞান অন্বেষণ, জ্ঞান অর্জন আর জ্ঞান বিতরণের যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের যাঁরা যুগপুরুষ—রামগোপাল, দেবেন্দ্র নাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, ভূদেব, মাইকেল প্রভৃতি—তাঁরা সকলেই দু'এক বছরের ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করেছেন। সাহিত্যে, সমাজে ও ধর্মে তখন বিপ্লব দেখা দিয়েছে। কলকাতা তখন অখ্যাত অসংস্কৃত পল্লী। সেখানে তখন বিদেশী বাণিজ্যের হাট বসেছে। গ্রামের শ্যামল আবেষ্টন সরিয়ে দিয়ে ক্রমে ক্রমে শহরের উদ্ধত রূপ প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে। দেখতে দেখতে পলাশি যুদ্ধের পর তেতাল্লিশ বছর কেটে গেল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সেই

শহর আধুনিক কালকে আসন পেতে দিয়েছে। বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রের পথ দিয়ে বাংলা দেশে এলো এক নূতন সভ্যতা। এই উপলক্ষে বাংলা দেশে বেগবান্ চিত্তের সংস্রব ঘটল। একদিকে পণ্য এবং রাষ্ট্র-বিস্তারে পাশ্চাত্ত্য-মানুষ এবং তার অনুবর্তীদের কঠোর শক্তিতে সমস্ত পৃথিবী অভিভূত। অন্য দিকে পূর্ব-পশ্চিমে সর্বত্রই আধুনিক কালের প্রধান বাহন পাশ্চাত্ত্য-সংস্কৃতির অমোঘ প্রভাব বিস্তীর্ণ হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য-সংস্কৃতিকে আমরা যে তখন স্বীকার করে নিয়েছিলাম তার স্বাভাবিক কারণ এই সংস্কৃতির উদারতা, চিত্তলোকে এর সর্বত্রগামিতা—নানা ধারায় এর অবাধ প্রবাহ, এর মধ্যে নিত্য-উদ্যমশীল বিকাশ-ধর্ম নিয়ত উন্মুখ—সব রকম যুক্তিহীন অন্ধ অবিশ্বাসের অবমাননা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবার জন্যে এই প্রয়াস। এই সংস্কৃতি নিজের বিজ্ঞানে দর্শনে সাহিত্যে, বিশ্ব ও মানবলোকের সকল বিভাগযুক্ত সকল বিষয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত, সব কিছুর পরীক্ষা করেছে, বিশ্লেষণ সংঘটন বর্ণনা করেছে, মনোবৃত্তির গভীরে প্রবেশ করে সূক্ষ্ম-স্থূল যত কিছু রহস্যকে অবারিত করেছে।

এই যুগ-সংস্কৃতির প্রথম স্পর্শেই বাংলা দেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল। এ নিয়ে বাঙালি যথার্থই গৌরব করতে পারে। প্রথম আরম্ভে ইংরেজি শিক্ষাকে ছাত্ররূপেই বাঙালি যুবক গ্রহণ করেছিল। প্রথম ইংরেজি শিক্ষার ফলে দেশের মধ্যে একদিকে যেমন সচেতন ভাবের জাগরণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল, অন্য দিকে তেমনি স্বদেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি বিরাগ একশ্রেণীর মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল। তাই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ধার করা সজ্জার মতন তাদের সবাইকে অস্থির করে রাখল, বাইরে থেকে পাওয়া জিনিসের অহংকার নিয়ত উদ্যত হয়ে রইল। তখন ইংরেজি সাহিত্যের ঐশ্বর্যভোগের অধিকার ছিল দুর্লভ এবং অল্পসংখ্যক লোকের আয়ত্তাধীন। সেই জন্যেই এই সংকীর্ণ শ্রেণীগত ইংরেজি শিক্ষিতের দল নূতনলব্ধ শিক্ষাকে অস্বাভাবিক আড়ম্বরের সঙ্গেই ব্যবহার করতেন। কথায় বার্তায়, চিঠিতে, সাহিত্য-রচনায় ইংরেজি ভাষার বাইরে পদক্ষেপ তখনকার নব্যশিক্ষিতদের পক্ষে ছিল অকৌলিন্যের পরিচায়ক। বাংলা ভাষা তখন সংস্কৃত-পণ্ডিত ও নব্যশিক্ষিত—দুই দলের কাছেই অপাঙক্তেয় ছিল। এই ভাষার দারিদ্র্যে তাঁরা লজ্জাবোধ করতেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "এই ভাষাকে তাঁরা এমন একটি অগভীর শীর্ণ নদীর মতো মনে করতেন যার হাঁটুজলে পাড়াগেঁয়ে মানুষের প্রতিদিনের সামান্য

ঘোরো কাজ চলে মাত্র, কিন্তু দেশ-বিদেশের পণ্যবাহী জাহাজ চলতে পারে না।”

বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব বাংলার জাতীয় জীবনের এই যুগসন্ধিক্ষণে।

সে এক বিস্ফোরণের যুগ। বিপুল উদ্যমে জ্ঞান-অর্জনের যুগ। সংঘাত ও সংঘর্ষের যুগ। ইতিহাসের গর্ভ স্পন্দিত-করা সেই যুগ। সেই যুগের চেতনাকে আত্মস্থ করেই যুগপুরুষ বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব।

পাশ্চাত্ত্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব এবং পাশ্চাত্ত্য-সমাজের রীতি-নীতির প্রভাব বাংলার সমাজ ও সাহিত্য-ক্ষেত্রকে আলোড়িত করে তুলেছিল। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য এবং পাশ্চাত্ত্য সমাজের আদর্শের সঙ্গে প্রাচ্যের সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্ম ও সাহিত্যে এক ঘোরতর বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই বিপ্লবের প্রতিকারের জন্যে—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ সামঞ্জস্য সাধনের জন্যে, রামমোহনের পরবর্তী যুগমানবগণ তখন বদ্ধপরিকর। সে যুগে দেশের কুপ্রথাগুলির মূলোচ্ছেদ হচ্ছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাব দেশের মধ্যে ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি—সকল দিকেই চলেছে পূর্ণবেগে পরিবর্তন। নূতন শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির পুরাতন রুচি ও প্রবণতার পরিবর্তন হয়েছে, বাঙালির মধ্যে এক নূতন আকাঙ্ক্ষা ও অভাববোধের আবির্ভাবে বাঙালি নূতন উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। পশ্চিম থেকে সদ্য আগত এই শক্তিশালী শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাতে বাংলার সমাজ-জীবনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত স্পন্দিত হয়ে উঠল—নব্যশিক্ষিত বাঙালি যুবকদের চেতনায় এনে দিল এক যুগান্তর। এই যুগ সাহসের যুগ, বন্ধন ছিন্ন করার যুগ, সংস্কারমুক্ত হওয়ার যুগ। তাই এই যুগের কোলে জন্মগ্রহণ করে বিদ্যাসাগর সকলের অলক্ষ্যে যে এই যুগের ভাবধারায় পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন, তা পরবর্তীকালে তাঁর কর্মজীবনের সূচনায় বুঝতে পারা গিয়েছিল। যুগের ধর্ম তাঁকে যেমন আকৃষ্ট করেছিল, তেমনি তাঁর প্রতিভার ওপর প্রভাবও বিস্তার করেছিল। প্রভাব বিস্তার করেছিল সত্য, কিন্তু প্রভাবান্বিত করতে পারে নি—বাঙালি বিদ্যাসাগর ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেও খাঁটি বাঙালি ছিলেন—চটি ও চাদরে তিনি তাঁর বাঙালিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গেছেন। পূর্বসূরী রামমোহনের মতন বিদ্যাসাগরও বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতাকে আত্মসাৎ করে,

বাংলার মৃতপ্রায় সমাজ-জীবনে রামমোহনের মতই এক অভূতপূর্ব যুগান্তর ঘটিয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, পলাশি যুদ্ধের তেষট্টি বছর পরে বিদ্যাসাগরের জন্ম। এই দীর্ঘকালে এদেশে ইংরেজের রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ভারতবর্ষ তথা বাংলা দেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থার সামাজিক প্রতিক্রিয়া সবেমাত্র ফলতে আরম্ভ করেছে। বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনের সময়ের মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করি যে ইংরেজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিজয় ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক বিজয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। শিক্ষিত বাঙালি পরিচিত পুরাতনকে পরিহার করে নূতনের মোহে মত্ত হয়ে উঠল—দীনবন্ধু মিত্রের নিমচাঁদের মত ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখবার দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল। আহারে-বিহারে, আচারে-ব্যবহারে ইংরেজের অনুকরণ করাই তার চরম ও পরম লক্ষ্য হয়ে উঠল। সমাজে নূতন প্রকারের জাতিভেদ দেখা দিল। বাঙালির জীবনে অভিনব ভাবের স্রোত প্রবাহিত হতে লাগল। বাঙালির পক্ষে সেদিন সে স্রোতের গতি রোধ করা অসম্ভব ছিল। বাঙালি সাদরে সে স্রোতের পথ প্রস্তুত করে দিল।

এই নূতন শিক্ষার ফলে বাঙালির মনের খাতে তার প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি যাতে বিরাগ জন্মায়, মেকলে তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তার ওপর ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য, তার শক্তি ও সভ্যতা বাংলার সমাজ-জীবনকে (বাংলার সমাজ-জীবন বলতে তখন মুখ্যত ইংরেজের তৈরি শহর এই কলকাতাকেই বুঝতে হবে) প্রবলভাবে আঘাত করেছিল। বাংলা দেশে তখন যে মানসিক পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল, তার সকল অংশ যে ইংরেজের ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি, তা নয়। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় সভ্যতার সংঘাত এর জন্যে বহুল পরিমাণে দায়ী। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে তখন বাঙালি দেখেছে শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীকরূপে। সুতরাং ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য হয় যে, এই সভ্যতার মোহ অতিক্রম করা সেদিন কঠিন ছিল।

বাংলার সমাজ-জীবনে এই সংস্কৃতি সংঘাতের ফল হয়েছিল সাংঘাতিক। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন: "হিন্দু কলেজের অনেক খ্যাতনামা ছাত্র বংলায় বিশুদ্ধরূপে আপন আপন নামও লিখিতে পারিতেন না। বাংলা

ভাষা বলিয়া যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা আছে বা থাকিতে পারে, তাহা তাঁহাদিগের মনে উদিত হইত না। সাধারণ দোকানদার ও অশিক্ষিত বৃদ্ধদিগের পাঠের জন্য রামায়ণ ও মহাভারত নামে দুইখানি পদ্য গ্রন্থ আছে; এইমাত্র তাঁহারা জানিতেন। গুপ্ত কবির 'প্রভাকর' তখন বঙ্গ-সমাজের একাংশে জ্যোতিঃ দান করিতেছিল বটে, কিন্তু নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহার বড় সমাদর ছিল না। নব্যদিগের মধ্যে যাঁহারাই অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত, তাঁহারাই তাহার সমাদর করিতেন। বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলা এবং বাংলায় পরস্পরকে পত্র লেখা অগৌরবকর বলিয়া তাহাদের ধারণা জন্মিল... ডিরোজিওর শিক্ষায় ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বদেশীয় আকার ও স্বদেশীয় সাহিত্য উভয়ই সমভাবে নির্বাসিত করিতে প্রস্তুত হইলেন।"

তবু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, নূতন জ্ঞান ও শিক্ষার প্রভাবে সেকালের মনীষীদের চিত্তক্ষেত্রে বিচিত্রভাবের ফসল ফলেছিল। তারা যে একই ঋতুর ফসল এটা যেন ভুলে না যাই। নব্য বঙ্গের যুবকরা আর কিছু না মানলেও সত্যকে মানতেন। ডিরোজিও বলতেন, হিন্দু কলেজের প্রত্যেক ছেলে যথার্থই সত্যের প্রতীক। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এই সত্য ছিল নৈতিক।

বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনকালে যাঁরা ছিলেন প্রাগ্রসর বাঙালিদের চিন্তা-নায়ক, তাঁদের অনেকেই ছিলেন রাজা রামমোহনের কর্মীবন্ধু অথবা মন্ত্রশিষ্য। ইংরেজ শাসনকে তাঁরাও মনে করলেন বিধাতার আশীর্বাদ; এমন কি, বোধবুদ্ধি, ধ্যান-ধারণা, চলন-বলন, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে তাঁরা হতে চাইলেন খাঁটি ইংরেজ। এঁদের সকলের ওপরই নব্যবঙ্গের দীক্ষাগুরু হেনরী ডিভিয়ান ডিরোজিওর ছিল অসামান্য প্রভাব।

"হিন্দু কলেজের সঙ্গে ডিরোজিওর নাম চিরদিনের জন্য এক সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। এই ডিরোজিও যে গুরুর শিষ্য (অর্থাৎ রামমোহন) ফরাসী-বিপ্লবের চিন্তার স্বাধীনতার বহ্নি তাঁর ভিতরে প্রজ্জ্বলিত ছিল। ডিরোজিওর সেই বহ্নিদীক্ষা হয়েছিল। অল্প বয়সে যথেষ্ট বিদ্যা অর্জন করে কবি ও চিন্তাশীল রূপে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বিশ বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষকরূপে নিয়োজিত হন; আর তিন বৎসর শিক্ষকতা

করার পর সেখান থেকে বিতাড়িত হন। এরই ভেতরে তাঁর শিষ্যদের চিত্তে যে আগুন তিনি জ্বালিয়ে দেন তাঁর কলেজ পরিত্যাগের পরও বহু দিন পর্যন্ত তার তেজ মন্দীভূত হয় নি। শুধু তাই নয়, নব্য বঙ্গের গুরুদের ভিতরে এই ডিরোজিওর এক বিশিষ্ট স্থান আছে।" শিক্ষাপ্রণালী ও পাণ্ডিত্য দুই মিলে তাঁকে অল্প দিনের মধ্যেই করে তুলেছিল একজন আদর্শ শিক্ষাব্রতী। বহু-ভঙ্গিম চরিত্রের মানুষ ছিলেন এই তরুণ ডিরোজিও—কবি, সাংবাদিক, সমাজসেবী, সাহিত্যিক রাজনৈতিক কর্মী এবং সত্যসন্ধ সরকারী কর্মচারী রূপেই তাঁর প্রসিদ্ধি। দয়ালু ও স্নেহপরায়ণ শিক্ষক ছিলেন ডিরোজিও। বিদ্যাবত্তার অভিমান করলেও তিনি সুবিদ্বান ছিলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার তাঁর দিকে ছাত্রদিগকে স্বতঃই আকর্ষণ করত। "এঁর শিষ্যেরা অনেকেই চরিত্র, বিদ্যা, সত্যানুরাগ ইত্যাদির জন্য জাতীয় জীবনে গৌরবের আসন লাভ করেছিলেন, এরই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজের আচার-বিচার বিধি-নিষেধ ইত্যাদি লঙ্ঘন দ্বারা সুনাম বা কুনাম অর্জন করে সমস্ত সমাজের ভিতর একটা নব মনোভাবের প্রবর্তন করেন।...রামমোহন য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চমৎকারিত্বের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মাত্র, কিন্তু সেই জ্ঞানের স্বাদ বাঙালি প্রকৃত প্রস্তাবে পায় ডিরোজিওর কাছ থেকে।"

প্রচলিত ধর্মের ও সমাজের বন্ধন ছিন্ন করবার জন্যে ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি তাঁর প্রিয় ছাত্রদের নিয়ে (হিন্দু কলেজের এঁরাই প্রথম দল) তিনি এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েসন নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতিতে সকল বিষয়ে স্বাধীনতার মন্ত্র ঘোষিত ও প্রচারিত হতো। বাংলা দেশে স্কুল-কলেজে বিতর্ক সভা বা স্কুল-কলেজের বাইরে সভা-সমিতির পথিকৃৎ এই এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েসন। এইখানে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা নব্য শিক্ষালব্ধ বিষয়-বস্তুরই শুধু আলোচনা করতেন না, তাঁরা নিজের নিজের জীবনে তার প্রয়োগের বিষয়ও অহরহ ভাবতেন, বলতেন। বাংলা তথা ভারতবর্ষের রেনেসাঁসের আবির্ভাবে এই বিদ্বৎসভার দান বিশেষভাবেই স্মরণীয়।

মোট কথা, তখনকার শিক্ষিত যুবকদের প্রাণস্পন্দনের ভেতরে রক্তের উত্তাপ ছিলেন এই ডিরোজিও এবং তাঁর শিক্ষার প্রভাব ও এ্যাকাডেমিক এ্যাসো-

সিয়েসনের প্রেরণা শুধু নব্য শিক্ষিতদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না ; এমন কি, বাংলা-সাহিত্য অনুশীলনকারীদেরও এইসব বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ডিরোজিও দ্বারা কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা পরিমাপ করা যায় না। কৃতী ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি একেবারে দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছিলেন। তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন যে, ফুলের পাঁপড়ির মতো তাঁর ছাত্রদের অন্তর্নিহিত শক্তি দলে দলে একদিন বিকশিত হবে। পরবর্তী কালের বাংলার ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, ডিরোজিওর এই আশা ব্যর্থ হয়নি। তাঁর সত্যপ্রিয় যুক্তিবাদী ও ভাবপ্রাণ ছাত্রদল সত্যই আগামীকালকে কর্মে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হিন্দু কলেজ মানেই তখন এই ডিরোজিও আর ডিরোজিও মানেই স্বাধীন চিন্তা, বুদ্ধিবাদী প্রজ্ঞা, যুক্তির প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, যে কোন যুক্তিগ্রাহ্য মতবাদকে অঙ্গীকার করার মত মানসিক ঔদার্য। সত্যের জন্যে বাঁচা এবং সত্যের জন্যে প্রাণত্যাগ করা—এই আদর্শ তখন বিদ্যুৎতরঙ্গে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে এবং তাদের মাধ্যমে সমাজ-জীবনের বৃহত্তম পরিসরে প্রসারিত হতে উদ্যত হয়। প্রিয়তম শিক্ষক ডিরোজিওর কণ্ঠস্বর থেকে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা (এবং হিন্দু কলেজের ছাত্র মানেই 'ইয়ং বেঙ্গল') শুনল ইংরেজি সাহিত্য দর্শন ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির নূতন বাণী। প্রাণোচ্ছল ও প্রেরণাময় সেই বাণী। সেই অবিচল কণ্ঠ থেকে সেদিন বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত হয়েছিল স্বাধীন চিন্তা ও সত্য নিষ্ঠা। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দু কলেজের বিদ্রোহ জীবনের প্রবাহপথে নিয়ে এলো সর্বগামী উদারচিত্ততা, বোধ ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং বিচারের ক্ষেত্র থেকে বিশ্বাস হলো বিসর্জিত। প্রথার দাসত্ব নয়, প্রচলিত ধ্যান-ধারণার ওপর অন্ধ বিশ্বাস নয়—শাণিত যুক্তি, মার্জিত বুদ্ধি, সর্বসংস্কার মুক্ত বিচারমুখী মন—সে যেন সমাজ-জীবনে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। হিন্দুর ধর্মকর্ম আচার আচরণ হলো পরিত্যক্ত। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম সন্ধ্যা আহ্নিকের স্থান নিল হোমার-ইলিয়ড। প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ আহারাদি ভক্ষণ পর্যন্ত বাদ গেল না। বিতর্ক সভা, আলোচনা বৈঠক—সর্বত্র চললো হিন্দু সমাজ ও ধর্মের ওপর নির্মম আক্রমণ। বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর বিমুখতা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠল। রামমোহন বাঙালির ঘরের

জানালা খুলে দিয়েছিলেন। সেই খোলা জানালার পথে দূর-দূরান্তের যে আলো আসতে লাগল তাতে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটল। পুরাতনের পত্রপুট বিদীর্ণ করে ইতিহাসের উদার গগনে এই যে নবীনের অভ্যুদয়, বিদ্যাসাগরের যুগ-সচেতন মন এই অভ্যুদয়কে স্বীকার করে নিতে পেরেছিল বলেই না তিনি বাংলার যুগপুরুষ হয়েছিলেন। যুগধর্মকে তিনি স্বীকার করলেন সমাহিত চিত্তে, ভাববিহ্বল চিত্তে নয়। সেইজন্যেই না আমরা যুগপুরুষ বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে পেলাম স্বাজাত্য বোধ, পেলাম বলিষ্ঠ বুদ্ধি ও বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের নির্দেশ আর পেলাম বিশ্বব্যাপক হৃদয়ধর্মের স্বাদ।

রাজনারায়ণ বসুর "একাল ও সেকাল" গ্রন্থে এবং তাঁর আত্মচরিতে উনবিংশ শতকে সমাজ বিপর্যয়ের নিখুঁত বিবরণ আছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বললেই চলে।

আত্মচরিতে রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন :

"তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। তাঁহারা কখনই পানাসক্ত হইতেন না, যদ্যপি তাহা সভ্যতার চিহ্ন মনে না করিতেন। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্র্যাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শক কার্য মনে করিতাম। ...একদিন সন্ধ্যার পর আমাকে পিতাঠাকুর তাঁহার লিখিবার ঘরে ডাকিয়া বলিলেন,—'তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে মদ্যপান করিবে ও এই সকল দ্রব্য (মুন্সী আমীর আলীর বাড়তে রান্না পোলাও ও কোপ্তা) আহার করিবে; কিন্তু শেরী মদ দুই গ্লাসের অধিক পাইবে না। যখনই শুনিব, অন্যত্র মদ খাও, সেদিন অবধি এই খাওয়া বন্ধ করিয়া দিব।' কিন্তু আমি এইরূপ পরিমিত পানে সন্তুষ্ট হইতাম না। অন্যত্র পান করিতাম।"

সেদিনের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এই উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"নূতন ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙালি ছাত্রেরা যখন হিন্দু কলেজ হইতে বাহির হইলেন, তখন তাঁহাদের কী ভীষণ মত্ততা জন্মিয়াছিল। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গুরুতর আঘাতে হিন্দুসমাজের হৃদয় হইতে রক্তপাত করিয়া তাহাই লইয়া প্রকাশ্যপথে আবীর খেলাইতেন। কঠোর অট্টহাস্য ও নিষ্ঠুর উৎসবের

কোলাহল তুলিয়া তখনকার শ্মশানদৃশ্য তাঁহারা আরো ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হিন্দু সমাজের কিছুই ভালো, কিছুই পবিত্র ছিল না। হিন্দুসমাজের যে সমস্ত কঙ্কাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাদের ভালোরূপ সৎকার করিয়া শেষ ভস্মমুষ্টি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া বিষণ্ণমনে যে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, প্রাচীন হিন্দুসমাজের স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের এতটুকুও শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা কালভৈরবের অনুচর ভূত-প্রেতের ন্যায় শ্মশানের নরকঙ্কালে মদিরা পান করিয়া বিকট উল্লাসে উন্মত্ত হইতেন। সে-সময়কার অবস্থা বিবেচনা করিলে তাঁহাদের ততটা দোষ দেওয়া যায় না। প্রথম বিপ্লবের সময় এইরূপই ঘটিয়া থাকে। একবার ভাঙিবার দিকে মন দিলে প্রলয়ের আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠে।"

ইতিহাসের নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে দেখলে পরে আমরা দেখতে পাই যে দেশবাসীদেরই আগ্রহে, অর্থে এবং পরিচালনায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক প্রচারের জন্যে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু নামে 'হিন্দু' হলেও, এই কলেজ ভাবে, গৌরবে ও শিক্ষাপদ্ধতিতে অ-হিন্দু মনোবৃত্তি প্রশ্রয়ের জন্যেই সৃষ্ট হয়েছিল, অন্তত প্রথম যুগে এই-ই হয়েছিল এই কলেজের বিজাতীয় শিক্ষার ফল। ১৮২৬ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত এই কলেজের যুক্তিবাদী তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর প্রেরণায় সেই সময়ের শিক্ষিত নব্যবঙ্গের ভাবজীবন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য এই দুই বিপরীতধর্মী আদর্শের সংঘর্ষে বিক্ষুব্ধ ও বিপর্যস্ত হয়েছিল। ডিরোজিওর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন চিন্তার বিকাশ, কিন্তু এর ফলে হয়েছিল একদিকে নূতনের উপর সীমাহীন ও অবিবেকী নির্ভরতা, অন্যদিকে পুরাতনের প্রতি অন্ধ ও দৃঢ়মূল বিদ্বেষ। এই দুই অন্তরায়ের মধ্যে পড়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রকৃত সমন্বয় সেই সময়ে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। একদিকে যেমন নূতন শিক্ষায় উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ নিজেদের 'সত্যের বন্ধু ও মিথ্যার শত্রু' বলে পরিচয় দিতেন, অন্যদিকে তেমনি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের ধর্মসভা; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে যা কিছু প্রাচীন, তাকেই আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করত। এদের মধ্যবর্তী ছিল প্রথমে সাধারণভাবে রামমোহন রায়ের ও পরে বিশিষ্টভাবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুগামী সম্প্রদায়, যা ছিল সংস্কারপন্থী ও যুক্তিদ্বারা ধর্মসমন্বয় প্রয়াসী। স্বয়ং ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজি বুদ্ধির পক্ষপাতী

হলেও, হিন্দুকলেজী দলের চরম মনোবৃত্তি ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ রামমোহন সমর্থন করতেন না ; কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাস, পৌত্তলিকতা-বিদ্বেষ, খৃষ্টের উপদেশাবলীর উপযোগিতা প্রভৃতি মতবাদ তাঁকে হিন্দু সমাজের বিরোধী ও খ্রীস্টান পাদরী সমাজের পক্ষপাতী করেছিল। এও উল্লেখযোগ্য, যেমন হিন্দু-ধর্মের ওপর, তেমনই খ্রীস্টান ধর্মের ওপর নব্যবঙ্গের অর্থাৎ ইয়ং বেঙ্গলদের বিরোধিতা ছিল স্পষ্ট ; কিন্তু কলেজী শিক্ষার ফলে যে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছিল তার সুযোগ নিয়ে, প্রধান ও প্রতিপত্তিশালী রামমোহনের আনুকূল্যে গোল-দীঘি ও হেদুয়ার সংলগ্ন হিন্দুপল্লী ও কলেজ মহলে আস্তানা স্থাপন করলেন ডাফ্ ও ডিল্‌ট্রি, যাঁদের সকল কর্মের প্রেরণা ছিল গোঁড়া খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকের মনোভাব।

এর থেকেই বোঝা যায় যে, নূতন শিক্ষার গতানুগতিকতার মোহভঙ্গ হয়েছিল, কিন্তু তখনো পূর্ণ জাগরণ হয় নি। দিগ্‌ভ্রান্ত হলেও নব্যবঙ্গের প্রাণশক্তি ছিল অক্ষুন্ন ও উদ্দাম, তাই সদ্য প্রবুদ্ধ আশা-আকাংখার মধ্যে দেখা যায় তীব্র অসন্তোষ, অল্প অসহিষ্ণুতা, বাদ-প্রতিবাদ, বিদ্রোহ। আধ্যাত্মিক সংকটে কেউ সমাজ-সংরক্ষণ, কেউ সমাজ-সংস্কার ; কেউ ধর্মান্তর গ্রহণ ; কেউ পুরাতন ধর্মের নূতন ব্যাখ্যান : কেউ অন্ধ বিশ্বাস, কেউ বা নিছক নাস্তিকের মনোভাব—এইরকম নানা লোকে নানা পন্থা অবলম্বন করল। চারদিকেই দেখা দিয়েছিল পথ খুঁজে নেবার উৎকণ্ঠা। যুগ-বিপ্লবের মুখে এই-ই ছিল এই যুগের লক্ষণ।

যুগবিপ্লবের সেই আগ্নেয়-উচ্ছ্বাস বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনের তটপ্রান্ত দিয়েই বয়ে গিয়েছিল। হিন্দু কলেজের পাঠগৃহে ডিরোজিওর কণ্ঠস্বর, সংস্কৃত কলেজে মুগ্ধবোধ পাঠ-নিরত বিদ্যাসাগরের কানেও যে না এসেছিল তা নয়—কিন্তু আশ্চর্য এই যে আর সকলের মত এই মানুষটির মত্ততা জন্মায় নি। তিনি স্থির চিত্তে ভালো-মন্দ সবই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এই-ই বিদ্যাসাগরের প্রধান মহত্ত্ব। একদিকে তিনি কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান ও জীবনহীন প্রথার মধ্যে জীবন্তে সমাহিত হিন্দু সমাজ-জীবনের পুনরুদ্ধার করলেন, অন্যদিকে, ইংরেজি শিক্ষার, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যেটুকু যথার্থ হিতকর ও যুগের প্রয়োজন সার্থক করার উপযোগী, কেবলমাত্র সেইটুকু নিলেন। রামমোহন রায়

আঘাত করেছিলেন হিন্দুধর্মের ওপর—আঘাত করে তিনিই আবার হিন্দু-ধর্মের জীবন রক্ষা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর আঘাত করলেন হিন্দুসমাজকে। তাঁর একদিকে হিন্দুসমাজের তটভূমি জীর্ণ হয়ে পড়ছিল, আর একদিকে বিদেশীয় সভ্যতার প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যুদ্‌বেগে অগ্রসর হচ্ছিল, বিদ্যাসাগর তাঁর পুর্বসূরী রামমোহনের মতই অটল মহত্ত্ব নিয়ে তার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন—চটি ও চাদরের অভ্রংলিহ মহত্ত্ব নিয়ে তিনি একাই পাশ্চাত্ত্য বিপ্লবের স্রোত ও অনুদার হিন্দুসমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিকারের স্রোত দুই-ই প্রতিহত করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। মহাকালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মতো তিনি বিদ্রোহ করেন নি।

এমনিভাবেই সেদিন—উনবিংশ শতাব্দীর সেই প্লাবন-ক্ষুব্ধ যুগে, হিন্দুসমাজের বহু স্তর-বদ্ধ কঠিন আচরণ ভেদ করে, সতেজে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

॥ পাঁচ ॥

সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের ছাত্র এখন ঈশ্বরচন্দ্র।

শুধু ছাত্র নয়—একেবারে সর্বাগ্রগণ্য ছাত্র।

একদিকে কল্পনাতীত আর্থিক দুর্দশা, অন্যদিকে সুকঠোর অধ্যবসায়—এরই মধ্যে একনিষ্ঠ চিত্তে অধ্যয়নে রত ঈশ্বরচন্দ্র। তাঁর পাণ্ডিত্যে অধ্যাপক শ্রেণী বিস্ময়ে হতবাক। এমন বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্র তাঁরা এর আগে আর দেখেন নি। একই আবাসের একদিকে সংস্কৃত কলেজ, অন্যদিকে হিন্দু কলেজ।

একদিকে প্রবাহিত সংস্কৃত শিক্ষার নিস্তরঙ্গ নদী, অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষার উদ্দাম স্রোত আর সেই স্রোতের আবর্তে হিন্দু কলেজের ভেতরে বাইরে চলছিল প্রলয়ঙ্কর আলোড়ন। তুমুল সেই সমাজ বিক্ষোভের সামনে দাঁড়িয়েই বিদ্যাসাগর ব্যাকরণের জগতে নিবিষ্ট মনে প্রবেশ করলেন। সংস্কৃত পড়েন বটে, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার ব্যূহবেষ্টন বালককে ঘিরে রইল। একদিকে হিন্দু কলেজের উন্মাদিনী শিক্ষা, অন্যদিকে মিশনারী কলেজের মোহিনীমায়া। তবু তিনি বিচলিত হলেন না। হবার উপায় ছিল না, কেননা তাঁর ছাত্রজীবন ছিল কঠোর পিতৃশাসনে নিয়ন্ত্রিত।

অধ্যাপক উইলসন সাহেব বাংলার কৃতবিদ্য বিচক্ষণ পণ্ডিতদের বেছে বেছে এনেছিলেন। তাই না সংস্কৃত কলেজ সংস্কৃত শিক্ষার অমন সিদ্ধপীঠ হয়ে উঠেছিল সেদিন। দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন নিমচাঁদ শিরোমণি, বেদান্তে শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, স্মৃতির পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, আয়ুর্বেদ পড়াতেন ক্ষুদিরাম বিশারদ, অলঙ্কার নাথুরাম শাস্ত্রী, সাহিত্য জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, ব্যাকরণের পাঠ দিতেন গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, হরিপ্রসাদ তর্কালঙ্কার, হরনাথ তর্কভূষণ আর জ্যোতিষে যোগধ্যান মিশ্র। প্রত্যেকেই দিক্‌পাল পণ্ডিত।

ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে ভর্তি হলে ঠাকুরদাসের একটা কাজ বাড়ল। প্রত্যহ ন'টার সময় ছেলেকে কলেজে দিয়ে আসতেন, আবার বিকেল চারটের সময় নিজে গিয়ে নিয়ে আসতেন। এক আধদিন নয়, দু'মাস এই রকম করেছিলেন। তারপর ঠাকুরদাস যখন বুঝলেন ছেলে একাই যাওয়া আসা করতে পারবে, তখন তিনি আর তার সঙ্গে যেতেন না। কলেজে যা শিখে আসতেন, প্রতিদিন রাত্রে বাবার কাছে তা মুখস্থ বলতেন। ঠাকুরদাস ব্যাকরণ ভালই জানতেন। ছেলে কোন বিষয় ভুলে গেলে ঠাকুরদাস তা মনে করিয়ে দিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বুঝতেন, তাঁর পিতা ব্যাকরণে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন। ছেলের বিদ্যানুরাগ বাড়াবার জন্যে ঠাকুরদাসের চেষ্টার অন্ত ছিল না। কর্মস্থলে কঠোর পরিশ্রমেও তিনি ক্লান্তি বোধ করতেন না। রাত ন'টার পর ঠাকুরদাস বাসায় ফিরতেন, রান্না করতেন এবং ছেলেকে খাইয়ে নিজে খেতেন। তারপর পিতাপুত্রে এক সঙ্গে শয়ন করতেন। শেষ রাতে উঠে ছেলেকে নিয়ে পড়াতে বসতেন, মুখে মুখে কত উদ্ভট শ্লোক তাকে শেখাতেন। পুত্র ঈশ্বর যেন ঠাকুরদাসের কাছে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ছিলেন। পুজারী যেমন একনিষ্ঠ মনে বিগ্রহের পুজা আরাধনা করে, ঠাকুরদাসের জীবনেও আমরা দেখতে পাই সেই নিষ্ঠা, ছেলেকে মানুষ করার জন্যে ঠিক সেইরকম একাগ্রতা। যদি কোন দিন রাত্রে বাসায় ফিরে এসে দেখতেন ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে, আর রক্ষা ছিল না। পিতার প্রচণ্ড চপেটাঘাতে কিংবা কর্ণমর্দনে ঈশ্বরের ঘুম ছুটে যেত। সে কী নিদারুণ প্রহার। চেলাকাঠ পর্যন্ত বাদ যেত না। সময়ে সময়ে বাবার কাছে মার খেয়ে ঈশ্বর এমন আর্তনাদ করে উঠতেন যে তাতে সিংহ-পরিবার উত্যক্ত হয়ে উঠতেন, রাইমণি পর্যন্ত অন্দরমহল থেকে ছুটে আসতেন এবং প্রহার-জর্জর ঈশ্বরকে নিজের বক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে ঠাকুরদাসকে বলতেন—শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মহত্যা করবেন না কি? পিতৃ-শাসনে এমনই সন্ত্রস্ত থাকতেন ঈশ্বরচন্দ্র যে সন্ধ্যার পর যখন রাজ্যের ঘুম এসে বালকের দুই চক্ষে ভর করত, ব্যাকরণের সন্ধিসূত্র মুখস্থ করেও যখন কিছুতেই ঘুমকে নিরস্ত করতে পারতেন না, তখন নিরুপায় বালক তাঁর দুই চক্ষে সরিষার তৈল দিতেন। এই ভাবে তিনি নিদ্রার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেন।

ব্যাকরণ-শ্রেণীতে ঈশ্বরের জুরি আর কোন ছাত্র ছিল না।

ব্যাকরণে তাঁর অসম্ভব ব্যুৎপত্তি অধ্যাপকদের বিস্ময়ের উদ্রেক করল। তিনি হলেন সকলের প্রীতির পাত্র। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ব্যাকরণের এমন মেধাবী ছাত্র বহুকাল দেখেন নি। ক্লাসের বাইরে ঈশ্বরচন্দ্রকে কাছে বসিয়ে তর্কবাগীশ মুখে মুখে তাঁকে উদ্ভট শ্লোক শেখাতেন। এই ভাবে পিতা ও অধ্যাপকের কাছে তিনি এই সময়ে প্রায় চার পাঁচশো শ্লোক শিখেছিলেন। তর্কবাগীশ ছাত্রকে শুধু শ্লোকই শেখাতেন না, তার অন্বয় ও অর্থও বলে দিতেন।

ছ'মাস পরে একটা পরীক্ষা হলো।

ঈশ্বরচন্দ্র সেই পরীক্ষায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে পাঁচ টাকা বৃত্তি পেলেন।

ঠাকুরদাসের সে কী আনন্দ! ঈশ্বর বৃত্তি পেয়েছে—তা'হলে সে নিশ্চয়ই কলেজের সেরা ছাত্র। অধ্যয়নে তিনি ছেলেকে আরো উৎসাহ দিতে লাগলেন। ব্যাকরণের শ্রেণীতে পড়ে, তিন বছরের মধ্যে তিনি ছু'বছর প্রচুর পারিতোষিক পেলেন। অধ্যয়ন ছিল তাঁর তপস্যা, কোন ছাত্র তাঁকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে, ঈশ্বরের কাছে এ চিন্তা অসহ্য ছিল। তিনি থাকবেন সকলের পুরোভাগে—এই ছিল তাঁর ছাত্রজীবনের অপরাজেয় সংকল্প। এই সংকল্পই ঈশ্বরচন্দ্রকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে জয়ী করে তুলেছিল।

এগার বছর বয়সের সময়ে ঠাকুরদাস ছেলের উপনয়ন সংস্কার করলেন। তারপর বার বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের ক্লাসে ভর্তি হলেন। জয়গোপাল তর্কলঙ্কার তখন সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি আপত্তি তুললেন ছেলের কম বয়স বলে—এইটুকু ছেলে সংস্কৃত সাহিত্য বুঝবে কি? বললেন জয়গোপাল তর্কলঙ্কার। ঈশ্বরচন্দ্রের অভিমানে আঘাত লাগল। বললেন—আমাকে পরীক্ষা করেই নিন।

জয়গোপালের মুখের ওপর কথা!

ছাত্রদের ত কথাই নেই, অধ্যাপকরা পর্যন্ত বিস্মিত হলেন বার বছরের একটি ছাত্রের মুখে এমন দম্ভের কথা শুনে।

বিস্মিত হলেন না কেবল জয়গোপাল! বালকের ললাটে তিনি প্রতিভার চিহ্ন দেখেছিলেন নিশ্চয়ই। তাই বললেন শান্তভাবে—বেশ, পরীক্ষাই দাও। কালিদাসের কুমারসম্ভব থেকে একটা শ্লোক বল দেখি?

ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে বললেন :

অক্ষাগ্রহস্তে মুকুলীকৃতাঙ্গুলৌ
সমর্পয়ন্তী স্ফটিকাক্ষমালিকাম।
কথঞ্চিদদ্রেস্তনয়ামিতাক্ষরং
চিরব্যবস্থাপিত বাগভাষত ॥

বালকের কণ্ঠে এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণ, অধ্যাপকেরা উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন। জয়গোপাল বললেন—ব্যাখ্যা কর। বিদ্যাসাগর কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে শ্লোকের ব্যাখ্যা শোনালেন : "অঙ্গুলিগুলিকে পুষ্প কলিকার ন্যায় মুদ্রিত করিয়া করাগ্রভাগে স্ফটিকাক্ষমালা স্থাপন করিতে করিতে অদ্রিতনয়া বহু কষ্টে মুখে বাক্য আনিয়া পরিমিত ভাষায় স্বীয় উচ্চাভিলাষের কথা ব্রহ্মচারীবেশী শিবকে ব্যক্ত করিলেন।" চমৎকার! সাধু! একবাক্যে বলে উঠলেন অধ্যাপকবৃন্দ।

জয়গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন—বল দেখি এই শ্লোকটি কোথায় আছে ?

মত্তৌদ্বিরেফ পরিচুম্বিতচারুপুষ্পা
মন্দানিলকুলিতনম্রমৃদুপ্রবালাঃ।
কুর্বন্তি কামিমনসঃ সহসোৎসুকত্বম
বালাতি মুক্ত লতিবাঃ সমবেক্ষ্যমানাঃ ॥

ঈশ্বরচন্দ্র উত্তর দিলেন—কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্যে।

জয়গোপাল। অর্থ বোঝ ?

ঈশ্বরচন্দ্র। বুঝি : "বসন্তের মৃদু বায়ুভরে কম্পিত কিশলয় শোভিত অভিনব মাধবী লতার মনোরম পুষ্পগুলিকে মত্ত ভ্রমরেরা চুম্বন করিতেছে আর তাহাই দেখিয়া কামীদের চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।"

জয়গোপাল। উত্তম। রঘুবংশের একটি শ্লোক বল দেখি ?

ঈশ্বরচন্দ্র আবৃত্তি করলেন :

আসসাদ মিথিলাং স বেষ্টয়ন্ পীড়িতোপবন-পাদপাং বলৈঃ।
প্রীতিরোধমসহিষ্ট সা পুরী স্ত্রীব কাণ্ড পরিভোগমায়তম্।

জয়গোপাল। ব্যাখ্যা কর।

ঈশ্বরচন্দ্র। "তিনি অর্থাৎ দশরথ মিথিলায় উপনীত হইয়া সৈন্যদলসহ মিথিলা বেষ্টন করিয়া উহার উপবন ও পাদপরাজি পীড়িত করিতে লাগিলেন। মিথিলা

তাঁহার প্রীতির অত্যাচার সহ্য করিল—যুবতী যেমন সহ্য করে প্রগাঢ় প্রিয়সম্ভোগ।"

জয়গোপাল। রঘুর কোন্ সর্গে এই শ্লোকটি আছে?

ঈশ্বরচন্দ্র। একাদশ সর্গে।

আর পরীক্ষার প্রয়োজন হলো না। জয়গোপাল ঈশ্বরচন্দ্রকে সাহিত্যের শ্রেণীতে ছাত্রহিসাবে গ্রহণ করলেন। শুধু কালিদাস নয়, সেদিন তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে ভট্টিরও কয়েকটি কঠিন কবিতার অর্থ করতে বলেছিলেন। তিনি অনায়াসেই সেসব কবিতার অন্বয় ও অর্থ দুই-ই করে, জয়গোপালকে চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন। সেইদিন থেকে তর্কালঙ্কার মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে ছাত্রের অধিক স্নেহ করতেন এবং পুত্রবাৎসল্যের সঙ্গে তাঁকে শিক্ষাদান করতেন।

বিদ্যাসাগরের এক জীবনচরিতকার লিখেছেন: "ঈশ্বরচন্দ্র এই শ্রেণীর প্রথম বর্ষে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও রাঘবপাণ্ডবীয় প্রভৃতি সাহিত্যগ্রন্থের পরীক্ষায় সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় বৎসরে মাঘ, ভারবি, মেঘদূত, শকুন্তলা, উত্তরচরিত, বিক্রমোর্বশী, মুদ্রারাক্ষস, কাদম্বরী ও দশকুমারচরিত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থসকল আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া শেষ পরীক্ষায় সকলকে পশ্চাতে রাখিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রগণ সকলে তাঁহার পরীক্ষার ফল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।"

শুধু কি কাব্যগুলি কণ্ঠস্থ ছিল? অনুবাদে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। বই না দেখে তিনি সংস্কৃত নাটকাদি অনর্গল বলতে পারতেন। বার বছরের ছেলে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন জলের মতন, অধ্যাপকেরা হাঁ করে শোনেন। এমন আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি ও অশ্রুতপূর্ব বাক্যবিন্যাস ক্ষমতা এই বয়সের আর কোন ছাত্রের মধ্যে তাঁরা দেখেন নি। দ্বিতীয় বৎসর সাহিত্য পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র সর্বপ্রথম হলেন। হাতের লেখা ছিল মুক্তার মত। প্রতি বছরই হাতের লেখার জন্যে তিনি পারিতোষিক পেতেন। এই হাতের লেখা ভালো হওয়ার একটা কারণ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র অনেক সংস্কৃত পুঁথি নিজের হাতে লিখে নিতেন। তাঁর পুঁথির লেখা দেখে সকলেই প্রশংসা করতেন, কোথাও এতটুকু কাটাকুটি নেই, প্রত্যেকটি লাইন সোজা—যেন কার্পেটের ওপর উল বুনে লেখা। সে এক আশ্চর্য শিল্পকর্ম। রচনাতেও তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। সংস্কৃত থেকে বাংলা অথবা বাংলা থেকে সংস্কৃত অনুবাদে ঈশ্বরচন্দ্রের

পারদর্শিতা অন্যান্য ছাত্রদের ঈর্ষার বিষয় ছিল। কি রচনা, কি অনুবাদ কোনটাতেই বর্ণাশুদ্ধি কিম্বা ব্যাকরণ ভুল হতো না। ছাত্রজীবনে ঈশ্বরচন্দ্র সত্যই ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। অথচ ভাবলে বিস্মিত হতে হবে যে, কৃতিত্বে সমুজ্জল তাঁর এই ছাত্রজীবন গড়ে উঠেছিল কঠোর দারিদ্র্যের ভেতর দিয়ে। ধনীর পুত্র তিনি ছিলেন না, বিলাসের কোলে লালিত-পালিত হন নি—দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁর আশৈশব পরিচয়। সে-দারিদ্র্য আজকের দিনে আমাদের কাছে কল্পনাতীত। তিনি নিজেই বলেছেন, তাঁর মত গরীব অতি অল্পই হয়। ঠাকুরদাস যেভাবে দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনের পথে তিলে তিলে অগ্রসর হয়েছিলেন, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু ছাত্রজীবনে যে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় তা সত্যই হৃদয়-বিদারক এবং তা শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করার জিনিস।

এই সম্পর্কে বিদ্যাসাগর নিজে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা তাঁর এক চরিতকার এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন: "তিনি বলিয়াছেন কখন অন্ন জুটিত, কখন জুটিত না; যখন জুটিত, তখনও সকল সময়ে পেট ভরিয়া খাইতে পারিতেন না। যখন পেট ভরিয়া অন্ন জুটিত, তখন আবার অনেক সময়ে ব্যঞ্জনের অভাবে, কেবল নুন-ভাতে দিনপাত করিতেন; যখন তরকারী ও মৎস্য পাইতেন, তখন মৎস্যের ঝোল রাঁধিয়া, এক বেলা ভাত আর সেই ব্যঞ্জনের ঝোল খাইয়া, বৈকালবেলার জন্য তরকারী ও মৎস্য রাখিয়া দিতেন; বৈকালে সেই ব্যঞ্জনের তরকারীর দ্বারা অন্ন উদরস্থ করিয়া, মাছগুলি পরদিনের জন্য রাখিয়া দিতেন; পরদিন সেই মাছের অম্বল রাঁধিয়া তাহার দ্বারাই সেদিনকার আহার সমাপন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন।"

তখন ঠাকুরদাস তাঁর মধ্যম পুত্র দীনবন্ধুকে কলকাতায় এনেছেন লেখাপড়া শেখাবার জন্যে। রান্নার ভার ঈশ্বরচন্দ্রের ওপর। কেবল কি তাই? "প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নান করিয়া তিনি বাজারে যাইতেন এবং বাজার হইতে পিতার অবস্থানুসারে আলু, পটোল প্রভৃতি তরি-তরকারী ও মৎস্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতেন। তৎপরে তিনি নিজেই ঝাল হলুদ শিলে বাটিয়া লইতেন। তখন পাথুরে কয়লার প্রচলন হয় নাই। তিনি স্বহস্তে কাঠ চালা করিতেন এবং উনুন ধরাইতেন। বাসায় চারিটি লোক খাইতেন। চারিজনের জন্য ভাত, ডাল, মাছের ঝোল রাঁধিয়া তিনি সকলকে

আহার করাইতেন এবং আহারান্তে সকলের উচ্ছিষ্ট মুক্ত করিয়া স্বয়ং বাসনাদি ধৌত করিতেন। হলুদ বাটিয়া, কাঠ চিরিয়া, বাসন মাজিয়া সত্য সত্যই তাঁহার অঙ্গুলি ও নখ কতকটা খইয়া গিয়াছিল।”

রান্না করে প্রতিদিন নিজের পড়া তৈরি করা, বিশেষত ঐ বয়সে, এ এক বিদ্যাসাগরেই সম্ভব। কষ্টকে তিনি কষ্ট মনে করতেন না—এমন অপূর্ব উপাদানে গঠিত ছিল তাঁর চরিত্র। কিন্তু কি অবস্থার মধ্যে তাঁকে এই রান্নার কাজ করতে হতো?

বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

“যে ঘরে তিনি রন্ধন করিতেন, সে ঘরটি অতি জঘন্য ছিল। একে তো ঘরটি বাড়ির সর্বনিম্নতলে, তাহার উপর জানালার অভাবে ভয়ানক অন্ধকারময়। নিকটে দুইটি পায়খানা ছিল; সুতরাং ঘরটি সর্বদাই দুর্গন্ধে পূর্ণ হইয়া থাকিত। মলমূত্রের কীটসকল ‘কিলিবিলি’ করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিত। ঈশ্বরচন্দ্র রন্ধন করিবার সময় ঘটীতে জল লইয়া বসিয়া থাকিতেন। পোকাগুলি ঘরের ভিতর ঢুকিলে তিনি জল দিয়া ধুইয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত, ঘরময় প্রায় আরসুলা উড়িয়া পড়িত। হঠাৎ কোন দিন ঈশ্বরচন্দ্র অজ্ঞাতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে একটা আরসুলা রাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রকাশ করিলে বা পাতের নিকট ফেলিয়া রাখিলে, ভ্রাতা বা পিতা ঘৃণাপ্রযুক্ত আর ভোজন করিবেন না, ইহা ভাবিয়া তিনি আরসুলাটি ব্যঞ্জন সহিত ভক্ষণ করেন।”

আজ এই কাহিনী হয়ত কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে কিন্তু বিদ্যাসাগরের চরিত্রের বলিষ্ঠতা ও মনের দৃঢ়তার পরিচয় বহন করে এই আরসুলা ভক্ষণের কাহিনীটি আমাদের কাছে একটা বিশেষ ঘটনা বলেই মনে না হয়ে পারে না—যে ঘটনা সর্বকালের বাঙালি সন্তানকে নীরবে এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে, মানুষ হতে হলে এমনি করেই কষ্ট স্বীকার করতে হয়।

বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন সত্যই ছিল তপস্যার জীবন।

কঠোর ও একাগ্র সেই তপস্যা।

কোন দেশে কোন কালে কোন ছাত্র বোধ হয় এমন তপস্যা করে নি।

বড়বাজার থেকে পটলডাঙা দু'বেলা পায়ে হেঁটে প্রতিদিন কলেজে যাওয়া-আসা, বাসায় রান্না করা, বাসন মাজা, তার ওপর নিজের পড়া তৈরি করা—ঘড়ির কাঁটার মত এই কাজ করতেন ঈশ্বরচন্দ্র প্রত্যহ প্রসন্ন চিত্তে।

আহার ছিল সামান্যই, আহার না বলে তাকে ক্ষুন্নিবৃত্তি বলা যেতে পারে। কিন্তু বিশ্রামের সুখও তাঁর ভাগ্যে বিন্দুমাত্র ছিল না। দিনরাতের পরিশ্রমের পর একটু যে ভালো করে শয়ন করবেন, দরিদ্র পিতার সংসারে সে ব্যবস্থা আদৌ ছিল না। এই সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র নারায়ণচন্দ্র যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন সেটি বিদ্যাসাগরের এক জীবন-চরিতকার এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন: "শয়নের অবস্থা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে তাঁহার শয়ন ব্যাপারের এইরূপ পরিচয় পাইয়াছি। নারায়ণবাবু বলেন,—একদিন চন্দননগরের বাসাবাড়িতে আমি বলিলাম—বাবা! এই ছোট ঘরে শুইতে আপনার কষ্ট হইবে না তো? বাবা বলিলেন—বলিস কিরে! ছেলেবেলায় বড়বাজারের বাসায় আমি দেড়হাত চওড়া ও দু-হাত লম্বা একটি বারাণ্ডায় প্রত্যহ শয়ন করিতাম। বারাণ্ডার আলিসা আমার বালিশ ছিল। আমি বারাণ্ডার মাপে একটি মাদুরী করিয়াছিলাম, সেই মাদুরীতেই শয়ন করিতাম। একদিন রাত্রিকালে দেখিলাম, সেই মাদুরীর উপর আমার একটি ভ্রাতা শুইয়া আছে। আমি তাহার নিকট গিয়া অনেক ডাকাডাকি করিলাম, সে কিন্তু কিছুতেই উঠিল না, তখন আমি তাহার নিজের বিছানায় গিয়া শুইলাম। শুইবামাত্র আমার গায়ে বিষ্ঠা লাগিয়া গেল। আমি তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া একটু মজা করিব বলিয়া যেখানে আমার সাধের বিছানায় ভাইটি শুইয়াছিল সেইখানে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, উঠ্‌বি তো ওঠ্‌, না হলে তোর গায়ে বিষ্ঠা মাখাইয়া দিব। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া চলিয়া আসিলাম। সে রাত্রিতে আর নিদ্রা হয় নাই।"

এই বিষ্ঠা কোথা থেকে এল? তৃতীয় ভাই শম্ভুচন্দ্র তখন কলকাতায় এসেছেন। সিংহীবাড়ির ক্ষুদ্র বাসায় স্থানের সঙ্কুলান হয় না বলে জগদ্দুর্লভ বাবুর বাড়ির সামনে তিলকচন্দ্র ঘোষের বাড়ির একতলার একটি ঘরে ঈশ্বরচন্দ্র শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন। শম্ভুচন্দ্র তাঁর বিছানায় শুতেন। ঈশ্বরচন্দ্র অনেক রাত পর্যন্ত পড়তেন। উপরিউক্ত ঘটনার দিন রাত্রে, শম্ভুচন্দ্র বিছানায় মলত্যাগ করে ফেলেছিলেন, পাছে এ কথা বললে পেটের অসুখ হয়েছে বলে খেতে না পান, সেই ভয়ে শম্ভুচন্দ্র মলত্যাগের কথা প্রকাশ করেন নি। ঈশ্বরচন্দ্র তো সে কথা জানতে পারেন নি। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখেন, তাঁর সর্বাঙ্গে

বিষ্ঠা। তখন নির্বিকার চিত্তে তিনি বিষ্ঠা ধুয়ে নিজের হাতে মলমূত্রাদি পরিষ্কার করে দিলেন।

অবিশ্বাস্য এই ঘটনা থেকে আমরা দুটো জিনিস পাই। প্রথম—বিদ্যাসাগরের ভ্রাতৃস্নেহ, দ্বিতীয় তাঁর মানসিক ধৈর্য। সারারাত বিষ্ঠার উপর নির্বিকার চিত্তে ঘুমিয়ে থাকা—এমন কৃচ্ছ্র সাধন অনেক যোগীঋষিদের ধারণার বাইরে, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা। কী বিচিত্র উপাদান দিয়ে যে ভগবান এই মানুষটিকে গড়েছিলেন, তা অনুভব মাত্র করা চলে, ভাষায় প্রকাশ করে বলা অসম্ভব। বিষ্ঠাকে বিষ্ঠাজ্ঞান করলেন না—তারই ওপর ঘুমিয়ে রাত কাটালেন—মন কোন্ স্তরে উঠ্‌লে পরে এই জিনিস সম্ভব, তা ভেবে দেখলেই সাগর-চরিত্রের মহত্ত্বের কিছুটা ধারণা আমরা করতে পারি।

বিদ্যাসাগর যখন সাহিত্য শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাঁর ওপর এক বেলা রান্নার ভার ছিল। রাতের রান্না ঠাকুরদাসই করতেন। এত কাজ, তবু তাঁর পড়াশুনার কোন ত্রুটি ছিল না। কথিত আছে যে, কলেজে যাবার সময় বিদ্যাসাগর বই খুলে পড়তে পড়তে যেতেন এবং কলেজ থেকে ফিরবার পথেও ঐ রকম করতেন। বিলাসে বীতস্পৃহ বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবন এমনি কঠোর পরিশ্রমের জীবন। মোটা কাপড় ও মোটা চাদর—এই ছিল তাঁর ছাত্রজীবনের পরিচ্ছদ—আবার এই ধুতি ও চাদরই ছিল বিদ্যাসাগরের সারা জীবনের পরিচ্ছদ। এ ছিল যেন তাঁর বিজয়-পতাকা; তাঁর জাতির বিজয়-পতাকা। জীবনের কোথাও কোন অবস্থায়ই এই পতাকা সেই ব্রাহ্মণ অবনমিত হতে দেন নি। তাঁর নিজের মা চরকায় সুতো কেটে, কাপড় তৈরি করে ছেলেকে কলকাতায় পাঠাতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সত্যই মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় করে নিয়েছিলেন এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও এই ছিল তাঁর গর্বের জিনিস। এই মোটা কাপড়েই আজীবন উন্নত তাঁর মেরুদণ্ড।

একদিন। সন্ধ্যাবেলা। ঠাকুরদাস সেদিন একটু সকাল সকাল ফিরেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পড়ার বইগুলি নিয়ে বসেছেন। ছোট ভাই কালিদাস এসে বললেন—দাদা শুনেছ, ঈশ্বর সন্ধ্যা ভুলে গিয়েছে। কোশাকুশি নিয়ে বসে বটে, কিন্তু কিছুই করে না, সব ভুলে মেরে দিয়েছে, দেখলাম। এই কথা শুনে বজ্রগম্ভীরস্বরে পিতা ডাকলেন—এই শোন্। ছেলে উঠে আসে কাঁপতে

কাঁপতে। ঠাকুরদাস জিজ্ঞাসা করলেন—সন্ধ্যা-আহ্নিক করেছিস? বালক মহাসঙ্কটে পড়লেন। নিরুত্তর।

—কী রে চুপ করে রইলি যে, করিস নি বুঝি? তুই না বামুনের ছেলে, তোর না পৈতে হয়েছে?

বালক তবু নিরুত্তর। শীর্ণ আঙুল দিয়ে ঈশ্বরের কর্ণ দুটি মর্দন করে ঠাকুরদাস আবার বললেন—কিরে গায়ত্রীটা মনে আছে, না তাও ভুলে মেরে দিয়েছিস? ঈশ্বরচন্দ্র সত্যই সন্ধ্যার মন্ত্র ভুলে গিয়েছিলেন। সেই রাত্রেই পুঁথি দেখে মুখস্থ করে নিলেন। ছেলের এতটুকু ত্রুটি, এতটুকু শৈথিল্য ঠাকুরদাস সহ্য করতে পারতেন না। অবশ্য ইতোমধ্যে পুত্রের চরিত্রের অনেক সদ্‌গুণের পরিচয় পেয়েছেন তিনি। জেনেছেন তার সাফল্যের কথা, বিদ্যালয়ে কৃতিত্বের কথা আর শুনেছেন বালকের দয়ার কথা। পিতা দরিদ্র, নিজে সর্বদা খেতে পেতেন কি না সন্দেহ, তবু বিদ্যালয়ে যে বৃত্তি পেতেন, সময়ে সময়ে তারো কিছু কিছু অন্য সহপাঠীদের সাহায্যের জন্যে ঈশ্বরচন্দ্র ব্যয় করতেন। কারো অসুখ করেছে শোনা মাত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। নিজে বাড়ির চরকায় কাটা মোটা সুতায় তৈরি মোটা চটের মত কাপড় পরেছেন, কিন্তু নিজের টাকায় অন্য দরিদ্র বালকদের জন্যে ভাল কাপড় কিনে দিতেন। নিরন্ন বালকের পক্ষে এমন স্বার্থত্যাগের কথা শুনে, পুত্রগর্বে ঠাকুরদাসের বুক ভরে উঠত। মুখে কিছু বলতেন না। তাঁর ছেলে, নিজের দুরবস্থা ভুলে গিয়ে, অন্যের সেবা করে—এতে যে ঠাকুরদাস কী আনন্দ বোধ করতেন, তা একমাত্র তিনিই জানতেন আর জানতেন তাঁর অন্তর্যামী। পৃথিবীর কোন দেশের কোন ছাত্রের জীবনে এমন দৃষ্টান্ত আর দেখা যায়নি। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবন-চরিতকার যথার্থই লিখেছেন:

"একদিকে অনাহার ও অনিদ্রাজনিত দুঃখকষ্ট, শ্রাবণের ধারার ন্যায় তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইত, অন্যদিকে ইহার উপর গৃহের পাকাদি কার্যের ভার তাঁহারই উপর ছিল; আবার তাহার উপরে অপর দশজনের সংবাদ লইয়া ও সেবা করিয়া বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করা কিরূপ বালকের পক্ষে সম্ভব, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারি না। সমগ্র সভ্যজগতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও, এরূপ দরিদ্র বালকের এ প্রকার ক্লেশ ও অসুবিধার ভিতরে, এরূপ পরসেবা

ও স্বার্থত্যাগের ভিতরে, আত্মোন্নতি সাধনের এমন উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। একান্ত বিরল—অতি দুর্লভ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।"

এই-ই বিদ্যাসাগর। ছেলেবেলা থেকেই তিনি আত্মনির্ভর। তাঁর গৌবরময় ছাত্রজীবন দাঁড়িয়ে আছে এই আত্মনির্ভরতা গুণের উপর। কারো সাহায্য না নিয়ে বিদ্যালয়ে তিনি সব বিষয়ে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছাত্র হবেন—তাঁর মনের মধ্যে সর্বক্ষণের জন্যে ছিল এই প্রতিজ্ঞা আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছাত্র হতে হলে যতরকম ক্লেশ ভোগ করার দরকার, বিদ্যাসাগর তাতে বিন্দুমাত্র পরাঙ্মুখ হতেন না।

•

কাব্যে ও ব্যাকরণে ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ ব্যুৎপত্তির কথা কলকাতা থেকে বীরসিংহ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। কলেজের ছুটির অবকাশে তিনি যখন দেশে আসতেন তখন অনেক শ্রাদ্ধ-সভায় তিনি নিমন্ত্রিত হতেন এবং বহু পণ্ডিতের সমাগমে উজ্জ্বল সেইসব শ্রাদ্ধ-সভায় কিশোর ঈশ্বরচন্দ্র মুখে মুখে সংস্কৃত কবিতা রচনা করে পণ্ডিতদের চমৎকৃত করতেন। সকলেই একবাক্যে রামজয়ের এই পৌত্রটির প্রতিভার প্রশংসা করতেন। শুধু কি কবিতা রচনা? বালক বিদ্যাসাগর শ্রাদ্ধ-সভায় সমাগত পণ্ডিতদের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণের বিচার করতেন। ধন্য ধন্য রব উঠত। লোকে বলতো—এই বয়সেই এমন, না জানি বড় হলে এ ছেলে কী হবে!

দেদীপ্যমান এই ছাত্রজীবন ছিল ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের মতন—তেমনই কঠোর, তেমনই দুশ্চর।

কলকাতার বাসায় এখন পরিবার সংখ্যা পাঁচজন। ঠাকুরদাস, তাঁর ভাই কালিদাস আর তিন ছেলে—ঈশ্বরচন্দ্র, দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্র দীনবন্ধু বড় হয়েছে। তাকে সংস্কৃত কলেজে পড়াবেন বলে কলকাতায় এনেছেন। শম্ভুকেও কাছে এনে রেখেছেন। লেখাপড়ার চাপ যত বাড়তে লাগলো বাসার কাজও তত বাড়তে লাগল। তাঁর ছাত্রজীবনের এই সময়কার কাহিনী তাঁর এক জীবন-চরিতকার এই ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন:

"ঈশ্বরচন্দ্রের গৃহকার্যের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা ও রন্ধনকার্য সমাপন করিতে হইত। বাসায় দাসদাসী ছিল না; প্রাতঃকালে

গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবার সময় কাশীনাথ বাবুর বাজারে গিয়া মৎস্য ও তরকারী ক্রয় করিয়া লইয়া বাসায় আসিতেন। বাসায় আসিয়া ব্যঞ্জনের ঝাল মসলা নিজেই বাটিতেন, তরকারী ও মাছ নিজেই কুটিতেন। পাকের কার্য নিজেই একাকী সম্পন্ন করিতেন। চারি-পাঁচজনের আহারের আয়োজন করিয়া তাঁহাদিগকে আহার করাইয়া ও নিজে আহার করিয়া, সে সকল ভোজনপাত্র ধৌত করিতেন, আহারের স্থান পরিষ্কার করিতেন। তৎপরে কলেজে যাইতেন। এ সকলের উপর ঠাকুরদাসের নিয়ম ছিল যে, একটি ভাত পাতের পাশে পড়িয়া থাকিবে না, ভোজনপাত্র ধুইয়া মুছিয়া যাইতে হইত। সে বিষয়ে কখনও ত্রুটি হইলে গুরুতর দণ্ড ভোগ করিতে হইত।"

ছাত্রজীবনে এই কঠোরতা উত্তরকালে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এনে দিয়েছিল অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও কর্মশক্তি। দীনবন্ধুকে কলেজে ভর্তি করা হলো। দুই ভাই এক সঙ্গে যেতেন, এক সঙ্গে আসতেন। ঠাকুরদাস রাত ন'টার পর কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে দেখতেন দুটিতে এক সঙ্গে পড়ছে। তাঁর দুই চোখ দশ চোখ হয়ে সেই দৃশ্য দেখত, আনন্দে তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। আর যদি দেখতেন যে প্রদীপ জলছে, আর দুই ভাই ঘুমিয়ে আছে, তা হলে আর রক্ষা ছিল না। প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করে তুলতেন তাদের।

ঈশ্বরচন্দ্র এখন বড় হয়েছেন। এখন তাঁর সেই বয়স যে বয়সে পিতা পুত্রের সঙ্গে মিত্রের মত ব্যবহার করে থাকেন। একদিন তিনি ছেলেকে ডাকলেন। বললেন—আমার ইচ্ছা সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা শেষ হলে তুমি বীরসিংহে গিয়ে টোল কর। বাবারও তাই ইচ্ছা ছিল।

—যে আজ্ঞে।

—আমাদের গ্রামের ও আশেপাশের গ্রামের নিরাশ্রয় ছেলেরা তোমার সেই টোলে পড়বে, কেমন?

—যে আজ্ঞে।

—তুমি কলেজে যে বৃত্তি পাচ্ছ, তাই দিয়ে দেশে কিছু জমি কেনো, তারই আয় থেকে বাইরের ছাত্রদের ভরণপোষণের ব্যয় সঙ্কুলান হবে, কি বল?

—যে আজ্ঞে।

— জমি কেনা হলে পরে, বৃত্তির টাকায় কিছু ভালো বই কেনো।

—যে আজ্ঞে।

বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতে আছে যে, পিতৃভক্ত পুত্র পিতার আদেশমত টোলের জন্যে জমি কিনেছিলেন, এবং অনেকগুলি হাতে-লেখা সংস্কৃত পুঁথিও কিনেছিলেন। বীরসিংহে অবশ্য তিনি টোল খোলেন নি; প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি বিদ্যালয়। সে বিদ্যালয়ে বহুকাল সংস্কৃত শিক্ষাই প্রচলিত ছিল। সমগ্র বাংলা দেশেই তিনি শিক্ষাদানের বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। সে কাহিনী আমরা যথাস্থানে বলব।

অল্পকালের মধ্যে ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রের খ্যাতি রটে গেল।

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে অসাধারণ পণ্ডিত—বাংলা ভাষার মত সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন, পণ্ডিতদের সঙ্গে ব্যাকরণের বিচার করতে পারেন। এক মুখের কথা দশ মুখে ছড়িয়ে পড়ে। দশ মুখ থেকে শত মুখ। এই ভাবে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও হুগলী জেলার নানা স্থানেই প্রচারিত হলো ঈশ্বরচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের কথা, তাঁর প্রতিভার কথা। রামজয়ের পৌত্র, তার ওপর এমন চৌকস ছেলে—এমন ছেলেকে কন্যাদান করবার প্রস্তাব নিয়ে লোক আসতে লাগল নানান দেশ থেকে। ঈশ্বরের বিয়ে দেবেন, মনের মত পাত্রী দেখেন ঠাকুরদাস। অনেক দেখাশুনার পর শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের সাত বছরের মেয়ে দীনময়ীকে তার পছন্দ হলো। ক্ষীরপাই-এর শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের নাম তিনি শুনেছেন। মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ। তাঁরই সর্বসুলক্ষণা মেয়ের সঙ্গে ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রের বিয়ে দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স তখন চোদ্দ বছর। বিয়ে করার ইচ্ছে তখন তাঁর আদৌ ছিল না। সারা জীবন লেখাপড়া শিখবেন, দেশের লোকের হিতসাধন করবেন, বিপন্নের দুঃখ দূর ও রোগীর সেবা করবেন—এই চিন্তাই তাঁর অন্তরকে আন্দোলিত করত। বিয়ের কথা তাঁর চিন্তার ত্রিসীমানার মধ্যেও আসেনি তখন, কিন্তু পাছে বাবা দুঃখ পান, এই ভয়ে সেই অল্প বয়সে তিনি পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হলেন। ভাগ্য তাঁর প্রসন্ন ছিল, তাই অমন সুলক্ষণা ও সুন্দরী মেয়েকে তিনি স্ত্রী-রূপে লাভ করেছিলেন। শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য সহসা ঠাকুরদাসের ছেলের সঙ্গে

মেয়ের বিয়ে দিতে সম্মত হন নি। ক্ষীরপাই ছিল গণ্ডগ্রাম আর ধনে জনে মানে শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য অনেকের অগ্রণী ছিলেন। আর কন্যা দীনময়ী ছিল রূপেগুণে আদর্শ পাত্রী। ঠাকুরদাসের অবস্থা তাঁর জানা ছিল। তাই সম্বন্ধ ঠিক করবার সময়ে শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য তাঁকে বলেছিলেন—বাঁড়ুয্যে, তোমার ধন নেই, কিন্তু তোমার ছেলে বিদ্বান, কেবল এই জন্যেই আমার মেয়েকে তোমার ছেলের হাতে দিলাম।

বিয়ে হয়ে গেল। ঈশ্বরচন্দ্র আবার কলকাতায় ফিরলেন।
আবার চললো যথারীতি তাঁর অধ্যয়ন।
পনর বছর বয়সে তিনি প্রবেশ করলেন অলঙ্কারের শ্রেণীতে।
পণ্ডিতপ্রবর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ তখন অলঙ্কারের অধ্যাপক। অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই ছিলেন সবচেয়ে কনিষ্ঠ। কিন্তু বয়সে কম হলে কি হয়, এক বছরের মধ্যেই তিনি সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, রসগঙ্গাধর প্রভৃতি অলঙ্কারের কঠিন গ্রন্থগুলি পড়ে শেষ করলেন। শুধু তাই নয়। বাৎসরিক পরীক্ষায় দেখা গেল এই কম বয়সের ছাত্রটিই প্রথম হয়ে পারিতোষিক লাভ করেছে। তখন বই ও টাকা প্রাইজ দেওয়া হতো। ঈশ্বরচন্দ্র বই পেলেন—সাতখানা বই।
সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে ঠাকুরদাস দেখেন ঈশ্বর বাড়ি নেই।
দুই চোখ অমনি কপালে তুলে ব্রাহ্মণ হুঙ্কার ছাড়লেন—ঈশ্বর!
কোথায় ঈশ্বর? দীনবন্ধু এসে বললেন—দাদা ওপরে গেছেন।
আসল কথা, এতগুলো বই প্রাইজ পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র মনের আনন্দে রাইমণিকে তা দেখাতে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ বাদেই সিংহীবাড়ির অন্তঃপুর থেকে এসে উৎফুল্লচিত্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঠাকুরদাসের পায়ের কাছে প্রাইজের বইগুলো রেখে তাঁকে প্রণাম করে বললেন—বাবা, অলঙ্কারের পরীক্ষায় আমি প্রথম হয়েছি। ঠাকুরদাস বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাইজের বইগুলো—রঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ রত্নাবলী, মালতীমাধব, মুদ্রারাক্ষস, বিক্রমোর্বশী আর মৃচ্ছকটিক। সংস্কৃত কলেজের লেবেল-আঁটা প্রত্যেকখানি বই, লেবেলের ওপর অধ্যক্ষের স্বাক্ষর আর ঈশ্বরের নাম জল্‌জল্ করছে। মধ্যম পুত্রের দিকে তাকিয়ে ঠাকুরদাস তখন বললেন—এই ত্যাখ, ভাতের

হাঁড়ি ঠেলে ঈশ্বর কত প্রাইজ পেয়েছে, আর তুই তো শুনি ঘুমিয়ে দিন কাটাস্।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিবাদ করে বলেন—না বাবা, দীনবন্ধু ঈষৎ অলস প্রকৃতির বটে, কিন্তু ও খুব মেধাবী আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন।

—তবে ও প্রাইজ পায় না কেন ?

পিতাপুত্রের এই কথাবার্তার মধ্যে এসে দাঁড়ান রাইমণি। বলেন—সবাই তো আর ঈশ্বর নয়, কাকা। রাইমণির হাতে একখানি রূপার থালা, থালার ওপর কয়েকটি টাকা, একজোড়া গরদের ধুতি ও রূপোর গেলাস বাটি।

—এসব কি ? জিজ্ঞাসা করেন ঠাকুরদাস।

—ঈশ্বরের জন্যে দাদা দিলেন। বললেন—কলেজে ও পারিতোষিক পেয়েছে, আমরা ওকে পুরস্কৃত করব। দাদা তাই এগুলো পাঠিয়ে দিলেন।

ঠাকুরদাসের মুখে কথা নেই। ঈশ্বরচন্দ্র, দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্রও তেমনি নির্বাক।

একদিন। ঠন্ঠনিয়ায় তারানাথ তর্কবাচস্পতির বাড়ি॥

ঈশ্বরের সেখানে নিমন্ত্রণ। সাহিত্যদর্পণ আবৃত্তি করতে বললেন বাচস্পতি মহাশয়। সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন ঈশ্বর। এমন সুন্দর আবৃত্তি বাচস্পতি মহাশয় কখনো শোনেন নি। কী কণ্ঠস্বর, কী বিশুদ্ধ উচ্চারণ! দর্শনের দিগ্বিজয়ী অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন সেখানে তখন উপস্থিত। ঈশ্বরের আবৃত্তি শুনে তিনি শতমুখে প্রশংসা করে বললেন—এত ছোট ছেলে, সাহিত্যদর্পণের এমন সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে, এ বড় আশ্চর্যের কথা। তারপর ঈশ্বরচন্দ্রকে আরো দু'একটি বিষয়ে প্রশ্ন করে সন্তুষ্ট হয়ে তর্কপঞ্চানন বলেছিলেন—বড় হলে এই ছেলে বাংলাদেশের অদ্বিতীয় লোক হবে, এ আমি তোমাকে বলে রাখলাম, বাচস্পতি।

ঈশ্বরচন্দ্র আবার বৃত্তি পেলেন। এবার আট টাকা।

বৃত্তির টাকা এনে বাপের হাতে তুলে দিলেন। প্রথম যেবার তিনি পাঁচ টাকা বৃত্তি পান, ছেলের সেই টাকা দিয়ে বীরসিংহ গ্রামে কিছু জমি কিনেছিলেন। এই জমিতে তাঁর টোল বসাবার সংকল্প ছিল। এবারকার বৃত্তির টাকা ঠাকুরদাস সব নিলেন না। বৃত্তির টাকা দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র কিছু হাতে-লেখা পুঁথি কিনলেন। আর বাকী টাকা খরচ করলেন পরের দুঃখমোচনে। সেই ক্ষুদ্র

বুকে, দয়া যেমন অপরিসীম, উপায় তো তেমন নেই। ভগবান যেন তাঁকে দীনের দুঃখ দূর করার ব্রত দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। ছাত্রজীবনেই সে ব্রতের শুরু। বৃত্তির টাকা যা বাঁচত তাই দিয়ে জল খেতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবন-চরিতকার লিখেছেন :

"জল খাইবার সময় যে সকল বালক তাঁহার নিকট থাকিত, তিনি তাহাদিগকেও জল খাওয়াইতেন। কাহারাও ছেঁড়া কাপড় দেখিলে, নিজের হাতে পয়সা না থাকিলেও, দরওয়ানের নিকট ধার করিয়া, তিনি তাহাদের কাপড় কিনিয়া দিতেন। বাসায় কেহ আসিলে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাকে জল খাওয়াইতেন। সে ভাবিত ঈশ্বরচন্দ্র বড় মানুষের ছেলে, কিন্তু ঈশ্বর কিসে বড়, তাহা বুঝিত না। কোন সমবয়স্ক বালকের পীড়া হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র সকল কার্য পরিত্যাগ করিয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। কাহারও কোন সংক্রামক পীড়া হইলে, অপর কেহ তাহার নিকট যাইত না; তিনি কিন্তু অম্লানবদনে ও অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহার মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিতেন।"

"বালক বিদ্যাসাগর যখন বীরসিংহ গ্রামে যাইতেন, তখন সর্বাগ্রে গুরুমহাশয় কালীকান্তের বাড়িতে গিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। পরে ক্রমে ক্রমে তিনি প্রত্যেক প্রতিবাসীর বাড়ি গিয়া, প্রত্যেকের তত্ত্ব লইতেন। কাহারও পীড়াদি হইলে, তিনি নির্বিকারচিত্তে তাহার সেবা-শুশ্রূষাদি করিতেন। এইজন্য তখন বালক বিদ্যাসাগর গ্রামবাসী কর্তৃক দয়াময় নামে অভিহিত হইতেন। তিনি তখন বিদ্যাসাগর হন নাই; কিন্তু দয়ার সাগর হইয়াছিলেন। কুকুর বিড়ালটি মরিলেও তাঁহার চক্ষে জল ঝরিত।"

কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডলের মতই বিদ্যাসাগর এই দয়াগুণ নিয়েই জন্মেছিলেন। পরবর্তীকালের বাঙালি সন্তানদের জন্য তিনি এই অক্ষয় সম্পদই রেখে গেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই সংঘাত-সংঘর্ষের যুগে, যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর বিদ্যার দম্ভ নয়, প্রাণের কোমলতা, অন্তরের সরসতা নিয়েই বাঙালির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ভগবান কেমন করে যে এই শীর্ণ কঙ্কালসার মানুষটির মধ্যে বাঙালি মায়ের স্নেহভরা একখানি হৃদয় দিয়েছিলেন তা বুঝেছিলেন মধুসূদন, বুঝেছিলেন নবীনচন্দ্র। বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন শুধু কঠোর অধ্যয়ন এবং প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যেই সার্থক হয়নি, দয়া, অমায়িকতা ও বিনয়নম্রতার ভেতর দিয়েও তা সার্থক হয়েছিল।

॥ পাঁচ ॥

অলঙ্কারের পরীক্ষায় সর্বোচ্চস্থান অধিকার করলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

কিন্তু সেই ক্ষীণ দুর্বল শরীরে এত কঠোর পরিশ্রম সহ্য হলো না।

পরীক্ষার পরে ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়লেন। রক্তভেদ। কঠিন অসুখ। কলকাতার চিকিৎসায় রোগ আরাম হলো না। ঠাকুরদাস ছেলেকে দেশে পাঠালেন। সেখানে দিন কতক থেকে তাঁর রোগ সেরে যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় ফিরলেন।

সেই রন্ধন আর অধ্যয়ন।

তার ওপর ভাইদের দেখাশুনো করতে হয়। তবে দীনবন্ধু রান্নার কাজে অগ্রজকে এখন কিছুটা সাহায্য করতেন এবং মাঝে মাঝে বাজারও করে দিতেন। কাছেই জোড়াসাঁকোর নতুন বাজার। একদিন সন্ধ্যার সময় বাজার করতে গিয়ে দীনবন্ধু আর ফেরেন না। ঈশ্বরচন্দ্র ভেবে আকুল। রাত এগারটা বেজে গেল, তবু ভাইয়ের উদ্দেশ নেই। ভয়ে ও ভাবনায় ঈশ্বরচন্দ্র কেঁদেই ফেললেন। তারপর নিজেই খুঁজতে বেরুলেন। খুঁজতে খুঁজতে নতুন বাজারের এককোণে ভাইকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পান এবং সেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে আসেন। এই ঘটনার পর থেকে দীনবন্ধুকে তিনি আর বড় একটা বাইরে যেতে দিতেন না। এমনি ভাই-অন্ত প্রাণ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

অলঙ্কারের পর স্মৃতি।

নিয়ম ছিল আগে ন্যায়-দর্শন ও তারপরে বেদান্ত পড়ে তবে স্মৃতি পড়বার অধিকার পাওয়া যেত। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য কর্তৃপক্ষ বিশেষ নিয়ম করলেন। তিনি আগেই স্মৃতি পড়বার অধিকার পেলেন। বয়স তখন তাঁর

মাত্র সতের কি আঠার। অদ্ভুত কীর্তি। ভাবলে বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হতে হয়। যেখানে দু'তিন বছর লাগে স্মৃতি পড়তে, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে ছ'মাসের মধ্যেই পড়া সাঙ্গ করে 'ল-কমিটির' পরীক্ষা দিলেন এবং বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কথিত আছে, যে ছ'মাস তিনি স্মৃতি পড়েছিলেন, সেই ছ'মাস ঈশ্বরচন্দ্রকে ঠাকুরদাস রান্নার কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি দিন-রাতের মধ্যে দু'তিন ঘণ্টামাত্র ঘুমোতেন। স্মৃতি তাঁর কণ্ঠস্থ হয়েছিল। অধ্যাপক ও সহপাঠীরা তাঁর এই অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখে যারপর নাই বিস্মিত হয়েছিলেন।

স্মৃতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র ল-কমিটির পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হলেন। আরো কঠিন পরীক্ষা এবং কঠিনতর বিষয়। কিন্তু ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই। মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ প্রভৃতি কঠিন গ্রন্থগুলি তিনি কঠোর পরিশ্রম সহকারে আয়ত্ত করলেন। অনন্যকর্মা হয়ে, দিনরাত পরিশ্রম করে, সেইসব দুর্বোধ্য এবং সুকঠিন গ্রন্থসকল আয়ত্ত করে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গেই কমিটির পরীক্ষায় পাশ করলেন। ঈশ্বরচন্দ্র আর একবার তার আশ্চর্য মেধা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে সকলকেই বিস্মিত করলেন।

সংস্কৃত কলেজের সতের-আঠার বছর বয়সের একটি ছেলে ছ' মাসের মধ্যে স্মৃতি ও ল-কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন—কলকাতা শহরে বিদ্যুদ্‌বেগে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। বিস্ময়কর এই ঘটনা সহজে কেউ বিশ্বাস করতে পারে নি। ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল ল-কমিটির পরীক্ষায় পাশ করে তিনি জজ-পণ্ডিত হবেন। এই সময়ে ত্রিপুরায় জজ-পণ্ডিতের একটি পদও খালি হলো। সতের বছরের ছেলে বিদ্যাসাগর এই পদপ্রাপ্তির জন্যে আবেদন করলেন। নিয়োগ পত্রও এলো যথাসময়ে। কিন্তু ঠাকুরদাসের ইচ্ছা ছিল না যে ছেলে দূর দেশে যায়। তাই তিনি তাঁকে ত্রিপুরায় যেতে নিষেধ করলেন।

জজ-পণ্ডিত হবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

বাকী এখন বেদান্ত, ন্যায় আর দর্শন।

উনিশ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্তের শ্রেণীতে ভর্তি হলেন।

বেদান্তের অধ্যাপক তখন শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি। বেদান্তে তাঁর অধিকার দেখে বয়োবৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয় একদিন ছাত্রের উপর সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন—তুমি ঈশ্বর।

বাৎসরিক পরীক্ষার সময় এল।

তখনকার নিয়ম অনুসারে সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য রচনা করতে হতো। সর্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্যে পুরস্কার ছিল একশো টাকা। পরীক্ষার দিন পরীক্ষার্থী ছাত্ররা এসেছে, পরীক্ষা আরম্ভ হবে। ঈশ্বরচন্দ্র কোথায়? অলঙ্কারের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাব্যস্ত হয়ে ঈশ্বরের খোঁজ করতে লাগলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তখন একান্তে অপেক্ষা করছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবকে বলে ঈশ্বরচন্দ্রকে পরীক্ষার হলে একরকম জোর করেই বসিয়ে দিলেন।

—আমি এ পরীক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, আমাকে অব্যাহতি দিন, সবিনয়ে বললেন ঈশ্বরচন্দ্র।

—যা পার লেখ, বললেন তর্কবাগীশ।

—আমাকে এ যাত্রায় নিষ্কৃতি দিন, মিনতি করে বলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

—তুমি এ কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র—মার্শেল সাহেব রাগ করবেন তুমি যদি পরীক্ষা না দাও।

—কিন্তু কি লিখব?

—সত্যং হি নাম আরম্ভ করে লেখ।

পরীক্ষা আরম্ভ হলো। প্রশ্নপত্রে গদ্য রচনার বিষয় ছিল—সত্য কথনের মহিমা।

অধ্যাপকের আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য করে সত্যের মহিমা বর্ণনা করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। মেধাবী ছাত্রের লেখনীতে সত্যের মহিমা ফুটে উঠল আশ্চর্য দীপ্তি নিয়ে। ছত্রে ছত্রে অপূর্ব লিপিচাতুর্য, আশ্চর্য রচনা-ভঙ্গি। সংস্কৃত কলেজের সমস্ত অধ্যাপক সেই রচনা পরীক্ষা করে একবাক্যে ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন। তাঁর প্রবন্ধই সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হলো।

একশো টাকা পুরস্কার পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

সেই টাকা এনে তিনি বাপের হাতে তুলে দিলেন।

এখন ঠাকুরদাসের স্বতন্ত্র বাসা।

মধ্যম পুত্র দীনবন্ধুর বিয়ে হয়েছে। শম্ভুও কলকাতায়। ঠাকুরদাস বাসার খরচ কমিয়ে দিলেন। বিকেলের জলখাবার আধ পয়সার ছোলা ভিজানো

আর আধ পয়সার বাতাসা। ঐ ভিজে ছোলার অর্ধেক আবার রাতের আলু-কুমড়ার তরকারীতে দেওয়া হতো। সেই সামান্য তরকারী ভাই দুটির পাতে দেবার সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র চক্ষের জল সংবরণ করতে পারতেন না। এই সময়ে খাবার যেমন কষ্ট, থাকবার কষ্টও তেমনি।

ঠাকুরদাস ঋণগ্রস্ত। তাঁর এতদিনকার আশ্রয়দাতারও সেই অবস্থা। কাজেই ছেলেদের নিয়ে ঠাকুরদাস তখন একটি একতালা ঘর ভাড়া করেছেন। বাসের অযোগ্য জঘন্য সেই ঘর। কিন্তু ঈশ্বর তেমনি নির্বিকার, তেমনি অকুণ্ঠিত। বিদ্যাসাগর নিজেই বলেছেন: "বাল্যকালে আমি অনেকে কষ্ট পাইয়াছি, কিন্তু কোন কষ্টকেই এক দিনও কষ্ট বলিয়া ভাবি নাই; বরং তাহাতে আমার উৎসাহ উদ্যম বর্ধিত হইত; কিন্তু ভাইগুলির কোন কষ্ট দেখিলে আমার যে কি অন্তর্যাতনা হইত, তাহা আর কি বলিব।"

এই-ই বিদ্যাসাগর। মাথাটি তাঁর বড় ছিল, কিন্তু হৃদয় ছিল আরো বড়।

বেদান্ত পড়া শেষ হলো।

এবার ন্যায় ও দর্শন।

মহাপণ্ডিত নিমচাঁদ শিরোমণি তখন ন্যায়দর্শনের অধ্যাপক।

সংস্কৃত কলেজের সকল অধ্যাপকের দৃষ্টি তখন ঈশ্বরচন্দ্রের উপর। ছাত্রের গৌরবে অধ্যাপকের গৌরব। শিরোমণি মহাশয় তাই পরম যত্নের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রকে ন্যায়দর্শনের শিক্ষা দিতে লাগলেন। ছাত্রের প্রতিভা, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় ও আগ্রহ ইতোমধ্যেই প্রবাদবাক্যের মত সকলের মুখে মুখে। ছাত্র তো ঈশ্বর—সবাই বলে এই কথা। দুর্ভাগ্যবশতঃ এইসময়ে নিমচাঁদ শিরোমণির মৃত্যু হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কাছে বেশী দিন পড়তে পারেন নি। ন্যায়দর্শনের অধ্যাপকের পদে কাকে নিয়োগ করা যায়—এই প্রশ্ন যখন উঠল, তখন ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বললেন—এই পদের জন্যে জয়নারায়ণ তর্করত্নই যোগ্য অধ্যাপক। ছাত্রের প্রস্তাবই অধ্যক্ষ মেনে নিলেন। ছাত্রজীবনে এ তাঁর পক্ষে কম প্রতিপত্তির পরিচায়ক নয়।

ন্যায় ও দর্শনের শ্রেণীতে তিনি যখন পড়ছিলেন, সেই সময়ে দু'মাসের জন্যে ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের যোগ্যতা

স্মরণ করে অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব তাঁকেই দু'মাসের জন্যে সেই কাজে নিযুক্ত করলেন। বেতন চল্লিশ টাকা। অধ্যাপনায় তাঁর দক্ষতা দেখে কি অধ্যাপক, কি ছাত্রবর্গ সকলেই মুগ্ধচিত্তে ঈশ্বরচন্দ্রের সর্বতোমুখী প্রতিভা স্বীকার করেছিলেন। কোন্ ছাত্র ছাত্রজীবনে এমন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছেন? দু'মাস অধ্যাপনা করে মাইনের আশী টাকা পেয়ে বাবার হাতে দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন—এই টাকা দিয়ে আপনি তীর্থ করুন। ঠাকুরদাস ছেলের সেই টাকায় পিতৃকৃত্য সম্পাদন করবার জন্যে গয়া যাত্রা করেন।

ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় বৎসরের পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র দু'টো পুরস্কার পেলেন— সর্বপ্রথম হওয়ার জন্যে একশো টাকা আর সংস্কৃত ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা রচনার জন্যে একশো টাকা। যে ন্যায়দর্শন পড়তে এক একজন ছাত্রের আট-দশ বছর লাগত, ঈশ্বরচন্দ্র চার বছরেই তা শেষ করলেন। সেইসঙ্গে তিনি আরো দুটো পুরস্কার পেলেন। আইন পরীক্ষার জন্যে পঁচিশ টাকা আর হাতের লেখার জন্যে আট টাকা—এই মোট দু'শো তেত্রিশ টাকা। ঋণগ্রস্ত পিতার হাতে ঈশ্বরচন্দ্র পুরস্কারের সমস্ত টাকা তুলে দিলেন। সেই টাকায় ঠাকুরদাসের ঋণের বোঝা কিছুটা হাল্কা হয়।

দর্শনশাস্ত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অনুজ শম্ভূচন্দ্র লিখেছেন: "যৎকালে তিনি দর্শন-শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন দেশে যাইলে অনেকের সহিত তাঁহার বিচার হইত। সকলেই তাঁহার সহিত বিচারে সন্তুষ্ট হইতেন। কুরাণ গ্রামবাসী সুবিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রবেত্তা রামমোহন তর্কসিদ্ধান্তের সহিত তাঁহার প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থের বিচার হয়। বিচারে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পরাজয় হয়। ইহা শুনিয়া পিতৃদেব তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পদরজ লইয়া দাদার মস্তকে দেন।" বলা বাহুল্য, ঈশ্বরচন্দ্র পরম ভক্তিভরে সেই প্রবীণ অধ্যাপকের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়েছিলেন। তাঁর বিদ্যাভিমান বিন্দুমাত্র ছিল না। সাগর-চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, বাল্যকালে তাঁর পূজনীয় যাঁরা ছিলেন, বয়সে তাঁরা তাঁর কাছে সমান সম্মান পেতেন। তাঁরা বিদ্যা-বুদ্ধিতে হীন হলেও, বিদ্যাসাগর বিদ্যাভিমানে বা পদগৌরবে গর্বিত হয়ে, কখনো তাঁদের অসম্মান করতেন না, বরং তাঁরা যদি তাঁকে সম্মান দেখাতেন, তিনি কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবন-চরিতকার একটি সুন্দর ঘটনা উল্লেখ করেছেন:

"বিদ্যাসাগর যখন কলেজের উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন কলেজের তদানীন্তন কেরানী রামধন বাবু তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিতেন। পাঠ্যাবস্থায় বিদ্যাসাগর ইহার পরম স্নেহভাজন ছিলেন। ইহাকে এইরূপ সসম্ভ্রমে সম্মান করিতে দেখিয়া বিদ্যাসাগর একদিন বলিয়াছিলেন,—'আমি আপনার সেই স্নেহপাত্রই আছি, আপনি অমন করিয়া আমাকে লজ্জা দিবেন না।' বিদ্যাসাগরের অমায়িকতা ও বিনয়নম্রতা দেখিয়া রামধন বাবু বিস্মিত হইয়াছিলেন।"

সাগর-চরিত্রের সকল অধ্যায়েই এই রকম বিস্ময়ের অসংখ্য কাহিনী।

বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর প্রত্যেকটি কাজের ভেতর দিয়ে, প্রত্যেকটি কথার ভেতর দিয়ে এমনি শতশত বিস্ময় সৃষ্টি করে গেছেন।

ভাইবোনদের ভালোবাসা, প্রাণহীন প্রতিমার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ দেবতা-জ্ঞানে পিতামাতার পূজা করা, দরিদ্র নিরন্ন সরল সাঁওতালদের সঙ্গে আন্তরিক স্নেহপূর্ণ ব্যবহার, বিধবার অশ্রুমোচন, নিজের প্রেস বাঁধা দিয়ে প্রবাসে কবি মধুসূদনকে সাহায্য করা, ছাত্রাবস্থায় অধ্যাপনা করা এবং চটি ও চাদরের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা—ঈশ্বরচন্দ্রের কোন্ কাজটা বিস্ময়ের উদ্রেক না করে? পিতামাতা ও স্বীয় অধ্যাপকগণের প্রতি (এমন কি, তাঁর ছাত্রজীবনের প্রথম শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত) এমন লোকবিরল অনুরাগপূর্ণ ভক্তি কোন্ ছেলে বা কোন্ ছাত্র তার জীবনে দেখাতে পেরেছে? ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি সপ্রেম ব্যবহার, সকলকে সমান মিষ্ট কথায় তুষ্ট করা—এ এক বিদ্যাসাগরের পক্ষেই সম্ভব ছিল। কিন্তু তাই বলে নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির শান্তশিষ্ট সুবোধ ছেলে তিনি ছিলেন না। তাঁর বাল্যের দৌরাত্ম্য, আজো প্রবাদ বাক্য হয়ে আছে। কপাটি খেলা, লাঠিখেলা, কুস্তী করা—এসব ঈশ্বরচন্দ্র কিছুই বাদ দেন নি। মোট কথা, "চঞ্চল বালকের প্রকৃতি, উদ্যমশীল যুবকের স্বভাব এবং কর্তব্যপরায়ণ তেজস্বিপুরুষের লক্ষণ পর্যায় ক্রমে তাঁহার চরিত্রে স্থান পাইয়াছে। তিনি সর্বদা সেইরূপ প্রকৃতির অনুগত হইয়া চলিতেই প্রয়াস পাইতেন ও ভাল-বাসিতেন।" ছাত্রজীবনে তাঁর আরসুলা-ভোজনের কাহিনী সম্ভবত ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার। তাঁর সেই বিস্ময়কর আচরণে সেদিন

সকলেই স্তম্ভিত হয়েছিলেন। এ কী মানুষের পক্ষে সম্ভব? কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে যা আরো অসম্ভব, ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রজীবনে তাই সম্ভব করেছিলেন —সাক্ষাৎ নরককুণ্ডের মধ্যে নির্বিকারচিত্তে বাস করে তিনি লেখাপড়া করেছেন, রান্না করেছেন এবং ন্যক্কারজনক ও দুঃসহ দুর্গন্ধপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে প্রসন্নচিত্তে আহার করেছেন এবং এই অবস্থার মধ্যে লেখাপড়া করে প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন—এ-জীবন তাই মানুষের ইতিহাসে চিরকালের একটি প্রচণ্ড বিস্ময়।

দর্শনশাস্ত্রের শেষ পরীক্ষা ষড়্‌দর্শন।
ষড়্‌দর্শনে ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যুৎপত্তি তাঁকে প্রতিপত্তির শিখরদেশে স্থাপিত করল।
সকল অধ্যাপকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি।
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন বললেন—এমন মেধাবী আর অদ্ভুতকর্মা ছাত্র আমি জীবনে দেখি নি।
কলেজের শেষ পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র উত্তীর্ণ হলেন সসম্মানে।
কুড়ি বছর বয়সে তাঁর প্রতিভাদীপ্ত ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি।
ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, দর্শন, বেদান্ত—সকল বিষয়েই তিনি বিশারদ।
বিশারদ এবং পারঙ্গম।
ঈশ্বরচন্দ্রের এই গৌরবোজ্জ্বল ছাত্রজীবন সম্পর্কে তাঁর এক জীবন-চরিতকার যথার্থই মন্তব্য করেছেন: "সকল বিষয়েই তিনি সুগভীর সাগরসদৃশ অতলস্পর্শ ছিলেন। পর্বতপ্রমাণ বাধা-বিঘ্নের সহিত বীরোচিত সংগ্রাম সহকারে অধ্যয়নে এতাদৃশ অনুরাগ প্রদর্শন, দরিদ্র বঙ্গের প্রত্যেক ছাত্রের অনুকরণীয়। অদ্ভুতকর্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় নিষ্ঠা সহকারে ব্রহ্মচর্যব্রতধারী হইয়া ছাত্রজীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রজীবন কঠোরতা, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও ত্যাগস্বীকারের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল।...বীরসিংহের কালীকান্ত গুরুমহাশয় হইতে মহামহোপাধ্যায় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় পর্যন্ত সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষাগুরু বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা ছাত্রজীবনের উচ্চতম শ্লাঘার বিষয় আর কি হইতে পারে?"[৩]

বিংশতি-বর্ষীয় এক যুবকের বুদ্ধির এই অপূর্ব বিক্রম দেখে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকমাত্রেই বিস্মিত। যে অধ্যাপক তাঁকে যে বিষয়ে শিক্ষা দান করেছেন তিনিই ভাবেন তাঁর অধ্যাপনা সার্থক। বিদ্যানুশীলনে প্রতিভার এমন বৈচিত্র্য আজো দুর্লভ। সেই লোকোত্তর প্রতিভার যোগ্য সম্মান দেবার জন্যে অগ্রসর হলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ।

বয়োবৃদ্ধ ও প্রবীণ অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে পুত্রের মতন স্নেহ করতেন। তিনিই অগ্রণী হয়ে প্রস্তাব করলেন—ঈশ্বরচন্দ্র এতগুলি বিষয়ে এই বয়সে পারদর্শী, তাঁকে একটি উপাধি দেওয়া দরকার। এমন অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন ছাত্র এই বিদ্যানিকেতনের গৌরব এবং আমাদেরও গৌরব। ছাত্রের গৌরবে অধ্যাপকের গৌরব। সেই গৌরবের পাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে একটি বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করা হোক—যে-উপাধি ইতিপূর্বে কেউ লাভ করে নি এবং ভবিষ্যতে করবে কিনা সন্দেহ। তাঁর দ্বাদশ বৎসরের অধ্যয়ন সার্থক। জ্ঞানের বিরাট বারিধি তিনি অঞ্জলিপুটে ধারণ করেছেন—তিনি 'বিদ্যাসাগর'।

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। বললেন—কয়েক বছর আগে এই বিদ্যায়তনের আর একটি মেধাবী ছাত্রকে তার প্রতিভার পুরস্কার হিসেবে আমরা 'বিশারদ' উপাধি দিয়েছি। আজ যাঁকে আমরা 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রদান করছি, সেই ঈশ্বরচন্দ্রও এই বিদ্যায়তনের গৌরব।

তর্কবাগীশ মহাশয় যে-ছাত্রটির কথা উল্লেখ করলেন, তিনি হালিশহরের সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত। এই গোবিন্দচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে সাত বছরের বড় ছিলেন। ইনি চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহপাঠী মুরারি গুপ্তের বংশধর। তাঁর আগে সংস্কৃত কলেজের আর কোন ছাত্র 'বিশারদ' উপাধি লাভ করেন নি। হালিশহরের গোবিন্দচন্দ্রের পর বীরসিংহের ঈশ্বরচন্দ্রই সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় জ্যোতিষ্ক। গোবিন্দ গুপ্ত দীর্ঘকাল হুগলী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন।

সমস্ত অধ্যাপক মিলে উপাধিপত্র দিলেন ঈশ্বরচন্দ্রকে—অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসা-পত্রং দীয়তে। সেই ঐতিহাসিক প্রশংসাপত্রে স্বাক্ষর করলেন সংস্কৃত কলেজের ছ'জন অধ্যাপক। সেই ছ'জন পণ্ডিতের নাম:

ব্যাকরণে গঙ্গাধর শর্মা, কাব্যে জয়গোপাল, অলঙ্কারে প্রেমচন্দ্র, বেদান্ত ও ধর্মশাস্ত্রে শম্ভুচন্দ্র, ন্যায়শাস্ত্রে জয়নারায়ণ এবং জ্যোতিষে যোগধ্যান।

এঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিষয়ে দিক্‌পাল পণ্ডিত।

ছাত্রজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

তিনি হলেন বিদ্যাসাগর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ক্রমে ক্রমে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়লো একটি নাম—বিদ্যাসাগর।

নাম নয়, উপাধি। এই উপাধিই শাশ্বত হয়ে আছে উনবিংশ শতকের বাংলার ইতিহাসে।

বাঙালির মানসপটেও চিরকালের মতন দেদীপ্যমান পাঁচটি অক্ষর-সম্বলিত এই উপাধি—বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর—এই একটি কথার মধ্যেই ওতপ্রোত হয়ে আছে বাঙালির চিরকালের গর্ব ও গৌরব।

॥ ছয় ॥

বিদ্যাসাগরের গরিমাময় ছাত্রজীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করব। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনে এই ঘটনাটির একটি বিশেষ মূল্য আছে।

ঈশ্বর যখন বেদান্তের ছাত্র তখন তাঁর অধ্যাপক ছিলেন শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি। বয়সে প্রবীণ এই অধ্যাপক তখন প্রায় স্থবিরত্বের কোঠায় এসে পৌঁচেছেন। ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে তিনি পুত্রের অধিক স্নেহ করতেন। এমনই স্থবির হয়ে পড়েছিলেন তিনি যে নিজের স্নান, আহার, আচমন ও শৌচকাজের জন্যে লোকের সাহায্যের দরকার হতো। বিগতদার এই বৃদ্ধ অধ্যাপকের সেবায় ঈশ্বরচন্দ্র নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। এইজন্যে তাঁর প্রতি গুরুর পুত্রাধিক বাৎসল্যের সঞ্চার হয়েছিল। সব কাজেই বাচস্পতি মহাশয় তাই ঈশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। ঈশ্বরগতপ্রাণ এই প্রবীণ অধ্যাপক সংসারের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় কাজে ঈশ্বরের মতামত চাইতেন। এ যেন উপযুক্ত ছেলের সঙ্গে বৃদ্ধ পিতার ব্যবহার। বলতেন—ঈশ্বর আমার ছাত্র নয়, পুত্র। তাই তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে বাচস্পতি মহাশয় প্রায় কোন কাজই করতেন না। ঈশ্বরচন্দ্রও প্রাণ ঢেলে তাঁর সেবা করতেন। এমন গুরুগতপ্রাণ ছাত্র সেদিন আর দুটি ছিল না। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক যখন ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন বৃদ্ধ অধ্যাপকের আবার দারপরিগ্রহের ইচ্ছা হলো।

একদিন তিনি বললেন ঈশ্বরচন্দ্রকে—দ্যাখ্, সংসারে আমার কেউ নেই। বড়ই কষ্ট পাচ্ছি। লোকে বলে এত কষ্ট ভোগ না করে আর একটা বিয়ে করলেই সব অসুবিধা দূর হবে।

স্থবির অধ্যাপকের মুখে এই কথা শুনে ঈশ্বরচন্দ্র স্তম্ভিত।

অধ্যাপকের এই কথার ভেতর দিয়ে বাংলার ক্ষীয়মাণ সমাজের সম্পূর্ণ চিত্র তাঁর চোখের সামনে যেন ফুটে উঠ্‌লো। কী অভিশপ্ত এই দেশ! বললেন—এ চিন্তাও আপনি মনের মধ্যে স্থান দেবেন না।

—কিন্তু আমার এই বুড়ো বয়সে আমাকে দেখবে কে ?

—কেন, আমরা তো আছি।

—তোরা তো আর চিরকাল থাকবি নে।

—আপনিও চিরকাল থাকবেন না—নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দিলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

—না বাবা, তোকে আমি বোঝাতে পারব না। অনেকেই আমাকে উৎসাহ দিচ্ছে, অনেকেই এ কাজে উদ্যোগী হয়েছে।

—তারা নিশ্চয়ই আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী নয়।

ছাত্রের এই স্পষ্ট ভাষণে বৃদ্ধের রাগ হয়। বলেন—তুই বুঝতে পারছিসনে, ঈশ্বর। তারা আমার অহিতটা করছে কোথায়? একটা সুস্বভাবা, বয়ঃস্থা ও সুন্দরী পাত্রীও পাওয়া গেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বুঝলেন অধ্যাপক বিয়ে করতে কৃতসংকল্প ; তাঁর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তিনি নিরুত্তর রইলেন।

বাচস্পতি মহাশয় তখন বললেন—ঈশ্বর, তুই আমার ছেলের মতো, এখন তোর মত হলেই বাবা আমি এ কার্যে অগ্রসর হতে পারি।

অগ্রসর তো তিনি অনেক দূরই হয়েছেন, মনে মনে ভাবলেন ঈশ্বরচন্দ্র। মেয়ে পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে। বৃদ্ধের এই অসঙ্গত প্রস্তাব, এই ধর্মবিগর্হিত সংকল্প—এতেও উৎসাহ দেবার লোক আছে জেনে ঈশ্বরচন্দ্র একবার শুধু ভাবলেন—হিন্দুসমাজ কোথায় নেমে গেছে। কী নির্মম ও স্বার্থান্ধ এই প্রস্তাব—এর প্রতিবাদ করবার লোক পর্যন্ত নেই! যে-সমাজের বহুবিধ প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে একদিন যিনি বিদ্রোহ করবেন, তারই সূচনা দেখা গেল আজ। না, গুরুর এই জঘন্য প্রস্তাবের অনুকূলে তিনি কিছুতেই মত দেবেন না, ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাধীন প্রকৃতি বিদ্রোহ করে উঠল।

বললেন—আপনার এই বুড়ো বয়সে নতুন সংসার করা কিছুতেই কর্তব্য নয়। আপনি আর ক'দিন বাঁচবেন? বিয়ে করে একটা নিরপরাধা বালিকাকে চিরদুঃখিনী করবেন না। বিয়ে দূরে থাক, বিয়ের চিন্তাও যে আপনার পাপ।

—আমার পাপ আমারই থাক—উনি লাটু বাবুর চেয়ে বেশী বোঝেন, এই বলে বৃদ্ধ বাচস্পতি ঈশ্বরচন্দ্রের কাছ থেকে পালিয়ে গেলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাচস্পতি মহাশয় কিছুক্ষণ বাদে আবার ফিরে এলেন।

ঈশ্বরের হাত দু'খানি ধরে অনেক কাকুতি মিনতি করে কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন—একবার ভেবে ছাখ আমার অসুবিধার কথা. কে দু'টো ভাত দেয়, কে একটু জল দেয় ?

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সিদ্ধান্তে অটল অচল রইলেন। যেন হিমালয় পর্বত।

স্থির চিত্তে, শান্তভাবে বৃদ্ধ অধ্যাপককে তিনি কত বোঝালেন, কত মিনতি করলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারলেন না। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গৃহে ফিরলেন। বার্ধক্যশিথিল দেহ, লোলচর্ম, মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের এ কী উৎকট অভিলাষ, আর এই সমাজেরই বা কী ব্যবস্থা! ঘৃণায়, ক্রোধে ঈশ্বরচন্দ্র যেন ফেটে পড়লেন—কিন্তু তাঁর করবার কি আছে ?

কলকাতার নামকরা বড়লোক ছাতুবাবু ও লাটুবাবু।

রামদুলাল সরকারের বংশধর।

এই ছাতুবাবু-লাটুবাবুদেরই সভাপণ্ডিত ছিলেন বাচস্পতি মহাশয়।

এ বিয়েতে তাঁরাই ছিলেন উদ্যোক্তা। তাঁদের সঙ্গে এসে মিলেছিলেন নড়াইলের প্রসিদ্ধ জমিদার রামরতন রায়। এঁরাই উদ্যোগী হয়ে বারাসতের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পরমা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বৃদ্ধ বাচস্পতির বিয়ে দিয়ে দিলেন। বিয়ে ত নয়, বলিদান। বধূ তাঁর নাত্‌নীর বয়সী।

দারুণ মর্মপীড়া পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

এত বড় একটা অন্যায় সমাজের বুকে হয়ে গেল, কেউ এর প্রতিবাদ করল না। এ দেশে কী মানুষ নেই, ভাবেন তিনি। অধ্যাপকের উপর বিরক্ত হলেন তিনি, কিন্তু শ্রদ্ধা হারালেন না, বা স্নেহের বন্ধনও ছেদ করলেন না।

বিয়ের কয়েকদিন পরে।

একদিন কলেজে বাচস্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—ঈশ্বর, তোমার মা-কে একদিন দেখতে গেলে না ?

অজস্র ধারায় অশ্রু নেমে এলো ঈশ্বরের দুই চোখ বেয়ে।

কোন উত্তর করলেন না।

পরে বাচস্পতি মহাশয় একদিন ছাত্রকে জোর করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। যাবার সময়ে কলেজের দারোয়ানের কাছ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র দু'টো টাকা চেয়ে নিলেন।

আগ্নেয়গিরির মত প্রবল আবেগে উদ্বেলিত তাঁর হৃদয়। সে আবেগ দমন করে উদ্দেশে প্রণাম করে বালিকার চরণপ্রান্তে টাকা দুটি রাখলেন তিনি। তারপর তিনি দ্রুতপদে চলে আসার উপক্রম করলেন।

বাচস্পতি তাঁর হাত ধরে বললেন—তোমার মা-কে দেখে যাও।

দাসী নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে দিল।

স্থবির অধ্যাপকের নব-বিবাহিতা পত্নীকে দেখে ঈশ্বরচন্দ্র আর অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। দরবিগলিত নেত্র ছাত্রকে দেখে বাচস্পতি মহাশয়ের মুখেও কথা নেই। কিন্তু কোমলপ্রাণ ছাত্রের অন্তরের এই ব্যথা বুঝবার মতন অনুভূতি তখন তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। বেদান্তের অনুশীলন করে যিনি জীবন কাটালেন, জীবন-সায়াহ্নে তাঁর এই আচরণ এবং সেই সঙ্গে বালিকার পরিণাম চিন্তা করে ঈশ্বরচন্দ্র সত্যই বালকের মত কাঁদতে লাগলেন। অনুভূতিশীল সেই কোমল প্রাণের কোন্ গোপন উৎস থেকে নির্গত হলো সেই করুণার ধারা, তার সন্ধান যদি সেই বৃদ্ধ অধ্যাপক সেদিন করতেন, তাহলে তাঁর এই গর্হিত কাজের জন্যে তিনি নিশ্চয়ই অনুতপ্ত এবং লজ্জিত হতেন।

নববধূ সামনে দাঁড়িয়ে।

বালিকার সীমন্তে সিন্দুর-রেখা আর ক'দিন ?

এই কথা ভাবেন আর ঈশ্বরচন্দ্র কাঁদেন।

—অকল্যাণ করিস্ না রে, বললেন বাচস্পতি মহাশয় এবং ছাত্রকে নিয়ে বাইরের বাড়িতে এলেন। পুত্রতুল্য ছাত্রকে প্রবোধ দেবার জন্যে এবং তাঁর মনের উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগকে শান্ত করবার জন্যে নানা শাস্ত্রের কথা তুললেন তিনি। কিন্তু এসব যুক্তি তাঁর কাছে নিষ্ফল। যে-শাস্ত্র বৃদ্ধের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ সমর্থন করে, সে-শাস্ত্র তিনি মানতে রাজী নন।

অন্দরমহল থেকে জলখাবার এলো। বাচস্পতি মহাশয় অনুরোধ করলেন ছাত্রকে খাবার জন্যে।

এইবার আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদ্গীরণ করল।

পাষাণের মত কঠিন প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র বলে উঠলেন—আপনার বাড়িতে আর কখনো জলস্পর্শ করব না।

কিছুদিন পরে। বাচস্পতি মহাশয়ের মৃত্যু হলো। বৃদ্ধের নববিবাহিতা কিশোরী ভার্যার দেহে তখনও বিয়ের সুবাস। তখনও বালিকার দুই চক্ষে জীবনের সাধ-আহ্লাদের স্বপ্ন। বৈধব্যের শুভ্রবেশে সজ্জিতা বাচস্পতি মহাশয়ের সেই কিশোরী বিধবা পত্নীকে দেখে ঈশ্বরচন্দ্র আর একবার কেঁদেছিলেন। বালিকা বিধবার শোকপূর্ণ এই ছবি তাঁর কোমল হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে গেল চিরদিনের মতন।

এই কান্না বৃথা হয়নি। বৃথা হয়নি বৃদ্ধ বাচস্পতির বালিকা-পত্নীর অকাল-বৈধব্য। সাগরের এই তপ্ত অশ্রুধারা থেকেই পরবর্তী কালে জন্ম নিয়েছিল এমন একটি আন্দোলন যার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র বাংলাদেশ এবং সেই সঙ্গে মৃতপ্রায় এই সমাজ স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল।

॥ সাত ॥

কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন বিদ্যাসাগর।

ছাত্রজীবনে যে অপরিসীম শ্রমশীলতা, যে প্রগাঢ় একাগ্রতা, যে অবিচলিত আত্মনির্ভরতা এবং প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও বহ্নিগর্ভ তেজস্বিতা আমরা দেখেছি, সেই একই পাথেয় সম্বল করে তিনি অবতীর্ণ হলেন কার্যক্ষেত্রে।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্লাবন-ক্ষুব্ধ সেদিনের বাংলায় বিদ্যাসাগরকে নিজের হাতে তাঁর কর্মের ক্ষেত্র তৈরি করে নিতে হয়েছিল। যদিও সমাজবিধান ও দেশাচারের কণ্টকাকীর্ণ পথ পরিষ্কার করে অগ্রসর হবার উদ্যম তাঁর আবির্ভাবের বহু পূর্বেই আরম্ভ হয়েছিল। তবে একথা সত্য যে তাঁরই প্রত্যক্ষ কর্মে সেই উদ্যম যেন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কালে সমসাময়িক কালের সংঘাত ও সংঘর্ষময় আবর্তের মধ্যে না পড়লেও বিদ্যাসাগরের কাল-সচেতন মন যুগের ইঙ্গিত সহজেই ধরতে পেরেছিল। যে বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে তাঁর ছাত্রজীবন গড়ে উঠেছিল, তার কিছু পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি। বিদ্যাসাগরের জন্মের তিন বছর আগে গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে একদিন হিন্দু কলেজের সূত্রপাত হলো। এদেশে ইংরেজি শিক্ষার এই আদিপর্বের ইতিহাসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নয়, কয়েকজন সহৃদয় ইংরেজ ও দেশীয় ভদ্রলোকের উৎসাহ ও আগ্রহই ছিল বেশী। প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ারের নাম এই ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। সম্পূর্ণ বেসরকারী এই উদ্যোগ যখন অর্থাভাবে নিষ্ফল হবার উপক্রম হলো তখন এগিয়ে এলেন বাংলা তথা ভারতের প্রাণপুরুষ রামমোহন রায়। তাঁর চেষ্টায় গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ল শিক্ষার দিকে। গভর্ণমেণ্ট বুঝলেন, শুধু দেশ শাসন করলেই হবে না, দেশের লোকের শিক্ষার সুব্যবস্থাও করতে হবে। নেপথ্যে রইলেন হেয়ার, সামনে রইলেন লর্ড বেন্টিঙ্ক আর রামমোহন—এদেশে

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের এই হলো গোড়ার কথা। তারপর মহাপ্রাণ হেয়ারের দেওয়া ভূমিখণ্ডের উপর উঠল সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের বাড়ি। একই ভবনে দুটি বিদ্যালয়—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুটি ধারা একই সঙ্গে প্রবাহিত হলো নবযুগের আগমনী ঘোষণা করে। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর রচিত ডেভিড হেয়ারের ক্ষুদ্র জীবন-চরিতে ইংরেজি শিক্ষার এই প্রাথমিক ইতিহাসের অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

দেশে ইংরেজি শিক্ষার বন্যা এলো। এলো নতুন ভাব, নতুন চিন্তা। বিদ্যুতের মত তীব্র তেজে চারদিক চমকে উঠল। ইতিহাসের গর্ভ থেকে একে একে বেরিয়ে এলেন নবযুগের নায়কবৃন্দ। রাজনারায়ণ বসু, মাইকেল মধুসূদন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ সিকদার, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দ বসাক—এঁরাই ছিলেন সেদিন হিন্দু-কলেজের প্রথম ছাত্র। আর এঁরাই সেদিন নব্যবাংলার দীক্ষাগুরু ডিরোজিওর কাছ থেকে ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির নতুন পাঠ গ্রহণ করে দেশের মধ্যে নিয়ে এলেন স্বাধীন চিন্তা আর সত্যনিষ্ঠা। এরই উপর ভিত্তি গড়ে উঠলো উনবিংশ শতকের বাংলার নতুন যুগ।

প্রবল তরঙ্গ তুলে বয়ে চললো ইংরেজি শিক্ষার স্রোত। প্রাচীনপন্থীদের ভয় ও ভাবনা এই স্রোতকে করে দিল বেগবান। অনেকে এর গতিরোধ করবার প্রয়াস পেলেন, কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ বিধানে তাঁদের সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়। তাঁরা শঙ্কিত চিত্তে দেখতে লাগলেন ইংরেজি শিক্ষার বিপরীত ফল। প্রতিবাদের কণ্ঠ হলো নীরব। সর্বপ্রথম যাঁরা এই নতুন শিক্ষার স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছিলেন, তাঁরা অনেকেই বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক। তিনি যখন ছাত্র, তাঁরাও তখন ছাত্র। তিনি ব্যাকরণ-সাহিত্য-অলঙ্কারের নিরাপদ গণ্ডীর একদিকে, তাঁরা টম্ পেইনের 'এজ অব্ রীজন্'-এর অপর দিকে। বিদ্যাসাগর করেন সন্ধ্যা-আহ্নিক, তাঁরা করেন হোমর-ইলিয়ড আবৃত্তি; বিদ্যাসাগরের আহার সামান্য মাছের ঝোল ও ডাল-তরকারী-ভাত, তাঁদের আহার্য ও পানীয়ের তালিকায় ছিল মুর্গী-মাটন, শেরি ও ব্র্যাণ্ডি। এঁদের অনেকের সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের পরিচয় আছে, কিন্তু ভাব বিনিময় নেই। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ভাব ও মানসজীবন, বিদ্যাসাগরের ভাব ও মানসজীবনের সম্পূর্ণ

বিপরীত ছিল। তবে ইতিহাসের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এ কথা বলা যেতে পারে যে, হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ভাব ও মানসজীবন যদিও বহুলাংশে ইংরেজকে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত হয়েছিল, তবু তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছিল দেশীয় সমাজ; প্রাগ্রসর চিন্তা, স্বাধীন মুক্ত ভাবধারার প্রচার ও দুঃসাহসিক কর্মের সাহায্যে তাঁরা ভারতীয় সমাজকে রূপান্তরিত করে চলেছিলেন। তাঁদের আক্রমণ ও অনাচারই সেদিন এই সমাজকে গতিশীল করে তুলেছিল।

হিন্দু কলেজের ভেতরে-বাইরে প্রলয়ঙ্কর আলোড়ন।

সংস্কৃত কলেজের আশেপাশে স্থির শান্ত অচঞ্চল ভাব।

ডিরোজিওর ছাত্রদের কথাবার্তা বুদ্ধিদীপ্ত। সমস্ত বাগ্‌বিতণ্ডার কেন্দ্রস্থল তারাই।

অন্যদিকে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের কথাবার্তা—শুধু কথাই, তার মধ্যে বার্তা নেই, নেই বিতণ্ডা। একনিষ্ঠ অধ্যয়ন ছিল, ছিল না নূতন কালের অনুভূতি।

হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ছিল ইংরেজের মানস-সন্তান।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবরসে পরিপুষ্ট।

একই ভবনে অধ্যয়ন করেছেন এই সব যুগ-নায়কগণ। কিন্তু নিজের নিজের ক্ষেত্রে স্বকীয়তার পরিচয় প্রদান করলেও, এঁদেরই মধ্যে থেকে শেষ পর্যন্ত যুগপুরুষ হয়ে ইতিহাসের উদয়-শিখরে, নিজের প্রচণ্ড মনুষ্যত্ব নিয়ে আবির্ভূত হলেন শুধু একজন। তিনি বিদ্যাসাগর। কি করে তা সম্ভব হলো? কঠোর পিতৃশাসনে জীবন-নিয়ন্ত্রিত, তবু ইতিহাস অতি সঙ্গোপনে কাজ করে চলেছিল। "কালের যে অন্তর-প্রেরণা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ধ্যান ধারণা চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করেছিল, কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পর দেখা গেল সংস্কৃত কলেজের শান্তশিষ্ট নিরীহ ছাত্র বিদ্যাসাগরের কর্মের ভেতর দিয়েও সেই অন্তর-প্রেরণাই অধিকতর তীব্র সামাজিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে প্রকাশিত হলো। যখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নীরব ও প্রশান্ত, তখনই সম্ভবত তাঁর চিত্ত বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল।"

কর্মজীবনে প্রবেশ করে বিদ্যাসাগর দেখলেন বাঙালির জীবনে আজ প্রয়োজন প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা—একান্তই প্রয়োজন। চাই সহৃদয়তা।

কর্মজীবনের যাত্রা-পথে বিদ্যাসাগর আরো দেখলেন:

"একদিকে অন্ধ বিশ্বাসের অধীন হইয়া আপনার ভাগ্যের নিন্দা করিতে করিতে লোকে অলসভাবে দিন যাপন করিতেছিল, আর একদিকে, নূতন ভাব ও নূতন উদ্যমের খরতর স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া সে সময়ের বঙ্গীয় যুবক মণ্ডলীকে কোথায় কোন্ অজ্ঞাত পথে লইয়া চলিয়াছিল ; বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, কর্মক্ষেত্রের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া নব্য বিদ্যাসাগর দেখিলেন, এক পার্শ্বে আবর্জনাপূর্ণ মঙ্গলময় বনভূমি বহু রত্নের আকর হইয়াও অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের দৃঢ় নিগড়ে পরিবেষ্টিত, অপর পার্শ্বে বিচিত্র দৃশ্য তারকাবলী-প্রতিবিম্বিত সলিলোচ্ছ্বাসপূর্ণ বারিধিবক্ষঃ সুপ্রসারিত হইয়া তাঁহার হৃদয় মন আকৃষ্ট করিতেছে ; কিন্তু কত ভীষণাকার তিমি ও মকর সে জলতলে লুক্কায়িত রহিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই উভয়ের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া দিব্যনেত্রে তাঁহার ভাবী সঙ্কল্পের পথ দেখিতে পাইলেন ; তাঁহার মানসনেত্র তাঁহাকে এই উভয়বিধ বাধাবিঘ্নের মধ্যে সর্বদা সুপথ দেখাইয়া দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবের সংমিশ্রণে তাঁহার নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া লইলেন।"

এই হলো বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের সূচনায় তখনকার বাংলা দেশের সামাজিক আবর্তের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এইটুকু জানা থাকলে তাঁর সেই বিরাট ও বহুমুখী কর্মজীবনের গতি ও প্রকৃতি অনুসরণ করতে আমাদের অসুবিধা হবে না।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন বিদ্যাসাগর হলেন তখন ইংরেজি ভাষা তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হলেও, তিনি যে অনেকটা ইংরেজি ভাব ও চিন্তার সংস্পর্শে এসেছিলেন, এ কথা বলা যেতে পারে। ইংরেজি শিখতে হবে—এই ধারণা তাঁর মনের মধ্যে প্রবল হলো সংস্কৃত কলেজের গণ্ডী অতিক্রম করবার সঙ্গে সঙ্গেই। নবীন উদ্যমে তিনি তার আয়োজনও করতে লাগলেন। সংস্কৃত কলেজে যা সম্ভব হয়নি, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে বিদ্যাসাগর তা সম্পন্ন করলেন—ইংরেজিতে কৃতবিদ্য হলেন। আগেই বলেছি তাঁর দৃষ্টি ছিল দূর-প্রসারী, জীবনবোধ ছিল ব্যাপক ; তিনি সহজেই এই সত্যটা অনুভব করেছিলেন যে, এই হতভাগ্য দেশকে যদি তার বর্তমান অধঃপতন থেকে উদ্ধার করতে হয়, তাহলে এ দেশের অচল অনড় সমাজকে পাশ্চমের গতিদ্বারা

সঞ্চালিত করতে হবে। বুঝেছিলেন ইংরেজি শিক্ষাই এই কর্মের প্রধান অস্ত্র। তিনি সর্বাগ্রে তাই ইংরেজি শিখবার আয়োজন করলেন। শুধু কি ইংরেজি? সেই সঙ্গে হিন্দীও। বস্তুত, ছাত্রের উদ্যম ও উৎসাহ তাঁর সারা জীবনই ছিল।

মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যুতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত বা সেরেস্তাদারের পদটি শূন্য হলো।

বিদ্যাসাগর তখন বীরসিংহ গ্রামে।

কলেজের সেক্রেটারী কাপ্তেন মার্শাল সাহেবের দৃষ্টি বরাবর তাঁর ওপর। অনেক প্রার্থীই ঐ পদের জন্যে লালায়িত এবং ঐ চাকরীটি পাবার জন্যে অনেকেই সচেষ্ট।

বিদ্যাসাগর তখন দীর্ঘ অধ্যয়নের পর মায়ের স্নেহের ছায়াতলে বসে একটু বিশ্রাম সুখ ভোগ করছেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ যখন ছিলেন মার্শাল সাহেব, তখন তিনি বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনের কৃতিত্বের কথা বিশেষরূপে জানতেন। তাঁর "অনন্যসাধারণ শ্রমশীলতা, দুর্দমনীয় অধ্যবসায়, আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তা, সুন্দর হস্তাক্ষর, রচনা-নৈপুণ্য এবং সর্ব বিষয়ে সমান অনুরাগ" বিদ্যাসাগরকে মার্শালের প্রিয় করে তুলেছিল।

মার্শাল সাহেব গুণগ্রাহী লোক। অনেকেই অনেকের জন্যে তদ্বির-তদারক করতে লাগলেন, কিন্তু মার্শাল সাহেবের ইচ্ছা ঐ পদে বিদ্যাসাগরকে নিযুক্ত করেন। কেন না, তাঁর দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর শুধু যে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন তা নয়, বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি তাঁর বেশী। বুদ্ধির চেয়ে চরিত্র। মার্শাল সাহেবের কাছে তিনি বরাবরই একজন অসাধারণ শক্তিশালী বুদ্ধিমান লোক। তর্কালঙ্কারের শূন্যপদে তিনি বিদ্যাসাগরকে নিযুক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু কোথায় সেই কৃতী যুবক? একদিন সংস্কৃত কলেজে এসে মার্শাল সাহেব জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের কাছে তাঁর খোঁজ করলেন। জানতে পারলেন যে বিদ্যাসাগর কলকাতায় নেই। কী করে খবর দেওয়া যায়? তর্কপঞ্চানন মহাশয় তখনি বড়বাজারে ঠাকুরদাসের কাছে খবরটা পাঠিয়ে দিলেন। ঠাকুরদাসের কাছে এ সুসংবাদ নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। তাঁর ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড পণ্ডিত হবে—এ সৌভাগ্য তিনি

কল্পনাই করতে পারেন নি। ছুটলেন তিনি বীরসিংহ গ্রামে। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ছেলেকে কলকাতায়।

শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হলেন।

মাইনে পঞ্চাশ টাকা। বর্তমান বাংলার সর্বপ্রধান শিক্ষাগুরুর কর্মজীবনের এই আরম্ভ। এই চাকরী তাঁর জীবনের গতি নির্দেশ করল। দরিদ্রের সন্তান, কল্পনাতীত অভাবের মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছেন। জীবনের আরম্ভেই এমন একটি চাকরী—দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়। এমন চাকরীর প্রতি মমতা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ বিদ্যাসাগর। চাকরী করতে এসেছেন, ন্যায় ও নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়ে চাকরী বজায় রাখবার মত প্রকৃতি তাঁর ছিল না। কথাটি একটু খুলে বলা দরকার। এই হেড পণ্ডিতের চাকরীটি খুব দায়িত্বপূর্ণ ছিল। ইংলণ্ড থেকে যেসব সিভিলিয়ান কোম্পানীর চাকরী নিয়ে ভারতে আসতেন, তাঁদেরকে এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা, হিন্দী, উর্দু ও ফার্সি শিখতে হতো। এই চারটি দেশীয় ভাষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তাঁরা কর্মে নিযুক্ত হতে পারতেন। এই সব সিভিলিয়ানদের তখন বলা হতো 'রাইটার্স অব দি কোম্পানী'। গোলদীঘির ধারে তাঁরা যে বাড়িতে থাকতেন, তার নাম ছিল 'রাইটার্স বিল্ডিং'। এই রাইটার্স বিল্ডিং থেকেই কলকাতার বর্তমান সেক্রেটেরিয়েটের নামকরণ হয় 'রাইটার্স বিল্ডিং'। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটা তখন এই ভবনেই ছিল।

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। বিদ্যাসাগরের সৌভাগ্যের সূচনা এইখান থেকেই, আবার বাংলা গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজই অন্যতম শক্তিশালী সহায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে গদ্য সাহিত্য-পাঠের প্রয়োজনীয়তা থেকেই পাঠ্য গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টির দিকে দৃষ্টি পড়ে। এরই ফলে অনেকগুলি পাঠ্য গদ্য পুস্তক প্রণীত হলো। কিন্তু তখনো বাংলা গদ্য সাহিত্য পুর্ণ পুষ্টির অপেক্ষায় ছিল। বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আসার পর সে অভাব পূর্ণ করলেন কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করে। বিদ্যাসাগরের ইহজীবনের সৌভাগ্য এবং বাংলা গদ্যসাহিত্যের পূর্ণ পরিপুষ্টি—

এই দুইয়েরই সূত্রপাত এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেই। সে এক স্বতন্ত্র ইতিহাস।

বিদ্যাসাগর এখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার বা হেড পণ্ডিত। সিভিলিয়ানদের পরীক্ষা করেন তিনি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে থেকে তাদেরকে মাসে মাসে পরীক্ষা দিতে হতো। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার একটা সময় ঠিক করা ছিল। সেই সময়ের মধ্যে তারা যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারত, তাহলে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে হতো। বিদ্যাসাগরের ওপর ভার ছিল পরীক্ষার। বড় কঠিন পরীক্ষক তিনি। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার লিখেছেন :

"এই কলেজের কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ দৃঢ়তা ও আগ্রহাতিশয় সহকারে কর্ম করিতেন, তাহাতে কর্তৃপক্ষ মার্শাল সাহেব দিন দিন তাঁহার প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া যাঁহাদিগকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইত, তাঁহাদিগের মনঃক্ষোভের সীমা থাকিত না ; তাই মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পরীক্ষার আঁটাআটি ভাবটা একটু কম করিতে বলিয়াছিলেন। তদুত্তরে যুবক বিদ্যাসাগর অতি স্পষ্ট ভাষায় মার্শাল সাহেবকে বলিয়াছিলেন, "ওটি আমাকে দিয়ে হবে না। না হয় চাকুরি ছাড়িয়া দিব, তবুও অন্যায়ের প্রশ্রয় দিব না'।"

চাকরীর মায়া বিদ্যাসাগরের ছিল না। নিজের ন্যায় ও বিবেক বিসর্জন দিয়ে চাকরী বজায় রাখবার মানুষ তিনি ছিলেন না। তাঁর চরিত্রের এই ন্যায়নিষ্ঠাই তাঁকে উত্তরকালে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের চক্ষে অপরিসীম শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল। এই স্বাধীনচিত্ততাই সাগর-চরিত্রকে একটা উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করে রেখেছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি যে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হতে পেরেছিলেন, তার মূলে ছিল দুটি জিনিস—কর্তব্যনিষ্ঠা আর স্বাধীনচিত্ততা।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরী নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাসাগর সর্বপ্রযত্নে ইংরেজি শিখতে লাগলেন। এই সময়ে তিনি ইংরেজি ও হিন্দী—দুটি ভাষাই শিখতে আরম্ভ করলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পিতা, তালতলার

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখনও চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন নি। বিদ্যাসাগরের তিনি একজন পরম বন্ধু। তিনি সব সময়ই বিদ্যাসাগরের বাসায় এসে আমোদ-প্রমোদ করতেন। একদিন বিদ্যাসাগর দুর্গাচরণকে বললেন—বাড়ুয্যে, আমাকে একটু ইংরেজি শেখাতে পার?

দুর্গাচরণ অবাক্। পণ্ডিত বলে কি? চাকরী করে আবার ইংরেজি শিখতে চায়! তারপরেই তিনি ভাবলেন—এ মানুষটির অসাধ্য কিছুই নেই। এমন শ্রমশীল আর অধ্যবসায়ীর কাছে কোন্ কাজটা কষ্টের? তখন বৌবাজার—পঞ্চানন তলায় নিতাই সেনের বাড়িতে বিদ্যাসাগরের বাসা। বাড়ির বাইরে দুটো বড় বড় ঘর। একটা ঘরে ভাইদের নিয়ে বিদ্যাসাগর থাকেন। অন্য ঘরে তাঁর আত্মীয়েরা বাস করতেন। পরে এখান থেকে কাছাকাছি হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তিনি উঠে যান।

কাজের অন্ত নেই। কলেজের চাকরী। ইংরেজি শেখা। তার ওপর এই সময়ে তাঁর কাছে সন্ধ্যাবেলায় ও সকালে অনেকেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পড়তে আসত। এদের পড়িয়ে তিনি আবার নিজে ইংরেজি পড়তেন। দুর্গাচরণ বাবু তখনও ডাক্তার হন নি। হেয়ার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক তিনি। খুব ভালো ইংরেজি জানেন। তাঁরই ছাত্র নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছে প্রথম প্রথম বিদ্যাসাগর ইংরেজি শিখতেন। তারপর দুর্গাচরণ বাবু কিছুদিন তাঁকে ইংরেজি শেখালেন। তারপর রাজনারায়ণ বসু ও রাজনারায়ণ গুপ্তের কাছে তিনি অশেষ যত্নের সঙ্গে নবীন ছাত্রের উদ্যম নিয়ে ইংরেজি শিখলেন—যেমন শিখেছিলেন তাঁর পূর্বসূরী রামমোহন রায় বাইস বছর বয়সে ডিগ্‌বি সাহেবের কাছে। দশ টাকা মাইনে দিয়ে একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত রেখে তার কাছে হিন্দী শিখলেন। এই ভাবে অল্প দিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

ইংরেজি শেখা হলো। এমন ভাবেই শিখলেন যে, শেষে এই চটি-পরা পণ্ডিতের ইংরেজিতে দখল দেখে সেদিনের বাংলার নব্য শিক্ষিতেরাও বিস্ময় বোধ না করে পারেন নি।

এবার অঙ্ক শিখতে হবে।

বিদ্যাসাগরের উৎসাহের শেষ নেই। শোভাবাজার রাজবাড়িতে তখন তাঁর তিন জন বন্ধু ছিলেন। রাজা রাধাকান্তের মধ্যম জামাতা অমৃতলাল মিত্র,

কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীনাথ ঘোষ আর দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু—সকলেই তাঁর পরম বন্ধু। এঁদের কাছেই তিনি শিখবার জন্যে যেতেন। কিন্তু নীরস অঙ্কশাস্ত্র বিদ্যাসাগরকে বেশী আকৃষ্ট করতে পারল না। তাই কিছু দূর অগ্রসর হয়ে মাস পাঁচ-ছয় প.রে তিনি বিরত হলেন।

অঙ্কের চর্চা ছেড়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর আনন্দকৃষ্ণের কাছে সেক্সপীয়র পড়তে লাগলেন। তিনি খুব সুন্দর সেক্সপীয়র আবৃত্তি করতে পারতেন। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সঙ্গে পরিচয় হয়। একদিন দুপুরবেলা। রাজাবাহাদুর মধ্যাহ্ন আহারের পর হাত-মুখ ধুচ্ছিলেন, এমন সময়ে বিদ্যাসাগর রাজবাড়িতে প্রবেশ করলেন এবং সোজা আনন্দকৃষ্ণের কাছে চললেন। হঠাৎ রাধাকান্তের দৃষ্টি পড়ল তাঁর ওপর। পাশে একজন আত্মীয় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ তেজঃপুঞ্জকলেবর ব্রাহ্মণ যুবকটি কে? ওর মুখে যেন প্রতিভার প্রভা ফেটে পড়ছে। ওকে ডেকে আনো তো। বিদ্যাসাগর এলেন। রাজাবাহাদুর তাঁর সঙ্গে আলাপ করে এবং তাঁর কথাবার্তা শুনে যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করলেন। পরবর্তী কালের সংস্কার-বিরোধী ও সংস্কার-প্রয়াসী দুই নেতার মধ্যে এই প্রথম আলাপ।

বর্ণনাতীত দুঃখকষ্টের দারুণ অবস্থার ভেতর দিয়ে মানুষ হয়েছেন বিদ্যাসাগর। দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান—আশৈশব দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। চোখের সামনে দেখেছেন উদয়াস্ত কী কঠোর পরিশ্রমই না করে ঠাকুরদাস তাঁকে মানুষ করেছেন। তাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরী নিয়েই পিতৃভক্ত পুত্রের প্রথম কাজ হলো পিতাকে পরিশ্রম থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া। চাকরী থেকে অবসর নেবার জন্যে বিদ্যাসাগর পিতাকে সর্বাগ্রে অনুরোধ করলেন। উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্ত কথা, সন্দেহ নেই। কিন্তু ঠাকুরদাস একটু ইতস্ততঃ করলেন; ভাবলেন নিজের শক্তি-সামর্থ্য থাকতে এইভাবে ছেলের অধীন হওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না। কিন্তু চিরকালের একগুঁয়ে ও জেদী বিদ্যাসাগর বাবাকে একদিন বললেন—এখন তো আমি উপার্জ্জনক্ষম হয়েছি, আপনি কেন আর চাকরী করবেন? দীর্ঘকাল সংসারের বোঝা বহন করেছেন, এখন একটু বিশ্রাম করুন। আমি আপনাকে আর কিছুতেই কাজ করতে দেব না।

ক্ষীরপাইতে বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত মডেল স্কুল
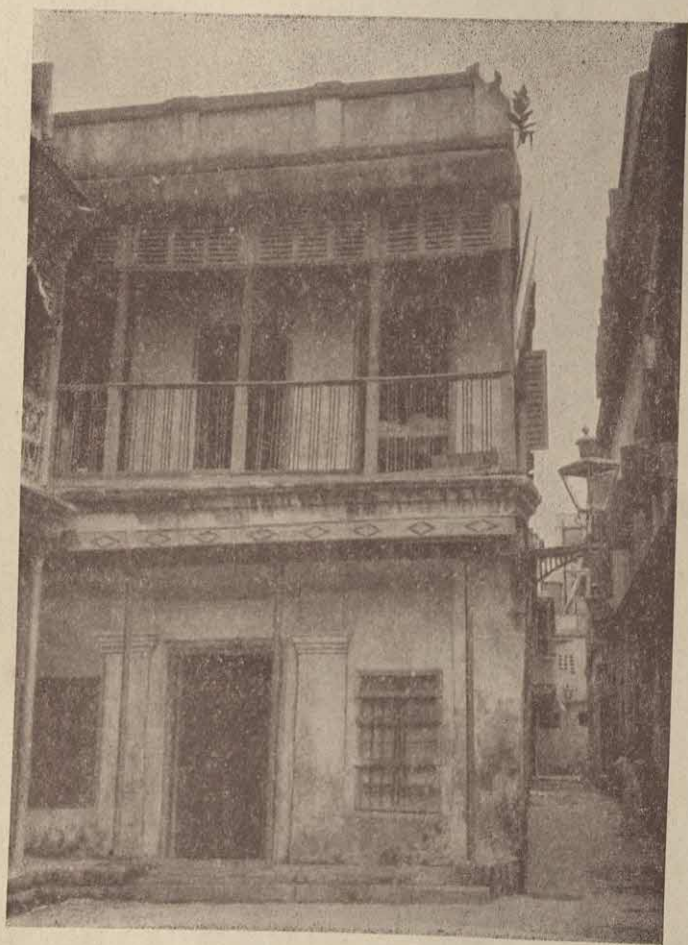
বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনের স্মৃতিপূত
বহুবাজারে হিদ্‌রাম ব্যানার্জির বাড়ি

পুত্রের এই অনুনয় ও অনুরোধ ঠাকুরদাস উপেক্ষা করতে পারলেন না। চাকরী ছেড়ে দিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁকে প্রতি মাসে কুড়ি টাকা করে পাঠাতে লাগলেন। বাকী ত্রিশ টাকায় তিনি কলকাতার বাসায় তিনটি ভাই, দু'টি পিতৃব্যপুত্র, দুটি পিস্তুতো ভাই, একটি মাস্তুতো ভাই ও পুরাতন ভৃত্য শ্রীরাম—মোট নজনের ভরণপোষণ নির্বাহ করতে লাগলেন। শুধু তাই? সকলের বড় হয়ে এবং সবচেয়ে বেশী রোজগার করেও তিনি পালা করে রান্নার কাজে সহায়তা করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। আবার এই ত্রিশ টাকার মধ্যেও বিদ্যাসাগর বাসাখরচ চালিয়ে, আবশ্যকমত সাধ্যানুসারে অন্নবস্ত্রার্থী এবং অসহায় পীড়িত লোকের সাহায্য করতেন। তাঁর স্বভাবের ধর্মই ছিল এই। বিদ্যাসাগরের বাসা তখন বৌবাজারে হৃদয়রাম বাঁড়ুয্যের বাড়িতে।

শোভাবাজারের রাজবাড়ি।

একদিন বিদ্যাসাগর আনন্দকৃষ্ণের কাছে বসে সেক্সপীয়র পড়ছেন, এমন সময়ে একটি কৃশদেহ যুবক সেখানে এলেন। প্রতিভাব্যঞ্জক চোখমুখ। এই যুবককে বিদ্যাসাগর আগে দেখেন নি। আনন্দকৃষ্ণ তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন—ইনি অক্ষয় দত্ত, 'তত্ত্ববোধিনীর' সম্পাদক। এঁরই লেখা আপনি সেদিন সংশোধন করেছেন। অক্ষয় দত্তের নাম তিনি শুনেছেন, এই প্রথম দেখলেন। অক্ষয় দত্তও সংস্কৃত কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছেন এবং তাঁকে দেখেছেন, কিন্তু আলাপ-পরিচয় এই প্রথম হলো। অক্ষয় দত্ত ও বিদ্যাসাগর দুজনাই শোভাবাজারের রাজবাড়িতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইংরেজি, অঙ্ক ও সাহিত্য পড়তে যেতেন। অল্প দিনেই বিদ্যাসাগর সেক্সপীয়র আয়ত্ত করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগরণের ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতায় যে প্রচণ্ড সামাজিক আলোড়ন আমরা লক্ষ্য করি, তারই ফলে ঐ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে কলকাতা শহরে অনেক সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তরুণ বাংলা এই সব সভার ভেতর দিয়েই তখন আত্মপ্রকাশ করেছিল। অসংখ্য সেই সভাসমিতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল তত্ত্ববোধিনী সভা। বাংলার

সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের ইতিহাসে এই সভার বিশেষ দান আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রতিষ্ঠাতা।

রামমোহনের উত্তরসাধক দেবেন্দ্রনাথ সে যুগের অন্যতম যুগনায়ক—সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের তিনিই ছিলেন নেতৃস্থানীয়। তাঁর ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল প্রভায় এই যুগ উদ্ভাসিত। তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যাতা দেবেন্দ্রনাথ এ যুগের সাহিত্য-নির্মাতাদেরও একজন। তাঁর রচনা-রীতির সরলতা এবং ব্যঞ্জনা বিস্ময়কর। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চ আদর্শের বাণী দিয়েছিলেন প্রথমতঃ রামমোহন, দ্বিতীয়তঃ দেবেন্দ্রনাথ। রামমোহনের আদর্শে তত্ত্ব ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধনে যে অপূর্ণতা ছিল, দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভা সেই অপূর্ণতাটিকে সম্পূর্ণ করল। কৃষ্ণমোহন ও অক্ষয়কুমারের প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথ বেদকে অভ্রান্ত মনে না করে উপনিষদ থেকে নূতন করে ধর্মশাস্ত্র সংকলন করলেন। অর্থাৎ তিনি উপনিষদকে শুধু বিচারের বস্তু করলেন না; তিনি তাকে জীবনধর্মে পরিণত করলেন। দেবেন্দ্রনাথ মূলতঃ ছিলেন ধর্মপ্রবক্তা। তাঁর ধর্ম ছিল উপলব্ধির ধর্ম। ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি দিয়েই তাঁর মনঃপ্রকৃতি গঠিত। তবে একথা ঠিক যে, দেবেন্দ্রনাথের লক্ষ্য ধর্ম হলেও, ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যরা প্রায় সকলেই প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি আলোচনায় ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। তত্ত্ববোধিনীর এই দিকটার প্রতিই বিদ্যাসাগর আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যেটুকু সংস্পর্শ তা এই সূত্র ধরেই সেদিন গড়ে উঠেছিল।

বাংলার সংস্কৃতির পীঠস্থান দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তত্ত্ব-বোধিনী সভা (প্রথমে নাম ছিল "তত্ত্বরঞ্জিনী") যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, বিদ্যাসাগর তখনো সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক পরিবর্তন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির নৈতিক জীবনে নিয়ে এল ভাঙন, নিয়ে এল উদ্দামতা আর উচ্ছৃঙ্খলতা। কালক্রমে প্রয়োজন হলো একে সংযত করার। প্রতিভাবান্ বাঙালি যুবকেরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করছে—চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখে তখনকার বাংলার সর্বজ্যেষ্ঠ চিন্তানায়ক, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রসর হলেন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি-সমাজে খ্রীষ্টানধর্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে অবাধ অগ্রগতির পথ প্রতিরোধ করতে। এই প্রয়োজন থেকেই সৃষ্টি হলো

সংস্কারমুক্ত ও ধর্মতত্ত্বান্বেষী তত্ত্ববোধিনী সভার। ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনী সভার ঐতিহাসিক ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সভার দান আজো স্মরণীয়। 'ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস' গ্রন্থে শিবনাথশাস্ত্রী এই সভার এবং এই সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন: "দশ জনমাত্র সভ্য লইয়া যে সভার সূচনা হয়, দুই বৎসরের মধ্যেই উহার সভ্য সংখ্যা পাঁচ শতে দাঁড়ায়।" আধুনিক এক লেখক এই সম্পর্কে লিখেছেন: "ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি বিদ্বৎসমাজের অধিকাংশই এই সভার সভ্য হন। সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা প্রবর্তন ক'রে বাংলা সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নতুন পথ প্রদর্শন করে। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের মতন প্রতিভাবানদের অভ্যুদয় এই পত্রিকার পৃষ্ঠায়।...উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভার মতন আর কোনো সভা বাংলার বিদ্বৎসমাজে এত ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েও, তত্ত্ববোধিনী সভা দেশীয় ঐতিহ্যের যা-কিছু মহান তাকে অস্বীকার করে নি। কোনো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতা তার ছিল না। ধর্মের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা ক'রে যে কোনো স্থায়ী সংস্কার কিছু করা যায় না, অথচ তার কালসঞ্চিত কুসংস্কার-গুলোকে ছেঁটে ফেলে দিয়ে মুক্ত মনের অঙ্গনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, এ-সত্য প্রথমে রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন। পরবর্তী কালে নোঙরহীন আদর্শবাদীদের দিগ্‌ভ্রান্তির মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভা এই দিক্-নির্ণয়ে সাহায্য করেছিল। পূর্বেকার সমস্ত প্রগতিশীল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সভার যা কিছু ভালো তার সবটুকু বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে এবং যা-কিছু মন্দ তার সবটুকু নির্ভয়ে বর্জন করে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ দিক থেকে তত্ত্ববোধিনী সভা বাংলার বিদ্বৎ-সমাজকে সুস্থির আদর্শ-সমন্বয়ের পথের সন্ধান দিয়েছিল।"

ইয়ং বেঙ্গলের প্রাণোন্মদনাকে সুস্থির সংস্কার আন্দোলনে, স্বদেশাভিমানে যুক্তিবদ্ধ চিন্তায় ও মার্জিত রসানুভূতিতে উন্মেষিত করে তুলেছিল সেদিন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

সেই তত্ত্ববোধিনী সভার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এলেন বিদ্যাসাগর। হলেন তার সভ্য। শুধু সভ্য নয়—সম্পাদক পর্যন্ত ছিলেন বিদ্যাসাগর। শোভাবাজার রাজবাড়িতে যুক্তিবাদী মনীষী অক্ষয়দত্তের সঙ্গে তাঁর আলাপ এইভাবেই সার্থক হয়েছিল সেদিন। তাঁর মানস-গঠনের পক্ষে তত্ত্ববোধিনীর ভাবধারার যে প্রেরণা ও প্রভাব ছিল, তা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। এই সভার লক্ষ্য ধর্ম হলেও ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে সভ্যরা প্রায় সকলেই প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি-আলোচনায় ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই এই সাধারণ মনোভাবে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। এ কথা প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই বলা চলে যে, তত্ত্ববোধিনী সভার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার ফলেই বিদ্যাসাগর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও মহাভারতের মধ্যে আদর্শোজ্জ্বল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সন্ধান পেয়েছিলেন এবং মহাভারত ও সংস্কৃত সাহিত্যের কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করাতে এই সংস্কৃতির প্রতি তাঁর নিবিড় অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। তত্ত্ববোধিনীর সংস্পর্শে না এলে হয়ত তিনি সাধারণ সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করতেন। ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে তিনি পেলেন একটি বলিষ্ঠ উদার দীপ্ত সভ্যতার সন্ধান এবং তাঁরই মধ্যে খুঁজে পেলেন সমসাময়িক সমাজের কলহ ও মালিন্য থেকে মুক্তির উপায়। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার লিখেছেন:

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যিনি যাহা লিখিতেন, আনন্দকৃষ্ণ বাবু প্রমুখ কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগকে তাহা দেখিয়া আবশ্যকমত সংশোধনাদি করিয়া দিতে হইত। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আনন্দবাবুর বাড়িতে বসিয়াছিলেন, এমন সময় অক্ষয়কুমার বাবুর একটি লেখা তথায় উপস্থিত হয়। আনন্দবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অক্ষয়কুমার বাবুর লেখাটা পড়াইয়া শুনাইয়া দেন। অক্ষয়কুমার বাবু পূর্বে যে সব অনুবাদ করিতেন, তাহাতে কতকটা ইংরেজি ভাব থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষয়কুমার বাবুর লেখা দেখিয়া বলিলেন, 'লেখা বেশ বটে, কিন্তু অনুবাদের স্থানে স্থানে ইংরেজি ভাব আছে।' আনন্দকৃষ্ণ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাহা সংশোধন করিয়া দিতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংশোধন করিয়া দেন। এইরূপ তিনি বারকতক সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। অক্ষয়বাবু সেই সুন্দর সংশোধন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইতেন।"

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের আলাপ এই ঘটনার পর থেকেই।
সংশোধনের বিশুদ্ধ-প্রাঞ্জল বাংলা দেখে অক্ষয় কুমার ভাবতেন—এমন বাংলা কে লেখে?

তারপরই কৌতূহল নিবারণের জন্যে তিনি একদিন এলেন শোভাবাজারে। সেইখানেই আলাপ হলো বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর জীবনব্যাপী বন্ধুত্বের এই প্রথম সূত্রপাত। পরবর্তী কালে বাংলা গদ্য-সাহিত্যে এই দুজন প্রতিভাবান পুরুষই নবযুগ এনেছিলেন। এঁরা দুজনেই আধ্যাত্মিকতার চেয়ে নৈতিকতাকেই বড়ো বলে জানতেন। এরপর অক্ষয় বাবু যা কিছু লিখতেন, তা বিদ্যাসাগরকে দেখিয়ে নিতেন। তিনিও সংশোধন করে দিতেন। এইভাবেই সেদিন বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব সংঘটিত হয়। অক্ষয়-বিদ্যাসাগরের এই সংযোগ বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। অক্ষয় বাবুই বিদ্যাসাগরকে তত্ত্ববোধিনী সভায় নিয়ে আসেন এবং তত্ত্ববোধিনীর ভেতর দিয়েই সেদিন বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে কবি ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার গুপ্ত-কবিরই আবিষ্কার। তত্ত্ববোধিনীর সভায় বিদ্যাসাগর যোগদান করলেন সাহিত্যের আকর্ষণে, ধর্মের টানে নয়। অক্ষয়কুমারের এক জীবনচরিত-লেখক লিখেছেন যে, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পর থেকে অক্ষয়কুমার নিজেকে উপকৃত বলে উল্লেখ করেছেন। আবার বিদ্যাসাগরও কম লাভবান হন নি। অক্ষয়কুমারের উৎসাহেই বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মহাভারতের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। আদিপর্বের কিয়দংশ মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এর আগে মহাভারতের এমন বাংলা অনুবাদ হয় নি। পরে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকেই প্রেরণা পেয়ে এবং তাঁর মত নিয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ করতে অগ্রণী হন। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের নিকট তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজে লিখেছেন: "আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং অনুবাদিত প্রস্তাবের কিয়দংশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে

প্রচারিত ও কিয়দ্ভাগ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সরল হৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন—তিনি অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন। ফলতঃ বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠ্যাবস্থাবধি আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দেশ করা যায় না।”

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভূমিকা আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত আধুনিকতার সূত্রপাত হয়। ইতোপূর্বে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার স্বরসৃষ্টির বিবিধ প্রচেষ্টা হয়েছে। সমাচার-দর্পণ, সংবাদকৌমুদী, সমাচার-চন্দ্রিকা, বঙ্গদূত, জ্ঞানান্বেষণ, সংবাদ-প্রভাকর প্রভৃতি সাময়িক পত্রের বিশিষ্ট ভূমিকাও স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার আগমনী সুর ধ্বনিত হলেও তখনো প্রকৃত সৌষ্ঠবের অভাব সাহিত্যকে রসাল করে তুলতে পারে নি। তত্ত্ববোধিনীর প্রচেষ্টায় সে অভাব দূর হলো। পূর্ববর্তী অন্যান্য সকল সাময়িক পত্রের গতানুগতিক ধারা ভঙ্গ হয়ে নতুন প্রাণবন্যায় বাংলা সাহিত্যের দেহ-বল্লরী সজীব ও সতেজ হয়ে উঠল। সে দেহে প্রকৃত আধুনিকতায় সাড়া ও স্পন্দন অনুভূত হলো। মননশীলতার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এলো সৌষ্ঠব। দুর্বোধ্য সমাসাকীর্ণ প্রবন্ধ নয়, একেবারে সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ সহজবোধ্য প্রবন্ধই আমরা পেলাম তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায়। অক্ষয়কুমারকে কেন্দ্র করে সেদিন তত্ত্ববোধিনীর জন্যে যাঁরা কলম ধরেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রলাল প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব মনীষীর রচনাগুণ ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাখর্যের আলোকে উদ্ভাসিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাংলার চিন্তাজগতে নিয়ে এলো এক আলোড়ন, বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণের হলো প্রতিষ্ঠা।

তত্ত্ববোধিনী তথা অক্ষয়কুমারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক তাই তাঁর জীবনের একটা বিশেষ অধ্যায়।

তিনি দীর্ঘকাল এই সভার ও সভার মুখপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ধর্ম

তিনি মানতেন না, কিন্তু তত্ত্ববোধিনীর সংস্কার-মুক্ত উদার ভাবধারা ও যুক্তিসিদ্ধ আদর্শ তাঁর কাছে হৃদ্য বলেই মনে হতো আর হৃদ্য ছিল অক্ষয়কুমারের বন্ধুত্ব। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা। এই পত্রিকা সম্পাদনের জন্যে অনন্যকর্মা অক্ষয়কুমারকে কঠিন পরিশ্রম করতে হতো এবং এর ফলে তিনি যখন গুরুতর শিরোরোগে আক্রান্ত হন, তখন বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবেই সভা থেকে অক্ষয়কুমারকে মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা হয়। এই দুই স্বাধীনচেতার বন্ধুত্ব বাঙালি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করবে।

অক্ষয়-বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ আরো একটু বলা দরকার।

সে যুগের অন্যতম যুগ-সারথি অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন অসামান্য প্রতিভাশালী পুরুষ। মস্তিষ্কের শক্তিতে এবং হৃদয়ে উদার ভাবে বিদ্যাসাগরের মতো তিনিও অক্ষয় কীর্তির অধিকারী। মাত্র আড়াই বছর ইংরেজি স্কুলে পড়লেও, বিজ্ঞানে ছিল তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি। অসামান্য পরিশ্রম ও বুদ্ধির প্রভাবে অক্ষয়কুমার এক রকম নিজের চেষ্টায় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। জ্ঞানানুশীলন তাঁর জীবনের ব্রত, যেমন দান ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনের ব্রত। জ্ঞানসংগ্রহে অক্ষয়কুমারের তৎপরতাও ছিল অসাধারণ। তাঁর ছিল অনুসন্ধিৎসা আর সাভিনিবেশ দৃষ্টি। বিদ্যাসাগরের ও অক্ষয় কুমারের এক জায়গায় মিল ছিল। দুজনেরই পিতা দরিদ্র। দারিদ্র্যের সঙ্গে দুজনেরই আবাল্য পরিচয়। দরিদ্র, কিন্তু আত্মদৈন্য ছিল না এতটুকু। এইখানে দুজনে আরো মিল। বিদ্যাসাগর ছিলেন শাস্ত্রদর্শী। অক্ষয়কুমার তত্ত্বদর্শী। দুজনেই প্রায় একই সময়ে বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধানে মনোনিবেশ করেন। "বিদ্যাসাগর যেমন কোমলতায় বাংলা সাহিত্যের মাধুর্য বৃদ্ধি করিয়াছেন, অক্ষয়কুমার সেইরূপ ওজস্বিতায় উহাকে উদ্দীপনাময় করিয়া তুলিয়াছেন।" অক্ষয়কুমার সম্পর্কে বেশী বলবার এই আছে যে, ঈশ্বরচন্দ্রের আগেই তিনি এমন শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা করেছিলেন যে তাতে কোনো রকম জড়তা বা জটিলতা ছিল না। আদিগঙ্গার কুত্‌ঘাটের কেশিয়ার ও দারোগা যে একদিন বাংলা ভাষার অন্যতম দিকপাল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন, তা কেউ ভেবেছিল? অক্ষয়কুমারেয় প্রতিভা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর নিজে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করতেন। 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়' অক্ষয়কুমারের মহাগ্রন্থ। এই

গ্রন্থে তিনি অসামান্য গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন এবং জীবনের যে অবস্থায় (দুরারোগ্য শিরোরোগের ব্যাধি তখন তাঁকে পঙ্গু করেছে) তিনি এই বই লিখেছিলেন তা স্মরণ করলে বিস্মিত হতে হয়। বাংলা সাহিত্যের এই বরণীয় মহাপুরুষ, এই অসাধারণ কর্মবীরের প্রতি বিদ্যাসাগরের মতো মহাপুরুষ ও কর্মবীর যে আকৃষ্ট হবেন—এই তো স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্ম অক্ষয়কুমারের বন্ধুত্ব বাংলার উনবিংশ শতকের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সত্যই একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

অক্ষয়কুমারের প্রতি বিদ্যাসাগরের আকৃষ্ট হবার আরো একটা কারণ ছিল। দুজনে শুধু সমবয়সী ছিলেন না ; বিদ্যাসাগরের মত অক্ষয়কুমারও একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। সমাজ-সংস্কারের প্রেরণা এবং তাঁর সাহিত্য সাধনা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। একের সাধনা অন্যের পরিপূরক। এবং এ কথা স্মরণ করতে পারি যে, রামমোহন থেকে শুরু করে অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি বাংলার নবজাগৃতিকালের সকল সাহিত্যসাধকই একাধারে সমাজ-সংস্কারক ও সাহিত্য-সাধক। বাংলার ভাবজগতে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠার যে সাধনায় তাঁরা ব্রতী ছিলেন, সেই ভাবাদর্শ প্রচার-প্রয়াসের অবধারিত উপায় হিসাবেই তাঁরা বাংলা সাহিত্য, বিশেষত গদ্য সাহিত্যের মাধ্যম বেছে নিয়েছিলেন। সকল দেশের ইতিহাসেই এর দৃষ্টান্ত বর্তমান। বাংলার ভাবজগতের ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাসেও তার ব্যতিক্রম নেই।

॥ আট ॥

একদিন। সকালবেলা।

শ্যামাচরণ সরকার, রামরতন মুখোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এসেছেন বিদ্যাসাগরের কাছে সংস্কৃত পড়তে। এঁরা সবাই তাঁর সমবয়স্ক বন্ধু। রোজই আসেন। বিদ্যাসাগর বন্ধুদের যত্নের সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা দেন। সেদিন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এলেন। হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র। বয়স বছর পনর-ষোল। তিনি বিদ্যাসাগরের খুব স্নেহের পাত্র। হিন্দুকলেজে কিছুকাল পড়ে তিনি পড়াশুনা ছেড়ে দেন। এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে কার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন রাজকৃষ্ণ বাবু:

> কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্ত শাপেনাস্তং গমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
>
> যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু।

—বাঃ, চমৎকার। কে পড়ছে? জিজ্ঞাসা করলেন রাজকৃষ্ণ বাবু বিমোহিত চিত্তে।

--দীনবন্ধু, আমার মধ্যম ভ্রাতা, বললেন বিদ্যাসাগর। ভারী মিষ্টি গলা ওর।

—কী পড়ছে?

—কালিদাসের মেঘদূত।

—সংস্কৃত এত সুন্দর। আমার ভারী ইচ্ছে একটু সংস্কৃত শিখি।

—বেশ তো, শেখ না।

—এই বয়সে তা কী আর সম্ভব?

—বিদ্যাশিক্ষার কী আর সময় অসময় আছে, রাজকৃষ্ণ? এই দেখ না আমি বুড়োবয়সে ইংরেজি শিখছি।

—আপনার কথা আলাদা। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা, কিন্তু ঐ যে আপনাদের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ওটি তো একটি রীতিমত বিভীষিকা।
—আচ্ছা, সে ভার আমার ওপর। দেখ, আমি যখন মুগ্ধবোধ মুখস্থ করি, তখন এর এক বর্ণও বুঝতে পারিনি। আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে সংস্কৃত শিখিয়ে দেব।

সেদিন আর বেশী কথাবার্তা হলোনা; রাজকৃষ্ণ বাবু খানিকক্ষণ বাদে চলে এলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে পরের দিন আসতে অনুরোধ করলেন। যাবার সময়ে তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুকে বললেন—তোমাকে একটা সহজ উপায়ে ব্যাকরণ শিখিয়ে দেব।
সেদিন সারারাত বিদ্যাসাগরের চক্ষে ঘুম এল না। তিনি ভেবে দেখলেন, রাজকৃষ্ণ বাবুর বয়স বেশী, এবং মুগ্ধবোধ অতি দুর্বোধ্য। মুগ্ধবোধ আয়ত্ত করা সহজ কাজ নয়—এ এক ভীষণ ধৈর্যসাপেক্ষ বিষয়। কী করা যায়? বিদ্যাসাগরের প্রতিভায় একটা উপায় উদ্ভাবিত হলো। এক রাত্রেই তিনি বাংলা অক্ষরে বর্ণমালা থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত এক নতুন ব্যাকরণ রচনা করলেন। একেবারে মুগ্ধবোধের সারাংশ। পরবর্তী কালে 'উপক্রমণিকা' সৃষ্টির এই ছিল নেপথ্য ইতিহাস। 'উপক্রমণিকা' বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনী শক্তির এক আশ্চর্য নিদর্শন। ক্ষুদ্র কলেবর এই পুস্তকখানির জন্যেই সংস্কৃত শিক্ষা আজ সরল ও সুগম্য হয়েছে। পরের দিন রাজকৃষ্ণ বাবু এসে দেখেন বিদ্যাসাগর তাঁরই অপেক্ষায় আছেন।
—এসো রাজকৃষ্ণ। তোমার জন্যে এক নতুন ব্যাকরণই লিখে ফেললাম, বললেন বিদ্যাসাগর। সেই 'উপক্রমণিকা' আশ্রয় করেই শুরু হলো রাজকৃষ্ণ বাবুর সংস্কৃত শিক্ষা। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা দেবার প্রণালীর গুণে রাজকৃষ্ণ বাবুর সংস্কৃত শিক্ষা দ্রুত এগিয়ে চললো, অবশ্য সেই সঙ্গে ছিল শিক্ষার্থীর সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়। দু মাসের মধ্যেই মুগ্ধবোধ শেষ করলেন তিনি। এ কথা যেই শুনলো সেই-ই অবাক হয়ে গেল। ছাত্র ও শিক্ষকের এই অদ্ভুত কৃতকার্যতায় বিস্মিত হয়ে সবাই বলতে লাগল—এও কী সম্ভব!
কিন্তু যা অসম্ভব বিদ্যাসাগরের প্রতিভা তাই সম্ভব করে গেছে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে। তখন সংস্কৃত কলেজে দু'টো পরীক্ষা ছিল—জুনিয়ার ও সিনিয়ার। বিদ্যাসাগর রাজকৃষ্ণ বাবুকে জুনিয়ার পরীক্ষা দিতে বললেন।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের এক জীবনচরিতকার লিখেছেন: "রাজকৃষ্ণবাবুও তাঁহার উপদেশমত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সহসা একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিলেন, এক অসহায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জুনিয়ার বৃত্তি পাইয়া সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন। পরীক্ষায় রাজকৃষ্ণ বাবুও উত্তীর্ণ হইলে, পরবৎসর হইতে ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণ বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার লেখাপড়া বন্ধ হইয়া যাইবে। সদয় হৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে এ চিন্তা অসহনীয় হইল, তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুকে জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা হইতে অগত্যা বিরত হইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, 'তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাওয়ার ফলে যখন এক ব্রাহ্মণের অন্ন মারা যায়, তখন আর তোমার জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়া হইবে না'।"

বলা বাহুল্য, রাজকৃষ্ণবাবু পরদুঃখকাতর বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। এমনি সহৃদয়তার দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগরের জীবনে অজস্র। দরিদ্রের ব্যথা, দরিদ্রের বেদনা তাঁকে যেমন অস্থির করে তুললো, এমন কারো জীবনে দেখা যায় না। এই মহত্ত্বের জন্যেই বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর। মাইকেল বৃথা লেখেন নি: "করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে, দীন যে, দীনের বন্ধু!"

বিদ্যাসাগর তখন রাজকৃষ্ণ বাবুকে সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে বললেন।

—আমি কি পারব? বললেন রাজকৃষ্ণবাবু।

—কেন পারবে না? উৎসাহ দিয়ে বললেন বিদ্যাসাগর।—তবে একটু বেশী পরিশ্রম করতে হবে।

তারপরের কাহিনী সুপরিচিত। আড়াই বছরে রাজকৃষ্ণবাবু এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি পেয়েছিলেন। এও ছিল অসাধ্য সাধন। রাজকৃষ্ণবাবুর সংস্কৃতশিক্ষা বিদ্যাসাগরের শিক্ষকতার এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদ্যাসাগরের প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল।

তাঁর ওপর মার্শাল সাহেবের অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি। বিদ্যাসাগরের কোন অনুরোধই তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন না। রসময় দত্ত তখন সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক। এই সময়ে ঐ কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাকরণ

সঙ্গে সরকারী উদ্যম, অর্থ ও পৃষ্ঠপোষকতা সংযুক্ত হওয়ায় বিদ্যাসাগর অসামান্য শ্রমসহিষ্ণুতা, মনোবল ও সাফল্যলাভের দুর্বার গতিবেগ নিয়ে বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের কাজে অবতীর্ণ হলেন। ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, ব্যক্তিগত স্বার্থের কোন আকর্ষণ নেই।

একশত একটি মডেল স্কুল স্থাপিত হলো। এইসব মডেল স্কুলের উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির জন্য বিদ্যাসাগর হিন্দু কলেজের বাংলা স্কুল 'পাঠশালা'কে সংস্কৃত কলেজের অন্তর্গত নর্ম্যাল স্কুলে পরিণত করেন। ঠিক হলো সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্ররাই এইসব স্কুলে শিক্ষকতা করবে। শিক্ষকদের নির্বাচন ও নিয়োগের ভার অর্পিত হলো মার্শাল সাহেব ও বিদ্যাসাগরের উপর। এর ফলে একদিকে বিদ্যাসাগরের কাজের গুরুত্ব ও পরিশ্রমের ভার যেমন বৃদ্ধি পেল, অন্য দিকে তেমনি সংস্কৃত কলেজের প্রবীন অধ্যাপকদের ঈর্ষার পাত্র অপ্রিয় হবার নানা কারণও উপস্থিত হলো। অদ্ভুতকর্মা বিদ্যাসাগর নিরপেক্ষভাবে কাজ করে চললেন—কারো নিন্দায় তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। আত্মপর নিরপেক্ষ হয়ে কেবলমাত্র যোগ্য লোককেই নিয়োগ করতে লাগলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবন-চরিতকার সত্যই মন্তব্য করেছেন: "সেই বীরপ্রকৃতি, ন্যায়পরায়ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ঈর্ষ্যাপ্রকাশে ও নিন্দাপ্রচারে ভয় করিবেন কেন? লোকনিন্দার ভয়ে কর্তব্যের অনুষ্ঠানে বিরত থাকা, কিংবা অন্যায় জানিয়াও তাহার প্রশ্রয় দেওয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।"

সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিয়োগের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের পদের বেতন ছিল নব্বই টাকা। শিক্ষা সমিতির অধ্যক্ষ ডাঃ ময়েট ঐ পদে একজন যোগ্য লোক নিযুক্ত করবার জন্যে মার্শাল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করেন। দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে বিদ্যাসাগরকে উক্ত পদে নিযুক্ত করা উচিত। তাঁর কাছে প্রস্তাব করা হলো। তিনি রাজী হলেন না। মার্শাল সাহেব অনেক চেষ্টা করেও বিদ্যাসাগরকে ঐ পদ গ্রহণে রাজী করাতে পারলেন না। কিন্তু আর যোগ্য লোক কোথায়?—এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বললেন, যোগ্য লোক আছে। সর্বশাস্ত্রবিশারদ তারানাথ তর্কবাচস্পতির নাম করলেন তিনি। বাচস্পতি মহাশয়কে যেমন করে হোক

একটা চাকরী ক'রে দেবেন বলে তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন। তিনি দেখলেন এই সুযোগ; বললেন—ইনি অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ। এ পদ তাঁরই প্রাপ্য, আপনি তাঁকেই ঐ পদে নিযুক্ত করুন।

কথা হলো শনিবার দিন। অধ্যাপকের দরকার সোমবার থেকেই। বাচস্পতি মহাশয়ও তখন কলকাতা থেকে ষাট মাইল দূরে কালনায়। তাঁকে খবর দেওয়া দরকার, চিঠি লিখবার সময় নেই সেই রাত্রেই তিনি নিজে কালনা রওনা হলেন। সারা রাত হেঁটে পরের দিন দুপুরবেলায় কালনায় উপস্থিত হলেন। বিদ্যাসাগর পায়ে হেঁটে এসেছেন তাঁকে এই খবর দেবার জন্যে—এই জেনে বাচস্পতি মহাশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পেলেন না। তিনি শুধু বিহ্বল চিত্তে সেই শীর্ণদেহ ধূলিধূসরিত-চরণ ব্রাহ্মণের প্রতি তাকিয়ে রইলেন। বিদ্যাসাগর বাচস্পতি মহাশয়ের আবেদনপত্র নিয়ে সেইদিনই পায়ে হেঁটে কলকাতায় যাত্রা করলেন। এই ঘটনাটি নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগরের মনের শক্তি, সাহস ও উদারতার পরিচায়ক এবং তাঁর স্বার্থত্যাগের ও প্রতিশ্রুতি পালনের সজীব সংকেত। এমন ঘটনা তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে আরো অনেক আছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবন-চরিতকার লিখেছেন: "এরূপ লোকবিরল পরোপকার সাধন, এই অধঃপতিত বঙ্গদেশে কেবল মহামনা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষেই সম্ভব। প্রায় দ্বিগুণ অর্থোপার্জনের সুযোগ পাইয়া তাহা গ্রহণ না করা, এবং সেই কর্ম অন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিবার প্রস্তাব করা, তৎপরে দিবারাত্রি পথ চলিয়া ত্রিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ব্যক্তিকে যথাসময়ে সংবাদ দেওয়া, সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার।" কিন্তু অসাধারণ-চরিত্রের মানুষ ছিলেন বলেই বিদ্যাসাগর সেদিন এই ব্যাপারে মনের এমন উচ্চতা ও হৃদয়ের প্রশস্ততার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন।

শম্ভুচন্দ্রের বিয়ে। বীরসিংহ থেকে একদিন চিঠি এল মায়ের। মা লিখেছেন—শম্ভুর বিয়ে, তোমার আসা চাই। মায়ের আদেশ। বিদ্যাসাগর দেশে যাবেন ঠিক করলেন। মার্শাল সাহেবের কাছে ছুটি চাইলেন। সাহেব ছুটি দিতে রাজী হলেন না—কলেজে ভয়ানক কাজ, বিদ্যাসাগর না থাকলে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য। বিদ্যাসাগর ক্ষুণ্ন মনে বাসায় ফিরলেন। বিয়ে উপলক্ষে বাসার সবাই চলে গেছে। ভাইয়ের বিয়ে, মা যেতে বলেছেন, তিনি ছুটি

পেলেন না। মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারলেন না ভেবে মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগরের সে রাত্রে ঘুমই হলো না। উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে উঠলেন। সকালেই মার্শাল সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, আমার মা আমাকে বাড়ি যেতে বলেছেন, আমাকে বাড়ি যেতেই হবে।

—কিন্তু পণ্ডিত, আমি কেমন করে ছুটি দিই আপনাকে? বলেন মার্শাল সাহেব।

—ছুটি না দিতে পারেন, আমি চাকরীতে ইস্তফা দিলাম। মঞ্জুর করুন, আমি বাড়ি যাই, বললেন দৃঢ়তার সঙ্গে বিদ্যাসাগর।

মার্শাল সাহেব পণ্ডিতের এমন মূর্তি দেখেন নি। মুগ্ধ চিত্তে তিনি বললেন—আপনাকে ইস্তফা দিতে হবে না, ছুটি দিলাম, বাড়ি যান।

বিদ্যাসাগরের বুক থেকে দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে গেল। সেই রাত্রেই খাওয়া-দাওয়ার পর ভৃত্য শ্রীরামকে নিয়ে তিনি বীরসিংহ যাত্রা করলেন। তখন প্রবল বর্ষাকাল। পথ দুর্গম। কিছু দূর গিয়ে শ্রীরাম আর চলতে পারল না। বিদ্যাসাগর তাকে ফিরে যেতে বললেন। পরের দিনই বিয়ে। যেমন করে হোক তাঁকে বাড়ি পৌঁছতেই হবে। কিন্তু উত্তাল তরঙ্গ-সমাকুল দামোদর নদ প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াল। বর্ষার দামোদর। ঢল নেমেছে। প্রবল স্রোত। পারঘাটে একখানা নৌকাও নেই। তারপরের কাহিনী রোমাঞ্চকর। অবিশ্বাস্য। বর্ষার সেই ভরা দামোদরের বুকে ঝাঁপ দিলেন বিদ্যাসাগর। সেই দুর্জয় দামোদর তিনি সাঁতরে পার হলেন। পাতুলে মায়ের মাতুলালয়ে বিকেলটা কাটিয়ে তিনি আবার যাত্রা শুরু করলেন। দারকেশ্বর নদও আগের মতন সাঁতরে পার হলেন। মাঠেই সন্ধ্যা নামল। পথে দস্যুভয়। কিন্তু অকুতোভয় বিদ্যাসাগর। মায়ের চরণ স্মরণ করে তিনি একাকী সেই নির্জন প্রান্তর অতিক্রম করলেন। গভীর রাত্রে সিক্ত বস্ত্রে ও ক্লান্ত দেহে তিনি গৃহে পৌঁছলেন। এই অসামান্য ঘটনাটি পুরাণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের। মাতৃভক্তির এমন অশ্রুতপূর্ব কাহিনী পুরাণেই আমরা শুনে থাকি, বিদ্যাসাগরের জীবনে আমরা পুরাণকে প্রত্যক্ষ করলাম। আজকের দিনে এ-ঘটনার মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে হয়ত অনেকে বিদ্যাসাগরকে উন্মাদ মনে করবেন এবং মাতৃভক্তির এই আতিশয্যের কোন মূল্যই হয়ত তাঁরা দেবেন না। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে

যে, বিদ্যাসাগর ছিলেন বাংলা দেশের দিশী মানুষ। তাই তিনি অকৃত্রিম ভক্তির এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। এই একটিমাত্র মানুষ যাঁর পায়ের তলায় বসে বাঙালি চিরদিন পিতৃমাতৃভক্তি শিখতে পারে।

পাঁচ বছর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড-পণ্ডিতের চাকরী করলেন বিদ্যাসাগর।

এমন সময়ে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হলো।

সম্পাদক রসময় দত্তের ইচ্ছা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঐ পদে নিযুক্ত হন। তিনি বিদ্যাসাগরকে তাঁর ছাত্রাবস্থা থেকেই জানেন এবং তাঁর যোগ্যতার ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু ঐ পদের বেতন মাত্র পঞ্চাশ টাকা এবং বিদ্যাসাগর ঐ বেতনে স্বীকৃত হবেন কি না, সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল। অবশেষে রসময় দত্ত শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক ডক্টর এফ. জে. মোয়াটকে একখানি পত্র লিখলেন এবং ঐ পত্রে তিনি বিদ্যাসাগরকে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। বেতন বৃদ্ধির কথাও তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি এবং চিঠির সঙ্গেই তিনি বিদ্যাসাগরের দরখাস্তখানিও ডাঃ মোয়াটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ডাঃ মোয়াট তখন ঐ পদে একজন সুযোগ্য লোকের কথাই চিন্তা করছিলেন। রসময় বাবুর চিঠি পেয়ে তিনি এ বিষয়ে পরামর্শ করতে গেলেন কাপ্তেন মার্শালের সঙ্গে। মার্শাল বললেন, ইংরেজিও জানেন, সংস্কৃতেও অভিজ্ঞ এমন পণ্ডিত তো একজনই আছেন।

—কে তিনি? জিজ্ঞাসা করলেন মোয়াট।

—তিনি বিদ্যাসাগর।

—ও, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর?

—হ্যাঁ, আমি তাঁরই কথা বলছি।

ঈশ্বরচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ও হিতৈষী মার্শাল সাহেবের সুপারিশ বৃথা হলো না।

দু'দিক থেকে দুজনের সুপারিশের ফলে ডাঃ মোয়াট বিদ্যাসাগরকেই সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদের জন্যে ঠিক করলেন। কিন্তু বেতন বৃদ্ধির কোন আশ্বাস দিতে পারলেন না। বিদ্যাসাগর এই চাকরী গ্রহণ করলেন

দু'টি সর্তে। সম্পাদক রসময় দত্তের প্রকৃতি তিনি বিলক্ষণ জানতেন। সেইজন্যে তিনি মার্শালকে বললেন—"যদি সেখানে কর্মকাজে মতান্তর হয়, কিংবা কোন প্রকার কথান্তর ঘটে, তাহলে আমি অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়ে চাকরী করতে পারব না ; সেরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে আমাকে কর্মত্যাগ করতে হবে। আমি আমার জন্যে ভাবি না। আমি কর্মত্যাগ করতে বাধ্য হলে, পাছে আমার পিতার কোন প্রকার অসুবিধা হয়, এই ভাবনায় আমি একটু ইতস্ততঃ করছি। আমার মধ্যম সহোদর দীনবন্ধুও অতি পণ্ডিত লোক ; তাকে আপনি যদি সেরেস্তাদারের কাজে নিযুক্ত করেন, তাহলে আমি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে পারি।"

মার্শাল সাহেব তাতেই সম্মত হলেন।

বিদ্যাসাগর পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হলেন।

এইখানে আমরা দীনবন্ধু-সম্পর্কিত একটা ঘটনার উল্লেখ করব।

ছোট্ট ঘটনা কিন্তু এর ভেতর দিয়েই বিদ্যাসাগরের জীবনের এক অসাধারণ মহত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়েছে। স্বার্থ ও পরার্থের বিরোধ যেখানে প্রবল, সেখানে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মতন সাধু মহাত্মারা কি ভাবে অকুণ্ঠিত চিত্তে পরার্থেরই পক্ষপাতী হন, তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই ঘটনাটি। রবার্ট কস্ট্ নামে একজন সিভিলিয়ান বিদ্যাসাগরের কাছে সংস্কৃত পড়তেন। বিদ্যাসাগর তাঁর নামে একবার একটা সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেছিলেন। সাহেবটি অত্যন্ত খুশি। তিনি বিদ্যাসাগরকে দুশো টাকা পুরস্কার দিতে উদ্যত হন। নির্লোভ বিদ্যাসাগর সে টাকা নিজে নিলেন না। ঐ টাকা দিয়ে সংস্কৃত কলেজে চার বছরের জন্যে পঞ্চাশ টাকার একটা স্কলারসিপ করিয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন। সাহেব বিদ্যাসাগরের পরামর্শ মত কাজ করলেন। ঠিক হলো, যে ছাত্র রচনায় সর্বোৎকৃষ্ট হবে সে পঞ্চাশ টাকার ঐ স্কলারসিপ পাবে। দ্বিতীয় বছরে ঐ স্কলারসিপের জন্যে দু'জন ছাত্র প্রার্থী হলেন। একজন বিদ্যাসাগরের মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও অন্যজন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের এক জীবন-চরিতকার লিখেছেন : "রচনা দুজনেরই সমান সুন্দর হইয়াছিল। শ্রীশচন্দ্রের ব্যাকরণ কিছু ভুল ছিল, দীনবন্ধুর তাহাও ছিল

না। দীনবন্ধুর দুর্ভাগ্য যে পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ ও পুরস্কার দানের ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। দীনবন্ধু সর্বপ্রকারে সর্বোৎকৃষ্ট হইলেও পুরস্কার পাইলেন না। প্রবল কারণ এই যে, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহোদর ; তিনি পুরস্কার পাইলে পাছে লোকে বলে দুইজনেই সমান হইল, তবে শ্রীশচন্দ্র না পাইয়া দীনবন্ধু কেন পাইবে ? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচারে শ্রীশচন্দ্রই পুরস্কারের উপযুক্ত বলিয়া নির্ধারিত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, দীনবন্ধুকে পুরস্কার দিলে, পাছে অজ্ঞাতসারেও স্বার্থপরতা দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করে, পাছে স্নেহানুরোধের অধীন হইয়া তিনি দীনবন্ধুর প্রতি অন্যায় অনুগ্রহ দেখান, ইহাই তাঁহার বিশেষ বিবেচনার বিষয় হইয়াছিল।"

এই বিবেচনা, এই স্বার্থশূন্যতার জন্যেই বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদার, তখন মার্শাল সাহেব সংস্কৃত কলেজের 'জুনিয়র' ও 'সিনিয়র' পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁর ভরসা বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরকেই সংস্কৃত প্রশ্ন প্রস্তুত করে দিয়ে মার্শালকে সাহায্য করতে হতো। ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি সকল প্রশ্ন তিনি নিজেই লিখে দিতেন। বিদ্যাসাগরের এই অসাধারণ কর্মকুশলতার কথা আমরা যখনই চিন্তা করি, তখনই ভাবি, একটা মানুষ এত কাজ কি করে করতেন ? বাঙালির জন্যে তিনি এই বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। এই গুণেই সামান্য ঈশ্বরচন্দ্র অসামান্য বিদ্যাসাগর হতে পেরেছিলেন। সত্যই, বিদ্যাসাগর যেন ঘোড়ার মতন এক মুহূর্তও বিশ্রাম না করে কাজ করতেন। কাজ আর কাজ—দিবারাত্র সহস্র রকম কাজের ভেতর দিয়ে জীবনের রাজপথে অগ্রসর হতেন বীরপুরুষ বিদ্যাসাগর। বিশ্রামে ভ্রূক্ষেপ নেই, অবসর বিনোদনের জন্যে বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই, তপস্বীর মতন একনিষ্ঠ মন নিয়ে বিদ্যাসাগর কাজ করতেন। সেই কঠোর কঙ্কাল-বিশিষ্ট শীর্ণ দেহে কাজ করবার এমন অফুরন্ত শক্তি, এমন নিরলস উদ্যম ভগবান তাঁকে অকৃপণ হস্তেই দিয়েছিলেন। শক্তিমান বিদ্যাসাগরের পক্ষে তাই ইহজগতে অসাধ্য কিছুই ছিল না।

আর্ত ও পীড়িতের সেবা বিদ্যাসাগরের স্বভাবের অন্যতম ধর্ম। কোথাও কারো অসুখ করেছে শুনলে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। ফোর্ট

উইলিয়ম কলেজের চাকরী-জীবনেও তিনি এই ধর্ম পালনে বিরত হন নি। একবার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশের বিসূচিকা পীড়া হয়। খবর পেলেন বিদ্যাসাগর। তখনি তিনি ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে করে এলেন তর্কবাগীশের বাসায়। দুর্গাচরণ তাঁর চিকিৎসা করলেন আর বিদ্যাসাগর নিজের হাতে পরিষ্কার করলেন রোগীর মলমূত্র—ওষুধের দাম দিলেন। এইরকম অজস্র ঘটনা তাঁর জীবনে। কোথাও কোন অনাথ দুঃস্থ লোক পীড়িত হলে, বিদ্যাসাগর নিজে গিয়ে তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং তাকে বাঁচাবার জন্যে নিজের খরচে ওষুধ ও পথ্য যোগাতেন। এমন নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ দয়ালু দাতা ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে বিরল। পৃথিবীতেও।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরী করবার সময় বিদ্যাসাগর প্রায়ই বাড়ি যেতেন। বাড়ি গিয়ে প্রতিবেশীর তত্ত্ব নেওয়া, আর্তপীড়িতের শুশ্রূষা করা—এই ছিল তাঁর কাজ। কলকাতা থেকে তিনি হেঁটেই বাড়ি যেতেন, হেঁটেই কলকাতায় আসতেন। গরমের দিনে পথে জলতৃষ্ণা পেলে ডাব খেতেন। যদি কোন সঙ্গী থাকত এবং তাদের সঙ্গে যদি ভারী মোট-বোঝা থাকতো, বিদ্যাসাগর অম্লান বদনে সেই মোট-বোঝা কতক নিজের মাথায় নিয়ে হাঁটতেন। এ কাজ তিনি তখনও করেছেন, যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। এ এক আশ্চর্য চরিত্র। বাড়ি গেলেই বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে ভাইদের ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে নিমন্ত্রণ খেতে যেতেন। পথে কৌতুক করবার জন্যে কোন নালা নর্দামা দেখলেই তিনি লাফিয়ে পার হতেন এবং দীনবন্ধুকে বলতেন পার হতে। দীনবন্ধু বাহাদুরি দেখাবার জন্যে কখন কখন লাফাতে গিয়ে পড়ে যেতেন। অমনি জ্যেষ্ঠের তুমুল হাসি। এমনি কৌতুকপ্রিয়তাও বিদ্যাসাগরের চরিত্রের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। সেবায়, মমতায় যেমন, কৌতুক ও পরিহাসেও তেমনি বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ—একেবারে বাংলাদেশের খাঁটি দেশী মানুষ।

আর একটি ঘটনার কথা বলি।

বীরসিংহ গ্রাম থেকে বিদ্যাসাগর হেঁটে আসছিলেন।

মাঠের মাঝে দেখলেন, একটা জরাজীর্ণ বৃদ্ধ কৃষক মাথায় মোট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করে জানলেন, লোকটির বাড়ি সেখান থেকে

দু'তিন ক্রোশ দূরে। তার জোয়ান ছেলে তার মাথায় এই বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়েছে। চলচ্ছক্তিহীন সেই বৃদ্ধের অবস্থা দেখে আর তার যুবক পুত্রের ব্যবহারের কথা শুনে, চোখের জলে বিদ্যাসাগরের বুক ভেসে গেল। তিনি তখনি বৃদ্ধের মাথার বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিলেন এবং তাকে সঙ্গে করে তার বাড়ি পর্যন্ত গেলেন। তিনি সেই মোট বৃদ্ধের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে, আবার হেঁটে কলকাতায় এলেন।

মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের এমন শক্তি সমবায় বাংলা দেশে আজো বিরল।

এমন অনাত্মপরতা আজো দুর্লভ। এমন সমবেদনা সত্যই অতুলনীয়।

বল, বুদ্ধি, দয়া—ত্রিবেণীর এই ত্রিধারা বিদ্যাসাগরের জীবনের তটপ্রান্ত দিয়ে আজীবন বয়ে গেছে। তাই সে-জীবন ছিল হৃদয়বত্তার অপরিমেয় আলোকে পূর্ণ। তাই না তিনি সহস্রের জীবনে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করে গেছেন।

॥ নয় ॥

বিদ্যাসাগর এখন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করলেন তাঁরই মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন। ইনিও সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র।

সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন ব্যাপারেই বিদ্যাসাগরের অসামান্য ও প্রখর কাল-চেতনার এবং সমাজ-বিপ্লবী মননের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সে আরো দুবছর পরে। এখন সহকারী সম্পাদকের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু সম্ভব, বিদ্যাসাগর ততটুকু অগ্রসর হলেন। নামেই সংস্কৃত কলেজ, আসলে পাকা দালানে টোল ছাড়া আর কিছুই নয়। হাতের লেখায় পুঁথিগুলি যেমন জীর্ণ, তেমনি শিক্ষায়তনের সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা। অধ্যাপকদের দিবানিদ্রা বাঁধা। পড়াবার সময় তাঁদের বেশীর ভাগই চেয়ারে বসে ঘুমোতেন, আর ছেলেরা তাল পাখা দিয়ে বাতাস করে তাঁদের ঘুমের তৃপ্তি বৃদ্ধি করত। তারপর নিদ্রাসুখ সম্ভোগের পর বিকেলে মুগ্ধবোধ নিয়ে একটু নাড়াচাড়া, সাহিত্য অলঙ্কার নিয়ে সামান্য আলোচনা। কলেজের সময়ের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। কী ছাত্র, কী অধ্যাপক, যাঁর যখন খুশি আসতেন, যখন খুশি চলে যেতেন। এ সবই বিদ্যাসাগর তাঁর ছাত্র-জীবনেই লক্ষ্য করেছিলেন। এখন কর্তৃত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, তিনি কলেজের সংস্কার সাধনে অগ্রণী হলেন। অধ্যাপকেরা দেরী করে আসেন। বিদ্যাসাগর মুখে কিছু বলতে পারেন না, কারণ তাঁদের অনেকেই তাঁর শিক্ষক। অনেক ভেবেচিন্তে বিদ্যাসাগর একটা উপায় ঠিক করলেন। নিজেই সকলের আগে এসে কলেজের ফটকের সামনে আপন মনে পায়চারী করতেন। অধ্যাপকদের চৈতন্য হলো। এরপর থেকে তাঁদের উপস্থিতিতে আর বিলম্ব হতো না। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার উল্লেখ করেছেন:

"বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের কার্যভার গ্রহণ করিয়া সর্বাগ্রে অধ্যাপক মহাশয়দের নিদ্রা নিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রগণের যাওয়া-আসার সময় নির্দেশ করিয়া দিলেন। মোট কথা, সংস্কৃত কলেজে তাঁহার সহকারী সম্পাদকরূপে প্রবিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে তথাকার স্বেচ্ছাচারিতার স্থানে বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা দেখা গিয়াছিল।"

বিদ্যাসাগর কিন্তু এইখানেই থামলেন না।

পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যাপারেও তিনি এক নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন। ফলে, অন্যান্য বছর অপেক্ষা সে বছর পরীক্ষার ফল ভালই হলো। ডাঃ মোয়াট ও সম্পাদক রসময় দত্ত দুজনেই খুশি। আগেকার বিশৃঙ্খলা, বে-বন্দোবস্ত নেই, নিয়মের রাজত্বে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে কলেজের কাজ চলছে। কলেজের চেহারাই যেন বদলে গেছে এই অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই। পাঠ্যপুস্তকে কত অশ্লীল কবিতা ছিল। সংস্কৃতে রচনা বলেই যে আদি রসাত্মক কবিতাগুলো পাঠ্যতালিকায় নির্বিচারে স্থান পাবে, বিদ্যাসাগর তা মনে করলেন না। তিনি সেগুলো উঠিয়ে দিলেন। দু'একজন প্রবীণ অধ্যাপক আপত্তি তুলেছিলেন, কিন্তু তাঁর যুক্তির কাছে সে আপত্তি টেকে নি। ব্যাকরণে ছাত্রদের অনাবশ্যক দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হতো আর ব্যাকরণ শিক্ষার মধ্যে জটিলতাও ছিল অনেক। বিদ্যাসাগর এ ক্ষেত্রেও প্রবর্তন করলেন এক নতুন পদ্ধতির ; ব্যাকরণের পাঠ সহজ, সুগম ও সংক্ষিপ্ত হলো। সাহিত্য শ্রেণীতে অঙ্ক শিক্ষার ব্যবস্থাও বাদ গেল না। এইভাবে দিন দিন নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে সংস্কৃত কলেজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর হলেন বিদ্যাসাগর। সম্পূর্ণভাবে এর চেহারা বদলে দেবার জন্যে কত পরিকল্পনার কথাই চিন্তা করেন তিনি। কত সময়ে তিনি কল্পনা নেত্রে দেখতে পান—সংস্কৃত কলেজ থেকেই এমন ছাত্র গড়ে উঠবে, যারা হবে সকল বিদ্যায় পারদর্শী অথচ কুসংস্কারমুক্ত। বিশ্বাসের চেয়ে যাদের কাছে বিচার হবে বড়ো, উক্তির চেয়ে যুক্তি। এই সংস্কারমুক্ত ছাত্ররাই একদিন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে ও জ্ঞানের আলো বিস্তার করবে। তারাই হবে নতুন দেশ ও নতুন জীবনের স্রষ্টিকর্তা। কল্পনা করেন—এই সংস্কৃত কলেজের পাশ-করা ছাত্ররাই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মতন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবে। কল্পনা করেন—জীর্ণ পুঁথি থাকবে না, ছেলেরা ছাপার অক্ষরে সংস্কৃত বই পড়বে। কল্পনা করেন—সংস্কৃত

কলেজ কলেজই হবে, পাকা দালানের মধ্যে টোল হয়ে থাকবে না। হবে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-নিকেতন।

সংস্কৃত কলেজের প্রাথমিক শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বিদ্যাসাগর যে চিন্তাশীলতা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা সংস্কৃত কলেজের নিয়মাবলীর মধ্যে আজো বর্তমান। কিন্তু যে উদ্যম আর উৎসাহ নিয়ে তিনি নূতন নীতি চালাতে অগ্রসর হয়েছিলেন তাতে বাধা এল অপ্রত্যাশিত ভাবে। বিদ্যাসাগর এক উন্নত প্রণালীর পঠন ব্যবস্থার রিপোর্ট প্রস্তুত করলেন। কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত সেই রিপোর্টের প্রধান প্রস্তাবগুলো শিক্ষা-পরিষদে পেশ করলেন। পরিষদ প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করলেন। সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য বিষয় ও রুটিন অনেকটা পাল্টে গেল। সংস্কারের বহর দেখে রসময় দত্ত শঙ্কিত। ক্ষমতার জোরে তিনি বিদ্যাসাগরের কতকগুলো প্রস্তাব একেবারে বাতিল করে দিলেন।

তাঁর প্রস্তাব বাতিল হবে!—এ চিন্তাই বিদ্যাসাগরের কাছে অসহ্য।

কিন্তু তাঁর ক্ষমতা যে সীমাবদ্ধ। তিনি সহকারী সম্পাদক মাত্র। রসময় বাবু সম্পাদক, তাঁর ক্ষমতা অনেক বেশী। উপায়? এভাবে তো কাজ করা চলবে না। তখন স্বাধীনচেতা মানুষের পক্ষে যা করা উচিত, বিদ্যাসাগর তাই করলেন।

কাজে ইস্তফা দিলেন।

বন্ধুদের সহস্র অনুরোধ তাঁকে এর থেকে নিবৃত্ত করতে পারল না। আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, স্বজন, পরিজন সকলেই অবাক। প্রত্যেকের মুখে উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন;

—সংসার চলবে কি করে?

—আলু পটল বেচে খাব, মুদীর দোকান করব, তবুও যে পদে সম্মান নেই, সে পদ নেব না—অম্লানে বদনে বললেন স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের জীবনে বহু ঘটনার মধ্যে এই চাকরী ছাড়ার ঘটনাটি তাঁর চরিত্রের যে দিকটিকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে—দিগ্বিজয়ী বীরের মত এই যে অচল অটল ভাব—এর ভেতর দিয়েই ফুটে উঠেছে সেই নির্লোভ দরিদ্র ব্রাহ্মণের দম্ভ। এই দম্ভ প্রকাশ করবার যোগ্যতা তাঁরই ছিল।

ঘটনাটা ঘটলো ঠিক এক বছরের মাথায়।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক তখনকার তিনটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের অশিষ্ট আচরণ; দ্বিতীয়টি সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নিয়োগ এবং তৃতীয়টি হলো পারিবারিক—তাঁর বারো বছরের ছোট ভাই হরচন্দ্রের মৃত্যু। কার সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটু মনোবাদ ঘটেছিল আগে থেকেই। একদিন কী একটা কাজে বিদ্যাসাগর এলেন কার সাহেবের কাছে। বিদ্যাসাগর ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখেন সাহেব টেবিলের ওপর পা তুলে বসে। বিদ্যাসাগর আরো বিস্মিত হলেন যখন তিনি দেখলেন যে, সাহেব সেই পা তোলা অবস্থায়ই তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। তিনি নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। সুযোগ এল কিছুদিন বাদেই। কার সাহেব এলেন সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে। তালতলার চটি-পরা পা-দুখানি টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে বিদ্যাসাগর নিঃশঙ্ক-চিত্তে কার সাহেবের সঙ্গে কথা বললেন; এমন কি, তাঁকে বসতে পর্যন্ত বললেন না। অশিষ্ট ও উদ্ধতকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতেন বিদ্যাসাগর এই ভাবেই। ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত কার সাহেব ডাঃ মোয়াটের কাছে ব্যাপারটা জানালেন। বিদ্যাসাগরের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হলো। কৈফিয়তে বিদ্যাসাগর তীব্র ভাষায় কার সাহেবের অশিষ্টাচারের কথাই উল্লেখ করলেন, অন্য কিছু লিখলেন না। বিদ্যাসাগরের এই আত্মসম্মান-বোধ ও তেজস্বিতায় মোয়াট সাহেব সন্তুষ্ট হলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটিতে সাগর-চরিত্রের আর একটি দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ খালি হলো। মাইনে নব্বই টাকা। রসময় দত্ত বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করলেন ঐ পদটি নেবার জন্যে। কিন্তু বিদ্যাসাগর দেখলেন ঐ পদ গ্রহণ করলে তাঁর হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাবে এবং তিনি কলেজের উন্নতিবিধানেও আর আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ পাবেন না। কাজেই তিনি সম্পাদকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং সেইসঙ্গে একজন প্রকৃত যোগ্য লোক যাতে ঐ পদে নিযুক্ত হন, তার চেষ্টা করতে লাগলেন। মনে পড়লো মদনমোহনের কথা। তিনি তাঁর বাল্য-সহাধ্যায়ী। এখন তিনি তর্কালঙ্কার উপাধি নিয়ে কৃষ্ণনগর কলেজের প্রধান পণ্ডিত। সাহিত্যশাস্ত্রে মদনমোহনের ব্যুৎপত্তির কথা বিদ্যাসাগরের জানা

ছিল। বিদ্যাসাগর উদ্যোগী হয়ে তর্কালঙ্কারকেই এই পদে নিযুক্ত করলেন। এমনি গুণের পক্ষপাতী তিনি চিরকাল ছিলেন।

এই সময়কার আর একটি ঘটনা উল্লেখ করব।

রামগোপাল ঘোষ ও ভূ-কৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষালের সঙ্গে বিদ্যাসাগর একবার বর্ধমান বেড়াতে গেলেন। তাঁরা তিন জনেই এক বাসায় ছিলেন। মহাতপচন্দ্র বাহাদুর তখন বর্ধমানের মহারাজা। বিদ্যাসাগরের নাম তিনি শুনেছেন—অত বড় পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক বিদ্যাসাগর এসেছেন তাঁর দেশে। মহারাজার আদেশে রাজবাটী থেকে প্রচুর সিদা পাঠান হলো বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর সিদা ফেরৎ দিলেন। অন্য এক বন্ধুর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলেন। মহারাজা এই খবর পেলেন। সেই নির্লোভ ব্রাহ্মণকে তিনি একবার দেখতে চাইলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার উদ্দেশ্যে তাঁকে রাজবাড়িতে আসবার জন্যে মহারাজা তাঁর দেওয়ানকে পাঠালেন। বিদ্যাসাগর প্রথমে সম্মত হলেন না ; কিন্তু নানা সাধ্য-সাধনায় শেষে অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। এলেন তিনি তাঁর চিরপরিচিত পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে—সেই চটি ও চাদর। মহাতপচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বহু সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করলেন। যাবার সময়ে মহারাজ তাঁকে উপহার-স্বরূপ পাঁচশো টাকা ও একজোড়া শাল দিলেন। বিদ্যাসাগর সে দান গ্রহণ করলেন না। বললেন—আমি কারো দান নিই নে। কলেজের মাইনেতেই আমার স্বচ্ছন্দে চলে।

মহারাজা বিস্মিত। বিদ্যাসাগরের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা আরো বাড়লো। সেইদিন থেকে বর্ধমানের মহারাজা তাঁর একজন অনুরাগী হয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগর যখনই বর্ধমানে যেতেন, মহারাজ তাঁর যোগ্য অভ্যর্থনা করতে ত্রুটি করতেন না। এই বর্ধমান মহারাজ বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে বিদ্যা-সাগরের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং আইনের জন্যে যে আবেদন করা হয়, তাতে অন্যান্যের সঙ্গে তাঁরও স্বাক্ষর ছিল।

সংস্কৃত কলেজের কাজ ছেড়ে দিলেন বিদ্যাসাগর।

স্বাধীনচিত্ততার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাঙালি সেই প্রথম দেখল। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক চরিতকার লিখেছেন:

"কাহারও তাঁবেদারি করা, কাহারও মুখাপেক্ষা করা, কাহারও কৃপাদৃষ্টি লাভাকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করা, তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি মুক্তভাবে আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য, এই স্বর্গীয় উচ্চ আদর্শ আমাদিগকে দেখাইবার জন্য, আমাদের মধ্যে আসিয়াছিলেন। কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, একদিনের জন্য চিন্তিত বা বিষণ্ণ হন নাই। সর্বদাই প্রসন্নভাবে কালাতিপাত করিতেন। বাসায় যেসকল অনাথ ছাত্র আহার করিত, তাহাদের কাহাকেও বিদায় করিয়া দেন নাই। বাটীতে গিয়া সকলের সহিত, পূর্বের ন্যায় বেশ সদ্ভাবে ও নিশ্চিন্ত ভাবে মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখে কোন প্রকার বিষাদের ভাব দেখা যায় নাই। মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু যে বেতন পাইতেন, তাহাতে কলিকাতার বাসা-খরচ চালাইয়া প্রতিমাসে ৫০৲ টাকা ঋণ করিয়া গৃহে পিতার নিকট পাঠাইতেন।"

এই অদম্য মানসিক শক্তির জন্যেই বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর।

কিছুকাল কাটল এই ভাবে। প্রচুর অবসর। বিদ্যাসাগর ঠিক করলেন বই লিখবেন।

এই দারুণ অভাবের সময়ে মার্শাল সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর কাপ্তেন ব্যাঙ্ক নামে এক সাহেবকে ছ মাস সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দী শিখিয়েছিলেন। ছ মাস পরে সাহেব যখন পঞ্চাশ টাকা হিসাবে তিনশো টাকা বিদ্যাসাগরকে দিতে এলেন, তিনি অম্লানবদনে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন—আপনি মার্শাল সাহেবের বন্ধু। তিনি আমারও পরম আত্মীয়। আমি বন্ধুর অনুরোধে পড়াতে এসে পারিশ্রমিক নেব কেমন করে?

এমনি নির্লোভ ছিলেন তিনি আজীবন।

থান ধুতি, মোটা চাদর আর চটি জুতা—নির্লোভ বিদ্যাসাগরের এই-ই ছিল জয়-নিশান।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রথম চাকরী নেবার পর কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে সুপাঠ্য বাংলা গদ্য পাঠ্য পুস্তক লিখতে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধের

ফল—'বাসুদেব-চরিত'—বিদ্যাসাগরের প্রথম বই এবং বাংলা ভাষায় তাঁর প্রথম গদ্য রচনা। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক চরিতকার লিখেছেন, "'বাসুদেব-চরিত' শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া রচিত। 'বাসুদেব-চরিতে' শ্রীমদ্ভাগবতের কোন কোন স্থান পরিত্যক্ত; কোন কোন স্থানের ভাবমাত্র গৃহীত এবং কোন কোন স্থান অবিকল ভাষান্তরিত। ইহা অবলম্বন বা অনুবাদ হউক, লিপি-মাধুর্যে ও ভাষা-সৌন্দর্যে মূল সৃষ্টি-সৌন্দর্যের সমীপবর্তী। 'বাসুদেব-চরিত' বাংলা গদ্য গ্রন্থের আদর্শ স্থল।" কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষ এমন সুপাঠ্য বই পাঠ্য পুস্তক হিসাবে অনুমোদন করলেন না। বইও প্রকাশিত হলো না। তাঁর জীবিতকালেও হয়নি।

মার্শাল সাহেব একদিন অনুরোধ করলেন, পণ্ডিত, কিছু বই লিখুন।

—কী বই? জিজ্ঞাসা করেন বিদ্যাসাগর।

—হিন্দী 'বৈতাল পঁচ্চিসী'র বাংলা অনুবাদ করলে কেমন হয়?—জিজ্ঞাসা করলেন মার্শাল।

—চেষ্টা করে দেখতে পারি, উত্তর দিলেন বিদ্যাসাগর।

এই সময়ে বিদ্যাসাগরের হিন্দী ভাষার ওপর যথেষ্ট দখল। সেই অভিজ্ঞতার পরিচয় তিনি দিলেন এই হিন্দী বইখানা অনুবাদ করে। শুধু তাই নয়, রুচিরও পরিচয় দিলেন। হিন্দী 'বৈতাল পঁচ্চিসী'র যে যে স্থান অশ্লীল বলে মনে হয়েছে, বিদ্যাসাগর সে-সব বর্জন করলেন। তাঁর প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে এই প্রথম বই। অনুবাদ যখন ছাপিয়ে বই আকারে বেরুলো, তখন সকলেই সবিস্ময়ে দেখল, বিদ্যাসাগরের বেতালের ভাষা বেতালা নয়, প্রাঞ্জল, ললিত, মধুর ও বিশুদ্ধ। প্রথম সংস্করণের বইখানির রচনা দীর্ঘ সমাস-বহুল বলে একটু শ্রুতিকঠোর হয়েছিল। এই সংস্করণের ভাষা এই রকম ছিল: "উত্তালতরঙ্গমালা-সঙ্কুল উৎফুল্লফেননিচয়চুম্বিত ভয়ঙ্কর তিমিমকরনক্রচক্র ভীষণ স্রোতস্বতীপতিপ্রবাহ মধ্য হইতে সহসা এক দিব্য তরু উদ্ভূত হইল।"

বিদ্যাসাগর নিজেই বুঝতে পারলেন এ ভাষা বাংলার উপযোগী নয়। পরবর্তী সংস্করণে তিনি ভাষার পরিবর্তন করলেন। তবু এ কথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রথমে সমাদর পায় নি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেও প্রথমে পাঠ্যরূপে গৃহীত হয় নি। শেষে শ্রীরামপুরের পাদ্রী-দের চেষ্টায় পাঠ্য হয় এবং তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষ তিনশো

টাকা দিয়ে একশোখানা 'বেতাল' কিনেছিলেন। তারপর শ্রীরামপুরের মিশনারীদের চেষ্টায় বইখানি পাঠক সমাজে ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এবং সে সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক বলে স্বীকৃত হয়। "ভাষা বিষয়ে বেতালই বর্তমান বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম গ্রন্থ।" বিদ্যাসাগরের 'বেতাল' থেকেই বাংলা ভাষায় নবযুগের সূত্রপাত।

একদিন মদনমোহন তর্কালঙ্কার এলেন বিদ্যাসাগরের কাছে।
বেতাল-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। তারপর একটা ছাপাখানা করার কথা উঠল। তর্কালঙ্কার নিজেই প্রস্তাব করলেন, একটা ছাপাখানা করতে পারলে ভালই হয়। কথাটা মনে লাগল বিদ্যাসাগরের। পরামর্শ ভালই। বিদ্যাসাগরের যে কথা সেই কাজ। হাতে টাকা নেই। ছশো টাকা ধার করে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠা করলেন সংস্কৃত প্রেস। বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনে এই প্রেসের গুরুত্ব অনেক।
এই প্রেসের প্রথম বই ভারতচন্দ্র। ভারতীর বরপুত্র ভারতচন্দ্র ছিলেন বিদ্যাসাগরের প্রিয়কবি। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের পাণ্ডুলিপি তিনি বহু যত্নে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ি থেকে আনিয়েছিলেন। নদীয়ার রাজবাটীর সংশ্রবে তিনি ইতোপূর্বেই এসেছেন এবং নদীয়ার তখনকার রাজা তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করতেন। বই ছাপা হলো, মার্শাল সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্যে ছ' শো টাকায় একশো খণ্ড ভারতচন্দ্র কিনলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে এই টাকাটা পেয়ে বিদ্যাসাগর সর্বাগ্রে প্রেসের দেনা শোধ করলেন। ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁর এই বিচক্ষণতা সত্যই প্রশংসনীয়। এই ভারতচন্দ্র প্রকাশ করার প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবন-চরিতকার লিখেছেন :
"ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বড় প্রিয় ছিল। ভারতচন্দ্রকে তিনি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস, কালিদাস যেমন সংস্কৃতে, ভারতচন্দ্র তেমনি বাংলায়। কালিদাসের গ্রন্থে যেমন সংস্কৃতের, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে তেমনি বাংলার পরিপাটি। অন্নদামঙ্গলের পরিমার্জিত ভাষা, বাংলা ভাষার আদর্শ বলে তাঁর ধারণা ছিল। তিনি ভাবিতেন, বাংলার ভারতচন্দ্র খাঁটি বাঙালি কবি। ভারতচন্দ্রের পর দাশরথি রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রসিকচন্দ্র রায় খাঁটি বাঙালি কবি বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতিভাজন ছিলেন।"

এই সময়ে বিদ্যাসাগর দ্বিতীয় অনুবাদ গ্রন্থে হাত দিলেন। তখন বাংলার ইতিহাস বলতে মাত্র একখানি বইকে মাত্র বোঝাত—সে বই মার্শমান সাহেবের লেখা 'হিস্টরি অব বেঙ্গল'। বিদ্যাসাগর এরই অনুবাদ করলেন। এ-অনুবাদের ভাষা আরো ভালো। তাই বাংলার ইতিহাসের আদর সর্বত্র হলো। মার্শমান সাহেব এ বইখানি প্রধানত লিখেছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মার্শাল সাহেবের অনুরোধে। বিদ্যাসাগরের অনেক আগেই রামগতি ন্যায়রত্ন একখানি ইতিহাস লেখেন। সে বইতে সিরাজউদ্দৌলার আগের ঘটনা বিবৃত হয়েছে বলে, বিদ্যাসাগর তাঁর বইখানির নাম দিলেন—বাংলার ইতিহাস, ২য় ভাগ। এই ইতিহাসে নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকাল থেকে বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কের রাজত্ব কাল পর্যন্ত শাসন-বিবরণ বিবৃত হয়েছে। ইংরেজি বই থেকে বিদ্যাসাগরের এই প্রথম অনুবাদ। সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাবগত থেকে প্রথম অনুবাদ করে লিখলেন 'বাসুদেব চরিত', হিন্দী থেকে অনুবাদ করলেন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' আর এখন ইংরেজি থেকে অনুবাদ করলেন এই ইতিহাসের বই। তিনটি ভাষা থেকে ভাষান্তর কার্যে বিদ্যাসাগর অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। সত্যই, "ইংরেজি হইতে হউক, হিন্দী হইতে হউক, আর সংস্কৃতে হইতে হউক, অনুবাদ-কৃতিত্বে বিদ্যাসাগর অতুলনীয়।"

এখানে একটি কথার উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদ্যাসাগরের মতো প্রতিভা ইতিহাসের অনুবাদে যেমন কৃতিত্ব দেখাল, দুঃখের বিষয়, গবেষণা ও প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, তাঁর কৃতিত্ব সে রকম নয়। মার্শমান ভারত-বিদ্বেষী ইংরেজ, বাঙালি-বিদ্বেষী ইংরেজ ছিলেন। স্বভাবতই তাঁর হাতে ইতিহাস বিকৃত হয়েছে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে মার্শমান সাহেব যে রকম নিষ্ঠুর, নৃশংস অরাজনীতিজ্ঞ বলে প্রমাণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন, পরবর্তীকালের একাধিক দেশী ও বিদেশী ঐতিহাসিকদের গবেষণার ফলে আমরা তার বিপরীত চিত্রই পাই। বিদ্যাসাগর ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন না। তাই পলাশি যুদ্ধের তথ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি যে খুব সচেতন ছিলেন, তা মনে হয় না।

পলাশির যুদ্ধ বর্তমান ভারত-ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা। পলাশির যুদ্ধ ভারতের নিয়তি-নেমির এক ভয়ঙ্কর আবর্ত। ভাগীরথী ও কালিন্দীর ন্যায় পুরাণ-প্রসিদ্ধ স্রোতস্বতী দুদিক থেকে প্রবাহিত হয়ে যেখানে এসে প্রাণভরে

পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, অনেকে ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে সেই স্থানকে তীর্থস্থান বলে পুজা করেন। আবার, সমুদ্রের পূর্বোচ্ছ্বাস প্রবাহগুলি যেখানে এসে ভৈরবরবে পরস্পর প্রহত হয়, এবং ভয়াবহ তরঙ্গমালা সৃষ্টি করে তটভূমি কাঁপিয়ে তোলে, অনেকে প্রকৃতির মহিমায় মুগ্ধ হয়ে সেই স্থানকে বৈজ্ঞানিকের দৃশ্যস্থান বলে আদর করেন। এই গণনায়, পলাশির ক্ষেত্র মহাতীর্থ ও মহাদৃশ্য। এখানে পূর্ব ও পশ্চিম সম্মিলিত হয়, এখানে প্রাচীন সভ্যতা ও আধুনিক উন্নতি এই দুই প্রতিকূল স্রোত পরস্পর পরস্পরকে আঘাত ও প্রতিঘাত করে, এখানে বংশপরম্পরায় সহস্র কোটি লোকের ললাট-রেখার পরীক্ষা হয়ে যায়; এখানে দুই মহাদেশের দুটি ইতিহাস কালের এক কুক্ষিতে যুগপৎ নিমজ্জিত হয়ে একীভূত নূতন মূর্তিতে ভেসে ওঠে। মার্শমানের ইতিহাসে এ জিনিস ব্যাখ্যাত হয় নি। বিদ্যাসাগরও ইতিহাসের অনিসন্ধিৎসু পাঠক ছিলেন না। মার্শমানের লেখা ইতিহাসকেই তিনি অভ্রান্ত বলে মনে করলেন এবং তাঁর বই অনুবাদ করলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বরাবরই ইংরেজ জাতিকে বিধাতৃ-প্রেরিত বিজেতা বলে শ্রদ্ধা করেছেন। এইখানে তিনি ইতিহাসের গতি কিছুটা অনুভব করতে পেরেছিলেন। তবু আমাদের এ কথা মনে না হয়ে পারে না যে, অনুবাদ করবার সময়ে বিদ্যাসাগর একবারও ভেবে দেখলেন না যে, সিরাজ-চরিত্রের কলঙ্কলেপনে ও কলঙ্ক-কীর্তনে মার্শমান বিদ্বেষেরই পরিচয় দিয়েছেন, একজন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের পরিচয় তিনি দেন নি। এ ভুল কবি নবীনচন্দ্র সেনও করেছিলেন। তবে প্রসঙ্গত এ কথা বলা দরকার যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে মার্শম্যানের বই-ই তখন একমাত্র ইতিহাস ছিল। ইতিহাসের প্রতি বাঙালির আগ্রহ এবং অনুসন্ধিৎসা জাগাবার জন্যেই বিদ্যাসাগর মার্শম্যানের বইখানা অনুবাদ করেন।

তবে এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার একটি মূল্যবান কথার উল্লেখ করেছেন। সেটি এই: "ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস লিখিবেন বলিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাচীনতম ও অধুনাতম ইতিহাস গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না বলিয়া একদিন আলমারীবদ্ধ এই সমুদয় ইতিহাস পুস্তক দেখিতে দেখিতে অবিরল ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন।"

তারপর বিদ্যাসাগর আর একখানা বই লিখলেন। এখানি জীবন-চরিত-মূলক বই। চেম্বার্স-এর 'বায়োগ্রাফী' বলে তখন একখানা ইংরেজি বই ছিল। এই বইয়ের গ্রন্থকার রবার্ট চেম্বার্স ও উইলিয়ম চেম্বার্স। চেম্বার্স-এর সঙ্কলিত এই বইখানা থেকে বিদ্যাসাগর কয়েকটি চরিত্র নিয়ে 'জীবন-চরিত' লিখলেন। এই জীবন-চরিতে কোপার্নিকাস্, গ্যালিলিও, নিউটন, হার্শেল, গ্রোসিয়স, লিনিয়স, ডুবাল, জেঙ্কিন্স, ও জোন্স—এই কয়টি চরিত-আখ্যায়িকা অনুবাদিত হয়েছে। স্পষ্টই দেখা যায়, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য রচনায় প্রথমে অনুবাদের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং হিন্দুর পুরাণের অন্তর্গত চরিত্রাবলী বাদ দিয়ে বাঙালিকে বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবার জন্যে তিনি বিদেশীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি। এও বিদ্যাসাগরের যুগসচেতন মনের একটি পরিচয়। সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্যাসাগর ইচ্ছা করলেই দেশীয় উপকরণ দিয়ে চরিতকথা লিখতে পারতেন, কিন্তু তা না করে তিনি জাতির চরিত্র গঠনের জন্যে, হিন্দু-সন্তানের শিক্ষণীয় এই সব বিদেশীয় চরিত্র তাদের সম্মুখে তুলে ধরলেন। এই প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। বিদ্যাসাগরের ইংরেজির শিক্ষাগুরু আনন্দকৃষ্ণ বসু তাঁকে একবার স্বদেশীয় লোকের জীবনী লিখতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর এই প্রস্তাবে সম্মতও হন এবং এর জন্যে উদ্যোগও করেছিলেন। অনেক বইও তিনি সংগ্রহ করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় শেষ পর্যন্ত তিনি এই বই লিখে উঠতে পারেন নি। পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগরের এই 'জীবন-চরিত' সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যতালিকায় স্থান পেয়েছিল।

বছর দুই কাটল এইভাবে।

এমন সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড রাইটারের চাকরী খালি হলো। ইতোমধ্যে ডাক্তারী পাশ করে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ চাকরী ছেড়ে দিয়ে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করবেন ঠিক করলেন। বিদ্যাসাগরের চেষ্টাতেই দুর্গাচরণের এই চাকরী, আবার তাঁরই প্রেরণায় তাঁর ডাক্তারী পড়া।

ইস্তফা-পত্রখানা মার্শাল সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে দুর্গাচরণ এসে বিদ্যাসাগরকে বললেন—পণ্ডিত, ডাক্তারী পাশ করলাম, এবার প্র্যাক্‌টিস করব। চাকরীট ছেড়েই দিলাম।

—ভালই করেছ, বললেন বিদ্যাসাগর।

—বলছিলাম কি, ঐ হেড রাইটারের চাকরীটা যদি তুমি নাও, কেমন হয়? প্রস্তাব করলেন দুর্গাচরণ।

—মন্দ হয় না। তবে নিজে যেচে তো বলতে পারিনে, আমার স্বভাব তোমরা জানো।

—ঐ তো তোমার একগুঁয়েমি, পণ্ডিত। চাকরী কী আর কেউ কাউকে সেধে দেয়। আর তোমার ওপর যখন সাহেবের সুনজর, একটু বললেই যদি হয়।

—ঐটি আমাকে দিয়ে হবে না, দুর্গাচরণ। মার্শাল সাহেব যদি ভালো বোঝেন, ডেকে পাঠাবেন।

মার্শাল বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ ও হিতৈষী। তিনি দুর্গাচরণের পদে বিদ্যা-সাগরকে নিযুক্ত করতে চাইলেন। মাইনে আশী টাকা। বন্ধুরাও তাঁকে ঐ পদ নিতে অনুরোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দুর্গাচরণ বাবুর পদ গ্রহণ করলেন। এই চাকরী নেবার পর তাঁর সাংসারিক অবস্থা কিছুটা সচ্ছল হলো। যে দু'বছর তিনি, যাকে বলে 'বসে ছিলেন', সেই দু' বছর গ্রন্থ-রচনার কাজের অবসরে বিদ্যাসাগর ইংরেজি শিক্ষার এবং ইংরেজি হাতের লেখার বিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন। বাংলা হাতের লেখার মতো তাঁর ইংরেজি হাতের লেখাও সুন্দর হয়েছিল। অক্ষর তো নয়, যেন মুক্তার সারি। বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়মে চাকরী নিলেন। হেড পণ্ডিত নয়, এবার হেড রাইটার।

এই সময়েই 'শুভঙ্করীর' আবির্ভাব। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সাহিত্যিক উদ্যম। ছেলেরা এলো বিদ্যাসাগরের কাছে লেখার জন্যে।—আমি তো পণ্ডিত মানুষ, কী লিখব?—জিজ্ঞাসা করেন বিদ্যাসাগর। হিন্দু কলেজের 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর দল উত্তর দেয়—যা খুশি লিখুন। লিখলেন একটা প্রবন্ধ। বিষয়—বাল্য-বিবাহ। সবাই পড়ে বুঝতে পারলো এ-মানুষটির ভেতর একজন সমাজ-সংস্কারক লুকিয়ে আছেন। 'শুভঙ্করীর' লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যাসাগর আরো তিন জনকে টেনে আনলেন; তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ভাই দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন আর তখনকার সংস্কৃত কলেজের সুলেখক মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত গোস্বামীকে। দীনবন্ধু আর মাধবকে দিয়ে বিদ্যাসাগর

দু'টি প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিয়েছিলেন। একটি হলো, চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে জিব ফুটো করা আর পিঠ ফুঁড়ে চড়ক করা। দ্বিতীয়টি হলো, মরবার আগে গঙ্গায় অন্তর্জলি করা। ভবিষ্যতের সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগরের পূর্বাভাষ এইগুলি। বিদ্যাসাগরের লেখার গুণে 'শুভঙ্করী' কতকটা প্রতিপত্তি লাভ করলেও, কাগজখানির অস্তিত্ব কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। হেড রাইটারের চাকরীর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষার বাংলা ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। সে বছর সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় বাংলা রচনার বিষয় বিদ্যাসাগর নির্ধারণ করলেন, 'স্ত্রী-শিক্ষা'। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র নীলকমল ভাদুড়ীর রচনা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয় এবং তিনি একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করেন। এই সময়েই বিদ্যাসাগর ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার প্রধানতম প্রবর্তক বেথুন সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হন। বেথুন সাহেব তখন সবেমাত্র পঁচিশটি মেয়ে নিয়ে একটি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরবর্তী কালে বেথুন-বিদ্যাসাগরের সম্মিলিত চেষ্টায় বাংলা দেশে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন হয়। বেথুনের প্রতি বিদ্যাসাগরের অসামান্য অনুরাগ ছিল। সে কাহিনী পরে বলব।

সংস্কৃত কলেজের জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগের বাৎসরিক পরীক্ষার দায়িত্বও তাঁর ওপর ন্যস্ত হলো। বিখ্যাত জর্মান পণ্ডিত ডাঃ রোয়ার ছিলেন অন্যতম পরীক্ষক। ডাঃ রোয়ার আর বিদ্যাসাগর দুজনে মিলে এই দুই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরী করতেন। সংস্কৃতজ্ঞ হলেও রোয়ার সাহেব সংস্কৃত প্রশ্ন প্রণয়নে বিদ্যাসাগরের সাহায্য নিতেন। এই প্রশ্ন তৈরী করার জন্যে একটা স্বতন্ত্র পারিশ্রমিক ছিল। বিদ্যাসাগর এই পারিশ্রমিকের টাকা সৎকাজে ব্যয় করেছিলেন। সে বছর সিনিয়র পরীক্ষায় কাব্যে ও অলঙ্কারে সর্বপ্রথম হলেন রামকমল ভট্টাচার্য। বিদ্যাসাগর কৃতী ছাত্রটিকে এক সেট সংস্কৃত মহাভারত কিনে উপহার দিলেন এবং বাকী টাকা দীন-দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করলেন—যা তাঁর স্বভাবের ধর্ম।

সৌভাগ্য একা আসে না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরীর অব্যবহিত কাল পরেই বিদ্যাসাগরের একটি পুত্রলাভ হলো। ইনিই বিদ্যাসাগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনিই বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র; এর পর তাঁর আর তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের আঘাতও এল অতর্কিত ভাবে। হরিশ মারা গেল ওলাওঠায়। হরিশচন্দ্র তাঁর পঞ্চম ভাই। বয়স মাত্র আট বছর। কলকাতায় পড়তে এসেছিল। ভাইয়ের শোকে বিদ্যাসাগর খুব কাতর হয়ে পড়লেন। "এই সময়ে তিনি শোকাতুরা জননীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী আসিয়া রাজকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজকৃষ্ণ বাবুর মা-কে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর মাতাও তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। শোক কিছু শান্ত হইলে পাঁচ-ছয় মাস পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় জননীকে বীরসিংহে পাঠাইয়া দেন। তিনি নিজে কিন্তু সহজে ও শীঘ্র ভ্রাতৃশোক ভুলিতে পারেন নাই।"

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরী বেশী দিন করতে হলো না।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদে জজ-পণ্ডিতের চাকরী নিয়ে চলে গেলে পরে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ খালি হলো। সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগরকে আবার কলেজে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন এই সুযোগে। কিন্তু বিদ্যাসাগর রাজী হলেন না। মাইনে নব্বুই টাকা হলেও টাকার কথাই তাঁর কাছে সব সময়ে বড়ো ছিল না। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের নিজের বক্তব্য এই: "শিক্ষা-পরিষদের সেক্রেটারী ডাঃ মোয়াট আমাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আমি নানা কারণ দর্শাইয়া, প্রথমতঃ অস্বীকার করি। পরে, তিনি সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে আমি কহিয়াছিলাম, যদি শিক্ষা-পরিষদ আমাকে অধ্যক্ষের ক্ষমতা দেন, তাহা হইলে আমি এই পদ স্বীকার করিতে পারি।"

তাই হলো। অধ্যক্ষের ক্ষমতা নিয়েই সংস্কৃত কলেজে ফিরে এলেন বিদ্যাসাগর সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে। এইবার শুরু হলো বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের আরেক অধ্যায়।

সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার ও সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা এইবার কী আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, সেই কাহিনী এইবার আলোচনা করব।

॥ দশ ॥

বিদ্যাসাগর এখন সাহিত্যের অধ্যাপক।

রসময় দত্ত তখনও সম্পাদক। দশ বছর ধরে তিনি সম্পাদক আছেন, কিন্তু কলেজের শৃঙ্খলা তাঁরই আমলে শিথিল হয়ে পড়ে। চারদিকেই অব্যবস্থা, গোলমাল আর সাবেকি নিয়ম-কানুন বর্তমান। অধ্যাপকেরা কী পড়ান, ছাত্রেরা কখন আসে—এ সবের কোন বাঁধাবাঁধি ব্যবস্থা ছিল না। এক কথায়, কলেজের অবস্থা তখন সঙ্গীন। শিক্ষাপরিষদ দেখলেন, পুরাতন সম্পাদকের ওপর আর ভরসা করা চলে না। এমন একজন কর্মপটু লোক তাঁরা চাইছিলেন যিনি কলেজের পুনর্গঠন সম্বন্ধে তাঁদের সুপরামর্শ দিতে পারেন। "সংস্কৃত কলেজের প্রকৃত অবস্থা কি, এবং কিরূপ ব্যবস্থা করিলে কলেজের উন্নতি হইতে পারে—এ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য বিদ্যাসাগরের ওপর ভার পড়িল।" ডাঃ মোয়াট নিজেই এই ভার দিলেন তাঁর ওপর। রসময় দত্ত ক্ষুণ্ণ হলেন।

বিদ্যাসাগর রিপোর্ট লিখলেন।

সংস্কৃত শিক্ষার পুনর্গঠন ও প্রসারের পক্ষে এই রিপোর্টের গুরুত্ব অনেক। সেদিন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন সংস্কৃত কলেজের অস্তিত্বই বুঝি লোপ পায়। আগের মত আর ছাত্র ভর্তি হয় না। ক্রমেই ছাত্র-সংখ্যা কমে আসছে। তখন ছাত্রদের কাছ থেকে মাইনে নেওয়া হতো না। এই বিপুল ব্যয়সাধ্য প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের আগ্রহও যেন ক্রমেই কমে আসছিল। শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষেরাও তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনের দিকে বেশী ঝুঁকেছিলেন। শিক্ষাপরিষদ ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে বদ্ধপরিকর হলেন। এই দিকে ছাত্রদের আকৃষ্ট করবার জন্যে নানা রকমের পরীক্ষা ও বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। তার ওপর যেসব ছেলে বেশী

কৃতিত্ব দেখাত, সরকারী কাজে ঢোকবার পক্ষে তাদের বেশী সুবিধা হতো। যারা ভালো ইংরেজি লেখাপড়া শিখতো, তারা সহজেই চাকরী পেতো। মোট কথা, ইংরেজি বিদ্যা তখন অর্থকরী হয়ে দাঁড়িয়েছে; সংস্কৃত শিক্ষিতদের পক্ষে তেমন কোন সুযোগই ছিল না, কাজেই সংস্কৃত পড়বার আগ্রহ অনিবার্য-ভাবেই কমে আসছিল। কলেজের খাতায় ছাত্র কম হবার এই একটা বিশেষ কারণ ছিল। অবশ্য সংস্কৃত পঠন-পাঠনে অনাবশ্যক দীর্ঘ সময় লাগতো। এইভাবে নানা কারণে কলেজের অস্তিত্ব লোপ পাবার সম্ভাবনা দিনের পর দিন প্রবল হয়ে উঠছিল। সংস্কৃত শিক্ষার সেই দুর্দিনে যদি বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার সম্পর্কে এই রিপোর্টটি না লিখতেন, তাহলে সংস্কৃত কলেজ সত্যিই লোপ পেয়ে যেত। বিদ্যাসাগরের সংগঠনী প্রতিভা এই রিপোর্টের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

যথাসময়ে বিদ্যাসাগর শিক্ষা-পরিষদে এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠালেন।

রিপোর্টের শেষে তিনি মন্তব্য করলেন, "অবশেষে নিবেদন এই যে, কলেজের সুবন্দোবস্তের নিমিত্ত আমি যে প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, তাহা বহু দিবসের প্রগাঢ় চিন্তা ও বিবেচনার ফল। আমার বিবেচনায় যে প্রণালীর অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে নিতান্তই প্রয়োজনীয়, আমি কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়াছি ও আশা করি যে, যদি কৌন্সিল (এডুকেশন কৌন্সিল) আমার প্রস্তাবিত পরামর্শগুলি কার্যে পরিণত করেন, তবে অল্প দিনের মধ্যেই অতি সুফল উৎপন্ন হইবে ও বিদ্যালয়টি পবিত্র ও প্রকৃত সংস্কৃত বিদ্যার আগার স্বরূপ হইবে। বিশেষতঃ ইহা হইতে জাতীয় সাহিত্যের উৎপত্তি ও সুশিক্ষার সংগঠন হইতে থাকিবে ও এই বিদ্যালয় হইতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সুদক্ষ শিক্ষকগণ সাধারণের মধ্যে জাতীয় বিদ্যা প্রচার করিয়া দেশের সর্বতোভাবে মঙ্গলসাধন করিতে থাকিবেন।"

রিপোর্ট বিদ্যাসাগর ইংরেজিতেই লিখেছিলেন। সহজ সরল ও সংযত ইংরেজি। বাহুল্যের লেশমাত্র ছিল না, দরকারী কথাগুলো বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে বিনা বাক্যাড়ম্বরে তিনি বলেছিলেন—রিপোর্টের এই হলো প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাসাগরের এই রিপোর্ট যেমন মূল্যবান তেমনি যুগান্তকারী বলে কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করেছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষাকে কত সহজ এবং সংক্ষিপ্ত করা যায়, তিনি এই রিপোর্টে তা দেখিয়েছিলেন। তাঁকে যখন

রিপোর্ট দেবার জন্যে ডাঃ মোয়াট অনুরোধ করেন, বিদ্যাসাগর তখনই শিক্ষাপরিষদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। বিদ্যাসাগর বুঝলেন যে, ইংরেজি শিক্ষার প্রবল স্রোতের সম্মুখে যদি সংস্কৃতের পঠন-পাঠন বজায় রাখতে হয়, তবে এর আমূল পরিবর্তন দরকার—অর্থাৎ সোজা কথায় যাকে বলে ঢেলে সাজা। অভ্রান্ত দূরদৃষ্টির বলে বিদ্যাসাগর বুঝতে পারলেন যে, সহজ প্রণালীর উদ্ভাবন করতে না পারলে সংস্কৃত কলেজের অস্তিত্ব লোপ পাবার আশঙ্কা আছে। কি ভাবে শিক্ষা-প্রণালী সহজ করা যায়, তাই তাঁর একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিপ্লবী চেতনা এও অনুভব না করে পারল না যে, শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের লেশমাত্র সম্পর্ক থাকলে পরে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। তাই তিনি সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচী থেকে ধর্মশাস্ত্র বর্জন করবার কথা বললেন।

ব্যাকরণ-বিভাগে ছাত্রদের অযথা দীর্ঘ সময় যেত। এই বিষয়ের উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর তাঁর রিপোর্টে লিখলেন: "অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট প্রণালীর অভাবে, ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বালকেরা এই বিভাগে পাঠকালে যে সময় অতিবাহিত করে, সময়ের সহিত তুলনা করিলে, তাহাদিগের শিক্ষা যৎসামান্য বলিতে হইবে। মুগ্ধবোধ অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ। ইহার প্রণেতা বোপদেব, সংক্ষিপ্ততার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় থাকাতে তিনি তাঁহার পুস্তককে অতিশয় দুরূহ করিয়াছেন। একে সংস্কৃত ভাষা অতিশয় কঠিন, তাহাতে একখানি দুরূহ ব্যাকরণ সহকারে ইহার শিক্ষা শুরু করা, আমার বিবেচনায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।···সুকুমারমতি বালকবৃন্দ সংস্কৃত শিক্ষার আরম্ভকালে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কাঠিন্যপ্রযুক্ত তাহাদিগের শিক্ষকগণের উচ্চারিত কথাগুলি কেবল মুখস্থ করিয়া রাখে। এরূপে কেবল ব্যাকরণ অধ্যয়নেই পাঁচ বৎসর অতি-বাহিত হয়। কিন্তু ভাষায় কিঞ্চিৎমাত্রও প্রবেশাধিকার জন্মে না।···সুতরাং বর্তমান পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রের প্রথম পাঁচ বৎসর বৃথা ব্যয় হয়।···এক্ষণে ব্যাকরণ-বিভাগে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কার করিতে ইচ্ছা করি।...আমি যে প্রণালী প্রচলনের পক্ষপাতী তাহাতে প্রথমতঃ বালকেরা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ব্যাকরণ পাঠ করিবার পরিবর্তে এদেশীয় ভাষায় রচিত ব্যাকরণের প্রধান প্রধান নিয়ম ও সূত্রগুলি পাঠ করিবে।··তৎপরে তাহারা

'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী' আরম্ভ করিবে। সমস্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে এইখানি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।...এই বন্দোবস্ত দ্বারা একটি বৎসর বাঁচিয়া যাইবে এবং ব্যাকরণ-বিভাগে পাঁচ বৎসরের পরিবর্তে চারি বৎসর নির্ধারিত হইবে।"

ঠিক এই রকম সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে রিপোর্টের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে। সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ ও গণিত, স্মৃতি বা আইন, ন্যায়—প্রত্যেকটি শ্রেণীর পাঠ্য বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করে রিপোর্টের একস্থানে বিদ্যাসাগর লিখলেন: "ইহা অতি সত্য কথা যে, হিন্দু-দর্শন শাস্ত্রের অধিকাংশের সহিত আধুনিক সময়ের উন্নত চিন্তার সৌসাদৃশ্য অল্পই লক্ষিত হয়। যদি শিক্ষা-পরিষদ আমার মন্তব্যগুলি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে যে সময়ের মধ্যে ছাত্রেরা দর্শন শ্রেণীতে উন্নীত হইবে, সেই সময়ের মধ্যে তাহাদিগের ইংরেজি ভাষা-জ্ঞান অনায়াসেই তাহাদিগকে যুরোপখণ্ডের দর্শনশাস্ত্রের জটিল বিষয়সমূহ প্রণিধান করিতে সমর্থ করিবে। তাহারা পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রের সহিত তাহাদিগের স্বদেশীয় দর্শনশাস্ত্রের তুলনা করিতে সহজেই পারঙ্গম হইবে। যুবকেরা এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষিত হইলে সহজেই প্রাচীন হিন্দুদর্শন-শাস্ত্রের ভ্রম-প্রমাদাদি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু যদি তাহাদিগকে হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞান য়ুরোপীয়দিগের নিকট শিক্ষা করিতে হয়, তবে উপরোক্ত সুবিধা তাহাদের কখনই ঘটিয়া উঠিবে না।"

এইখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যাসাগরের চিন্তা সংকীর্ণতা-মুক্ত ছিল এবং শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁহার চিন্তা সেই সময়কার আধুনিক উন্নত চিন্তার গতি ও প্রকৃতি সহজেই ধরিতে এবং বুঝিতে পারিয়াছিল। তিনি তাই এক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই রিপোর্টের বিষয়গুলি অতি সুনিপুণভাবে আলোচনা করেছিলেন। রিপোর্টের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হলো ইংরেজি বিভাগ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য। বিদ্যাসাগরের জীবনের তটপ্রান্ত দিয়ে তখন যুগপ্রবাহ উত্তাল তরঙ্গ তুলে বয়ে চলেছে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হয়েও তিনি স্পষ্টই উপলব্ধি করলেন যে, এটা ইংরেজি শিক্ষার যুগ। তিনি নিজেও চেষ্টা করে, যত্ন করে ইংরেজি শিখতে পরাঙ্মুখ হলেন না। বিদ্যাসাগরের কণ্ঠে তাই যুগপৎ কালিদাস ও সেক্সপীয়র উচ্চারিত হতো অনবদ্যভাবে। তিনি দেখলেন, চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমন

নবযুগের একশ্রেণীর বাঙালিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে এই ইংরেজি শিক্ষা। শাস্ত্র ও লোকাচারের প্রাচীর তুলে ইংরেজি শিক্ষার স্রোতকে কিছুতেই প্রতিরোধ করতে পারা যাবে না। তিনি আরো দেখলেন যে, নব্য বঙ্গের প্রথম যুগের লোক যাঁরা—সেই রামতনু লাহিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—সকলেই ইংরেজি শিক্ষার সুফল এবং হিন্দুকলেজের সৃষ্টি। সংস্কৃত কলেজেও তখন ইংরেজী বিভাগ ছিল এবং ইংরেজি পড়ানো হতো, কিন্তু যেভাবে পড়ানো হতো, বিদ্যাসাগরের মতে, "তাহা অতীব অসন্তোষকর।"

সেই অসন্তোষকর অবস্থার আলোচনা করে বিদ্যাসাগর তাঁর এই ঐতিহাসিক রিপোর্টে লিখলেন: "এ বিভাগে কি শিক্ষা করিতে হইবে, তাহা ছাত্রের ইচ্ছাধীন। যখন ইচ্ছা সে তাহার পাঠ আরম্ভ করে ও ইচ্ছানুসারে তাহা পরিত্যাগ করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার পরেই ব্যাকরণ শ্রেণীতে পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু একেবারে দুইটি নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে তাহাদিগকে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই অধিকাংশ ছাত্রই, হয় ইংরেজি কিংবা সংস্কৃতভাষা শিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করে; প্রায়ই পরীক্ষার পূর্বে অধিকাংশ ছাত্র ইংরেজি বিভাগ হইতে পলাইয়া আসে।"

তারপর সংস্কৃতের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে ছেলেরা ইংরেজি পড়তে আসতো। এমন কি ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণী থেকেও। এর ফলে তারা নিয়মিত ভাবে সংস্কৃতের ক্লাসেও উপস্থিত হতে পারত না। এ ছাড়া, ইংরেজি শেখার বিষয়টাই ছিল ইচ্ছা বা অনিচ্ছার ব্যাপার। মোট কথা, বিদ্যাসাগর দেখলেন যে, সংস্কৃত ক্লাসের খুব কম ছেলেই ইংরেজি বিভাগে পড়ে। এই অবহেলিত বিভাগটি গোড়া থেকেই এই ভাবে চলে আসার ফলে, যেসব ছাত্র সংস্কৃত কলেজে পড়তে আসতো, তারা ইংরেজি শেখার জন্যে খুব বেশী আগ্রহ বোধ করত না। বিদ্যাসাগর তাই তাঁর রিপোর্টে লিখলেন: "আমি যে কয়েকটি বন্দোবস্তের অবতারণা করিতেছি, তাহা কার্যে পরিণত হইলে নিশ্চয়ই সুফল উৎপন্ন হইবে। আমার মন্তব্যগুলি এই: ছাত্রেরা সংস্কৃত ভাষায় কিছু পারদর্শিতা দেখাইতে না পারিলে তাহাদিগকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিতে দেওয়া উচিত নয়।

সংস্কৃত শ্রেণীর ছাত্রেরা সেই সঙ্গে তাহাদিগের নিজের শ্রেণীতে ইংরেজি ভাষাও শিক্ষা করিবে। ইংরেজি শিক্ষা ইচ্ছাধীন না হইয়া অন্যান্য পাঠের ন্যায় অবশ্য-পাঠ্য হইবে।...আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, অলঙ্কার শ্রেণীতেই ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভ হউক।"

বিদ্যাসাগর তাঁর এই রিপোর্টে সংস্কৃত কলেজের সকল দিকই আলোচনা করেছেন। এমন কি, ব্যাকরণের পঞ্চম অধ্যাপক কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন যে অতি বৃদ্ধ এবং তাঁকে দিয়ে যে সুচারুভাবে অধ্যাপনা চলতে পারে না—এ কথার উল্লেখ করতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। তারপর এখানে কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। "বালকগণের উপস্থিতি, সামান্য কারণে শ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে যাওয়া ও অনাবশ্যক গোলমাল ও কথাবার্তা এবং সর্বপ্রকার গোলযোগ সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। অন্যান্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে যেরূপ নিয়মাদি ও সুশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়, এই বিদ্যালয়ে কেন যে তাহা প্রবর্তিত হইবে না, তাহার কারণ বুঝিতে পারি না, সেইরূপ প্রণালী এ বিদ্যালয়েও প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিতান্ত উচিত।"

এইভাবে বিদ্যাসাগর তাঁর দীর্ঘ দিনের প্রগাঢ় চিন্তা ও বিবেচনার ভিত্তিতে এই রিপোর্ট লিখতে পেরেছিলেন। রিপোর্টে কেবল সহজ শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবিত হয় নি, সংস্কৃত কলেজের সমগ্র পাঠ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা দেওয়া হয়েছে এবং তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন বন্দোবস্ত ও শৃঙ্খলার ওপর। "পুনর্গঠিত সংস্কৃত কলেজ যে সংস্কৃত বিদ্যানুশীলনের কেন্দ্র ও মাতৃভাষা-রচিত সাহিত্যের জন্মক্ষেত্র হইবে, এবং এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই যে শিক্ষকরূপে একদিন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, জ্ঞান ও সাহিত্য-রস বিতরণ করিবে,—পরিবর্তনের ফল যে একান্ত শুভ ও আশাপ্রদ,"—রিপোর্টে বিদ্যাসাগর দৃঢ়তার সঙ্গেই এ কথা জানালেন।

যথাসময়ে কর্তৃপক্ষের হাতে বিদ্যাসাগরের রিপোর্ট পৌছলো।

ডাঃ মোয়াট বিদ্যাসাগরের দূরদর্শিতা ও সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় পেলেন এই রিপোর্টের মধ্যে। শিক্ষা-পরিষদের অন্যান্য সদস্যেরাও রিপোর্ট পাঠ করে খুশি হলেন। সংস্কৃত কলেজের সম্পূর্ণ চিত্র তাঁদের সামনে পরিস্ফুট হলো এবং বিদ্যাসাগরের এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই শিক্ষা-পরিষদ সংস্কৃত কলেজ

পুনর্গঠনের কথা নতুন করে চিন্তা করলেন। বাংলা দেশে পরবর্তী কালে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের এই রিপোর্টের অসীম প্রভাব ছিল। শিক্ষা-বিভাগ এমনই একজন কার্যপটু ও দৃঢ়চিত্ত লোককে চাইছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগরের পর সেকালে এক ভূদেব মুখোপাধ্যায় ভিন্ন, শিক্ষা-সংস্কার ব্যাপারে এমন সুচিন্তিত রিপোর্ট আর কেউ লেখেন নি। বাংলাদেশে শিক্ষা-বিস্তার ও শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রে তাই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ভূদেবচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এই রিপোর্ট লেখার ফলে কর্তৃপক্ষের নিকট বিদ্যাসাগরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দুই-ই বাড়লো। কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত দেখলেন, শিক্ষা-পরিষদের দৃষ্টি এখন বিদ্যাসাগরের ওপর, তিনি যা বলবেন তাই হবে। এমন অবস্থায় তাঁর পক্ষে যা স্বাভাবিক, রসময় বাবু তাই-ই করলেন। তিনি পদত্যাগ পত্র দাখিল করলেন। ইতোপূর্বে তাঁর কার্য পর্যালোচনা করবার জন্যে পরিষদ একটি কমিটি বসিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের রিপোর্ট, কমিটির রিপোর্ট এবং রসময় দত্তের পদত্যাগপত্রের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা-পরিষদ তখন কর্তৃপক্ষকে লিখলেন: "দশ বছর ধরিয়া বাবু রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের কাজ করিয়া আসিতেছেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার জ্ঞান নাই বলিলেই চলে। সারাদিন তিনি অন্যত্র দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিবিষ্ট থাকেন। কলেজের কাজ যখন চলে, তখন তিনি কলেজে উপস্থিত থাকিতে পারেন না। ফলে কলেজের শৃঙ্খলা শিথিল হইয়াছে··· ···নানারূপ গোলমাল ও অব্যবস্থায় কলেজের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কার্যকারিতা একান্তভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।·· কর্মিষ্ঠ লোকের হাতে পড়িলে কলেজের উন্নতি হইতে পারে। বাবু রসময় দত্তের পদত্যাগে এই বিপুল ব্যয়সাধ্য প্রতিষ্ঠানের একমাত্র অন্তরায় দূর হইল। ···শিক্ষা-পরিষদের মতে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। তাঁহার মত উদ্যমশীল, কর্মনিপুণ ও দৃঢ়চিত্ত লোক বাঙালির মধ্যে দুর্লভ। তিনি অধ্যক্ষ হইলে, বর্তমান সহকারী সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যক্ষের পদ দেওয়া যাইতে পারে। সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের পদ উঠিয়া যাইবে। এই দুই পদের বেতন মোট ১৫০৲ টাকা। অধ্যক্ষকে এই ১৫০৲ টাকা দিলেই চলিবে। গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় সম্প্রতি অস্থায়িভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের উপরই সংস্কৃত কলেজের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইল।"

যথাসময়ে শিক্ষাপরিষদ রসময় দত্তের পদত্যাগের আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং যে-চিঠিতে তাঁকে এই কথা জানান হয়, সেই চিঠির একখানা নকল বিদ্যাসাগরের কাছেও পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেই চিঠিতে তাঁকে রসময় দত্তের কাছ থেকে কলেজের কার্যভার বুঝে নেবারও নির্দেশ দেওয়া হয়। এর অল্প দিন পরেই সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পরিবর্তে ১৫০৲ টাকা মাইনেতে অধ্যক্ষের নতুন পদ সৃষ্টি হলো। সেই পদে অধিষ্ঠিত হলেন বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত কলেজের তিনিই প্রথম অধ্যক্ষ।

এইখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিদ্যাসাগরের এই নিয়োগ সম্পর্কে সেই সময় নানারকম জনশ্রুতি প্রচারিত হয়েছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবন-চরিতকার লিখলেন যে, সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি হলে পরে বেথুন সাহেব প্রথমে ঐ পদ গ্রহণের জন্য তর্কালঙ্কারকে অনুরোধ করেন। তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বিদ্যাসাগরকে ঐ পদে নিযুক্ত করবার জন্যে বেথুন সাহেবকে অনুরোধ করেন। সত্যবাদী বিদ্যাসাগর এই জনশ্রুতি নিজেই খণ্ডন করে গেছেন। এই সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য এই রকম :

"আমি যে সূত্রে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হই, তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত এই। মদনমোহন তর্কালঙ্কার জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদ প্রস্থান করিলে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। শিক্ষাসমাজের তৎকালীন সেক্রেটারী ডাঃ মোয়াট সাহেব আমাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আমি নানা কারণ দর্শাইয়া প্রথমত অস্বীকার করি। পরে, তিনি সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে, আমি কহিয়াছিলাম, যদি শিক্ষা-সমাজ আমাকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দেন, তাহা হইলে আমি ঐ পদ স্বীকার করিতে পারি। তৎপরে ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে, আমি সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হই। আমার এই নিয়োগের কিছুদিন পরে, রসময় দত্ত মহাশয় সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করেন। সংস্কৃত কলেজের বর্তমান অবস্থা ও উত্তরকালে কিরূপ ব্যবস্থা করিলে, সংস্কৃত কলেজের উন্নতি হইতে পারে, এই দুই বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত, আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হয়। তদনুসারে আমি রিপোর্ট সমর্পণ করিলে, ঐ রিপোর্ট দৃষ্টে

সন্তুষ্ট হইয়া শিক্ষা-সমাজ আমাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা কার্য সেক্রেটারী ও অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী এই দুই ব্যক্তি দ্বারা নির্বাহিত হইয়া আসিতেছিল; ঐ দুই পদ রহিত হইয়া প্রিন্সিপালের পদ নূতন সৃষ্ট হইল। ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ, আমি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলাম।"

॥ এগার ॥

বিদ্যাসাগর এখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ।
তখন তাঁর বয়স মাত্র একত্রিশ।
তাঁর কর্মজীবনে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা এখান থেকেই।
তিনি তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও উদ্যম নিয়ে সংস্কৃত কলেজকে একেবারে নতুন করে গড়তে চাইলেন। আগেই বলেছি, সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন ব্যাপারেই বিদ্যাসাগরের অসামান্য ও প্রখর কালচেতনার এবং সমাজবিপ্লবী মননের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু সংস্কৃত কলেজ কেন, বলতে গেলে বাংলা দেশের সমগ্র শিক্ষা-বিভাগের পুনর্গঠন ব্যাপারেও বিদ্যাসাগরের মনীষা তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে গেছে। সংস্কৃত কলেজের তিনি ছাত্র। আজ সেই শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, এর উন্নতি যেন বিদ্যাসাগরের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়াল। বিনি মাইনের এই বিদ্যালয়টি সম্পর্কে শাসক সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্য ও অবহেলার মোড় ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি সর্বাগ্রে রচনা করলেন অমন সর্বাঙ্গসুন্দর রিপোর্টটি। সংস্কৃত শিক্ষা লোপ পেয়ে গেলে জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি বলতে আর কী অবশিষ্ট থাকবে ?—এ কথা তিনি যেমন চিন্তা করলেন, অন্য দিকে আবার তিনি দেখলেন এর আমূল সংস্কার-সাধন ও সাবেকি নিয়মের পরিবর্তন করতে না পারলে এবং এর পাশে ইংরেজি ভাষার চর্চাকে স্থান দিতে না পারলে, জাগরণকে ব্যাপক ভাবে সার্থক করে তোলা যাবে না। তাই বিদ্যাসাগরের সময় থেকে সংস্কৃত কলেজের যে ইতিহাস, প্রকৃতপক্ষে তা এর পুনর্গঠনের ইতিহাস। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপে এর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের সুযোগ পেলেন বিদ্যাসাগর। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক চরিতকার লিখেছেন :

"এই পদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সুবিস্তৃত হৃদয়ে গভীর দায়িত্ব-জ্ঞানের সঞ্চার হয়। কি উপায় অবলম্বন করিলে, সংস্কৃত কলেজের ও সমগ্র শিক্ষাবিভাগের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয়, সেই গুরুতর প্রশ্নের বিশদ মীমাংসার জন্য নিজের সমগ্র বিদ্যা-বুদ্ধির নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং শয়নে, স্বপনে, সজনে ও নির্জনে সর্বদা এই একই চিন্তা তাঁহার মনের উপর রাজত্ব করিত।"

বিদ্যাসাগরের প্রথম কাজ হলো, "অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহের আমলের হস্তলিখিত পলিত গলিত পুঁথিগুলির মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করা।" দুষ্প্রাপ্য দর্শনশাস্ত্রের পুঁথিগুলিও তিনি ছাপাবার ব্যবস্থা করলেন। এতে অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েরই সুবিধা হলো। তালপাতার জীর্ণ পুঁথির বদলে ছাপা বই হাতে পেয়ে অধ্যাপকদের অধ্যাপনার উৎসাহ বাড়ল, ছাত্রদেরও সংস্কৃতপাঠে অনুরাগ বৃদ্ধি পেল। সেই সঙ্গে তিনি প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনায়ও মন দিলেন। তারপর বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি পড়ল ছাত্র ও শিক্ষকদের অনিয়মিত আসা-যাওয়ার ওপর। ইতোপূর্বে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক হিসাবে তিনি এ-বিষয়ে কিছু বাঁধাবাঁধি নিয়মের প্রবর্তন করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অধ্যক্ষ হয়ে এসে দেখলেন যে, আবার শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হবার পর থেকে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের একাংশেই বাস করতেন। কলেজের শিক্ষকগণ যাতে ঠিক সময়ে উপস্থিত থেকে নিজের নিজের কাজে প্রবৃত্ত হন, সে-বিষয়ে বহু চেষ্টা করেও যখন বিফলমনোরথ হলেন, তখন অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করলেন। অধ্যাপকগণ সকলেই তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অনেকেই আবার তাঁর শিক্ষক। কাজেই কুণ্ঠা বোধ করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, সামনাসামনি কাউকে কিছু বলতে পারতেন না। ঘড়িতে যেই সাড়ে দশটা বাজত, অমনি বিদ্যাসাগর ওপর থেকে কলেজের ফটকের দিকে দৃষ্টি রাখতেন। যখনই দেখতেন, কেউ দেরী করে আসতেন, অমনি তাড়াতাড়ি নীচেয় নেমে এসে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে সমাগত শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করতেন—এই এলেন নাকি?

ওষুধ কাজে লাগল। নবীন অধ্যক্ষের এই "এই এলেন নাকি?"—যেন ধিক্কার ও অনুযোগের মূর্তি নিয়ে অধ্যাপকদের লজ্জা দিত। তাঁদের চৈতন্য হলো। তাঁরা নিয়মিত সময়ে আসতে লাগলেন। ক্রমে নিয়মিত সময়ে আসাটা

প্রচলিত হয়ে গেল। কেবল একজন অধ্যাপক সম্পর্কে বিদ্যাসাগর এই অনুযোগ-বাণী উচ্চারণ করতে কুণ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর গুরু জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। বিদ্যাসাগরের এক জীবন-চরিতকার এই ঘটনাটির উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ "জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন আবার সকলের অপেক্ষা অধিক বিলম্বে আসিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় গুরুর আগমন প্রতীক্ষায় কলেজের দ্বারদেশে নীরবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। ক্রমাগত এইরূপ করায়, বৃদ্ধ শিক্ষক একদিন মার্তণ্ড মূর্তি ধারণ করিয়া ছাত্র-অধ্যক্ষকে বলিলেন, 'তুমি যে কিছু বল না, এতেই সর্বনাশ করিলে। কথা কহিলে একটা জবাব দিতে পারিতাম, কি জন্য দেরী হয় তাও বলিতে পারিতাম, এমন করে জব্দ করিলে আর উপায় কি? আচ্ছা, মরি আর বাঁচ, কাল হইতে ঠিক সময়ে আসিব।"
তারপর থেকে বৃদ্ধ তর্কপঞ্চাননকেও ঠিক সময়ে কলেজে হাজিরা দিতে হতো। বিদ্যাসাগরের শৃঙ্খলাপ্রিয়তা এমনই কঠোর ছিল। এমনি শৃঙ্খলাপ্রিয়তা ছিল তাঁর প্রত্যেক কর্মে।

এইবার বিদ্যাসাগর কলেজের আভ্যন্তরীণ উন্নতির দিকে সন্ধানী দৃষ্টি দিলেন। ছাত্রদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ভিন্ন কলেজের উন্নতি আদৌ সম্ভব নয়—এ কথা বিদ্যাসাগর যতখানি বুঝতেন, সেদিন সংস্কৃত কলেজের আর কোন শিক্ষক ততখানি বুঝতেন কিনা সন্দেহ। এবং সেই সঙ্গে তিনি এ কথাও বিলক্ষণ বুঝেছিলেন যে, ছাত্রদের সদিচ্ছা ও সহযোগিতা লাভ করবার একটি মাত্র পথ আছে। সে পথ শাসনের নয়, হৃদয়ের। উদ্যতবেত্র-শিক্ষক ছাত্রদের নিকট চিরদিনই অপ্রিয়। বিদ্যাসাগরের হাতে কোন দিন কেউ বেত দেখেনি অথচ তিনিই ছিলেন সেদিন সংস্কৃত কলেজে সকল ছাত্রের প্রিয়তম শিক্ষক। ছাত্রদের তিনি দেখতেন ঠিক তাঁর নিজের সন্তানের মতো—তিনি তাঁর স্নেহ-মমতাপূর্ণ হৃদয়খানি তাদের সামনে মেলে ধরেছিলেন। স্নেহের শাসন যে বেতের শাসনের চেয়েও কার্যকরী, এ দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগরই দেখালেন প্রথম। ছাত্রদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করলে, তারা সহজেই নিয়ম মেনে চলবে, পড়াশুনায় মন দেবে—এ ধারণা বিদ্যাসাগরের বদ্ধমূল ছিল। এই সম্পর্কে ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন নামে বিদ্যাসাগরের এক বিখ্যাত ছাত্রের একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ "আমরা যখন সংস্কৃত কলেজে পড়িতাম,

তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই সংস্কৃত কলেজে থাকিতেন। কলেজের ছুটী হইলে পর অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি সেই সুপ্রসন্ন সহাস্যবদনে সকলকেই যথারীতি সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া নানা প্রসঙ্গে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ ও রহস্যপূর্ণ কথাবার্তা কহিতেন। তাঁহার কাছে যাইলেই ছাত্রেরা প্রায়ই রসগোল্লা, সন্দেশ খাইতে পাইত। তাঁহার প্রীতি-সম্ভাষণে কেহই বিমুখ হইত না। বালকদিগের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকালই বান্ধব-ব্যবহার করিতেন, তা কি সংস্কৃত কলেজে আর কি স্বকৃত বিদ্যালয়ে। ছাত্রবর্গকে সর্বদা মধুর আত্মীয়-সম্ভাষণে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করাই তাঁহার স্বভাব ছিল। তাঁহার মুখে সেই অমৃতায়মান 'তুই' সম্বোধন শুনিয়া, প্রিয় ছাত্রবর্গ আপনাদিগকে তাঁহার আত্মীয় অপেক্ষা আত্মীয় বিবেচনা করিত। সত্য সত্যই সেই 'তুই'টুকু যেন স্বর্গীয় স্নেহের ক্ষীরভরা।...বালকদিগের প্রতি যেমন তিনি সত্যই কোমল ব্যবহার করিতেন, আবার আবশ্যক হইলে, কর্তব্যানুরোধে তেমনই কঠোর হইতেন।...বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তব্যে কঠোর হইতেন বটে, কিন্তু কঠোরতার কারণ দূর হইলেই, কারুণ্যে ভাসিয়া যাইতেন।"

এই গুণেই বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর।

এই বিশ্বম্ভর আত্মীয়তা সাগর-চরিত্রের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য।

বিদ্যাসাগরের কড়া হুকুম ছিল কোন অধ্যাপক যেন ছাত্রদের বেত না মারেন, কারণ, তিনি কায়িক দণ্ডবিধানের একান্ত বিরোধী ছিলেন। একবার এক অধ্যাপকের টেবিলে একগাছি বেত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—বেত কেন হে? অধ্যাপক বললেন—ম্যাপ দেখাবার সুবিধা হয়। বিদ্যাসাগর তখন বললেন—কিন্তু সাবধান, এ বেত যেন ছাত্রের পিঠে না পড়ে।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের কাছে অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর এইভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

অক্লান্তকর্মা পুরুষ বিদ্যাসাগর। যেমন তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি-সম্পন্ন, তেমনি বলিষ্ঠ-চরিত্র। লেফাফা-দোরস্ত কাজ তাঁর ধাতে সইত না।

স্বভাব-বিলাসী, আরামপ্রিয় বাঙালির মতো রুটিন-মাফিক কাজ করে, দিনের অবশিষ্ট সময় তিনি বিলাস-ব্যসনে অতিবাহিত করতেন না।

সে কর্মবীরের কোন দিনই বিরাম-বিরতি ছিল না।

তাঁর সমস্ত মন এখন কলেজের ওপর। এই অধ্যক্ষের কাজে একা বিদ্যাসাগর যেন দশটা বিদ্যাসাগরের কাজ করে গেছেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমেও তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। বিস্ময়াবহ সেই পরিশ্রম—কি ছাত্র কি শিক্ষক যেই দেখত, সেই বিস্ময় বোধ না করে পারত না। দেড়শো টাকা মাইনের চাকরী হলে কি হয়, পদের দায়িত্ব ছিল প্রচুর। যে রিপোর্ট তিনি কর্তৃপক্ষকে দিয়েছিলেন, তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে বিদ্যাসাগরকে সেই অনুসারে কাজ করতে অনুমতি দিলেন। কাজেই সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য সম্বন্ধে তিনি যে সঙ্কল্প করেছিলেন, এখন তা কাজে পরিণত করতে তিনি অগ্রসর হলেন। বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক লিখতে তন্ময় হলেন।

এক বছরের মধ্যেই কলেজে এক উন্নত প্রণালীর শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো। প্রত্যেকটি বিভাগ সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হলো। সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষাকে তিনি কালোপযোগী করে নবভাবে স্থাপিত করলেন। এই তীক্ষ্ণধী, সহৃদয় ব্রাহ্মণ সর্বদাই হিন্দুর পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করেছেন এবং সর্বত্রই গোঁড়ামির আবর্জনা দূর করবার চেষ্টা পেয়েছেন। আজীবন সংস্কৃত ব্যাকরণের ঘুরপাকে পড়ে ছাত্ররা "সহর্ণেবঃ" মুখস্থ করে কাল কাটাত। সংস্কৃত দর্শন, সংস্কৃত কাব্য, সংস্কৃত বিজ্ঞান এই সব বিদ্যার দরজায় প্রবেশ করতেও জীবনে সময়-সঙ্কুলান হতো না। এই দুর্গতির হাত থেকে ছাত্রদের রক্ষা করতে গিয়ে বোপদেবের 'মুগ্ধবোধের' পরিবর্তে বিদ্যাসাগর ছাত্রদের হাতে দিলেন তাঁর প্রতিভার অন্যতম দান, 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ-কৌমুদী'। পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, হিতোপদেশ ও মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত গদ্য ও কাব্য থেকে কতকগুলি নির্বাচিত অংশ নিয়ে তিন খণ্ডে সংকলন করলেন একখানি সুন্দর সহজ বই—নাম দিলেন 'ঋজুপাঠ'। এই দুখানা বই পড়েই খুব কম সময়ের মধ্যেই ছাত্ররা সংস্কৃতে মোটামুটি ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে। এমনি করেই সেদিন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষার বাধা-বিপত্তি দূর করে, ভারতীর মন্দিরের পথ ছাত্রদের পক্ষে সুগম করে দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত একটা কথার উল্লেখ করব। সংস্কৃত-শিক্ষার পথ সুগম করে দিয়ে বিদ্যাসাগর সেদিন খুব নাম কিনেছিলেন সত্য, কিন্তু সমসাময়িক বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত এই ব্যাপারে সেদিন বিপরীত অভিমতও প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের মতে বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দেন নি ; কেননা সংস্কৃত

ভাষা ও সাহিত্য, সংস্কৃত ব্যাকরণে গভীর জ্ঞান ভিন্ন কিছুতেই আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। মুগ্ধবোধকে তাই সরল করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে সংস্কৃত চর্চার মূলে কুঠারাঘাতই করে গেছেন—এমন কথাও সেদিন অনেকের মুখে শোনা গিয়েছিল। এ অভিযোগ বা অভিমত বিচার করে দেখবার মতো।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন, তখন এই শিক্ষায়তনের বয়স সাতাশ বছর। গোড়া থেকেই ছেলেদের কাছ থেকে মাইনে নেওয়া হতো না। বেতন দেবার ব্যবস্থা না থাকার ফলে এই দাঁড়াল যে, ছেলেরা বিনা বাধায় কলেজে ভর্তি হতো এবং সুবিধা পেলেই অন্য ইংরেজি স্কুলে চলে যেত। "এমনই হইত, ভর্তি হইয়া নাম লিখাইয়া ছেলের আর দেখা নাই, তারপর দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে যখন হাজিরা খাতা হইতে নাম কাটা গেল, তখন ছাত্র অথবা ছাত্রের অভিভাবক এমন করিয়া আসিয়া কর্তৃপক্ষকে ধরিয়া পড়িল যে, নিবেদন অগ্রাহ্য করা দুরূহ। এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিদ্যাসাগর প্রথমে দুই টাকা প্রবেশ-দক্ষিণার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন। পুনঃপ্রবেশের জন্যও ঐ ব্যবস্থা বাহাল হইল। তারপর মাসিক এক টাকা বেতনের বন্দোবস্ত হইল। ইহাতে অব্যবস্থিতচিত্ত ছাত্রদের কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইল, বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির হারও যথেষ্ট বাড়িয়া গেল।" সংস্কৃত কলেজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যা করতে পারেন নি, বিদ্যাসাগর তাই করলেন। যে বিদ্যালয় এতদিন অবৈতনিক ভাবে চলে আসছিল, সেইখানে বেতনের নিয়ম করাতে বিদ্যাসাগরকে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি তাতে ভ্রূক্ষেপ করলেন না; দরিদ্র এবং অসমর্থ ছাত্রদের জন্যে অবশ্য তিনি বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ অব্যাহত রেখেছিলেন। বিদ্যাসাগর দূরদর্শী লোক ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, বিনি মাইনের স্কুল কর্তৃপক্ষ হয়ত বেশী দিন নাও চালাতে পারেন্। সেদিন যে সংস্কৃত কলেজ উঠে যায় নি, সে শুধু বিদ্যাসাগরের জন্যেই।

এই ভাবে ক্রমে ক্রমে বিদ্যাসাগরের দূরদর্শিতা শৃঙ্খলা-শিথিল সংস্কৃত কলেজকে একটা পরিচ্ছন্ন রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিল। এইবার বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি পড়ল ইংরেজি-বিভাগের ওপর। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে

সঙ্গেই ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে কর্তৃপক্ষ আট বছর বাদেই ঐ বিভাগটি বন্ধ করে দিলেন। আবার সাত বছর বাদে শিক্ষা-পরিষদের চেষ্টায় বিভাগটি পুনস্থাপিত হলো বটে, কিন্তু আগের মতোই আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না। বিদ্যাসাগর বুঝলেন, কোথায় এর গলদ। এইবার তিনি ইংরেজি বিভাগকে ফলপ্রসূ করতে সচেষ্ট হলেন। বিদ্যাসাগর যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যে যুগের পরিবেশের মধ্যে থেকে অধ্যয়ন করেছেন, সেই যুগের গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণে তিনি ভুল করেন নি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, "বাংলায় ভাল শিক্ষক হইতে হইলে এবং নব সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হইলে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের পক্ষে সংস্কৃত ও ইংরেজি, এই দুই ভাষাতেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন হওয়া দরকার।" এই সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত জানিয়ে তিনি পরিষদকে একখানা দীর্ঘ পত্র লিখলেন। এই পত্রে তাঁর দুটি প্রধান বক্তব্য ছিল। প্রথম, ইংরেজি-বিভাগ সুদৃঢ় ও পুনর্গঠিত হওয়া দরকার; দ্বিতীয়, এর জন্যে অর্থের প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর তাঁর চিঠিতে টাকার দাবীও তুললেন। ইংরেজি-বিভাগ ভালো করে চালাতে গেলে কম পক্ষে পাঁচজন শিক্ষকের দরকার। মোট কথা, প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলন সম্পর্কে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলাতের ডিরেক্টরা ইতিপূর্বে যে নীতি নির্ধারণ করেছিলেন, তাঁর পত্রে এর উল্লেখ করে বললেন যে, সংস্কৃত কলেজের উন্নতির জন্যে সরকারের কাছে অতিরিক্ত খরচের দাবী করা আদৌ অসঙ্গত নয়। বিদ্যাসাগরের যুক্তি এবং বিশ্লেষণ-পূর্ণ এই পত্র বৃথা হয় নি। ইংরেজি ও সংস্কৃত—এই দুই ভাষার এরূপ মিলিত উপকার উপলব্ধি করে, শিক্ষা-পরিষদ সরকারের সম্মতিক্রমে কলেজের জন্যে অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করলেন। যেখানে বছরে খরচ হতো সাড়ে সতর হাজার টাকা, বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় সেখানে এখন থেকে বার্ষিক খরচ বরাদ্দ হলো চব্বিশ হাজার টাকা।

বিদ্যাসাগর ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলেন। নিয়ম করলেন যে, অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে যেমন নম্বর রাখতে হয়, ইংরেজিতেও সেইরকম নম্বর রাখতে হবে এবং পরীক্ষায় পাশের জন্যে ইংরেজি প্রশ্নপত্রের নম্বরও বিশেষরূপে বিবেচিত হবে। ব্যবস্থা তো হলো, কিন্তু ইংরেজি পড়াবার উপযুক্ত শিক্ষক কোথায়? বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি পড়ল হিন্দু কলেজের কৃতী

ছাত্র প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর ওপর। তাঁকেই তিনি একশো টাকা মাইনে দিয়ে ইংরেজির প্রধান শিক্ষক করে নিয়ে এলেন। তখন তিনি হিন্দু কলেজে চল্লিশ টাকা মাইনেতে চাকরী করছিলেন। মানবচরিত্র অধ্যয়নে বিদ্যাসাগর ছিলেন অদ্বিতীয়; লোক চিনতে এবং লোকের মূল্য বুঝতে তাঁর কোনও দিন ভুল হতো না। এই প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীই পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগরের পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদেই নিযুক্ত হয়েছিলেন। তারপর একে একে এলেন শ্রীনাথ দাস, কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রসন্নকুমার রায়।

এর কিছুদিন পরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ থেকেও ছাত্র পাঠালেন। তারা অন্যান্য স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে সমানভাবে কৃতকার্য হলো দেখে বিদ্যাসাগরের কী আনন্দ।

ইংরেজি বাধ্যতামূলক করার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি অঙ্ক শেখার ব্যবস্থা করলেন। ভাস্করাচার্যের লীলাবতী ও বীজগণিতের স্থলে তিনি প্রবর্তন করলেন পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক গণিতশাস্ত্র।

বিদ্যাসাগরের বিপ্লবী চেতনা আরো এক ধাপ অগ্রসর হলো।

তখন পর্যন্ত শুধু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্ররা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ পেত। তার মধ্যে বৈদ্য ছাত্রদের পক্ষে ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ছিল। বিদ্যাসাগর অধ্যক্ষ হয়ে দু'মাসের মধ্যেই কায়স্থদের প্রবেশাধিকার দিলেন, আর বছর যেতে না যেতে অন্যান্য ব্রাহ্মণেতর জাতির ছাত্রদের জন্যে সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। বিদ্যাসাগরের দূরদৃষ্টিতে একটা বড়ো সত্য বুঝতে বিলম্ব হয়নি যে, কালের পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিয়ে হিন্দুসমাজকে সেইভাবে পরিবর্তনমুখী করে তুলতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্যের প্রাকারকে ধূলিসাৎ করে দিতে হবে—তবেই এ দেশে শিক্ষার প্রসার ব্যাপক হবে। জ্ঞান-পথের পথিকের জাতিভেদ নেই, বর্ণ-বিচার নেই, নেই কোন রকম ভেদ-বৈষম্য—এই কথা বলার সাহস সেদিন বিদ্যাসাগরেরই ছিল। পরবর্তী কালে এই রকম সাহস দেখিয়েছিলেন আর একজন। তিনি স্বনামধন্য আশুতোষ। অধ্যাপকেরা বিরোধিতা করবার চেষ্টা করলেন, অনেকে

অনেক রকম আপত্তি তুললেন। বিদ্যাসাগর অকাট্য যুক্তির সাহায্যে সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের আদর্শ ও ব্যবহারে, নীতি ও কর্মে স্ববিরোধ প্রতিপন্ন করে তাঁদের নিরস্ত করলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব শূদ্র—তিনি সংস্কৃত পড়েন কি করে? অধ্যাপকেরা মাইনে নিয়ে সাহেবদের সংস্কৃত শেখান কি করে? সেদিন বিদ্যাসাগরের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিরোধীদল নিরুত্তর ছিলেন। এই সম্পর্কে বিদ্যাসাগর শিক্ষা-পরিষদে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, তাতে তিনি উল্লেখ করলেন: "যখন বৈদ্য কলেজে পড়িতে পারে, তখন কায়স্থ পড়িবে না কেন? বৈদ্য শূদ্র জাতি। আর যখন শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেবের জামাতা, হিন্দু স্কুলের ছাত্র অমৃতলাল মিত্র সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অধিকার পাইয়াছে, তখন অন্যান্য কায়স্থ পড়িতে পারিবে না কেন? কায়স্থ ক্ষত্রিয় আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর তাহার প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কায়স্থেরা অধুনা বাংলার সম্ভ্রান্ত জাতি। আপাতত কায়স্থদিগকে সংস্কৃত কলেজে লওয়া উচিত।...প্রধান ও প্রবীণ অধ্যাপকেরা সকলেই আমার এই মতের বিরোধিতা করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের এই বিরোধিতার কোন যুক্তি নাই।"

কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। তারপর কায়স্থেতর বর্ণের ছাত্রও সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্র পড়বার অধিকার পায়। সেদিন তাঁকে এই বৈপ্লবিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে গিয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, "তিনি কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন,—'যদি এ কার্যে সিদ্ধিলাভ না করিতে পারি, তাহা হইলে এ ছার পদ পরিত্যাগ করিব'।"

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে বছরে দু'মাস গরমের ছুটি প্রবর্তন করলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক চরিতকার উল্লেখ করেছেন যে, বাংলা দেশে স্কুল-কলেজে যে গ্রীষ্মাবকাশ হয়ে থাকে, বিদ্যাসাগরই তার প্রথম প্রবর্তক। তিনিই শিক্ষা-পরিষদকে বলে এই ব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়েছিলেন। এইভাবে অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে এইসব পরিবর্তন করতে গিয়ে, বিদ্যাসাগরকে যে কত শ্রম ও কত চিন্তা করতে হতো, তা আজকের দিনে কল্পনা করা অসম্ভব। সত্যই তিনি যেন এই উপেক্ষিত শিক্ষায়তনটির

সামগ্রিক উন্নতি সাধনের জন্যে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন, এবং সব সময়েই চিন্তা করতেন কোথায় কিরূপ ব্যবস্থা করলে, শিক্ষা দেওয়া সহজ হবে, শৃঙ্খলা-বদ্ধ হবে। আর সব বিষয়ের উল্লেখ না করলেও, এক উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ কৌমুদী রচনার কথা চিন্তা করলেই বিদ্যাসাগরের মনীষা সম্পর্কে বিস্ময় বোধ না করে পারা যায় না। 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করলেও, এ কথা ঠিক যে তখন ঈশ্বরচন্দ্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিভাবান্ পণ্ডিত অনেক ছিলেন এবং তাঁদের কারো কারো পাণ্ডিত্যের বিশালতা ও গভীরতা বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্যের বিশালতা ও গভীরতা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। তবে এঁদের পাণ্ডিত্য কোন একটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আর বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার ছিল বহুমুখীনতা ও ব্যাপকতা। এবং এরই বলে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার পথ আশ্চর্যভাবে সুগম করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইখানেই বিদ্যাসাগর একমেবাদ্বিতীয়ম্।

অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হবার পাঁচ-ছমাস পরে বিদ্যাসাগর মাথার অসুখে ভীষণ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গুরুতর পরিশ্রমই এই অসুস্থতার কারণ। ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের চিকিৎসায় তিনি শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী জীবনে এই শিরঃপীড়ার ব্যাধি তাঁর সহচর ছিল বললেই হয়। এই অসুখের আগে বিদ্যাসাগর দারুণ মানসিক আঘাত পান বেথুন সাহেবের আকস্মিক মৃত্যুতে। বেথুন ছিলেন শিক্ষাপরিষদের সভাপতি। ভারতবন্ধু সহৃদয় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের আগেই আলাপ হয়েছিল। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের চাকরীতে ইস্তফা দেবার ঠিক এক বছর পরে জন এলিয়ট ড্রিঙ্ক-ওয়াটার বেথুন বড়লাটের পরিষদের আইন সদস্য হয়ে এদেশে আসেন। ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষার তিনি অন্যতম নায়ক। ভারতবর্ষে আসবার এক বছর পরে সে যুগের অনেক প্রাগ্রসর বাঙালি, যথা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতির সহযোগিতায় বেথুন একুশটি মাত্র ছাত্রী নিয়ে দক্ষিণারঞ্জনের সিমুলিয়ার বৈঠকখানা বাড়িতে বিনা আড়ম্বরে বালিকা বিদ্যালয় খুললেন। বিদ্যালয়ে বেথুনের উদ্বোধনী বক্তৃতা শিক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। একুশজন ছাত্রীর মধ্যে ছিলেন মদন-

মোহনের দুই মেয়ে, ভুবনমালা ও কুন্দমালা। সেদিন এই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে বেথুন আরেকজনের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর। বিদ্যালয়টির জন্যে বেথুন সত্যই একজন উৎসাহী কর্মী পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের মধ্যে। শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি হিসাবে বেথুন সাহেব ইতিপুর্বেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কর্মক্ষমতা ও সংগঠনী প্রতিভার পরিচয়ও পেয়েছিলেন।

"বেথুন যৌবনে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া র‍্যাংলারের সম্মানিত পদ অধিকার করেন। তৎপরে আইন অধ্যয়ন করিয়া পার্লিয়ামেণ্টের কাউন্সিলের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদ হইতে তিনি গভর্ণর-জেনারেলের সচিব-রূপে এদেশে প্রেরিত হন। তিনি বড় মাতৃভক্ত ছিলেন, এবং এরূপ কথিত আছে যে, মাতৃভক্তিই তাঁহার স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভারতীয় নারীগণের উন্নতি সাধনে ইচ্ছা সমুৎপন্ন করিয়াছিল।" সম্ভবত বেথুন সাহেবের মাতৃভক্তি, মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগরকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে থাকবে।

বেথুন সাহেব এই বালিকা বিদালয়ে বিদ্যাসাগরকে অবৈতনিক সম্পাদক করেন। স্ত্রী-শিক্ষায় বিদ্যাসাগরের নিজেরও খুব উৎসাহ ছিল এবং তাঁকেও আমরা বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম নায়ক হিসাবে গণ্য করতে পারি। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো উচিত, এ ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল ছিল। প্রাচীনপন্থী সহকর্মীরা কিংবা সংস্কৃত কলেজের প্রবীণ অধ্যাপকেরা যখন এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধাচরণ করতেন, তখন তিনি তাদের সামনে তাদেরই শাস্ত্র থেকে তুলে ধরতেন এই শ্লোকটি: 'কন্যাপেব্যং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।' বেথুন স্কুলের গাড়ির দুই দিকে এই বিধানটি লিখিয়ে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। এই শাস্ত্র-বচনের দ্বারা তিনি চেয়েছিলেন এ দেশ-বাসীর মানসিক আচ্ছন্নতা ও প্রতিরোধ বিনষ্ট করতে। তবু বিদ্যালয়ের যাতায়াতের পথে মেয়েদের লক্ষ্য করে অভদ্র বিদ্রূপ, কুৎসিত শ্লেষ এবং কটুক্তি বর্ষিত হয়েছিল সেদিন। সমস্ত প্রতিরোধ উপেক্ষা করে বিদ্যাসাগর চলতে লাগলেন। বিদ্যাসাগরের ধারণা ছিল, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে হিন্দুর সংসার সুখময় হবে। তাই এর জন্যে তিনি প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন।

বেথুনের স্কুল সমাজে সমাজ-সংস্কারের প্রবল আন্দোলন নিয়ে এল। বাঙালির মেয়েরা গাড়ি চড়ে স্কুলে যায়, পথের লোক হা করে তাকিয়ে থাকে, ছড়া

বাঁধে। "সুকুমারমতি শিশুবালিকাদিগকে উদ্দেশ করিয়া লোকে কত অভদ্র কথাই কহিত। তাহারা বলিতে লাগিল—এইবার কলির বাকি যা ছিল হইয়া গেল। মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবে না। নাটুকে রামনারায়ণ রসিকতা করিয়া বাবুদের মজলিসে বলিতে লাগিলেন, বাপ্‌রে বাপ্, মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে।"

তবু স্কুল চললো। বেথুন-বিদ্যাসাগরের মিলিত প্রয়াস সেদিন যে ব্যর্থ হয়নি, বাংলার এ সৌভাগ্যই বলতে হবে।

যেদিন বেথুনের মৃত্যুর মর্মান্তিক দুঃসংবাদ বিদ্যাসাগরের কাছে এল, সেদিন তিনি বালকের মতো কেঁদে উঠেছিলেন ; এমনই অন্তরের গভীর আকর্ষণ বোধ করতেন তিনি ভারতপ্রেমিক সেই ইংরেজের প্রতি। বেথুনের মৃত্যুতে তিনি মর্মাহত হলেন এই জন্যে যে, তাঁর মধ্যে বিদ্যাসাগর পেয়েছিলেন একজন উন্নতহৃদয়, কল্যাণ-কর্মী এক ইংরেজকে যিনি সামাজিক স্বৈরাচারের বন্ধন থেকে ভারতের নারীজাতির মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। বেথুনের মৃত্যুর ঠিক ন বছর আগে বিদ্যাসাগর এমনি শোকার্ত হয়েছিলেন ভারত-হিতৈষী আরেক ইংরেজের মৃত্যুতে। তিনি ডেভিড হেয়ার। উত্তরকালে হেয়ারের নাম করলেই বিদ্যাসাগরের চোখ জলে ভরে উঠত। প্রতি বৎসর হেয়ারের মৃত্যুদিনে অনুষ্ঠিত স্মরণ-সভায় বিদ্যাসাগর বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হয়ে উপস্থিত থাকতেন। বেথুনের অকালমৃত্যুর শোকাবহ ঘটনাটি এইরকম।

একদিন কলিকাতা থেকে বার মাইল দূরে জনাইতে একটি বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গেলেন বেথুন সাহেব। তখন বর্ষাকাল। বাংলার বর্ষা। বেথুন ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের মহৎ কাজে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন মহৎপ্রাণ বেথুন। তাই যখন যেখানে বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর ডাক আসত, পথঘাটের সুবিধা-অসুবিধার কথা কিছু-মাত্র বিবেচনা না করে তিনি ছুটে যেতেন সেখানে। জনাই যাবার সময় পথেই তাঁর মাথার ওপর প্রবল বর্ষণে বৃষ্টি নেমে এল। তাঁর সর্বাঙ্গ ভিজে গেল। বহু কষ্টে বর্ষার সেই দুর্যোগের ভেতর দিয়ে বেথুন এসে পৌঁছলেন জনাইতে। সেই তাঁর শেষ কাজ। সেই রাত্রেই তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মারা যান। বেথুনের মৃত্যুসংবাদে বিচলিত বিদ্যা-সাগর বিদ্যালয়ের সেক্রেটারীর পদ পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয়ে বলেছিলেন :

পিতা ঠাকুরদাসকে লেখা বিদ্যাসাগরের পত্র

Registered 8040

Sreejoot Thakoordoss Banerjea
Care of
Pundit [illegible]
Modonpoorah Bengalitollah
Benares

Ishwarchundra Vidyasagar
Calcutta

"যে মহাত্মার অবিচলিত অধ্যবসায়ে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত, যিনি উহার প্রাণ, তিনিই যখন জন্মের মত চলিয়া গেলেন, তখন আর এ বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে প্রবৃত্তি হয় না।" অবশ্য কর্তৃপক্ষের সনির্বন্ধ অনুরোধে বিদ্যাসাগর সেক্রেটারীর পদ পরিত্যাগ করেন নি। বেথুনের প্রতি বিদ্যাসাগরের এমন শ্রদ্ধাভক্তি ছিল যে, তিনি তাঁর প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়ে তাঁর বাড়িতে রেখে দিয়েছিলেন। সত্যই বেথুন সাহেব তাঁর নিজের নাম বাঙালির স্মৃতির ফলকে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখে রেখে গেছেন। বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাসে এ নাম চিরদিন থাকবে।

বেথুনের মৃত্যুর পর সম্পাদক হিসাবে বেথুন স্কুলের পরিচালনায় বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব বড় কম নয়। স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে প্রায় আঠারো বছর কাল বিদ্যাসাগর এই স্কুলের সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁরই তত্ত্বাবধান সময়ে বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। সেদিন বিদ্যাসাগর না থাকলে বেথুনের এই কর্মকীর্তি হয়ত সুচারুভাবে পরিচালিত হতো কি না সন্দেহ। এই সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার উল্লেখ করেছেন: "যতদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় বেথুন বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি ছিলেন, ততদিন তিনি কায়মনোবাক্যে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করিতেন। বিদ্যালয়ের বালিকাগণকে তিনি কন্যার মত ভালবাসিতেন। তিনি কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসী, কাহাকেও মা, ইত্যাদিরূপ সম্বোধন করিয়া সকলেরই সহিত সাদর সম্ভাষণ করিতেন। একবার রাজা দিনকর রাও, তাঁহার সহিত বেথুন বালিকা বিদ্যালয় দেখিতে গিয়া বালিকাদিগকে মিঠাই খাইবার জন্য তিনশত টাকা দিয়াছিলেন। মিঠাই খাইলে মেয়েদের পেটের পীড়া হইতে পারে, প্রেসিডেন্ট বিডন্ সাহেবের (তখনকার ভারত-সরকারের সেক্রেটারি স্যার সিসিল বিডন বেথুন স্কুলের পরিচালনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন) এই ধারণা ছিল; সুতরাং তিনি মিঠাই খাইতে নিষেধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন সেই টাকায় বালিকাদিগকে কাপড় কিনিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি ঢাকাই শাড়ী ক্রয় করিয়া বালিকাদিগকে বিতরণ করিলেন।"

সংস্কৃত কলেজের আমূল সংস্কার-সাধন বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষ-জীবনের সুমহতী কীর্তি। তাঁরই আমলে এই বিদ্যায়তন এক নতুন আকৃতি ধারণ করল।

সংস্কৃত কলেজের উন্নতিকল্পে এই মানুষটির অমানুষী শক্তি দেখে সেদিন ইংরেজ রাজপুরুষেরা পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজকে ভালবাসতেন—মা যেমন শিশুকে ভালবাসে। সহস্র কাজের মধ্যে তাঁর অন্তঃকরণ পড়ে থাকত এই শিক্ষায়তনের ওপর। এর প্রতিটি ক্ষুদ্র স্বার্থ তাঁর কাছে স্বীয় দেহের রক্তবিন্দুর মূল্য বহন করত। পরবর্তীকালে আমরা ঠিক এই জিনিস লক্ষ্য করেছি আর একজনের মধ্যে। তিনি শিক্ষাব্রতী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন করে গড়তে তিনিও প্রাণান্ত চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা দেশে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসের দুটি বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন পর্বে বিদ্যাসাগর ও আশুতোষ—এই দুটি নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের নাম এখন চারদিকে। সমগ্র শিক্ষা-বিভাগে তাঁরই প্রবর্তিত নীতি। সর্বত্রই সুনিয়ম ও শৃঙ্খলা। তাঁরই কার্যকুশলতার প্রশংসা শহরের সর্বত্র। ইংরেজ মহলে যেমন, দেশীয় সমাজেও তেমনি তাঁর সমান খ্যাতি ও প্রতিপত্তি।

বিদ্যাসাগর একজন অসাধারণ লোক—তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার জন্যে ইংরেজ রাজপুরুষেরা বললেন এই কথা। মার্শাল এবং মোয়াট তো তাঁর গুণের পক্ষপাতী ছিলেনই, তারপর বেথুন-বিদ্যাসাগর সংযোগ,—অল্পদিনের জন্যে হলেও—তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তিকে সর্বভারতীয় করে তুলেছিল সেদিন। বিদ্যাসাগর—এই নামটিকে কেন্দ্র করেই সেদিন গড়ে উঠেছিল বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস—বিশেষ করে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাস। বেথুন, বিডন, গ্রে, গ্র্যাণ্ট, হ্যালিডে প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ইংরেজদের সম্মান যেমন পেলেন বিদ্যাসাগর, তেমনি তখনকার কলিকাতার শীর্ষস্থানীয় যাঁরা—সেই প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ—প্রভৃতির নিকটেও বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তিরূপে স্বীকৃত হলেন। এক অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীগ্রামের এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে এ সৌভাগ্য সত্যই কল্পনাতীত। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জনপ্রিয়তা শুধু সম্ভ্রান্ত মহলেই সেদিন সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলার নব উন্মেষিত

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে পুরোগামী ছিলেন যাঁরা, সেই দ্বারকানাথ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, অক্ষয়কুমার, প্যারীচরণ, রাজনারায়ণ প্রভৃতিরাও তাঁর বন্ধুত্ব লাভ করে সেদিন ধন্য হয়েছিলেন। আবার এই বিদ্যাসাগরই নিরন্ন দরিদ্রের কুটীরে, মুমূর্ষু রোগীর শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়িয়ে অম্লানবদনে সেবা-শুশ্রূষা করছেন—এ দৃশ্যও সেদিন বিরল ছিল না। ব্রাহ্মণোচিত সরলতা ও তেজস্বিতা নিয়ে সমাজের সকল স্তরেই ছিল বিদ্যাসাগরের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। সর্বত্রই তাঁর স্নেহদৃষ্টি ছিল অবাধে প্রসারিত। সত্যই, এই সময়কার "বিদ্যাসাগরমূর্তি এতই সুন্দর, এতই চিত্তমুগ্ধকর যে, কি ইংরাজ কি বাঙালী যিনি দেখিতেন, তিনিই আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার কোমলতাময় বীরত্বব্যঞ্জক সে মুখমণ্ডলে প্রতিভার পরাক্রম পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তাঁহার সে মধুর লাবণ্যভরা মূর্তি সন্দর্শনে একদিকে যেমন হার্ডিঞ্জ, ড্যালহাউসি, ক্যানিং ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ইংরাজমণ্ডলী সম্মান সহকারে নতমস্তক হইতেন, অপর দিকে আবার দেশীয় রাজন্যবর্গ ও বঙ্গীয় লক্ষপতি জমিদারগণ তাঁহার আত্মীয়তা ও স্নেহদৃষ্টির অনুগত হইয়া চলিতে সুখানুভব করিতেন।"

এই ভাবেই সেদিন কর্মবীর বিদ্যাসাগর তাঁর চারদিকে অসংখ্য কর্মের আবর্ত রচনা করে, জ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তারে জীবনকে উৎসর্গ করে, বাঙালির সামনে যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার তুলনা কোথায়?

॥ বারো ॥

সংস্কৃত কলেজের উন্নতি হতে লাগল, কিন্তু এখানকার ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কি? একদিন চিন্তা করলেন বিদ্যাসাগর। এরা কি শুধু টোলের পণ্ডিত হয়েই জীবন কাটাবে? হিন্দু কলেজ এবং মাদ্রাসার পাশ-করা কৃতবিদ্য ছাত্ররা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী পেতো। সংস্কৃত কলেজের পাশ-করা কৃতবিদ্য ছাত্ররাই বা ঐ চাকরী পাবে না কেন? যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। বিদ্যাসাগর শিক্ষা-পরিষদের মারফৎ কর্তৃপক্ষের কাছে এই সম্পর্কে একখানি সুচিন্তিত চিঠি লিখলেন। সংস্কৃত কলেজের সম্মান ও ছাত্রদের ভবিষ্যতের ওপর তাঁর যে প্রখর দৃষ্টি ছিল, তা এই চিঠি থেকেই বোঝা যায়। সেই চিঠিতে বিদ্যাসাগর অধ্যক্ষ হিসাবে সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য ছাত্রদের এই বিষয়ে সমান সুযোগ ও সুবিধা দেবার কথা তুললেন। তাঁর অনুরোধ ব্যর্থ হয় নি। তারপর থেকে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের পরে ডেপুটিগিরি দেওয়া হতো।

বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষতায় সংস্কৃত কলেজের নাম ছড়িয়ে পড়ল।
কাশীতেও তখন একটি সরকারী সংস্কৃত কলেজ ছিল।
ব্যালাণ্টাইন তার অধ্যক্ষ। বিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ জে. আর. ব্যালাণ্টইন।
শিক্ষাপরিষদ আহ্বান করলেন তাঁকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করবার জন্যে। এই সম্পর্কে পরিষদ সরকারকে লিখলেন: "বর্তমান সুযোগ্য উদ্যোগী অধ্যক্ষের নিয়োগ অবধি সংস্কৃত কলেজে বহুবিধ গুরুতর সংস্কারের প্রবর্তন হয়েছে। ফল ভালোই হয়েছে। এখনকার তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়টি একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এখন যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা হবে, সে সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত-পণ্ডিতের মত জানবার জন্যে শিক্ষা-পরিষদ বিশেষ ইচ্ছুক।"

কর্তৃপক্ষ পরিষদের প্রস্তাবে রাজী হলেন। যথাসময়ে ডাঃ ব্যালান্টাইন এখানকার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করতে এলেন। বিদ্যাসাগরের নাম তাঁর অজানা ছিল না। সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে তাঁর সেই বিখ্যাত রিপোর্ট পড়া অবধি ডাঃ ব্যালান্টাইনও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে আগ্রহান্বিত ছিলেন। এইবার সেই সুযোগ চরিতার্থ হলো।

বিদ্যাসাগর ও ব্যালান্টাইন—এই দুই পণ্ডিতের মিলনের ফলেই কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনের পথ আরো প্রশস্ত হলো। বিদ্যাসাগরের রিপোর্ট পড়ে এই মানুষটি সম্বন্ধে ব্যালন্টাইন যে ধারণা করেছিলেন, প্রত্যক্ষ আলাপ-পরিচয় হবার পর এই শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিত বুঝলেন যে এই দেশী পণ্ডিতটির ব্রাহ্মণোচিত সরলতার পেছনে আছে এক সুকঠিন এবং অনমনীয় দৃঢ়তা। অধ্যক্ষ ব্যালান্টাইন আরো বুঝলেন যে, অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্পর্কে সত্যই গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং তাঁর সেই চিন্তাকে কার্যে রূপ দেবার উপযুক্ত সংগঠনী প্রতিভাও তাঁর যথেষ্ট আছে। ব্যালান্টাইন তাই বিদ্যাসাগর সম্পর্কে শ্রদ্ধা বোধ না করে পারলেন না। তাই তিনি সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে গিয়ে যথাসময়ে শিক্ষাপরিষদে একটি রিপোর্ট পাঠালেন। সেই রিপোর্টে তিনি অকুণ্ঠভাবেই লিখলেন: "পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের খ্যাতির কথা শুনিয়া এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে তৎপ্রদত্ত রিপোর্ট পাঠ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মিয়াছিল, এই সুধী অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ আলাপে আমার সে ধারণা দৃঢ়তর হইল, এই আলাপে আমি যথেষ্ট আনন্দলাভ করিলাম।"

আনন্দ প্রকাশ করলেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সংস্কৃত কলেজে নূতন প্রণালী প্রবর্তনের কথাও তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করলেন। বিশেষ করে তিনি লিখলেন, "কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজি এই উভয়বিধ পাঠ্যই পড়িতে হয় বটে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উভয় ভাষার শাস্ত্রের কোথায় মিল, কোথায় অমিল—তাহা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নিজেদের ঠিক করিয়া লইতে হয়। ছাত্রদের অবধারণ সন্তোষজনক নয়, কলেজের নির্দিষ্ট পাঠ্য ছাড়া অতিরিক্ত গ্রন্থের প্রচলন প্রয়োজন।"

যথাসময়ে পরিষদ ব্যালান্টাইনের এই রিপোর্ট বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বিশেষ যত্নের সঙ্গে সেই রিপোর্ট পড়লেন; কিন্তু রিপোর্টে

উল্লিখিত সব কথা মেনে নিতে পারলেন না। উত্তরে বিদ্যাসাগর লিখলেন : "ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক প্রচলন বিষয়ে আমি তাঁহার সঙ্গে একমত হইতে পারিলাম না।" ডাঃ ব্যালাণ্টাইন মিলের লজিকের একখানা সংক্ষিপ্তসার লিখেছিলেন; কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে তিনি সেই বইখানা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। মূল গ্রন্থের দাম বেশী—এই ওজুহাতেই তিনি এই প্রস্তাব করেছিলেন। বিদ্যাসাগর এর বিরোধিতা করে লিখলেন যে, সংস্কৃত কলেজে মিল পড়ান দরকার এবং সংক্ষিপ্তসার না পড়িয়ে মূল গ্রন্থখানাই পাঠ করা উচিত এবং সেই সঙ্গে তিনি এও উল্লেখ করলেন যে, "আমাদের ছাত্রদের প্রামাণিক গ্রন্থ-সমূহ একটু বেশী দাম দিয়াও কিনিবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কাজেই মূল্যাধিক্যের জন্য এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রচলন হইতে বিরত থাকিবার কারণ নাই।" রিপোর্টের উত্তরে বিদ্যাসাগর আরো লিখলেন : "ইংরেজি অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ বেদান্ত, ন্যায় ও সাংখ্য-দর্শনের তিনখানি পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তনের প্রস্তাবও তিনি করিয়াছেন। 'বেদান্তসার' পূর্ব হইতেই সংস্কৃত কলেজে পাঠ্যরূপে গৃহীত ; ইহার ইংরেজি অনুবাদ পড়ানো যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত ন্যায়-সম্বন্ধীয় 'তর্ক-সংগ্রহ' এবং সাংখ্য-সম্পর্কিত 'তত্ত্বসমাস' নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ, আমাদের পাঠ্যসূচিতে উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুস্তকের নির্দেশ আছে।" ব্যালাণ্টাইন বিশপ বার্কলের *Inquiry* বইখানা পাঠ্য করার প্রস্তাব করেছিলেন; বিদ্যাসাগর বললেন, এই বই পড়ালে সুফলের চেয়ে কুফলের সম্ভাবনাই বেশী। এই প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি ও বিশ্লেষণ বড় চমৎকার :

"কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত না পড়াইয়া উপায় নাই। সে সকল কারণের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই। মিথ্যা হইলেও হিন্দুর কাছে এই দুই দর্শন অত্যন্ত শ্রদ্ধার জিনিস। সংস্কৃতে যখন এগুলি শিখাইতেই হইবে, ইহাদের প্রভাব কাটাইয়া তুলিতে প্রতিষেধক রূপে ইংরেজিতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ানো দরকার। বার্কলের *Inquiry*, বেদান্ত বা সাংখ্যের মত একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে; য়ুরোপেও এখন আর উহা খাঁটি দর্শন বলিয়া বিবেচিত হয় না, কাজেই ইহাতে কোনক্রমেই সে কাজ চলিবেনা। তা ছাড়া, হিন্দু-শিক্ষার্থীরা যখন দেখিবে বেদান্ত ও সাংখ্য-দর্শনের মত একজন

য়ুরোপীয় দার্শনিকের মতের অনুরূপ, তখন এই দুই দর্শনের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা কমা দূরে থাকুক, বরং আরো বাড়িয়া যাইবে। এ অবস্থায় বিশপ বার্কলের গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলন করিতে আমি ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত একমত নহি।"

সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজি দুই-ই শিক্ষা দেওয়া হতো। ব্যালাণ্টাইন এটা পছন্দ করেন নি। অবশ্য ব্যবস্থার নিন্দা তিনি তাঁর রিপোর্ট করেন নি ; কিন্তু পরোক্ষে যা বললেন, সেটা মারাত্মক। "উভয়বিধ পাঠের ফলে 'সত্য দ্বিবিধ'—এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাত্রদের মনে জন্মিতে পারে"—ব্যালাণ্টাইন এই কথার উল্লেখ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তার উত্তরে লিখলেন : "আমার বিশ্বাস যে-লোক সংস্কৃত ও ইংরেজি—এই উভয় ভাষার বিজ্ঞান ও সাহিত্য বুদ্ধিমানের মত পাঠ করিয়াছে, বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে—তাহার সম্বন্ধে এরূপ ভয় করিবার কোন কারণ নাই। 'সত্য দুই রকমের' এই ভাব অসম্পূর্ণ ধারণার ফল। সংস্কৃত কলেজে আমরা যে শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে এইরূপ ফলের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই দূর হইবে। যেখানে দুইটি সত্যের মধ্যে প্রকৃতই মিল আছে, সেখানে সেই ঐক্য যদি কোন বুদ্ধিমান ছাত্র বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে সেরূপ ঘটনা সত্যই অদ্ভুত বলিতে হইবে। ধরা যাক, ইংরেজি ও সংস্কৃত—উভয় ভাষাতেই ছাত্রেরা লজিক, অথবা দর্শন বিজ্ঞানের যে-কোন বিভাগ অধ্যয়ন করিল। এখন যদি তাহারা বলে, 'লজিকের পাশ্চাত্ত্য থিয়োরিও সত্য, হিন্দু থিয়োরিও সত্য', অথচ যদি তাহারা উভয়ের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান না পায়, এবং না পাইয়া এক ভাষার সত্য অন্য ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, হয় তাহারা বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, না-হয়, সে-ভাষায় তাহারা নিজেদের ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম, সেই ভাষায় তাহাদের জ্ঞান অল্প।"

ব্যালাণ্টাইন তাঁর রিপোর্টে বললেন : "...এমন একদল লোক গড়িয়া তোলা দরকার, যাহারা পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় উভয় শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিবে, এবং উভয় দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিভাষী ব্যাখ্যাতার কার্য করিয়া উভয়ের মধ্যে যেখানে দৃশ্যত অনৈক্য, সেইখানে সত্যকার মিল দেখাইয়া দিয়া অনাবশ্যক কুসংস্কার দূর করিবে ; হিন্দুর দার্শনিক আলোচনা যে-সকল প্রাথমিক সত্যে

পৌঁছিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে তাহাদের পূর্ণতর বিকাশ দেখাইয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবে।”

উত্তরে বিদ্যাসাগর লিখলেন: “দুঃখের বিষয়, এ-বিষয়ে আমি ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত ভিন্ন মত। আমার মনে হয় না আমরা সকল জায়গায় হিন্দুশাস্ত্র ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের ঐক্য দেখাইতে পারিব। যদি বা ধরিয়া লওয়া যায়, ইহা সম্ভব, তবুও আমার মনে হয় উন্নতিশীল য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের তথ্য সকল ভারতীয় পণ্ডিতগণের গ্রহণযোগ্য করা দুঃসাধ্য। তাহাদের বহুকাল-সঞ্চিত কুসংস্কার দূর করা অসম্ভব।...পুরাতন কুসংস্কার তাহারা অন্ধভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে।”

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের এই যে বহুকাল-সঞ্চিত কুসংস্কার—বিদ্যাসাগরের প্রাগ্রসর চিন্তা তাঁহার পূর্বসূরী রামমোহনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে—এরই বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করতে সেদিন কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি। এই কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করা তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। তাই তিনি ভারতীয় পণ্ডিতগণের গোঁড়ামির সঙ্গে আরব দেশের মুসলমানদের গোঁড়ামির তুলনা করে এরই উত্তরে লিখলেন: “আমার বলিতে লজ্জা হয়, ভারতীয় পণ্ডিতদের বিশ্বাস, সর্বজ্ঞ ঋষিদের মস্তিষ্ক হইতে শাস্ত্র নির্গত হইয়াছে, অতএব শাস্ত্রসমূহ অভ্রান্ত। আলাপ অথবা আলোচনার সময় পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের নূতন সত্যের কথা অবতারণা করিলে, তাহারা হাসি-ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দেয়। সম্প্রতি ভারতবর্ষের এই প্রদেশে—বিশেষতঃ কলিকাতা ও তাহার আশেপাশে—পণ্ডিতদের মধ্যে একটি মনোভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে; শাস্ত্রে যাহার অঙ্কুর আছে, এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনিলে, সেই সত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা দেখান দূরে থাক, শাস্ত্রের প্রতি তাহাদের কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস আরো দৃঢ়ীভূত হয় এবং ‘আমাদেরই জয়’ এই মনোভাব ফুটিয়া উঠে। এই সব বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদের নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করাইবার কোন আশা আছে, এমন আমার বোধ হয় না।”

ডাঃ ব্যালাণ্টাইন চেয়েছিলেন দেশীয় পণ্ডিতদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে এবং তাঁর রিপোর্টে তিনি সে কথার উল্লেখও করেন। বিদ্যাসাগর এ ক্ষেত্রেও বিপরীত মত পোষণ করতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে তাঁর জন্ম, বার বছর সংস্কৃত লেখাপড়া শিখেছেন, তবু

তাঁর যুগ-সচেতন মন বর্তমান ধারাকে জীইয়ে রাখার পক্ষপাতী কিছুতেই ছিল না। তিনি তাঁর দূরদৃষ্টি বলে দেখতে পেয়েছিলেন যে, বাংলা দেশে যেখানেই শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে, সেইখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমে আসছে, তাঁদের কণ্ঠ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। তাই ব্যালান্টাইনের রিপোর্টে উল্লিখিত এই প্রসঙ্গের উত্তরে বিদ্যাসাগর লিখলেন : "আমি সযত্নে এখানকার (অর্থাৎ বাংলাদেশের) অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছি। এই দেশের স্থানীয় অবস্থার দরুণ শিক্ষাবিস্তার-কার্যে আমাদের ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছে·· দেশীয় পণ্ডিতদের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের প্রয়োজন নাই, কেননা আমরা তাঁহাদের কোনরূপ সাহায্য চাই না।···দেশীয় পণ্ডিতদের মনস্তুষ্টি না করিয়াও আমরা কি করিতে পারি, তাহা দেশের বিভিন্ন অংশে স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাই আমাদের শিখাইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার—ইহাই এখন আমাদের প্রয়োজন।"

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার—এত বড়ো বৈপ্লবিক চিন্তা সে যুগে একমাত্র বিদ্যাসাগরের মস্তিষ্কেই উদ্ভূত হয় এবং এই দিকে কাজ করতে হলে কি ভাবে অগ্রসর হতে হবে, তারো সঠিক ও নির্ভুল পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর উত্তরে লিখলেন : "আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করিতে হইবে, এইসব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে হইবে, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে পারে এমন একদল লোক সৃষ্টি করিতে হইবে। মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তি,—শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরণের দরকারী লোক গড়িয়া তোলাই আমার উদ্দেশ্য—আমার সঙ্কল্প। ইহার জন্য আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইবে।"

ব্যালান্টাইনের রিপোর্টের উত্তরে লেখা বিদ্যাসাগরের এই সুদীর্ঘ পত্রের একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ইতিপূর্বে সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কারে তিনি যতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, এইবার তাঁর এই উত্তরকে ভিত্তি করে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আরো অগ্রসর হবার সুযোগ পেলেন। এই মন্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সংস্কৃত-শাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল, অথচ আনুষঙ্গিক শাস্ত্রীয় গোঁড়ামি মোটেই ছিল না। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী এবং

অসাধারণ কর্মী। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-আহরণের পক্ষে প্রাচীন শাস্ত্রের ওপর অন্ধ ভক্তিই যে প্রধান অন্তরায়—এ কথা সেদিন বিদ্যাসাগর যেমন বুঝেছিলেন, এমন আর কেউ নয়। ভারতবাসীর মন পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পূর্ণ হয়ে উঠুক—এই-ই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা। সেই জন্যেই সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি-বিভাগের উন্নতি-কল্পে তিনি এত আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, শিক্ষার্থীদের মানসপরিমণ্ডল মুক্ত করবার উদ্দেশ্যেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে এমন সব ইংরেজি গ্রন্থের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করতে চেয়েছিলেন যাদের আদর্শ ও যুক্তিধারা বেদান্ত ও সাংখ্যের প্রভাব প্রতিহত করবে। তিনি তরুণ শিক্ষার্থীদের মনকে পরিশুদ্ধ, বুদ্ধিবাদী, সত্যনিষ্ঠ ও দেশীয় কুসংস্কারমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এই কারণেই তিনি জন ষ্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থাদির অধ্যয়ন অপরিহার্য বলে ঘোষণা করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি। তাই দেখতে পাই, হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মুখে সেকালের যে-উক্তি প্রতিধ্বনিত হতো, তারই অনুচ্চারিত প্রতিধ্বনি হিসেবে বিদ্যাসাগর শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক মোয়াট সাহেবকে এক পত্রে লিখছেন: "বাংলায় প্রকৃত অধিকার জন্মাইবার জন্য যদি সংস্কৃত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিতে পারি, এবং তাহার-পর যদি ইংরেজির সাহায্যে ছাত্রদের মনে বিশুদ্ধ জ্ঞানসঞ্চার করিতে পারি, তাহা হইলে জানিব যে আমার সংকল্প সিদ্ধ হইল।" নতুন দিনের জন্যে নতুন ধরণের শিক্ষক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর—প্রাচীন সংস্কারের ভারবাহী, নস্য-বিলাসী, আরাম-প্রয়াসী টুলো পণ্ডিতদের দিয়ে যে এ কাজ হবে না, তা তিনি অভ্রান্ত ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই বললেন: "মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল থেকে মুক্তি—শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই।" শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নীতি আজো প্রযোজ্য। পল্লবগ্রাহী জ্ঞান নয়, 'যথেষ্ট' জ্ঞান অর্থাৎ thorough knowledge দরকার—এই মূল্যবান কথাটি আজো তার কিছুমাত্র মূল্য হারিয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না।

সাংখ্য ও বেদান্ত বাতিল করবার মধ্যে বিদ্যাসাগরের ছিল না এতটুকু সংকোচ বা দ্বিধা। বিদ্যাসাগরের সমাজ-সচেতন রূপান্তরধর্মী সংবেদনশীল চিত্ত, তাঁর দেশবাসীর, বিশেষত পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিদের, কুসংস্কার ও গোঁড়ামিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। "ভারতবর্ষের পণ্ডিতদের গোঁড়ামি

আরবদেশের মুসলমানদের গোঁড়ামিরই সমতুল্য"—কতখানি শক্তি, দৃঢ়তা, সংকল্প ও দুঃসাহসের অধিকারী একজন মানুষের পক্ষে সমগ্র রক্ষণশীল পণ্ডিত-সমাজকে উপেক্ষা করে এ কথা বলা সম্ভব, তা শুধু কল্পনা করাই চলে, ব্যাখ্যা করা যায় না।

বিদ্যাসাগরের এই উত্তর, এই নির্ভীক মন্তব্য, এই যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ কিন্তু প্রসন্ন মনে গ্রহণ করলেন না। ইংরেজের ন্যায় বিচারে এবং এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে তাঁদের নীতির ওপর তাঁর বিশ্বাস ছিল। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর মতামত শিক্ষাপরিষদ বিবেচনা করবেন এবং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন। বিদ্যাসাগরের এ ধারণা ভেঙে গেল যখন তিনি তাঁর রিপোর্ট সম্পর্কে শিক্ষা-বিভাগ থেকে এই মন্তব্য পেলেন: "পরিষদ চান যে, অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ডাঃ ব্যালান্টাইনের সংক্ষিপ্ত-সার ও অন্যান্য গ্রন্থ অবাধে ব্যবহার করেন। তাঁহার অধীন শিক্ষকদের পাঠনার অন্তর্গত বিষয়-সমূহের অর্থ বুঝাইবার ও উদাহরণ দিবার জন্য এগুলি অত্যন্ত কাজে লাগিবে।...তাঁহার বিদ্যালয়ের উন্নতি সম্বন্ধে অধ্যক্ষ যেন ডাঃ ব্যালান্টাইনের সহিত সর্বদা পত্র ব্যবহার করেন—ইহাই শিক্ষাপরিষদের ইচ্ছা।"

স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের কাজে এই রকম হস্তক্ষেপ পছন্দ করলেন না। প্রাণপণ চেষ্টা করে সংস্কৃত কলেজ নতুন করে গড়বার কাজে তিনি নিজেকে একরকম উৎসর্গ করেছিলেন। তাই এমন সময় শিক্ষা-পরিষদের এই আদেশ তাঁহার ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করে তুললো। তিনি যা ঠিক বলে মনে করতেন, তার থেকে একচুলও নড়তেন না। পরিষদ-সম্পাদক ডাঃ মোয়াটকে বিদ্যাসাগর একখানা আধা সরকারী চিঠিতে লিখলেন: "ডাঃ ব্যালান্টাইনের রিপোর্ট সম্পর্কে শিক্ষাপরিষদের আদেশ স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম; সেই আদেশগুলি হুবহু প্রতিপালন করিতে গেলে, পরিষদের অনুমতিক্রমে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্প্রতি সংস্কৃত কলেজে প্রবর্তিত করিয়াছি, তাহাতে অযথা হস্তক্ষেপ করা হইবে। ফলে, কলেজে আমার অবস্থা কতকটা অপ্রীতিকর, এবং বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়াও ক্ষতিকর হইবে।...যে শিক্ষা-ব্যবস্থার আমি অনুমোদন করিতে পারি না তাহাই গ্রহণ করিতে, অথবা আমার সমপদস্থ অধ্যক্ষের সহিত

বিদ্যালয়ের উন্নতির সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহার করিতে বাধ্য হওয়ার মধ্যে মর্যাদাহানির যে কথা আছে, এমন একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে সেই ব্যক্তিগত কথা সম্প্রতি আমি মিশাইতে চাহি না; এই সব সর্তে কাজ করিতে কোন শিক্ষিত ইংরেজই রাজী হইত না।"

তখন গ্রীষ্মাবকাশের সময়। দীর্ঘ পত্র লিখবার সময় ছিল না। তাই বিদ্যাসাগর এই পত্রে তাঁর যা বক্তব্য ছিল সংক্ষেপে তার উল্লেখ করে, পরিষদের সম্পাদক ডাঃ মোয়াটকে স্পষ্টভাষায় তিনি জানিয়ে দিলেন যে, "বাংলায় যথার্থ অধিকারী করিবার জন্য যদি আমি সংস্কৃত শিখাইতে পাই, তারপর যদি ইংরেজির সাহায্যে ছাত্রদের মনে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার করিতে পারি এবং আমার কার্যে শিক্ষা-পরিষদের সাহায্য ও উৎসাহ পাই, তাহা হইলে এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন একদল যুবক তৈয়ারি করিয়া দিব, যাহারা আপনাদের ইংরেজি অথবা দেশীয় যে-কোন কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রদের অপেক্ষা ভালরূপে দেশের লোকের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিতে পারিবে—আমার এই একান্ত অভিলাষ—এই মহৎ উদ্দেশ্য কার্যকর করিবার জন্য আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা দিতে হইবে। ...আমাকে যদি অন্যের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—আমার কার্য শেষ হইয়াছে।"

শিক্ষা-পরিষদ বুঝলেন এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একটা আদর্শ নিয়ে কাজ করতে এসেছেন, নিছক চাকরীর মায়া তাঁর নেই। তিনি মানুষ গড়তে চান এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে চান—এর থেকেই কর্তৃপক্ষ বুঝলেন অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের কর্তব্যজ্ঞান যেমন গভীর, দায়িত্ববোধ তেমনি তীক্ষ্ণ। শিক্ষাপরিষদ আরো বুঝলেন যে, বিদ্যাসাগর তাঁর নীতিই অনুসরণ করতে চান এবং বিনা হস্তক্ষেপেই সংস্কৃত কলেজকে তাঁর নিজের মত করে গড়ে তুলতে চান, অন্যথায় তিনি পদত্যাগ পর্যন্ত করতে প্রস্তুত। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক চরিতকার লিখেছেন: "এই পত্রখানিতে সুফল ফলিয়াছিল। বিদ্যাসাগর নিজের ব্যবস্থিত শিক্ষা-প্রণালী যে সুফলপ্রসূ হইয়াছিল, তাহা না বলিলেও চলে। এই সাফল্যের একটি প্রধান কারণ,—নিজের ভাবে ঠিক ধরণের লোক বাছিয়া লইবার অদ্ভুত ক্ষমতা বিদ্যাসাগরের

ছিল। সংস্কারের ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল। শিক্ষাপরিষদ সন্তুষ্ট হইয়া বিদ্যাসাগরের বেতন বাড়াইয়া তিন শত টাকা করিয়া দেন।"

বিদ্যাসাগর-ব্যালাণ্টাইন প্রসঙ্গ আমরা একটু বিস্তারিত ভাবেই আলোচনা করলাম শুধু এই দেখাবার জন্যে যে বিদ্যাসাগর কতখানি স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং রাজকর্মচারীরা তাঁকে কতখানি সম্মান করে চলতেন। চাকরী তাঁর জীবনের ইষ্ট ছিল না, তাঁর লক্ষ্য ছিল নতুন যুগের বাংলার জন্যে নতুন মানুষ গড়ে তোলা। বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি—শিক্ষাকে ত্রিমুখী ধারায় দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত করিয়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর শিক্ষার ক্ষেত্রে সেদিন সত্যিই একটা যুগান্তর এনেছিলেন। তাই এখন থেকে শিক্ষা-বিষয়ক কাজে এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গেই পরামর্শ করতে কর্তৃপক্ষ আর দ্বিধা বোধ করলেন না। তাঁর যুক্তির সারবত্তা ও কর্তব্যে নিষ্ঠা দেখে শিক্ষাপরিষদের সদস্য ও বাংলার প্রথম ছোটলাট ফ্রেডারিক হ্যালিডে পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের মাইনে বৃদ্ধি পেয়ে হলো তিনশো টাকা। এটা অবশ্য মোয়াট সাহেবের জন্যেই হয়েছিল। কাজ ও দায়িত্বের তুলনায় অধ্যক্ষ যে সত্যি কম বেতন পান, এটা তিনিই উপলব্ধি করেন এবং তিনিই কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে বিদ্যাসাগরের মাইনে দেড় শোর জায়গায় তিনশো করিয়ে দিলেন। সেইসঙ্গে কলেজের উন্নতিসাধনের জন্যে তাঁকে আরো স্বাধীনতা দেওয়া হলো। এখন থেকে এই বিদ্যায়তনের বিধাতা-পুরুষ হিসাবে বিদ্যাসাগর দ্বিগুণ উৎসাহে কলেজের আভ্যন্তরীণ উন্নতিকল্পে নিজেকে নিয়োগ করলেন। তাঁর খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পড়লো, প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পেল।

॥ তেরো ॥

প্রতি বছর গরমের ছুটিতে বিদ্যাসাগর বাড়ি যেতেন।

বাড়িতে এসে তিনি যখন বাবাকে প্রণাম করতেন, বৃদ্ধ ঠাকুরদাস তখন তাঁর ছেলের দিকে চেয়ে দেখতেন আর ভাবতেন, এই সেই আট বছরের ছেলে যাকে নিয়ে তিনি একদিন কলকাতায় গিয়েছিলেন; অশেষ দুঃখ-দারিদ্র্যের ভেতর দিয়ে যাকে তিনি মানুষ করেছিলেন—সেই ছেলে আজ বঙ্গবিখ্যাত বিদ্যাসাগর—সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। পুত্রের গর্বে ঠাকুরদাসের বুক ভরে ওঠে। তাঁর ঈশ্বরচন্দ্র আজ জ্ঞান-ভগীরথ—সারা দেশে শিক্ষার ও জ্ঞানের নির্মল স্রোত প্রবাহিত করে নিয়ে চলেছেন। পিতার ভবিষ্যদ্বাণী আজ সার্থক। মায়েরও আনন্দের সীমা নেই। তাঁর সেই চপল-চঞ্চল দুরন্ত ঈশ্বর আজ কত বড়ো হয়েছে, লোকের মুখে শোনেন ছেলের কত খ্যাতি, কত প্রতিপত্তি। ইংরেজ রাজপুরুষেরা পর্যন্ত তাঁর ছেলেকে শ্রদ্ধা করে। ঈশ্বর এসে মায়ের চরণবন্দনা করেন। মা কুণ্ঠিত হন। বলেন, থাক, থাক। গণ্যমান্য ছেলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন—ভগবতী দেবী সঙ্কোচ বোধ না করে পারেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কাছে ইহজীবনে প্রত্যক্ষ ইষ্ট ছিলেন তাঁর মা এবং বাবা। বিপুল সাফল্যের জয়-তিলক তাঁর ললাটে, প্রচুর উপায় করেন, দানও করেন দু'হাতে—তবু পিতামাতার চরণবন্দনা না করলে বিদ্যাসাগরের চিত্ত কিছুতেই ভরে না। কলকাতার সহস্র কাজের মধ্যে থেকেও তিনি নিয়মিতভাবে পিতামাতার সংবাদ নিতেন, তাঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সর্বদাই তৎপর থাকতেন। গরমের ছুটির অবকাশ পেলেই তিনি ছুটে আসতেন বীরসিংহ গ্রামে, অধ্যক্ষের খ্যাতি প্রতিপত্তি সব কিছু পেছনে ফেলে তিনি আসতেন সহজ সরল পিতৃ-মাতৃভক্ত সন্তানের মত। সেই দারিদ্র্য-নিষ্পেশিত সংসার এখন নেই—বাপ, মা স্ত্রী, পুত্র, ভাই এবং ভ্রাতৃবধূ—একান্নবর্তী পরিবারের

অগাধ শান্তির নীড়ে বিদ্যাসাগর ফিরে আসতেন তাঁর স্বাভাবিক সরলতা নিয়ে।

সমস্ত বীরসিংহ গ্রামখানিই যেন অপেক্ষা করে থাকত এই সময়ে তাঁর আসার জন্যে। বীরসিংহের প্রাণ যে তিনি—তাই সেই মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর যখন আসতেন, রিক্ত হস্তে আসতেন না। "বিদ্যাসাগর মহাশয় বাড়িতে যাইলে, বীরসিংহ ও নিকটবর্তী গ্রামের দীনদরিদ্র অবস্থাহীন ব্যক্তিবর্গকে আপনার সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিতেন। সন্ধ্যার পর তিনি চাদরের খুঁটে টাকা বাঁধিয়া, লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়া গোপনে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেন। এইরূপ গোপনে অর্থ-সাহায্য করিবার কারণ এই যে, এই সকল লোক অবস্থা-হীন বটে, কিন্তু ভদ্র-পরিবারভুক্ত ; সুতরাং প্রকাশ্যে অর্থ-সাহায্যের প্রার্থনা করা নিশ্চিত তাহাদের পক্ষে ঘোরতর লজ্জাকর।" বিদ্যাসাগর তাদের এই লজ্জা দিতে চাইতেন না বলেই এইভাবে দান করতেন। পরিচিত অপরিচিত, গ্রামের কেউ-ই বড় একটা তাঁর দান থেকে বঞ্চিত হতো না। সেই জন্যে অনেকেই বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বিদ্যাসাগরের আসার প্রতীক্ষায় দিন গুণতো।

—দেশে একটা স্কুল করবি না, ঈশ্বর? একদিন জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুরদাস ছেলেকে।

—নিশ্চয়ই করবো, বাবা, উত্তর দিলেন কৃতী ছেলে।

গুরুমশাই করালীকান্তের পাঠশালায় গেলেন একদিন বেড়াতে বিদ্যাসাগর। সেই আটচালা ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে যেমন ছিল ছাব্বিশ বছর আগে, যখন তিনি এইখানে প্রথম লেখাপড়া শিখতে আসেন। দেশে এখন লোক বেড়েছে, একটা পাঠশালায় কুলোয় না, বুঝলেন বিদ্যাসাগর। শিক্ষার হোমানল জ্বালিয়ে তুলতে এসেছেন তিনি—নিজের জন্মভূমিকে কি বিদ্যাসাগর উপেক্ষা করতে পারেন?

গ্রামের প্রবীণদের সঙ্গে আলোচনা করলেন এই নিয়ে। তাদের বোঝালেন, যুগ পাল্টে যাচ্ছে, এখন আর পাঠশালার গণ্ডীর মধ্যে শিক্ষাকে ধরে রাখলে চলবে না—স্কুল চাই, রীতিমত স্কুল। কেউ খরচের প্রশ্ন তুললেন। বীরসিংহ তো আর তেমন বর্ধিষ্ণু গ্রাম নয়, টাকা দেবে কে? একটা পাঠশালা আছে,

তাই কোনো রকমে চলে, তার আটচালাটি বছরে একবার ভালো করে ছাওয়া হয় কিনা সন্দেহ। আর গুরুমশাইয়ের দিন তো চলে ছাত্রদের বাড়ি থেকে পাওয়া সিদেয়। এমন অবস্থায় একটা স্কুল—উঁহু, প্রবীণরা মাথা নাড়েন। বিদ্যাসাগর সব শুনলেন। তারপর যা করবার তিনি নিজেই করলেন, কারো মুখের দিকে চাইলেন না, কারো দরজায় চাঁদার খাতা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন না। এ তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন—একেবারে অবৈতনিক স্কুল। ছাত্রদের মাইনে লাগবে না। সকলে বিস্মিত। বিজ্ঞজনেরা ধন্য ধন্য করে বললেন—হ্যাঁ, একেই বলে বিদ্যা দান। বিদ্যাসাগর দীর্ঘজীবী হোন। বীরসিংহে বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁর এক জীবন-চরিতকার লিখেছেন :

"বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহ গ্রামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিদ্যালয়ে রাত্রিকালে কৃষকপুত্রেরা লেখাপড়া শিক্ষা করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের অর্থে বিদ্যালয়ের জমি ক্রয় করেন। বিদ্যালয়ের বাটী নির্মাণও তাঁহারই অর্থে হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং কোদাল ধরিয়া গৃহ নির্মাণের জন্য প্রথমে মৃত্তিকা খনন করিয়াছিলেন। এই সময়ে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ের ব্যয়-ভার তিনি সকলই বহন করিতেন। ...প্রতি মাসে বীরসিংহের বিদ্যালয়ে শিক্ষকাদির বেতন তিন শত টাকা ও শ্লেট পুস্তক প্রভৃতিতে এক শত টাকা ব্যয় হইত। বালিকা-বিদ্যালয় ও নৈশ বিদ্যালয়ের ব্যয় মাসে চল্লিশ হইতে পঁয়তাল্লিশ টাকার কমে হইত না।"

প্রশ্ন উঠতে পারে এত টাকা বিদ্যাসাগর পেতেন কোথায়? তাঁর মাসিক উপার্জন এখন তিন শো টাকা—তা'ছাড়া এই সময়ে বই বিক্রী বাবদও তিনি উপায় করতেন প্রচুর। সেই টাকা থেকেই তিনি এই খরচ বহন করতেন। শুধু কি স্কুল? গ্রামের গরীব লোকদের চিকিৎসার জন্যে একটা দাতব্য ঔষধালয়ও স্থাপিত করলেন। সকলেই বিনামূল্যে ওষুধ পেত। বিনা দর্শনীতে ডাক্তার চিকিৎসা করতেন। একান্ত অবস্থাহীন, দীন-দরিদ্র লোককে হাসপাতাল থেকে সাগু, বাতাসা প্রভৃতি দেবার ব্যবস্থাও ছিল। এর জন্যেও বিদ্যাসাগরের মাসে খরচ পড়ত এক শো টাকা। এই ভাবে দানের ভেতর দিয়েই বিদ্যাসাগর তাঁর উপার্জনকে সেদিন সার্থক করেছিলেন। ঐশ্বর্যকে কিভাবে সৎ কাজে নিয়োগ করে সার্থক করতে হয়, তারই মহৎ দৃষ্টান্ত সেদিন

স্থাপন করলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্র বিদ্যাসাগর। পরবর্তী কালে একাধিক বাঙালি সন্তান বিদ্যাসাগরের এই দৃষ্টান্ত দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

একবার গরমের ছুটিতে দেশের বাড়িতে ডাকাতি হলো। প্রায় সর্বস্বই লুণ্ঠিত হয়। বাড়ির সকলেই—বিদ্যাসাগর পর্যন্ত খিড়কীর দরজা দিয়ে পালিয়ে জীবন রক্ষা করেন। তাঁর এক জীবন-চরিতকার লিখেছেন, এই ডাকাতির ফলে তিনি সপরিবারে হৃতসর্বস্ব হন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এত বড় একটা বিপদেও বিদ্যাসাগর কিছুমাত্র বিচলিত হন নি। পরের দিন সকালবেলায় বন্ধু ও ভাইদের নিয়ে পরমানন্দে কপাটি খেলেছিলেন। যে দারোগা তদন্ত করতে এসেছিলেন, তিনি তাকে ঐ অবস্থায় দেখে অবাক্ হয়েছিলেন। হ্যালিডে তখন বাংলার ছোটলাট। ছুটীর পর বিদ্যাসাগর কলকাতায় ফিরে এসে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কথায় কথায় ডাকাতির কথা বললেন বিদ্যাসাগর। হ্যালিডে সব শুনে বললেন, আপনি তো বড় কাপুরুষ, বাড়িতে ডাকাত পড়লো, আর অমনি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলেন? উত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন, এখন তো এই কথা বলছেন, আর সেই ত্রিশ-চল্লিশ জন ডাকাতের সঙ্গে একাকী লড়াই করতে গিয়ে, আমি যদি মারা যেতাম, তাহলে আমার নির্বুদ্ধিতার কথা দেশময় ছড়িয়ে পড়তো। আপনিই হয়ত সকলের আগে এই কথা রটাতেন। হ্যালিডে সাহেবের মুখে আর কথা নেই। তারপর বিদ্যাসাগর বললেন, যখন প্রাণ নিয়ে আপনার কাছে আসতে পেরেছি, তখন লুণ্ঠিত সর্বস্বের জন্যে আর চিন্তা করি না। এ ঘটনা কিংবা এই উক্তি সত্য হতে পারে, কিংবদন্তীও হতে পারে।
বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিতকারগণ তাঁর সম্পর্কে এমন বহু অবিশ্বাস্য ঘটনার উল্লেখ করে গেছেন যেগুলিকে কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এইসব কিংবদন্তীর একটা সুবিধা এই যে, এইগুলি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, অথচ যাঁকে কেন্দ্র করে এর সৃষ্টি, তাঁর চরিত্রকে এর দ্বারা অনেকটা বড়ো করে দেখাবার সুবিধা হয়। বাংলা দেশে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ—বহু লোকোত্তর জীবনেই এই রকম অজস্র কিংবদন্তীর সমাবেশ দেখা যায়। বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের জীবনে। কোন যুগ-মানবের চরিত্রকে যদি এই রকম কিংবদন্তীর সাহায্যে বড় করে দেখাতে

হয়, তাহলে সে চরিত্রের মূল্য কোথায় রইলো? তবে এই সঙ্গে এ কথাও বলা যেতে পারে যে, আধুনিক ইতিহাস-বিজ্ঞানের মতে কিংবদন্তীও ইতিহাসের একটি বিশেষ উপাদান। কিংবদন্তী একেবারে কাল্পনিক বস্তু নয়; এর মূলে কিছুটা সত্য থাকতে পারে এবং পরবর্তী কালে তার অতিরঞ্জন স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘন করে এমন অস্বাভাবিক এবং অবাস্তব রূপ ধারণ করে যে, তখন মানুষের কাছে তার মূল্য অল্পই থাকে। বৃহৎ চরিত্র এবং মহৎ চরিত্রের মানুষ মাত্রেই কিংবদন্তীর জন্ম দিয়ে থাকেন। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে এর যে একটু বাহুল্য ঘটেছে, তা আমরা নির্ভয়েই উল্লেখ করতে পারি। বিদ্যাসাগরের জীবনের আট আনা ঘটনাই যে জনশ্রুতি নয়, তা বলা শক্ত—তবু এতে বিদ্যাসাগরের বিদ্যাসাগরত্ব কিছুমাত্র হানি হয় না। কেননা, যে মানুষের চিন্তা ও চরিত্রের ভেতর দিয়ে একটা যুগ সক্রিয় হয়ে উঠবে, তাকে কেন্দ্র করে এমন দু'চারটা কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়ে থাকেই। বিদ্যাসাগর আমাদের কাছে 'সংস্কৃতের ঘিয়ে ভাজা ইংরেজি ডিম্' মাত্র নন, পবিত্র নির্মাল্য স্বরূপ। বাঙালি চিরদিনই সেই নির্মাল্যকে পরম শ্রদ্ধায় মাথায় করে রাখবে, কিংবদন্তী বলে উপেক্ষা করবে না।

জ্ঞান-ভগীরথ বিদ্যাসাগরের খ্যাতি আরেক ক্ষেত্রে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠলো বাংলার সমাজে। তিনি দয়ার সাগর। তিনি দানের সাগর। জাতিবর্ণনির্বিশেষে যাচিত-অযাচিতের কাছে তাঁর অকৃপণ হাতের দান তাঁর ললাটে এঁকে দিলো মহাপ্রাণতার জয়-তিলক। আশৈশব দরিদ্র তিনি, তাই দরিদ্রের ব্যথা বিদ্যাসাগর যেমন বুঝতেন, এমন আর কেউ সে'দিন বুঝতনা। কলকাতার সমাজের এদিকে ওদিকে তখন কত ধনী, কোম্পানীর আমলের কত নতুন বড়লোক—কিন্তু তাঁরাও লজ্জা পেতেন এই মহাপ্রাণের অযাচিত দানের কাছে। সে-দানের জয়-ডঙ্কা ঘোষিত হতো না, তবু কলকাতার লোকের মুখে মুখে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে কীর্তিত হতে লাগল। এই দানশীলতা সাগর-চরিত্রকে করে তুললো মহৎ ও সুন্দর। তাঁর জীবনে দানের কাহিনী অজস্র। বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সেই সময়কার একটি কাহিনী (এই কাহিনীটি বিদ্যাসাগরের কোন জীবন-চরিতে উল্লিখিত হয় নি—এটি লেখকের নিজস্ব সংগ্রহ) এইখানে আমরা লিপিবদ্ধ করলাম।

একদিন বিদ্যাসাগর চলেছেন আমহার্স্ট ষ্ট্রীট সংলগ্ন সরু গলি নরসিংহ লেন দিয়ে কলেজ স্কোয়ারের দিকে। গলির প্রায় শেষ মুখে, একটি বাড়ি থেকে হঠাৎ নারী-কণ্ঠের বিলাপ তাঁর কাণে এলো। চকিতে বিদ্যাসাগরের দুটি পায়ের গতি শ্লথ হলো। উৎকর্ণ হয়ে তিনি শুনলেন ক্রন্দনরত ছেলেদের খাবার কিনে দেবার মতো হাতে একটিও পয়সা নেই বলে মা নিজের দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিচ্ছেন। দয়ারসাগর আর স্থির থাকতে পারলেন না, তিনি গিয়ে সেই ঘরের দরজার কড়া নাড়লেন। দরিদ্র গৃহস্থ-মহিলার স্বামী পয়সার চেষ্টাতেই কিছুক্ষণ আগে বের হয়ে গিয়েছিলেন, তিনিই ফিরে এসেছেন মনে করে গৃহিণী তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন। কিন্তু সম্মুখে একজন অপরিচিত লোককে দেখে একটু বিব্রত বোধ করলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে কোন কথা বলবার অবসর না দিয়েই একখানা দশ টাকার নোট তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—এই সামান্য কিছু দিয়ে গেলুম মা, এখনই ছেলেদের জন্যে খাবার আনিয়ে দাও। কুলবধূ একেবারে অবাক। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কম্পিতকণ্ঠে শুধু উচ্চারিত হলো দুটি কথা—আপনি কে বাবা? উত্তর হলো—আমি তোমার আরেক ছেলে মা। আমার নাম বিদ্যাসাগর। আবার যদি কখনো এ রকম কষ্টে পড়, আমায় জানিও। এই আমার ঠিকানা রইল। কথা শেষ করেই তিনি চলে গেলেন। কে বিদ্যাসাগর, কি বিদ্যাসাগর, ভদ্রমহিলা তার কিছুই জানেন না, শুধু দেখলেন যে এক দেবতা নিজে যেচে এসে তাঁকে দয়া করে গেলেন। বিদ্যাসাগরের দানের এই ছিল রীতি। মানুষের দুঃখের কথা শুনবার জন্যে বিদ্যাসাগরের কান সর্বদা সজাগ থাকত।

বিদ্যাসাগরের কৃতজ্ঞতাও প্রসিদ্ধ।
যেখানে যার কাছে জীবনে যৎটুকু অনুগ্রহ বা সাহায্য পেয়েছেন, তিনি কখনো তা বিস্মৃত হন নি। দয়েহাটার সিংহী বাড়ির রাইমণি দিদিকে বিদ্যাসাগর কোন দিনই ভোলেন নি। ভোলেন নি সেই মহীয়সী নারীর স্নেহ-মমতার কথা। তাঁর পুত্র, তাঁরই সমবয়সী গোপালের কথা। রাইমণির স্নেহ-ভালবাসার কথা বিদ্যাসাগরের স্মৃতিতে চিরদিন জাগরূক ছিল। তিনি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে অনেক বার এই স্নেহময়ী নারীর কথা উল্লেখ করতেন—জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও করতেন। রাইমণি প্রবাস-সমাগত

ঈশ্বরচন্দ্রের দিদির স্থান অধিকার করে, তাঁর অতুলনীয় স্নেহ যত্ন দিয়ে কিভাবে তাঁর কিশোর-হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করেছিলেন, বিদ্যাসাগরের জবানবন্দীতে আমরা সে কথা আগেই বলেছি। রাইমণির দয়া ও সৌজন্য বালক-বিদ্যাসাগরের প্রবাস-জীবনকে যে সুখময় করে তুলেছিল এবং তাঁকে যে বিদ্যাসাগর দেবীর মতো শ্রদ্ধা করতেন—সে শ্রদ্ধা তিনি শুধু মুখের কথায় প্রকাশ করেন নি, কাজেও তার প্রমাণ দিয়েছিলেন। কতটুকু বয়সেই বা বিদ্যাসাগর কলকাতায় পড়তে এসেছিলেন! আর কলকাতার মতো প্রলোভনপুর্ণ শহরে তিনি যে সুরক্ষিত ছিলেন, তা অনেকটা রাইমণির স্নেহের গুণে। এই স্নেহ বিদ্যা-সাগরের বালকজীবনে এক মহা রক্ষাকবচের মত হয়েছিল—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই স্নেহের ঋণ পরিশোধ করতে বিদ্যাসাগর তাই কোন দিন পরাঙ্মুখ হন নি। রাইমণির একমাত্র ছেলে গোপালচন্দ্র ঘোষকে তিনি আজীবন বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং বন্ধুর জন্যে বন্ধুর যা করা দরকার, তা অকুণ্ঠিত চিত্তেই করতেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা, কালক্রমে সিংহী বাড়ির যখন ভাগ্য-বিপর্যয় হয়, তখন বিদ্যাসাগর যশ ও ঐশ্বর্যের শিখরে। সেই অবস্থায়ও তিনি তাঁর এবং তাঁর পিতার প্রতিপালকের কন্যা রাইমণিকে নিয়মিতভাবে মাসোহারা দিতেন। লোকের হাত দিয়ে না পাঠিয়ে এই টাকা তিনি নিজে গিয়ে দিদির হাতে দিয়ে আসতেন। এই ভাবেই বিদ্যাসাগর বাঙালিকে দয়া ও কৃতজ্ঞতার ধর্ম শিখিয়ে গেছেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হবার পর থেকেই বিদ্যাসাগরের সমস্ত চিন্তা একটি বিন্দুতে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। শিক্ষা এবং শিক্ষাবিস্তার—এ ছাড়া তাঁর তখন দ্বিতীয় চিন্তা ছিল না। এবং এই শিক্ষাবিস্তার বলতে তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি—এই তিনটি ভাষায় যুগপৎ শিক্ষাবিস্তার করার কথাই বুঝতেন। সরকারী শিক্ষানীতির সঙ্গে তাঁর শিক্ষানীতির প্রবল পার্থক্য ছিল এইখানেই। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন ভারতবাসীর শিক্ষার দিকে ভারত সরকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। রাজদণ্ড হাতে পেয়ে বণিকজাতি যখন শাসকের স্থান নিল, তখন তারা নিজেদের স্বার্থই বেশী করে বুঝতো, এ দেশের লোকের শিক্ষা-সম্পর্কিত প্রয়োজন সম্পর্কে তারা উদাসীন ছিল বললেই হয়। শিক্ষা বলতে তাঁরা ইংরেজী শিক্ষাই বুঝতেন

এবং এ দেশের লোককে ইংরেজি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলার মধ্যে আসল উদ্দেশ্য ছিল তাদের শাসনকার্যে সহায়তা করতে পারে, এমন এক শ্রেণী তৈরি করা। সংস্কৃত ও আরবির জন্যে সামান্য টাকা ব্যয় করতেন। বিদ্যাসাগরের জন্মের পনর বছর পরে আমরা দেখতে পাই গভর্ণর-জেনারেল বেন্টিঙ্ক বিলাতে কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টরদের কাছে লিখছেন: "ভারতবাসী জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রচারই বৃটিশ-রাজের মহৎ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং শিক্ষা বাবদ সকল মঞ্জুরী অর্থ শুধু ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলেই ভালো হয়।" ভারতে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে বেন্টিঙ্কের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুতর হয়েছিল এবং সেই সময় থেকে তাঁদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় গভর্ণমেন্ট ইংরেজি ভাষাকেই প্রাধান্য দিলেন, উৎসাহ দিলেন। বেন্টিঙ্কের এই নতুন ব্যবস্থায় উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষা-সম্পর্কিত অভাব কিছুটা দূর হলো বটে, কিন্তু জনসাধারণ তাদের দাবী তুললো মাতৃভাষায় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্যে। সেই দাবীতে বলা হলো যে ইংরেজি, সংস্কৃত বা আরবির ভাষার ভেতর দিয়ে দেশের লোককে শিক্ষিত করে তুলতে পারা যাবে না—মাতৃভাষার সাহায্যেই জনসাধারণ জ্ঞান লাভ করে।

এই অবস্থায় এ দেশে এলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। তাঁর প্রথম উদ্যোগ বাংলা বিহার উড়িষ্যার নানা স্থানে একশো একটি পল্লী পাঠশালা স্থাপন। এখনও খুঁজলে পরে বাংলা দেশের কোন না কোন স্থানের স্কুলের জীর্ণ প্রস্তর-ফলকে 'হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয়'—এই কথা উৎকীর্ণ রয়েছে দেখা যাবে। এর জন্যে গভর্ণমেণ্টের মাসে খরচ হতে লাগল দু'হাজার টাকা করে। হার্ডিঞ্জের এই উদ্যোগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন বিদ্যাসাগর—এ কথার উল্লেখ আগেই করেছি। বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার। এই পাঠশালাগুলির উন্নতির জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন। এই সব পাঠশালার জন্যে শিক্ষক নির্বাচনের ভার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল ও বিদ্যাসাগরের ওপর ছিল। কিন্তু চার বছর যেতে না যেতেই দেখা গেল পাঠশালাগুলো ঠিকমতো চলছেনা। না আছে পাঠ্যপুস্তক, না আছে উপযুক্ত শিক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক। সরকারের উৎসাহ শিথিল হলো; তাঁরা ঘোষণা করলেন: সফলতা অসম্ভব, বাংলা পাঠশালাগুলির কোনো আশা নেই।

বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে সরকারী ভাবে আর কিছু করার আগ্রহ দেখা গেল না। অথচ দেখা গেল যে ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলে (উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে) দেশীয় ভাষায় শিক্ষা-প্রণালী অপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। বড়লাট এ বিষয়ে একটা রিপোর্ট পেলেন এবং সেই রিপোর্ট পেয়ে তিনি বাংলা সরকারকে ঐ বিষয়ে মতামত জানাতে অনুরোধ করলেন। বাংলা গভর্ণমেণ্ট তখন বাংলা শিক্ষা-প্রণালী সম্পর্কে একটা খসড়া তৈরি করবার জন্যে শিক্ষাপরিষদকে লিখলেন। এমন সময়ে বাংলার প্রথম ছোটলাট হয়ে এলেন ফ্রেডারিক জে হ্যালিডে। শিক্ষাপরিষদের সদস্যও ইনি ছিলেন। হ্যালিডে শিক্ষাপরিষদের কাছ থেকে কাগজপত্র চেয়ে নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে এবং বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিশেষভাবে পরামর্শ করে বড়লাটকে এক ডেসপ্যাচে লিখলেন:

"বাংলাদেশে অসংখ্য দেশীয় ধরণের পাঠশালা আছে।...পাঠশালাগুলির অবস্থা অতি শোচনীয়, কারণ শিক্ষকের কার্য অতি অযোগ্য লোকের হাতেই গিয়া পড়িয়াছে। পাঠশালাগুলিকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইলে কতকগুলি মডেল স্কুলের ব্যবস্থা করা দরকার। এই মডেল স্কুলগুলি পরিদর্শন করিলে পাঠশালার গুরুমহাশয়দের উপকার হইবে।...এই বিষয় সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের সুদক্ষ অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা একটি মন্তব্য সংযুক্ত হইল। এ কথা সকলেই জানেন, ইনি বাংলা-শিক্ষা প্রচারকার্যে বহুদিন হইতেই অত্যন্ত উৎসাহী। সংস্কৃত কলেজে নবব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়া এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য প্রাথমিক পুস্তক-সমূহ রচনা করিয়া এ-সম্বন্ধে ইনি যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন। ...শিক্ষক তৈয়ারি করিবার জন্য নর্মাল স্কুলের প্রয়োজনীয়তার কথা কিছু বলি নাই। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষায় এখন বেশ ভাল শিক্ষক গড়িয়া উঠিতেছে। বর্তমান অধ্যক্ষের হাতে পড়িয়া সংস্কৃত কলেজ বাংলা দেশে নর্মাল স্কুলের স্থান অধিকার করিয়াছে।"

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, বিদ্যাসাগরের সুচিন্তিত মন্তব্যের ওপর নির্ভর করেই হ্যালিডে এই রিপোর্ট লিখেছিলেন। পরবর্তী কালে বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি-সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের নির্দেশ বহুল পরিমাণেই গৃহীত হয়। বিদ্যাসাগরের সেই সুচিন্তিত মন্তব্যের খানিকটা এইখানে তুলে দিলাম:

"সুবিস্তৃত এবং সুব্যবস্থিত বাংলা-শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কেননা মাত্র ইহারই

সাহায্যে জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব। লেখা, পড়া, আর কিছু অঙ্ক শেখাতেই এই শিক্ষা পর্যবসিত হইলে চলিবে না ; শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থ-বিদ্যা, নীতি-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, এবং শারীরতত্ত্ব শেখানো প্রয়োজন। প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক কিছু রচিত হইয়াছে ; পাটীগণিত. জ্যামিতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি রচিত হইতেছে। ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ ইত্যাদি এখনো রচনা করিতে হইবে। বর্তমানে ভারতবর্ষ, গ্রীক, রোম এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস হইলেই চলিবে। একজন শিক্ষক হইলে চলিবে না ; প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্তত দুইজন করিয়া শিক্ষক চাই। স্কুলগুলিতে সম্ভবত তিনটি হইতে পাঁচটি করিয়া শ্রেণী থাকিবে। পণ্ডিতদের মাহিনা কমপক্ষে ৩০৲, ২৫৲ অথবা ২০৲ টাকা হওয়া চাই ; পরে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে একজন হেড-পণ্ডিত রাখার প্রয়োজন হইবে। শিক্ষকেরা যাহাতে নিয়মিতভাবে বেতন পান তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর—এই চারিটি জেলা বর্তমান কাজের জন্য নির্বাচিত করিয়া লইতে হইবে। উপস্থিত পঁচিশটি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত। প্রয়োজনানুসারে জেলা চারিটির মধ্যে এইগুলি ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। নগর এবং গ্রামের এমন স্থানে স্কুল স্থাপন করিতে হইবে যেন তাহার নিকটে কোন ইংরেজি কলেজ বা স্কুল না থাকে।...কর্মকুশল সুদক্ষ তত্ত্বাবধানের উপরও বটে, এবং কৃতবিদ্য ছাত্রদের উৎসাহদানের উপরও বটে, বাংলা-শিক্ষার সাফল্য বহুপরিমাণে নির্ভর করে। দুইজন তত্ত্বাবধায়ক রাখা প্রয়োজন। তাঁহাদের কাজ হইবে ঘন ঘন স্কুলগুলি পরিদর্শন করা, শ্রেণীগুলির পরীক্ষা লওয়া এবং শিক্ষা-প্রণালী সংশোধন করা। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইবেন।...গ্রন্থ-প্রণয়ন, এবং পুস্তক ও শিক্ষক নির্বাচনের ভার প্রধান তত্ত্বাবধায়কের উপর থাকিবে। সংস্কৃত কলেজ সাধারণ শিক্ষার এক কেন্দ্রভূমি হইয়াও বাংলা শিক্ষক গড়িবার জন্য নর্মাল স্কুলরূপে পরিগণিত হইবে। ...গুরুমহাশয়-চালিত এখনকার পাঠশালাগুলি কোনো কাজেরই নয়। যে-কাজে তাহারা অযোগ্য, এই সকল শিক্ষক সেই কাজ হাতে লওয়াতে পাঠশালাগুলির অবস্থা শোচনীয়।...প্রকৃতপক্ষে পাঠশালাগুলি যাহাতে প্রয়োজনসাধক বিদ্যালয়রূপে গড়িয়া উঠে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।"

বাংলা দেশে সেদিন দেশীয় ভাষায় শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর-হ্যালিডের সংযোগ এক ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়েই দেখা দিয়েছিল। সংস্কৃত কলেজের প্রতি গভর্ণমেণ্টের সপত্নীসুলভ প্রীতি বিদ্যাসাগরের অজানা ছিল না; বাংলা-ভাষা সম্পর্কে তাঁদের ঔদাসীন্যের মোড় ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে সেদিন এই বিদ্যাসাগর-হ্যালিডে সংযোগ সত্যই কার্যকরী হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের শক্তি সম্বন্ধে হ্যালিডের খুব শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধা থেকেই বন্ধুত্বের উৎপত্তি হয়। অনেক সময়ে বিদ্যাসাগর এবং হ্যালিডে দুজনে একসঙ্গে বসে শিক্ষা-সম্পর্কে নানা বিষয়ের আলোচনা করতেন। পণ্ডিতের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টি দেখে ছোটলাট মুগ্ধ হতেন। তাই হ্যালিডে ছোটলাটের গদীতে বসেই বিদ্যাসাগরের ওপর প্রস্তাবিত মডেল বঙ্গবিদ্যালয়গুলির স্থান-নির্বাচনের ভার দিলেন।

বিদ্যাসাগরের কাজ বাড়ল।

কলেজের অধ্যক্ষ-পদের গুরুভার দায়িত্বের সঙ্গে তিনি হৃষ্টচিত্তে এই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ছুটির অবসরে প্রায় এক মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর হুগলী জেলার বারটি গ্রাম পরিভ্রমণ করে ছোটলাটের কাছে রিপোর্ট পাঠালেন। সেই রিপোর্টে তিনি লিখলেন যে প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীদের স্কুল-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ আছে। হুগলী জেলার অন্যান্য স্থান, নদীয়া, বর্ধমান ও ২৪ পরগণায় স্কুল-প্রতিষ্ঠার উপযোগী গ্রামগুলি সম্বন্ধে তিনি সযত্নে নানারূপ তথ্য কলকাতায় বসেই সংগ্রহ করেছিলেন। রিপোর্টের শেষে লিখলেন: "বিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য যেমন অনুমতি পাওয়া যাবে, স্কুল-ঘর তৈয়ারি করিবার জন্য দু-তিন মাস অপেক্ষা না করিয়া, আমার নির্বাচিত স্থানগুলিতে অমনি যেন স্কুল-খোলা হয়।"

এই সময়ে বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিল।

শিক্ষা-পরিষদ উঠে গিয়ে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসন সংস্থার সৃষ্টি হলো।

কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করবার উদ্দেশ্যে এক কমিটি গঠিত হলো।

বিদ্যাসাগর এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি এর 'ফেলো' নিযুক্ত হয়েছিলেন। এক কথায় বলতে

গেলে বাংলাদেশে শিক্ষা-বিস্তারের যেন এক বিরাট যজ্ঞ আরম্ভ হলো। সেই যজ্ঞশালায় সেদিন সর্বপ্রধান ব্যক্তিরূপে বিদ্যাসাগরের সংগঠনী প্রতিভা কী পরিমাণ কার্যকরী হয়ে পরবর্তীকালের শিক্ষা-বিস্তারের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল, সে কাহিনী বাংলাদেশের শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

॥ চৌদ্দ ॥

বাংলায় শিক্ষা-বিস্তারের বিরাট যজ্ঞ শুরু হলো।

বিদ্যাসাগর একাই তার হোতা এবং পুরোধা।

এডুকেশন কাউন্সিল উঠে গিয়ে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন্ হলো।

ডাঃ মোয়াটের বদলে তরুণ সিবিলিয়ান ডাব্লিউ গর্ডন ইয়ং প্রথম ডিরেক্টর হলেন।

তবু হ্যালিডে অনুভব করলেন, যদি বাংলা দেশে বাংলা-শিক্ষার ব্যবস্থা সবল করে তুলতে হয়, তাহলে বিদ্যাসাগরের মতো লোকের সাহায্য ছাড়া সে কাজ অসম্ভব। ডিরেক্টর বিদ্যাসাগরকে অস্থায়িভাবে স্কুল পরিদর্শকের কাজ দিতে চাইলেন। হ্যালিডের এ ব্যবস্থা মনঃপুত হলো না। তিনি লিখলেন: "অস্থায়িভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে নিযুক্ত করিয়া কোনো লাভ নাই। ঈশ্বরচন্দ্র দৃঢ়চিত্ত লোক। তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে দিতে হইবে।...বাংলা-শিক্ষার ব্যবস্থা অতি গুরুতর বিষয়। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কতকগুলি সুচিন্তিত মত আছে।...এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের একজন প্রধান উদ্যোগীকে না পাইলে, এই ব্যবস্থা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। বিদ্যাসাগরের মতো বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোককে একটা অস্থায়ী পদে নিযুক্ত করিবার আমি বিরোধী।...এরূপ নিয়োগ তাঁহার চরিত্র ও গুণের যোগ্য হইবে না।...আমার মত এই, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মাকে এখনই অনুমোদিত ব্যবস্থা-অনুসারে কাজ করিতে নির্দেশ করা হউক...সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে বেতন ছাড়া, পণ্ডিত এই কাজ করিবার কালে মাসিক দুইশত টাকা এবং যাতায়াতের পথ-খরচা পাইবেন।"

হ্যালিডের প্রস্তাবই গৃহীত হলো।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে তরুণ সিবিলিয়ান ইয়ং সাহেবকে যখন শিক্ষা বিভাগের শীর্ষস্থানে বসান হয়, তখনই বিদ্যাসাগর গভর্ণর হ্যালিডেকে বলেছিলেন, একজন পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন প্রবীণ লোককে ডিরেক্টর করা উচিত ছিল। অবশ্য সকল দিক বিবেচনা করে এ কথা বলা যেতে পারে যে ঐ পদ বিদ্যাসাগরেরই ন্যায্যতঃ প্রাপ্য ছিল। তবু যখন কার্যকালে একজন শ্বেতাঙ্গকে ঐ দায়িত্বজনক পদে নিযুক্ত করা হলো, তখন বিদ্যাসাগর এর প্রতিবাদ না করে পারেন নি—যদিও সে ছিল পরোক্ষে মৃদু প্রতিবাদ। হ্যালিডে বিদ্যাসাগরকে বোঝালেন, তিনি নিজেই সব করবেন, মিষ্টার ইয়ং উপলক্ষ মাত্র। উপরন্তু তরুণ ডিরেক্টরকে কাজকর্ম শেখাবার ভার তিনি দিলেন বিদ্যাসাগরের উপর।

বিদ্যাসাগর দক্ষিণ-বাংলার স্কুলগুলির স্পেশ্যাল ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হলেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে তিন্‌শো, আর এই নূতন পদের জন্যে দুশো—মোট মাইনে হলো পাঁচশো টাকা। হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলায় স্কুল স্থাপন ও পরিদর্শন করাই হলো ইনস্পেক্টারের কাজ। নূতন দায়িত্ব নিয়েই বিদ্যাসাগর নিজের সহকারী বেছে নিলেন এবং মডেল স্কুল স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করবার জন্যে তাঁদের মফঃস্বলে পাঠালেন। প্রস্তাবিত নতুন বাংলা স্কুলগুলোর জন্যে শিক্ষক-নির্বাচন করাই হলো তাঁর প্রথম কাজ। বিদ্যাসাগর জানতেন, এই সব শিক্ষকের উপযুক্তরূপ জ্ঞানের ওপরই সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করছে। এ বিষয়ে তাঁর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ অত্যন্ত সুচিন্তিত। বাংলা শিক্ষক নির্বাচনের জন্যে বিদ্যাসাগর প্রথমেই একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। পরীক্ষা হবে সংস্কৃত কলেজে। নোটিশ বেরুল। পরীক্ষা দেবার জন্যে প্রায় দুশো আবেদন এলো বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তাদের পরীক্ষা গ্রহণ করলেন। দেখলেন—শিক্ষক হিসাবে সব অচল; আর কিছু শিক্ষা না পেলে তাদের মধ্যে খুব কম লোকেই মডেল স্কুলগুলোর ভার নিতে সক্ষম হবে। তখনই প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল একটি নর্মাল স্কুলের—যেখানে শিক্ষকদের উপযুক্ত ট্রেনিং দেওয়া হবে। হিন্দু কলেজের সংশ্লিষ্ট একটি বাংলা স্কুল ছিল—পাঠশালা। মডেল স্কুল স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়ে

বিদ্যাসাগর এই 'পাঠশালা' তাঁর তত্ত্বাবধানে নিয়ে এলেন। নর্মাল স্কুল স্থাপন সম্পর্কে ডিরেক্টরকে বিদ্যাসাগর একখানা চিঠি লিখলেন। এই চিঠির শেষে আছে :

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সর্বজনবিদিত সম্পাদক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন—ইহাই আমার অভিমত।...দ্বিতীয় শিক্ষক হিসাবে আমি পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির নাম উল্লেখ করি।"

গভর্নমেণ্ট ও ডিরেক্টর দুজনেই বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর প্রস্তাবে লিখেছিলেন যে, ছ মাস অন্তর ষাটটি করে গুণী শিক্ষক স্কুল থেকে বেরুবে; তুলনায় মাসিক পাঁচশো টাকা খরচ কিছুই নয়। যথাসময় বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে নর্মাল স্কুল খোলা হলো। অক্ষয়কুমার হেড মাষ্টার হলেন। আলাদা বাড়ি না পাওয়ায় নর্মাল স্কুলের কাজ সকাল-বেলায় সংস্কৃত কলেজের প্রশস্ত ভবনে সম্পন্ন হতো। অক্ষয়বাবুকে যে হেড মাষ্টার করা হলো—এ কথা তাঁর জানা ছিল না। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই তিনি এই খবর পান। বিদ্যাসাগর তাঁকে পূর্বাহ্ণে না জানিয়েই ডিরেক্টরের কাছে অক্ষয়বাবুর নামটি প্রস্তাব করেছিলেন এবং ডিরেক্টর অনুমোদন করলে পরে, বিদ্যাসাগর লোকমুখে অক্ষয় দত্তের কাছে এই সংবাদ পাঠান। অক্ষয়বাবু সম্মত হতে ইতস্ততঃ করলেন, কেননা তখন তাঁর ওপর তত্ত্ববোধিনীর গুরুভার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। যে লোক খবর নিয়ে গিয়েছিল, সেই লোকই ফিরে এসে বিদ্যাসাগরকে জানাল যে অক্ষয়বাবু হেড মাষ্টার হতে রাজী নন। বিদ্যাসাগর কিছু বললেন না। দু'দিন বাদেই কি একটা ব্যাপারে অক্ষয়কুমার এলেন বিদ্যাসাগরের কাছে।

—এসো, হেড মাষ্টার এসো, এই বলে স্বাগত জানালেন বন্ধুকে ঈশ্বরচন্দ্র।

—কিসের হেড মাষ্টার, কী ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করেন অক্ষয়কুমার।

—কেন, নর্মাল স্কুলের হেড মাষ্টার হয়েছ তুমি—খুব আনন্দের কথা নয় কি? অক্ষয়বাবু বিস্মিত ও চমৎকৃত। বললেন—কেন? অমৃতলাল কি তোমাকে কোন কথা বলেন নি? আমি ও কাজ নিতে পারছি না।

—কেন?

—তত্ত্ববোধিনী কে দেখবে?—কাগজখানা যে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

—কিন্তু এদিকে ব্যবস্থা যে সব পাকা—ইয়ং সাহেব তোমার নামে নিয়োগপত্র

পর্যন্ত সই করে পাঠিয়েছেন আমার কাছে। তুমি অমত করলে সাহেবের কাছে আমি যে অপদস্থ হব।

—কেন অপদস্থ হবে?

—শোন মজার কথা। আমি যে লোকের জন্যে অনুরোধ করলাম, তার নিজের মত নেই, একথা শুনলে সাহেব আমাকে অপদস্থ করবে না? এখন বুঝছি, তোমার মত না নিয়ে এমন করা আমার ঠিক হয় নি।

—কোন উপায়ে এ বন্দোবস্তের পরিবর্তন করা যায় না?

—না।

অগত্যা অক্ষয়কুমার দত্ত নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণে স্বীকৃত হলেন, কিন্তু তত্ত্ববোধিনীর সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করলেন না।

বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের কাজ শুরু হলো।

হ্যালিডের আমলে যেসব মডেল স্কুল স্থাপিত হলো, তার মূলে ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরই সুনিপুণ পরিকল্পনা। শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রায় প্রত্যেকটি ব্যাপারেই হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের বিচারবুদ্ধি ও সুবিবেচনার ওপর নির্ভর করতেন। তাঁর ধ্যান, আদর্শ ও পরিকল্পনার সঙ্গে সহকারী উদ্যম, অর্থ ও পৃষ্ঠপোষকতা সংযুক্ত হওয়ায় বিদ্যাসাগর অসামান্য শ্রম-সহিষ্ণুতা, মনোবল ও সাফল্যলাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, ব্যক্তিগত স্বার্থের কোন আকর্ষণ নেই।

একাত্তরটি ছাত্র নিয়ে নর্মাল স্কুল আরম্ভ হলো।

উচ্চশ্রেণীর ভার অক্ষয়কুমার দত্তের উপর, আর নীচের শ্রেণীর ভার নিলেন তাঁরই বাল্যসহচর, দ্বিতীয় শিক্ষক মধুসূদন বাচস্পতি। অক্ষয়কুমার অবশ্য বেশী দিন প্রধান শিক্ষকের কাজ করতে পারেন নি। মাথার অসুখের জন্যে তিনি কাজ ছেড়ে দিলে পরে বিদ্যাসাগরের অনুরোধে রামকমল ভট্টাচার্য নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ছাত্রদের মাসিক পাঁচ টাকা করে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। পাঠ্যসূচী বিদ্যাসাগরই ঠিক করে দিলেন। মাসে মাসে পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা ছিল। অমনোযোগী ছাত্ররা স্কুল থেকে বিতাড়িত, এবং পাঠে অগ্রসর ছাত্ররা শিক্ষকরূপে নির্বাচিত হতো।

নর্মাল স্কুল স্থাপনের দু'মাসের মধ্যেই বিদ্যাসাগর তাঁর এলাকার প্রত্যেক জেলায় পাঁচটি করে মডেল স্কুল স্থাপন করলেন। স্কুল-পিছু মাসে পঞ্চাশ টাকা

করে খরচ পড়ত। গ্রামবাসীরা নিজেদের খরচে স্কুল-বাড়ি তৈরি করে দিল। ছ'মাস পর্যন্ত ছেলের কাছ থেকে মাইনে নেওয়া হলো না। অক্লান্তকর্মা বিদ্যাসাগর একসঙ্গে অধ্যক্ষরূপে সংস্কৃত কলেজ, এবং স্পেশ্যাল ইনস্পেক্টার রূপে নর্মাল স্কুল, এতগুলো মডেল স্কুল ও বাংলা পাঠশালার তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। তাঁর সামনে ছিল হার্ডিঞ্জ স্কুলগুলির বিফলতাময় ইতিহাস। তবু তিনি দমলেন না। প্রচুর পরিশ্রম করতে লাগলেন। পাল্কি করে জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রত্যেকটি স্কুলের কাজকর্ম দেখতে লাগলেন। একটিমাত্র চিন্তা সর্বক্ষণের জন্যে তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে থাকতো—যেমন করে হোক স্কুলগুলোকে দাঁড় করাতে হবে। সেইসঙ্গে চললো পাঠ্যপুস্তক রচনা করা। এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম বিফলে যেতে পারে না। তিন বছর পরে বিদ্যাসাগর রিপোর্ট লিখলেন :—

"প্রায় তিন বৎসর হইল মডেল বঙ্গবিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই স্কুলগুলি সন্তোষজনক উন্নতি লাভ করিয়াছে। ছাত্রগণ সকল বাংলা পাঠ্যপুস্তকই পাঠ করিয়াছে। ভাষার উপর তাহাদের সম্পূর্ণ দখলের পরিচয় পাওয়া যায়; প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়েও তাহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছে। গোড়ায় অনেকে সন্দেহ করিয়াছিল, মফঃস্বলের লোকেরা মডেল স্কুলগুলির মর্ম বুঝিবে না। প্রতিষ্ঠানগুলির পূর্ণ সার্থকতা এই সন্দেহ দূর করিয়াছে। যে-যে স্থানে স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত, সেইসব গ্রামের এবং তাহাদের আশেপাশের পল্লীবাসীরা এই বিদ্যালয়গুলি অতি উপকারী বলিয়া মনে করে। স্কুলগুলির যে যথেষ্ট আদর হইয়াছে, বর্তমান ছাত্রসংখ্যাই তাহার প্রমাণ।"

স্বগ্রাম বীরসিংহের অবৈতনিক স্কুলটি বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ নিজের ব্যয়ে আগেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দক্ষিণ-বাংলার স্কুল-সমূহের ইনস্পেক্টার লজ্ সাহেব একবার এই স্কুলটি পরিদর্শন করে এই রকম মন্তব্য করেন: "বীরসিংহ বিদ্যালয়—এই স্কুলটি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহারই সম্পূর্ণ ব্যয়ে পরিচালিত।...ছয় সাতজন শিক্ষকের বেতন তিনি নিজেই দেন। ছাত্রদের নিকট মাহিনা লওয়া হয় না, বিনামূল্যে তাহাদের সকল রকম বই দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়; পণ্ডিতের নিজের বাড়িতে প্রায় ত্রিশজন দরিদ্র ছেলের আহারের ও থাকিবার ব্যবস্থা আছে; দরকার

পড়িলে বস্ত্রাদি পর্যন্ত দেওয়া হয়, অসুখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্র সংখ্যা ১৬০। ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত তিন প্রকার পাঠ্যই আছে, তবে সংস্কৃতই প্রধান।"

বিদ্যাসাগরের স্কুল ইনস্পেক্টরের জীবনে সহস্র কর্মের মধ্যে দয়াদাক্ষিণ্য সমান ভাবেই বজায় ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক চরিতকার লিখেছেন: "তাঁহাকে তখন প্রায় মফঃস্বল পরিদর্শনে যাইতে হইত। পরিভ্রমণকালে পথে কোন পীড়িত চলৎশক্তি হীন লোককে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে, তিনি আপন পাল্কি হইতে অবতরণ করিয়া সেই আতুর লোককে পাল্কির ভিতর তুলিয়া দিতেন এবং স্বয়ং পদব্রজে চলিয়া যাইতেন; পরে কোন চটী পাইলে, পীড়িত ব্যক্তিকে সেই চটীতে রাখিয়া, চটীর কর্তাকে টাকা-কড়ি দিতেন। পরিভ্রমণকালে তিনি সঙ্গে টাকা, আধুলি, সিকি প্রভৃতি রাখিয়া দিতেন; লোককে অবস্থানুসারে তাহা দান করিতেন।...কোথাও গিয়া যদি শুনিতেন, অন্নাভাবে বা অর্থাভাবে কাহারও লেখাপড়া হইতেছে না, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তখনি তাহাকে আপনার বাসায় আনাইয়া অথবা অন্য কোন রকম ব্যবস্থা করিয়া, তাহার লেখাপড়া শিখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন; একবার পরিদর্শনকালে চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত দত্তপুকুর নিবাসী কালীকৃষ্ণ দত্তের বাড়িতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে একটি দীন হীন অনাথ ব্রাহ্মণ সন্তান তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কাতর কণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে আপনার অভাব ও দুঃখের কথা নিবেদন করে। তাহার অবস্থার কথা শুনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তিনি পরে সেই ব্রাহ্মণ সন্তানকে আপনার বাসায় আনাইয়া তাহার লেখা-পড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন।"

বিদ্যাসাগর যখনই মফঃস্বলে যেতেন তখন তাঁকে দেখবার জন্যে গ্রামবাসীরা ভীড় করে আসতো। কী এক আকর্ষণী শক্তি ছিল 'বিদ্যাসাগর' এই নামটির, যার জন্যে লোকে দলে দলে আসতো সেই নামের মানুষটিকে দেখতে। যখন কল্পনা করি, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, যাঁকে দেখলে ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেই সভয়ে সম্মান সহকারে নতমস্তক হতেন, যাঁর সামনে কেউ মাথা তুলে জোরে কথা বলতে সাহস করতেন না—সেই দুরতিক্রমণীয় গম্ভীর মানুষটি যখন বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন, তখন গ্রামের লোকেরা তাঁকে আপন জন মনে করে নিঃসংকোচে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতো, সুখ-দুঃখের কথা বলতো;

ছেলেমেয়েরা এসে তাঁর পাল্কি ঘিরে দাঁড়াত—যেন কত আপনার লোক তিনি তাদের, তখনই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে মনুষ্যত্ব ও মানবতার এক সজীব বিগ্রহ। তখনই বুঝতে পারি কোথায় বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব, কোথায় সেই পরার্থপরতাময় চরিত্রের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য।

এই সময়কার একটি ঘটনা কলকাতার সমাজে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। বিদ্যাসাগর একদিন সকালে তাঁর বৈঠকখানায় বসে পাঠ্যপুস্তক রচনা করছিলেন, এমন সময়ে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও সহকর্মী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সকলেরই মুখে চোখে একটা উত্তেজনার ভাব। তাঁরা এসে চেয়ারে বসলেন। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, ধুতি-চাদর ও চটি-পরা বিদ্যাসাগরের বৈঠকখানায় ফরাস পাতা থাকত না কোন দিন, বিলিতি কায়দায় টেবিল চেয়ারেরই ব্যবস্থা ছিল সেখানে। লোকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, যিনি জাতীয় পরিচ্ছদ ও জাতীয় ভাবের একান্ত পক্ষপাতী, যিনি ধুতি-চাদর ভিন্ন অন্য পরিচ্ছদে কোথাও যেতেন না, সেই বিদ্যাসাগরের বৈঠকখানায় টেবিল-চেয়ার কেন? কলকাতার সমাজ-জীবনে বিদ্যাসাগর যখন প্রবেশ করলেন, তখন প্রথম যে জিনিসটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেটি হলো বাঙালির বৈঠকখানার ফরাস—তাকিয়া পাতা, দেয়ালে বিলম্বিত বিলিতি মেমসাহেবদের আবক্ষ-নগ্ন অথবা অর্ধ-নগ্ন চিত্র, রূপোর নল সমেত গড়গড়া—বাঙালির বৈঠকখানার এ চিত্র বিদ্যাসাগরের মনকে সহজেই পীড়িত করল। ফরাসের ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বাঙালি একদিকে বিলাসী ও অন্যদিকে শ্রমবিমুখ হয়ে উঠছে—এরই প্রতিবাদে তিনি তাঁর বৈঠকখানায় ফরাসের পরিবর্তে টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা করেন। এ তাঁর ইংরেজি ভাবানুরাগের পরিচয় নয়—এর দ্বারা তিনি বাঙালিকে বিলাসিতার পথ থেকে শ্রমশীলতার পথে আনতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজে সমভাবে চেয়ারের ওপর বসে সর্বদা কাজে নিবিষ্ট থাকতেন।

বিদ্যাসাগর বন্ধুদের স্বাগত জানিয়ে তাঁদের আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন—তোমাদের সবাইকে কেমন যেন একটু চঞ্চল দেখছি। কী ব্যাপার?

অক্ষয়বাবু বললেন—ব্যাপার হীরা বুলবুল।
দুর্গাচরণ বললেন—কলকাতায় যেন বোমা পড়েছে।
—বলো কি ? একেবারে বোমা ! হেসে বললেন বিদ্যাসাগর।
রাজকৃষ্ণ বললেন—তা বোমা বৈ কি। হিন্দু কলেজের মতো স্কুল হারা বুলবুলের ছেলের ভর্তি নিয়ে আপত্তি তুলেছে।
—তা তো তুলবেই। হাজার হোক গণিকার পুত্র তো। আমি জানি শহরের রক্ষণশীল হিন্দু ও ব্রাহ্মণরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। কমিটিতে এ নিয়ে ঘোরতর মতভেদ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে।
—কিন্তু তোমার কি মত ? কাজটা ভাল না মন্দ ? জিজ্ঞাসা করলেন অক্ষয়কুমার।
—শুনলাম দেবেন ঠাকুর নাকি রাজেন দত্তকে নিয়ে একটা আলাদা স্কুলই করবেন ঠিক করেছেন, কথাটা কি সত্যি ? জিজ্ঞাসা করলেন বিদ্যাসাগর।
রাজকৃষ্ণ বাবু বললেন—হ্যাঁ, খবর ঠিক তাই। রিচার্ডসন সেই স্কুলের হেড মাষ্টার হবেন ঠিক হয়েছে।
—হুঁ, তাহলে তো বিস্ফোরণ অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে।
—তাই তো জিজ্ঞাসা করছি, তুমি এর মধ্যে আছ কিনা ? দুর্গাচরণ জিজ্ঞাসা করলেন। বিদ্যাসাগর বললেন, দেখ আমার কথা আলাদা। আমি যখন সংস্কৃত কলেজের দরজা সকল জাতের জন্যে উন্মুক্ত করে দিলাম, জানো তো তখন বামুনরা বিদ্যাসাগরকে গালাগাল না দিয়ে জল স্পর্শ করতেন না। তারপর দেখ, কালক্রমে প্রমাণ হয়ে গেল কাজটা আমি খারাপ করি নি। কাজেই আজকের এই হীরা বুলবুলের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে যেটুকু উত্তেজনা দেখা দিয়েছে, এ নিবে এলো বলে। হীরা বুলবুল গণিকা হতে পারে, তার ছেলে তো আর কোন দোষ করে নি, লেখাপড়া শিখতে তার বাধা কি ? এই বলে বিদ্যাসাগর চুপ করলেন।
রাজকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, আপনার কলেজে ওকে ভর্তি করতে পারতেন ?
—বিলক্ষণ। জানো তো আমি শাস্ত্রের ভারবাহী বামুন পণ্ডিত নই—যুগের হাওয়া কোন্ দিকে, সেটা আমি বুঝেছি বলেই সংস্কৃত কলেজটাকে অমন করে ভেঙে গড়লাম। কারো তোয়াক্কা রাখলাম ?

বন্ধুরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

বিদ্যাসাগর আবার পাঠ্য পুস্তক রচনায় মন দিলেন।

হীরা বুলবুলের ঘটনাটি এই :

"হীরা বুলবুল নামে এক প্রসিদ্ধ বারাঙ্গনা তখন কলিকাতা শহরে বাস করিত। ঐ হীরা বুলবুল একজন পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোক ছিল; হীরা শহরের অনেক ধনী ও পদস্থ লোকের সহিত সংসৃষ্ট হইয়াছিল। হীরা আপনার একটি পুত্রকে তদানীন্তন হিন্দু কলেজে ভর্তি করিবার জন্য পাঠায়। ইহাতে বারাঙ্গনার পুত্রকে হিন্দু সন্তান বলিয়া কলেজে ভর্তি করা হইবে কি না, এই বিচার উঠে। তাহাকে ভর্তি করা হইবে কি না এই বিষয় লইয়া তদানীন্তন এডুকেশন কাউন্সিল ও হিন্দু কালেজের ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে মতভেদ ঘটে। সেই মতভেদ সত্ত্বেও বালকটিকে ভর্তি করাতে শহরের দেশীয় হিন্দু ভদ্রলোকদিগের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্ত পরিবারের সুবিখ্যাত বংশধর রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় সেই আন্দোলনের সারথি হইয়া (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তায়) হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ নামে এক কালেজ স্থাপন করেন। সিন্দুরীয়াপটীস্থ সুপ্রসিদ্ধ গোপাল মল্লিকের বিশাল প্রাসাদে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসন এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি মহামতি বেথুন সাহেবের সহিত বিবাদ করিয়া গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবু তাঁহাকে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।...কাপ্তেন সাহেবকে অধ্যক্ষ করিয়া মহাসমারোহে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের কার্যারম্ভ হয়। এই কলেজ কয়েক বৎসর মাত্র জীবিত ছিল।"

নতুন বন্দোবস্তে সংস্কৃত কলেজে যখন ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া সাব্যস্ত হলো, তখন ইংরেজির প্রথম ও প্রধান শিক্ষক হয়ে এলেন প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এবং তারপর শ্রীনাথ দাস, কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রসন্নকুমার রায় ক্রমান্বয়ে পরবর্তী ইংরেজী শিক্ষক নিযুক্ত হন। কালীচরণ ঘোষ বিদ্যাসাগরের খুব স্নেহের পাত্র ছিলেন। বয়স কম বটে, কিন্তু তিনি ইংরেজি খুব ভাল জানতেন এবং যোগ্যতার আদর বিদ্যাসাগরের

কাছে সব সময়েই। তিনি কালীচরণকে কিছুদিনের জন্যে সংস্কৃত কলেজের কোন এক শ্রেণীর ইংরেজি শিক্ষার ভার দিলেন। এত অল্প বয়সের শিক্ষককে ছাত্রদের পছন্দ হলো না এবং তাঁর কাছে তারা পড়তে রাজী হলো না। ক্লাসে গোলমাল, শিক্ষককে অপদস্থ করবার চেষ্টা—বিদ্যাসাগর বিরক্ত হলেন। ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় তিনি কোনো দিনই দিতেন না। পরবর্তী কাহিনী এই রকম। বিদ্যাসাগর খোঁজ করতে লাগলেন কোন্ কোন্ ছাত্র এর পেছনে আছে। কেউ দোষ স্বীকার করল না, কেউই ধরা পড়ল না। মিথ্যাচরণের ঘোর শত্রু বিদ্যাসাগর তখন ঐ শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রদের স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলেন। প্রয়োজন হলে তিনি এই রকম কঠোর হতে পারতেন। কোমলতার সঙ্গে কঠোরতা—এই গুণেই বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবন-চরিতকার লিখেছেন :

"বালকেরা দল বাঁধিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিল। কর্তৃপক্ষ, এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন বক্তব্য আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। তদুত্তরে তিনি সাহেবকে জানাইয়াছিলেন যে, কলেজের আভ্যন্তরিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সম্বন্ধে অধ্যক্ষের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আবশ্যক। এরূপ বিষয়ে বালকেরা কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিবার সুযোগ পাইলে, তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, আর তাহাদিগকে শাসনে রাখা যাইবে না। কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগরের সহিত একমত হইয়া সমস্ত কাগজপত্র তাঁহাকে ফিরাইয়া দেন এবং বালকদিগকে বলিয়া দেন যে, এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা করিবেন তাহাই হইবে।...বালকদের আত্মীয়-স্বজন ক্রমে বালকদের এই সকল দুর্বৃত্ততা জানিতে পারিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইহার প্রতিবিধান করিতে অনুরোধ করিলেন।"

কিন্তু বিদ্যাসাগর বড় কঠিন প্রকৃতির মানুষ।

ছেলেদের তিনি কালীচরণ ঘোষের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

তারা এসে অনুতপ্ত হৃদয়ে শিক্ষকের কাছে দোষ স্বীকার করল, ক্ষমা চাইল। তবু বিদ্যাসাগর অটল। বললেন—তুমি মাপ করতে বললে, মাপ করব, নইলে করব না।

কালীচরণ বিষম বিপদে পড়লেন। তিনি জানেন তাঁকে উপলক্ষ করে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার সময়ে ছেলেরা শিষ্টতার সকল

সীমা লঙ্ঘন করেছিল। তারা বলেছিল—পণ্ডিতের এবার চাকরী যাবে; দাঁড়িপাল্লা ধরতে হবে। কালীচরণের সঙ্গে উদ্ধত ছাত্রদের দু'একজন প্রতিনিধি যখন তাঁর কাছে এসে দাড়াল, তখন বিদ্যাসাগর তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে, দাঁড়িপাল্লা কে ধরবে? তোরা না আমি? কালীচরণ বললেন—ওরা বেশী অপরাধী আপনারা কাছে, আপনি যা ইচ্ছা করুন।
নিরুপায় ছাত্ররা তখন বিদ্যাসাগরের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইল।
ক্ষমাসুন্দর চক্ষে বিদ্যাসাগর বললেন—যা পা ছেড়ে দে, স্কুল যাস্।
এই-ই বিদ্যাসাগর।
প্রতিজ্ঞায় যেমন দুর্জয়, ক্ষমার তেমনি কোমল মূর্তি।

বহু-ভঙ্গিম চরিত্রের মানুষ বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষ জীবনের আর দুটি কাহিনী এখানে উল্লেখ করব। একবার কোন লোকের কথায় বিশ্বাস করে বিদ্যাসাগর তারাকুমার কবিরত্নের প্রতি কিছু অন্যায় করেন। কবিরত্ন নীরবে তা সহ্য করলেন। কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর যখন জানতে পারলেন কবিরত্ন নির্দোষ, তখন তাঁর অনুশোচনার অন্ত রইল না। অমনি তাঁর বাড়িতে ছুটে এলেন বিদ্যাসাগর; অশ্রুপূর্ণ চক্ষে করুণ স্বরে বললেন—তারাকুমার, আমাকে ক্ষমা কর, ভাই। বলো, কি করলে এর প্রতিবিধান হয়?
কবিরত্নের মুখে কথা নেই। তিনি শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন এই মানুষটির মহত্ব কোথায়। সমুন্নত, গম্ভীর দৃঢ়মূর্তি বিদ্যাসাগর এমন সরল ও কোমল হতে পারেন, কবিরত্ন তা কল্পনা করতে পারেন নি।
বিদ্যাসাগরের প্রকৃতির একটা দুর্বলতা ছিল যে, তিনি হঠাৎ রেগে যেতেন আর বারুদের আগুনের মত দপ্ করে জলে উঠতেন আবার সঙ্গে সঙ্গে সে আগুন নিবে জল হয়ে যেত। তাঁর চরিত্রের মহৎ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে তিনি রাগের মুখে যদি কাউকে অকারণ তিরস্কার করতেন আর নিজের ভুল পরে বুঝতে পারতেন, তবে তার আছে অকুণ্ঠ মার্জনা চাইতে এতটুকু ইতস্ততঃ করতেন না। মানুষ বিদ্যাসাগরের মহত্ব এইখানেই।
দ্বিতীয় ঘটনাটি তাঁর চরিত্রের আর একটি দিককে উদ্ভাসিত করেছে।
"একদিন কোথায় এক বিশেষ কাজে গিয়া, আসিবার সময় বেলা অধিক হইয়া যায়। বাটী আসিয়া আহারাদি করিতে গেলে, যথা সময়ে বিদ্যালয়ে

উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। পথে নিকটে পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের ছাত্রাবাস। বিদ্যাসাগর সেই বাসায় প্রবেশ করিলেন; একখানা ভিজা কাপড় পরিয়া পাতকুয়া হইতে কয়েক ঘটি জল তুলিয়া মাথায় ঢালিলেন; বালকেরা আহারে বসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে বসিলেন; সকলের পাত হইতে এক এক থাবা ভাত লইয়া উদর পূর্ণ করিয়া সকলের অগ্রে উঠিলেন, সকলের অগ্রে বিদ্যালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বালকেরা কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁহাকে সঙ্গে পাইয়া, তাহাদের আহার্য হইতে কিছু কিছু খাইতে দেখিয়া এবং দু'চারটা আমোদের কথা কহিতে পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গেল। সেই অল্প সময়ের মধ্যে কত গল্প করিলেন, কত রং-তামাসা করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।"

এমনি আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর।

সাগরের মতোই সে-চরিত্রের কত রূপ, কত তরঙ্গ-ভঙ্গ।

এই কঠিন, এই কোমল। এই গম্ভীর, এই হাস্যময়—বিদ্যাসাগরের এই মূর্তি-পরিবর্তন তাঁর প্রকৃতির এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য, আত্ম-শাসনের এক অদ্ভুত নিদর্শন। সাধারণ মানুষে এ-শক্তি দুর্লভ। এই শক্তির বলেই বিদ্যাসাগর ধনীর প্রাসাদ থেকে পর্ণকুটীর—সব জায়গায় সব সময় অনমনীয় ও অপরাজেয় থাকতেন।

বিদ্যাসাগরের আয় যত বাড়তে লাগল, দানও তত বাড়তে লাগল।

সে-দানের ইতিহাস কেউ লিপিবদ্ধ করে রাখে নি। দুঃস্থ ও নিঃস্ব লোকের মাসহারা বাঁধা ছিল। তাঁর ও তাঁর পিতার প্রতিপালক জগদ্দুর্লভ সিংহের মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর যখন শুনলেন সিংহীবাড়ির অবস্থা শোচনীয়, তখনও তাঁর ছেলে ভুবনমোহন সিংহের নামে ত্রিশ টাকা করে মাসহরা ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। তাঁর মেয়ে রাইমণিকে সাহায্যের কথা আগেই বলেছি। "মাসহারা বন্দোবস্ত অনেকেরই ছিল। মাসহারা ব্যতীত অনেকে অন্য প্রকারে সাহায্য পাইত। সকল জানিবার উপায় নাই। কেন না, পাছে লজ্জা পায় বলিয়া অনেককেই তিনি গোপনে গোপনে সাহায্য করিতেন।"

দান-শৌণ্ড বিদ্যাসাগরের দানের কাহিনী অজস্র এবং বিচিত্র। অধুনালুপ্ত 'দৈনিক' পত্রের স্তম্ভ থেকে উদ্ধার করে এমনি একটি কাহিনী এখানে তুলে দিলাম। এটি লিপিবদ্ধ করেছেন বিদ্যাসাগরেরই এক বিশ্বস্ত কর্মচারী।

একদিন সকাল বেলায় বিদ্যাসাগর তাঁকে বললেন, দেখ কলুটোলার অমুক গলির অমুক নম্বরের বাড়িতে এই নামে একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক আছেন। তিনি নাকি অর্থাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন। তুমি এখনি সেখানে গিয়ে সবিশেষ সংবাদ নিয়ে এস। বিদ্যাসাগরের আদেশে কর্মচারিটি নির্দিষ্ট স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। গৃহস্বামীর কাছে খোঁজ নিয়ে জানলেন যে তাঁরই বাড়ির একতলায় সেই মাদ্রাজী ভদ্রলোকটি সপরিবারে বাস করেন। আরো জানতে পারলেন যে ভদ্রলোকের দু'মাসের বাড়ি ভাড়া বাকী পড়েছে। তিনি দিতে অপারগ। বাড়িওলা তাঁকে উঠে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছেন। তিনি আরো শুনলেন যে ভদ্রলোক দু-তিন দিন সপরিবারে অনাহারে রয়েছেন। তারপর নীচে এসে ভদ্রলোকটির সঙ্গে তিনি দেখা করলেন। দেখলেন মাদ্রাজী লোকটি একটি ছোট্ট একটি অন্ধকার ঘরে পাঁচটি মেয়ে আর দুটি ছেলে নিয়ে সামান্য দরমার ওপর বসে আছেন। ছেলেমেয়েরা রুগ্ন ও অনাহারে শীর্ণ। ভদ্রলোক বললেন—আমি এই কলকাতা শহরে অনেক বড়লোকের কাছে আমার কষ্টের কথা জানিয়েছিলাম। কিন্তু কেউই আমার দুরবস্থায় দয়ার্দ্র হয়ে একটি কপর্দকও দিয়ে সাহায্য করেন নি। অবশেষে একটি বাবুর নিকট ভিক্ষার্থ উপস্থিত হই। তিনি ভিক্ষা না দিয়ে একখানি পোষ্টকার্ডে পত্র লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন—এই শহরে একজন দয়ালু বিদ্যাসাগর আছেন। আমি তোমারই নামে তোমার দুরবস্থার বিষয় লিখে দিলাম। চিঠিখানা ডাকে দিয়ে এস। আমি তাই করেছি। এখন আমার অদৃষ্ট। কর্মচারী ফিরে এসে বিদ্যাসাগরকে সব কথা জানালেন। শুনে বিদ্যাসাগর অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করতে করতে ঐ কর্মচারীর হাতে মাদ্রাজী ভদ্রলোকের বাকী ভাড়া বাবদ ত্রিশ টাকা, খোরাকী দশ টাকা এবং তাদের জন্যে ন খানা কাপড় দিয়ে বললেন—এগুলো দিয়ে এস আর যদি তারা দেশে যেতে চায় তাহলে কত টাকা লাগবে জেনে এস। আর এখানে থাকলে আমি প্রতি মাসে পনর টাকা করে দেব। কর্মচারী এসে ঐ ভদ্রলোককে টাকা ও কাপড় দিয়ে বিদ্যাসাগরের কথা জানালেন। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের এই দয়ায় ভদ্রলোক অভিভূত হলেন। বললেন, একশো টাকা হলে আমরা দেশে ফিরে যেতে পারি। বিদ্যাসাগর সেই টাকা পাঠিয়ে দিলেন এবং তাদের ষ্টীমারে উঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে তবে নিশ্চিত হলেন।

এমন দাতা বাংলাদেশে ক'জন জন্মেছেন ?

বিদ্যা দান করে, অর্থ দান করে, অন্ন দান করে বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনকে এমনি আশ্চর্যভাবে সার্থক করে গিয়েছেন। সত্যই, করুণার মোহিনী মাধুরীতে সাগরের হৃদয় সর্বদা পরিপূর্ণ থাকত। দান করে বিদ্যাসাগর কোন দিন আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন না, বাহবা নিতেন না কিংবা আত্মগৌরব ঘোষণা করতেন না। নীরবে দুঃখীর দুঃখমোচন ছিল তাঁর স্বভাবের ধর্ম—তাঁর প্রতিদিনের কর্ম। বাঙালি আজো সেই দানময় জীবনের উন্নত আদর্শের উত্তরাধিকারত্ব স্বীকার করল না—বুঝল না সাগরের অশ্রুপ্রবাহের প্রকৃত মূল্য কোথায়। মুক্তাফলের মতো বিদ্যাসাগরের সেই দুই চক্ষের অশ্রুবিন্দু ইতিহাসের পটে যেন আজো টল্‌টল্ করছে। তারই মধ্যে প্রতিবিম্বিত একটি হৃদয়ের মর্মানুভূতি আর অলৌকিক বেদনাবোধ।

॥ পনর ॥

বেথুন স্কুল একান্তভাবেই বেথুন সাহেবের ছিল।
কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন এর প্রাণস্বরূপ।
বেথুন সাহেব বেঁচে থাকতেই বিদ্যালয়টি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।
সরকারী রাজকোষ তখনো পর্যন্ত স্ত্রী-শিক্ষার জন্যে উন্মুক্ত ছিল না। যা কিছু উদ্যম বেসরকারী ভাবেই চলছিল। বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পনর দিনের মধ্যেই কলকাতায় রাজা রাধাকান্ত দেব নিজের শোভাবাজার রাজবাড়িতে মেয়েদের জন্যে একটা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। বারাসতের বালিকা বিদ্যালয়টি নতুনভাবে গঠিত হলো। শুকসাগর, নিবুধই প্রভৃতি কয়েকটি স্থানেও অল্প সময়ের ব্যবধানে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। উত্তরপাড়ার জমিদাররাও এ বিষয়ে অগ্রণী হলেন। এইভাবে দেশের বহু জায়গায় স্ত্রী-শিক্ষার উদ্যোগ আয়োজন চলতে লাগল। তবে একেবারে বিনা বাধায় এ কাজ সেদিন সম্ভব হয় নি। বহু বাধা-বিপত্তি ও বিরুদ্ধ সমালোচনার ভেতর দিয়েই বাংলা দেশে স্ত্রী-শিক্ষার ইতিহাস গড়ে উঠেছে। বেথুন বিদ্যালয়ের ভাগ্যে আরম্ভতে কি রকম বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছিল, সে কথা আগেই বলেছি। সরকারী সাহায্য তো ছিলই না, এমন কি সহানুভূতি পর্যন্ত ছিল না বলেই বিরোধী দল মেয়েদের শিক্ষার বিরোধিতা এমন তীব্রভাবে করতে ভরসা পেয়েছিল। তবু বেথুন সাহেব এই কাজে দেহ মন প্রাণ নিয়োগ করলেন। বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং কয়েকজন দেশীয় ভদ্রলোকের উৎসাহই ছিল বেথুনের একমাত্র মূলধন। ডেভিড হেয়ার যেমন একদা ছেলেদের শিক্ষা নিয়ে মেতে উঠেছিলেন, বেথুনও তেমনি মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে মেতে উঠলেন।

স্কুল-প্রতিষ্ঠার দেড় বছর বাদে হেদুয়ার পশ্চিমে (এখন যেখানে বেথুন কলেজ ও স্কুল) একখণ্ড জমির ওপর বেথুন বিদ্যালয়ের স্থায়ী ভবন নির্মিত হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন। বেথুন সাহেবের সেদিনকার বক্তৃতা এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণের বেশীর ভাগ টাকা বেথুন নিজে দেন। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এজন্যে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। বিদ্যালয় গৃহটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি হওয়ার আগেই বেথুন মারা যান। "তিনি স্ত্রী-শিক্ষার এতদূর পক্ষপাতী ছিলেন যে, এদেশে স্থিত অন্যূন ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি তিনি বিদ্যালয়টির জন্য উইল করিয়া দিয়া যান।" বেথুনকে মহাপ্রাণ ভিন্ন আর কী বলব? ডেভিডের দেহ এ দেশের মাটির তলায় আছে, বেথুনের দেহও আছে—আর আছে তাঁদের কর্মকীর্তি।

স্কুল চালাবার জন্যে বেথুন সাহেব মাসে সাত-আটশো টাকা খরচ করতেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন নিজেই খরচ চালাতেন। তিনি মারা গেলে পরে বড়লাট লর্ড ডালহৌসি স্কুলটির ভার নিজের হাতে নিলেন। তিনি চলে গেলে পরে বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করলেন ভারত সরকার। বেথুন স্কুল সরকারী স্কুল হলো। সরকার পক্ষে সেক্রেটারী স্যর সিসিল বীডনের ওপর এই সম্পর্কে সব ব্যবস্থা করবার ভার পড়ল। বিদ্যালয়টি যাতে ঠিকভাবে পরিচালিত হয় সেজন্যে বীডন সাহেব দেশীয় গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে একটা ম্যানেজিং কমিটি গঠন করলেন। স্যর সিসিল বীডন স্বয়ং হলেন এই কমিটির সভাপতি, আর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদক। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কাশী-প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি দশজন এর সদস্য হলেন। কিন্তু স্কুল পরিচালনার যা কিছু দায়িত্ব তা বহন করতে হলো বিদ্যাসাগরকে। বিদ্যাসাগর তখন তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা নিয়োগ করে, বেথুনের স্মৃতিপূত এই প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা করতে সচেষ্ট হলেন। তা ছাড়া, স্ত্রী-শিক্ষার অন্যতম নায়ক হিসেবেও বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের উন্নতিকল্পে এগিয়ে এলেন। বেথুনের মতো বিদ্যাসাগরও স্ত্রী-শিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন; তিনিও মনে করতেন স্ত্রী-শিক্ষা ভিন্ন দেশের উন্নতি নেই। তাঁর উৎসাহও উদ্যম শুধু বেথুন স্কুলের কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সে কথা পরে বলছি।

বেথুনের স্মৃতিটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বিদ্যাসাগরের চেষ্টার অন্ত ছিল না। বেথুন সাহেবের স্মৃতি হিসেবে তাঁর স্কুল তো ছিলই ; তবুও বিদ্যাসাগর বেথুনের এমন অনুরাগী ছিলেন যে, তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে বেথুন সোসাইটি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন। অবশ্য কলকাতার বহু কৃতবিদ্য লোকেরই এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহ এবং আন্তরিকতা ছিল, তবে বিদ্যাসাগরই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী। সভাপতি হলেন ডাঃ মোয়াট আর সম্পাদক নিযুক্ত হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। এই সোসাইটি স্থাপিত হবার পর থেকেই প্যারীচাঁদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। প্যারীচাঁদের নাম তার অনেক আগেই বিদ্যাসাগর শুনেছেন এবং এই বয়োজ্যেষ্ঠ প্যারীচাঁদের দেশোন্নতিবিধায়ক নানাবিধ কর্মপ্রচেষ্টার কথাও তিনি জানতেন। তারপর যখন 'আলালের ঘরের দুলাল' বের হলো, তখন বিদ্যাসাগর অগ্রণী হয়ে প্যারীচাঁদকে বাংলা সাহিত্যের ও বাংলা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক বলে অভিনন্দিত করলেন। অক্ষয়কুমারকে ডেকে বলেছিলেন— "দেখ অক্ষয়, প্যারীবাবু কথ্যভাষায় কী চমৎকার বই লিখিয়াছেন।"

বেথুন সোসাইটি শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সভাতেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্য-শাস্ত্র সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এই সভারই এক অধিবেশনে কেশবচন্দ্র সেন 'যীশুখৃষ্ট— য়ুরোপ ও এশিয়া' নামে তাঁর সেই বিখ্যাত বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন। সরকারী পরিচালনায় আসবার পর থেকে বিদ্যাসাগর প্রায় বারো বছর-কাল সম্পাদক হিসেবে স্কুলটির সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত ছিলেন। বিদ্যালয়টি ক্রমে মেয়েদের একটি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ছ বছর বাদে পরিচালনা-কমিটির পক্ষে গভর্ণমেণ্টের কাছে বিদ্যাসাগর যে বার্ষিক বিবরণ পেশ করেন তার থেকে জানা যায় যে, স্কুলটি ক্রমশই উন্নতির পথে চলেছে। পরবর্তী কালে কুমারী মেরী কার্পেণ্টার এসে প্রস্তাব করলেন যে, বাংলা দেশে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা যে রকম বাড়ছে তাতে গভর্ণ-মেণ্টের পক্ষ থেকে শিক্ষয়িত্রী তৈরি করার জন্যে বেথুন স্কুল গৃহে একটি নর্মাল স্কুল অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের সম্পাদক, কাজেই গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে তাঁর মত চেয়ে পাঠালেন। বিদ্যাসাগর এই বলে আপত্তি জানালেন যে, শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন যথেষ্ট থাকলেও এখনকার

সামাজিক ব্যবস্থায় হিন্দু মেয়েদের মধ্যে বয়স্থা ছাত্রী পাওয়া কঠিন। বিদ্যাসাগরের ছিল অভ্রান্ত দূরদৃষ্টি। তিনি তাই লিখলেন: "মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা যে কতটা অভিপ্রেত এবং প্রয়োজনীয় তাহা আমি বিশেষ জানি। আমার দেশবাসীর সামাজিক কুসংস্কার যদি অলঙ্ঘনীয় বাধারূপে না দাঁড়াইত, তাহা হইলে আমিই সকলের আগে এ প্রস্তাব অনুমোদন করিতাম, এবং ইহাকে কার্যকর করিবার জন্য আন্তরিক সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। সম্রান্ত হিন্দুরা যখন অবরোধ-প্রথা ভঙ্গ করিয়া দশ-এগারো বছরের বিবাহিত বালিকাদেরই বাড়ি হইতে বাহির হইতে দেয় না, তখন তাহারা বয়স্থা আত্মীয়াদের শিক্ষয়িত্রীর কার্য গ্রহণ করিতে কিরূপে সম্মতি দিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। ...আমি এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের পোষকতা করিতে পারি না।" গভর্ণমেণ্ট কিন্তু বিদ্যাসাগরের কথা শুনলেন না; বেথুন বিদ্যালয়ের সঙ্গেই একটা নর্মাল স্কুল স্থাপন করলেন এবং পরিচালনা সমিতি ভেঙে দিয়ে দুটি বিদ্যালয়কেই খাস সরকারী তত্ত্বাবধানে আনলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বেথুন স্কুলের সম্পর্কের এইখানেই অবসান ঘটল।

বিদ্যাসাগরের কথাই ফলেছিল। তিন বছর যেতে-না-যেতেই পরবর্তী ছোটলাট স্যর জর্জ ক্যাম্পবেল বেথুন বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট নর্মাল স্কুলটি তুলে দেবার আদেশ দিলেন। দেশের রীতি ও সংস্কারকে যে সব সময়ে উপেক্ষা করা যায় না, তা তাঁরা পরে বুঝেছিলেন। বিদ্যাসাগর অবশ্য তার অনেক আগেই এ কথা বুঝেছিলেন।

এই সময়ে ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের দিকে গভর্ণমেণ্ট একটু করে মন দিতে লাগলেন। এখানে-ওখানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হতে লাগল। এর কৃতিত্ব অবশ্য হ্যালিডেরই প্রাপ্য। তিনি বিদ্যাসাগরকে ডাকিয়ে, তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করলেন। কাজ যে খুব কঠিন, তা তাঁরা দুজনেই বুঝলেন। হিন্দুসমাজ-জীবনের প্রকৃতি বিদ্যাসাগরের ভালো করেই জানা ছিল: রক্ষণশীলতার ঘোর তখনো পর্যন্ত কাটে নি। মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে সম্রান্ত হিন্দুদের মনে কতটা অনিচ্ছা, বিদ্যাসাগর ভালো করেই তা বুঝতেন। তবু তাঁর বিশ্বাস ছিল, উৎসাহ ও উদ্যমের সঙ্গে

কাজে লাগলে, এ রকম সৎ কাজে জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করা কঠিন হবে না।

বলতে গেলে বেথুনের কাজের ছিন্ন সূত্র অবলম্বন করেই বিদ্যাসাগর স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এতে তাঁর সুনাম ও প্রতিষ্ঠার প্রতি অনেকেই সেদিন কটাক্ষ করেছিলেন। বলেছিলেন, বিদ্যাসাগরের হিন্দুবুদ্ধির বিপর্যয় ঘটেছে। কিন্তু সংকল্পে দুর্জয় বিদ্যাসাগর কোন কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্যে জীবন উৎসর্গ করলেন। বেথুন স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলেও বিদ্যাসাগর প্রায়ই বিদ্যালয়টির খোঁজ-খবর রাখতেন। স্কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন লোকের সঙ্গে দেখা হলেই অমনি তাকে স্কুলের যাবতীয় খবর জিজ্ঞাসা করতেন। বহুকাল বাদে, জী'ন-সায়াহ্নে বিদ্যাসাগর একদিন তাঁর এক বন্ধুর পুত্রবধূকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দিতে গিয়েছিলেন। প্রথম আমলের একটি ঝি তখনো বেঁচেছিল। তাকে দেখে বিদ্যাসাগরের পুরানো দিনের কথা মনে পড়ল ; স্কুলের দালানে বেথুনের একটি মর্মর মূর্তি ছিল। তার সামনে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর নীরবে কত অশ্রুপাত করলেন। সেদিন তিনি নিজের টাকায় বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদের জন্যে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। স্কুলের কাজ কর্ম দেখে শুনে তাঁর খুবই ভাল লেগেছিল। কথিত আছে, সেদিন রাতে বিদ্যাসাগর বেথুনের কথা স্মরণ করে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন। বলেছিলেন—এতগুলো মেয়ে লেখাপড়া শিখছে, তারাই আবার সেই স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করছে, কিন্তু যে মানুষটি এর জন্যে প্রাণপাত করেছিল, সে দেখল না।

এই হৃদয়ের জন্যেই বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর।

হ্যালিডে সাহেবের মুখের কথায় বিদ্যাসাগর মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী ও নদীয়া জেলার নানা জায়গায় অনেকগুলো বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করলেন। সর্বত্র লোককে বোঝাতেন মেয়েদের লেখাপড়া শেখাও, দেশের উন্নতি হবে, সমাজের মঙ্গল হবে, সংসারের কল্যাণ হবে। এমনি দুরন্ত আগ্রহ বুকে নিয়েই বিদ্যাসাগর সেদিন সারা বাংলাদেশে শিক্ষার দীপ জ্বালিয়েছিলেন। হ্যালিডের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। ইংরেজ ও বাঙালিতে, মনিব ও কর্মচারীতে এমন আত্মীয়তা খুব কমই দেখা গিয়েছে। মডেল

বাংলা স্কুল খুলে বিদ্যাসাগর ইতিপূর্বে বাংলাদেশের শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন, এইবার তিনি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি ফেরালেন। সরকারী আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে কি যাবে না, এই চিন্তায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তিনি এই কাজ করেছিলেন। মডেল বাংলা-বিদ্যালয় সম্পর্কে তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন, এ ক্ষেত্রেও তাই করলেন। তিনি আগে থেকেই অনুমান করে নিলেন, কর্তৃপক্ষ তাঁর কাজ সমর্থন করবেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি নিজের এলাকাভুক্ত জেলাগুলিতে অনেকগুলো বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। এইভাবে বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি জেলায় কয়েকটি স্কুল স্থাপন করে, তিনি শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ ইয়ং সাহেবের কাছে সেই সংবাদ যথা সময়ে পাঠিয়ে মাসিক সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সাত মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়ায় মোট পঁয়ত্রিশটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। ছাত্রী-সংখ্যা হয়েছিল তেরো শো। বাংলার নিভৃততম পল্লীতে এ এক অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার—জীবনের প্রবাহ পথে নতুন দৃষ্টির আবির্ভাব। এইসব স্কুলের জন্মে সরকারী সাহায্য চেয়ে বিদ্যাসাগর ইয়ং সাহেবের কাছে যেসব চিঠি লেখেন, তিনি সেই চিঠিগুলির নকল ছোটলাটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ছোটলাট ভারত-সরকারের কাছে এ বিষয়ে রিপোর্ট পাঠালেন এবং অবিলম্বে সরকারী সাহায্যদান মঞ্জুর করার জন্মে অনুরোধ করলেন। এসব স্কুলে ছাত্রীদের কাছ থেকে মাইনে নেওয়া হতো না এবং অধিকাংশ স্থলেই গ্রাম-বাসীরা নিজেদের খরচে স্কুল-গৃহ তৈরি করে দিত। ছোটলাট লিখলেন, এ সত্ত্বেও কিছু সরকারী সাহায্য দরকার।

ভারত সরকার তখনো পর্যন্ত ভারতে শিক্ষা-প্রসারকল্পে উদার নীতি অবলম্বন করেন নি। তাঁরা বালিকাবিদ্যালয় সম্পর্কে সরকারী সাহায্যের নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম করতে অস্বীকৃত হলেন। বললেন, উপযুক্ত পরিমাণে স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্য না পাওয়া গেলে এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই ভালো। এতে বিদ্যাসাগর নিরুৎসাহ বোধ করলেন। গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন ও সাহায্য পাওয়া যাবে মনে করেই তিনি এতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন এবং নিজের দায়িত্বে এতগুলো বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এখন তিনি বুঝলেন, তাঁর সব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে, এত কষ্টের স্কুলগুলো বুঝি উঠে যায়। আরো একটা

দুশ্চিন্তার বোঝা তাঁর মনে; স্কুল হয়ে অবধি শিক্ষকেরা মাইনে পান নি—প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকার মতন মাইনে বাকী। বিদ্যাসাগর বিচলিত হয়ে এক পত্রে ইয়ং সাহেবকে লিখলেন: "আপনি অথবা বাংলা সরকার যদি অমত প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে এতগুলি বিদ্যালয় খুলিয়া এখন আমাকে এমন বিপদে পড়িতে হইত না। বেতনের জন্য শিক্ষকেরা স্বভাবতই আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। যদি আমাকে নিজ হইতে এত টাকা দিতে হয়, তাহা হইলে সত্যই আমার উপর অবিচার করা হইবে—বিশেষতঃ খরচ যখন সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য করা হইয়াছে।"

ডিরেক্টর বাংলা সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। মন্তব্যের শেষে লিখলেন: "যদি আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বাংলা দেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচারে অচিরেই নিরুৎসাহের ভাব আসিয়া পড়িবে।" ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব ইয়ং সাহেবের বক্তব্য সমর্থন করে এবং স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে সংস্কৃত কলেজের অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কৃতী অধ্যক্ষের আড়ম্বরহীন উৎসাহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে ভারত সরকারকে বিষয়টি (অর্থাৎ অর্থসাহায্য মঞ্জুর করা) আবার বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করলেন।

ভারত সরকারের বজ্রমুষ্টি কিন্তু শিথিল হলো না।

রাজকোষ থেকে একটি পয়সাও পাওয়া গেল না।

উপরন্তু ছোটলাটের কৈফিয়ৎ তলব করা হলো, বিদ্যাসাগরকে পরোক্ষে অবিবেচক বলা হলো। সরকারী ভাষার ভঙ্গিটা ছিল এইরকম: "পণ্ডিত কেন ও কিরূপ অবস্থায় টাকা মঞ্জুর হইবে ধরিয়া লইয়া, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে এত ভারী রকমের খরচ করিতে উৎসাহশীল হইলেন? এ উৎসাহের জন্য দায়ী কে?" বিদ্যাসাগর ছাড়বার পাত্র নন। ভারত সরকারের প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসনকে লিখলেন: "আমি বিশ্বাস করিয়াছিলাম সরকার সাধারণভাবে ইহা অনুমোদন করিবেন। প্রত্যেকটি স্কুল খোলার সংবাদ নিয়মিতভাবে জানাইয়াছি, স্কুল খুলিতে কত ব্যয় হইল, প্রত্যেক চিঠিতেই উহা উল্লেখ করিয়াছি। ব্যয় সংক্রান্ত আমার নিবেদনপত্রগুলি সকল সময়েই গ্রাহ্য হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুযায়ী কাজ

করিতেছি—ইহাই আমার বিশ্বাস ছিল।...আমাকে এই কাজে কোন দিন নিরুৎসাহিতও করা হয় নাই।”

ডিরেক্টর বিদ্যাসাগরের চিঠিখানি বাংলা সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। লিখলেন: “আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে সরকার পণ্ডিতের কাজ সুদৃষ্টিতেই দেখেন।...সেই হেতু আমি তাঁহাকে নিরুৎসাহ করি নাই।”

ছোটলাট ভারত সরকারের কাছে সমস্ত কথা পরিষ্কারভাবে খুলে বললেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন: “ব্যাপারটি আগাগোড়া এক ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। ছোটলাট হইতে আরম্ভ করিয়া পণ্ডিত পর্যন্ত সকলেই একটি ভ্রান্ত ধারণার বশে কাজ করিয়াছেন।...ব্যাপারটিকে যেন অনুগ্রহের চক্ষে দেখা হয়।”

কিন্তু সে অনুগ্রহ আর ভারত সরকার করলেন না। বিদ্যাসাগর সুবিচার পেলেন না। সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব তাঁর নিজের ঘাড়েই পড়ল—বিদ্যাসাগরের একাধিক জীবন-চরিতকার এই গল্প রচনা করেছেন এবং পরবর্তী কালে এই গল্প থেকেই এই সম্পর্কে একটা অদ্ভুত কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকৃত ঘটনা অন্যরূপ। বিদ্যালয়গুলি স্থাপনে সাড়ে তিন হাজার টাকার মতন যা খরচ পড়েছিল, সপরিষদ বড়লাট সেই টাকার দায় থেকে বিদ্যাসাগরকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং সরকার থেকেই এই টাকা দেওয়া যাবে বলে আদেশ দিয়েছিলেন। তবে বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলির ব্যয় নির্বাহের জন্যে স্থায়ী অর্থসাহায্য করতে ভারত গভর্ণমেণ্ট সম্মত হন নি। তবে সেইসঙ্গে তাঁরা এ কথাও বললেন যে, ভবিষ্যতে এই বিষয়ে তাঁরা বিবেচনা করবেন।* স্থায়ী সাহায্য দিতে অস্বীকার হওয়ার একটা বড় কারণ ছিল সিপাহী যুদ্ধের জন্যে আর্থিক অনটন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সূচনা করে লর্ড ডালহৌসী বিদায় নিলেন। এলেন লর্ড ক্যানিং। ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসের সঙ্গে এই ভারত-সুহৃদের নাম সংশ্লিষ্ট আছে এবং থাকবেও। সিপাহী যুদ্ধের বছরের গোড়াতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবের রূপ নিল।

১৮৫৭-র ২৪শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো।

* এই মূল্যবান তথ্যটি সর্বপ্রথম উদ্‌ঘাটিত করেন ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ‘বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ’ পুস্তক দ্রষ্টব্য।

ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষে এই-ই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। এই প্রসঙ্গে একটু ইতিহাসের কথা বলব।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের অনুপ্রেরণায় স্থাপিত হিন্দু কলেজ বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন করে, সে-কথা আগেই বলেছি। চল্লিশ বছরের মধ্যে এই শিক্ষার উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা ব্যক্তি এবং দল-নির্বিশেষে স্বীকৃত হয়। ভারতের ইংরেজ প্রভুরা সহজে এই শিক্ষার প্রবর্তন করেন নি। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশি যুদ্ধের পরে বাংলা দেশে ইংরেজ আধিপত্যের সূচনা। কিন্তু পরবর্তী একশো বছরের মধ্যে ইংরেজ শাসকগণ উচ্চ শিক্ষা বিস্তারকল্পে বিশেষ কোনো প্রয়াস করেন নি। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের মেয়াদ বৃদ্ধির সময়ে ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মাত্র এক লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ধারিত হয়। ইংরেজ-শাসিত সমগ্র ভারতের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার তুলনায় এই টাকা ছিল নিতান্তই নগণ্য। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৮১৩ থেকে ১৮৫৩ পর্যন্ত এই চল্লিশ বছর ভারতের শিক্ষার ধারা ও সংস্কার সম্বন্ধে নানা রকমের জটিল সমস্যা ও বাদানুবাদে এই সময়ের অনেক মনীষীই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ও তার ফলাফল এই আলোচনাকে অনেকাংশে প্রভাবান্বিত করে।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানত ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন সদস্য লর্ড মেকলের নেতৃত্বে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি গৃহীত হয়। এই শিক্ষাপদ্ধতির সূচনাকালে মেকলে এবং অন্যান্য রাজপুরুষগণের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ এবং আশঙ্কার কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে মেকলে এক ঔদ্ধত্যজনক উক্তি করেছিলেন যে, সাধারণ যে কোনো য়ুরোপীয় গ্রন্থাগারের এক শেলফ্ বই সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় লেখা সমগ্র পুস্তকগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে। এই মেকলেই আবার ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে ভারতীয়গণের ইংরেজের আইন ও শাসন নীতি লাভের আকাঙ্ক্ষা হওয়া স্বাভাবিক, বৃটিশ পার্লামেণ্টের এই আশঙ্কার উত্তরে বলে-ছিলেন, "এমন একদিন আসিবে কিনা জানিনা যেদিন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়গণ পাশ্চাত্ত্য শাসননীতি ও শাসন ব্যবস্থার দাবি করিবেন,

কিন্তু এমন দিন যদি সত্যই আসে, তবে উহাই হইবে ইংলণ্ডের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ গৌরবের দিন।" মেকলের এই উক্তির তারিখ থেকে অল্পবেশী একশো বছর পরে, ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট তারিখটি গ্রেট বৃটেন ও ভারতের ইতিহাসে চিরকাল এই সম্মানের দাবি করবে। ১৮৩৫-এ বেন্টিকের শাসনকালে মেকলের নেতৃত্বে যে নীতির প্রবর্ত্তন হয়, তারই পূর্ণ বিকাশ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ডালহৌসির শাসনকালে স্যর চার্লস উডের ডেসপ্যাচে। এই ডেসপ্যাচের নীতি অনুযায়ী ১৮৫৭-তে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ—এই তিনটি প্রেসিডেন্সী শহরে বর্তমান যুগের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চশিক্ষার প্রবর্তনের ফলে একশো বছরে ভারতের অনেক উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু জাতীয় জীবনে এর সার্থকতা কতটুকু? পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ইংরেজরা যতই মহত্ত্ব দাবি করুন না কেন, এ কথা সত্য যে তাঁদের সমগ্র চেষ্টা এবং অপচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জনগণের শতকরা ৮৮ জন ছিল নিরক্ষর। বর্তমান যুগের যে কোনো সভ্য শাসকবর্গের এতে গৌরবান্বিত বোধ না করে লজ্জিত বোধ করা উচিত নয় কি?

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো।

উনচল্লিশ জন সদস্যদের মধ্যে ছজন ছিলেন ভারতীয়—চার জন হিন্দু ও দুজন মুসলমান। হিন্দু চারজনের মধ্যে ছিলেন বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় ও রামগোপাল ঘোষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাৎসরিক সভায় চ্যান্সলারের এক পাশে লর্ড বিসপ ও অন্য পাশে বিদ্যাসাগর উপবিষ্ট ছিলেন। তখনকার দিনে শিক্ষার যে কোন ব্যাপারেই বিদ্যাসাগরের পরামর্শ অপরিহার্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এর গঠন কার্যে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ সাদরে গৃহীত হতো। দ্বিতীয় বৎসরে একটি পরীক্ষক সমিতি গঠিত হলো। বিদ্যাসাগর এই সমিতির সভ্য নির্বাচিত হলেন এবং তাঁর ওপর সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও উড়িয়া ভাষার প্রশ্নপত্র তৈরি করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উপযুক্ততা ঠিক করবার দায়িত্ব ন্যস্ত হলো। প্রবেশিকা ও বি. এ. পরীক্ষার সমস্ত ভার ছিল এই পরীক্ষক সমিতির উপর এবং সমিতির অন্যান্য সদস্যেরা একান্তভাবেই নির্ভরশীল ছিলেন বিদ্যাসাগরের

উপর। এর জন্যে তিনি ও অন্যান্য সভ্যরা বছরে দশ টাকা করে পারিশ্রমিক পেতেন। বি. এ. এবং এম. এ. পরীক্ষায় তিনি সংস্কৃত পরীক্ষক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর কর্তৃপক্ষ চাইলেন সংস্কৃত কলেজ উঠিয়ে দিতে। একমাত্র বিদ্যাসাগরই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন; তাঁর যুক্তি ও তর্কের সামনে প্রতিপক্ষগণ নিরস্ত হয়ে যান। সংস্কৃত কলেজ আজো যে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে, এ শুধু বিদ্যাসাগরের জন্যেই। সংস্কৃত কলেজের প্রয়োজনীয়তা গভর্ণমেণ্ট ভালো করে উপলব্ধি করলেন যখন মফঃস্বলের মডেল স্কুলগুলির জন্যে বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষকের দরকার হলো।

আগেই বলেছি ছোটলাট হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের একান্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন। একদিন লাটভবনে বিদ্যাসাগর এসেছেন হ্যালিডের সঙ্গে দেখা করতে। শহরের আরো দু'চার জন গণ্যমান্য লোকও এসেছেন এবং তাঁরা অনেকক্ষণ আগে থেকেই এসে অপেক্ষা করছেন। বিদ্যাসাগর এসেছেন এই খবর পাওয়া মাত্র ছোটলাট তখনি তাঁকে ভেতরে ডেকে পাঠালেন। যাঁরা আগে থেকে এসে অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের কেউ কেউ এতে মনঃক্ষুণ্ণ হলেন এবং পরে ব্যবহারের এই তারতম্য সম্পর্কে এঁদের কেউ কেউ যখন হ্যালিডে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কথিত আছে, উত্তরে লাটসাহেব তখন বলেছিলেন: আপনারা আসেন নিজের স্বার্থে আর পণ্ডিত আসেন আমার স্বার্থে; এ ক্ষেত্রে তাঁকে যদি আগে আসতে বলি, তাতে কি কোন দোষ হয়েছে?

এই যে লাট-দরবারে যাওয়া-আসা, এর জন্যে বিদ্যাসাগরের কোন স্বতন্ত্র বেশভূষা ছিল না, ছিল না কোন পোষাকী পরিচ্ছদ—সেই দারিদ্র্যের চিরপ্রিয় বিদ্যাসাগরী চাদর গায়ে দিয়ে আর তালতলার চটি পায়ে দিয়েই যেতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবন-চরিতকার উল্লেখ করেছেন: "ছোটলাট বহু অনুনয় বিনয় করিয়া অনুরোধ করায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকবার পেণ্টলুন, চোগা-চাপকান ও পাগড়ী পরিশোভিত হইয়া অতি গোপনে শহর অতিক্রম করিয়া আলিপুরে বেল্‌ভেডিয়ারে দর্শন দিয়াছিলেন। এই কার্যটা তাঁহার নিকট একটা অপকর্ম বলিয়া মনে হইত। এই সভ্যতা-সঙ্গত বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া তিনি মনে করিতেন, যেন সঙ্ সাজিয়াছেন। তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশ ও অসুবিধা হইত। দুই তিন বার এইরূপ অপ্রীতিকর ও

যন্ত্রণাদায়ক পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া ছোটলাট ভবনে যাতায়াত করিবার পর, বোধ হয় চতুর্থ দিবসে, তিনি সাহেবকে বলিলেন, এই আপনার সহিত আমার শেষ দেখা। সাহেব চমকিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, কেন পণ্ডিত, কি হইয়াছে যে আর দেখা হইবে না? স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিতে হাসিতে ছোটলাটের মুখের উপর বলিলেন, কয়েদীর মত যন্ত্রণাদায়ক পোষাক পরিয়া সঙ্ সাজিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব। এ কার্য আমার দ্বারা হইবে না। সাহেব ক্ষণকাল নতমুখে কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, পণ্ডিত, যে পোষাকে আপনি আসিলে আপনার সুখ ও সুবিধা হয়, তাহাই করিবেন, এ বিষয়ে আমার পছন্দের দিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন নাই। এই ঘটনার পর আর কখনও চটি জুতা, থান ধুতি, আর তাঁহার প্রবর্তিত বিদ্যাসাগরী চাদর পরিত্যাগ করেন নাই।"

জাতীয় ভাবের মর্যাদা রক্ষায় বিদ্যাসাগর এই রকম সচেষ্ট ছিলেন বলেই তাঁর মহত্ত্ব অক্ষুণ্ণ, সম্মান অব্যাহত আর প্রাধান্য অপ্রতিহত থাকত। জাতীয় ভাবের একান্ত পক্ষপাতিত্বের জন্যেই বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর।

পরবর্তীকালে দেশীয় পোষাকের গৌরব যিনি শিক্ষিত সমাজে বাড়িয়েছিলেন, তিনি হলেন আশুতোষ। হাইকোর্টের বাইরে আশুতোষ আজীবন বাঙালির অনাড়ম্বর পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকতেন—লাট-বেলাটের সম্মুখেও তাই।

বিদ্যাসাগরের তেজস্বিতা, তাঁর স্বাধীনচিত্ততায় হ্যালিডে মুগ্ধ ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইয়ং সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কোনো দিনই বনিবনা হতো না। তিনি শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, অতএব তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র। অথচ তরুণ সিবিলিয়ান ইয়ং সাহেব অল্প দিনের মধ্যেই বুঝলেন, এই চটি-চাদর-পরা মানুষটির দেশ-জোড়া খ্যাতি-প্রতিপত্তি, স্বয়ং ছোটলাট তাঁর অনুগত। লাট-দরবারে এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যেতেন উন্নত মস্তকে, সোজা মেরুদণ্ড নিয়ে। সে-মেরুদণ্ড কোনো অবস্থাতেই আনত হতো না। এই দম্ভ, এই তেজ, এই প্রখর ও প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ইয়ং সাহেব বরদাস্ত করা দূরে থাক, খুব প্রসন্ন মনে দেখতেন না। অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে ইয়ং সাহেব জেদ করতেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরেরও ছিল এঁড়ে বাছুরের একগুঁয়েমি—তাই প্রায়ই দুজনার মধ্যে সংঘর্ষ বাধতো। বুদ্ধিমান বিদ্যাসাগর

বুঝলেন এভাবে বেশী দিন কাজ করা অসম্ভব। "পরিশেষে একবার তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শন কার্যের বিবরণ প্রদান করিলে পর, ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেব সেই রিপোর্ট বেশ সুন্দর করিয়া সাজাইয়া দিতে বলেন। এরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, বিবরণটি দেখিতে শুনিতে বেশ জাঁকজমক বিশিষ্ট হয়; উপরিতন কর্মচারিরা দেখিয়া বুঝিবেন যে বেশ কাজকর্ম হইতেছে। উন্নতমনা, ন্যায়পরায়ণ বিদ্যাসাগর এইরূপ অনুরোধে অপমানিত বোধ করিলেন, তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কোন স্থানে একটি বর্ণও পরিবর্তন করিতে সম্মত হইলেন না। পীড়াপীড়ি করায় শেষে কর্মত্যাগের অভিপ্রায় জানাইলেন।"

প্র্যাট সাহেব তখন বাংলায় স্কুলগুলির ইনস্পেক্টর।

তিনি ছুটি নিয়ে বিলেত যাবেন।

বিদ্যাসাগর আশা করলেন, তাঁর কাজের পুরস্কার-স্বরূপ এইবার গভর্ণমেণ্ট তাঁকেই ঐ শূন্য পদে নিযুক্ত করবেন। এ দাবিও তিনি করতে পারেন। শিক্ষা-বিভাগের কর্মচারিরূপে তিনি যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা সরকারের অজানা নেই। সংস্কৃত-শিক্ষার, সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন, বাংলা-শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন এবং স্ত্রী-শিক্ষার বহুল বিস্তার—বলতে গেলে তিনি একাই এসব কাজ করেছেন নিরলস উৎসাহ ও বিচক্ষণতার সঙ্গেই। যেমন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন, তেমন সার্থকতায় উজ্জ্বল তাঁর কর্মজীবন। কাজেই এ ক্ষেত্রে আর সকলের মতো, ইন্সপেক্টরের চাকরীটা পাবার আশা করা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গতও কিছু ছিল না, বরং ন্যায্যতঃ এ পদ তাঁরই প্রাপ্য। হ্যালিডের বন্ধুত্বের ওপর তাঁর ভরসা ছিল এবং তাঁর সঙ্গে এই সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের কিছু কথাবার্তাও হয়েছিল।

হ্যালিডে শেষ পর্যন্ত লজ সাহেবকে ঐ শূন্য পদে নিয়োগ করলেন।

বিদ্যাসাগরের দাবি উপেক্ষিত হলো। তিনি বিস্মিত ও মর্মাহত হলেন। নিরাশায় তাঁর মন ছেয়ে গেল।

ইংরেজের কাছে তিনি সুবিচার পাবেন—এ বিশ্বাস তিনি বরাবর পোষণ করে এসেছেন, যদিও ইতিপূর্বে তাঁর পদোন্নতির ন্যায্য দাবি বার-বার উপেক্ষিত হয়েছে। শিক্ষাবিভাগের তরুণ ডিরেক্টর গর্ডন ইয়ং-এর সঙ্গে প্রতিপদে ঝগড়া করে কাজ করে এসেছেন, শুধু ছোটলাটের অকৃত্রিম

কুকুরের ওপর ভরসা করে। কর্তৃপক্ষের ছন্দানুবর্তী হয়ে চলার মানুষ বিদ্যাসাগর ছিলেন না।

কিন্তু লজের নিয়োগের সংবাদ পেয়ে বিদ্যাসাগরের মন ভেঙে গেল।

তাঁর চাকরীর মোহ কেটে গেল।

ডিরেক্টারকে এক চিঠিতে জানালেন—এবার আমি অবসর নেব।

সংস্কৃত কলেজের উন্নতিকল্পে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর নিজের হাতে গড়া এই সারস্বত প্রতিষ্ঠান ছিল তাঁর দিবসের চিন্তা, রাত্রির স্বপ্ন। তাই এই চিঠির একাংশে তিনি লিখলেন: "সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাবিষয়ক নূতন পদ্ধতি এখনো সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই, তাহা সুসম্পন্ন করিতে আরো দুই তিন মাস লাগিবে। ডিসেম্বরে আমি আমার কর্মত্যাগ-পত্র যথারীতি প্রেরণ করিব।"

এই চিঠির প্রতিলিপি তিনি ছোটলাটের কাছেও পাঠিয়ে দিলেন। বিদ্যাসাগরের কথা জেনে হ্যালিডে সাহেব তখনি তাঁকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করলেন।

হ্যালিডে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিদ্যাসাগরকে আরো এক বছর ধরে রাখতে চাইলেন।

বিদ্যাসাগর বললেন—সাহেব, আমাকে আর পীড়াপীড়ি করবেন না। কাজে আমার আর মন নেই, আপনার কথায় আমি আর এক বছর থাকতে রাজী হলাম। আমার মনও ভেঙেছে, স্বাস্থ্যও ভেঙেছে—আমার দ্বারা আর চাকরী করা চলবে না।

এক বছর পরে বিদ্যাসাগর ডিরেক্টরের কাছে কর্মত্যাগ-পত্র পাঠিয়ে দিলেন। বিদ্যাসাগর তখন এক বিরাট সমাজ-সংস্কার কাজে হাত দিয়েছেন, সে কাজে প্রচুর টাকার দরকার, হ্যালিডে তা জানতেন। তাই তিনি শেষবারের মতন পণ্ডিতকে অনুরোধ করলেন—আপনি যে কাজে এখন জড়িয়ে পড়েছেন, চাকরী ছেড়ে দিলে অর্থাভাবে কষ্ট পাবেন, এখনো বিবেচনা করুন।

বিদ্যাসাগর বললেন, যদি বা আপনার অনুরোধ রাখতাম, কিন্তু কষ্টের কথা যখন তুললেন, তখন আর ও চাইকর্ম গ্রহণ করব না।

—পণ্ডিত, আর একবার ভেবে দেখুন, হ্যালিডে আর একবার অনুরোধ করলেন।

আমার সিদ্ধান্ত অটল—আর চাকরী নয়। এই বলে বিদ্যাসাগর চলে এলেন।

বিদ্যাসাগর চাকরী ছেড়ে দিলেন।

প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তিনি সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। তাঁর এতদিনের কাজের পুরস্কার-স্বরূপ তিনি কোন রকম পেন্‌সন বা পুরস্কারও পেলেন না।

গভর্ণমেণ্ট তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন এই বলে: "লেফটেনেণ্ট গভর্ণর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও অতিরিক্ত ইন্‌সপেক্টর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিতেছেন।...দেশবাসীর হিতার্থে শিক্ষাবিস্তারকল্পে তিনি দীর্ঘকাল উৎসাহের সঙ্গে যে কাজ করিয়াছেন তজ্জন্য সরকার তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।" এই পদত্যাগ উপলক্ষে বিদ্যাসাগর ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে সুদীর্ঘ পত্র-বিনিময় হয়েছিল তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়। সেই সব পত্রের প্রতিটি ছত্রে বিদ্যাসাগরীয় দৃঢ়তা লক্ষ্য করবার বিষয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনের পরবর্তী কালের ঘটনাসমূহ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সরকারী চাকরী থেকে তাঁর এই অবসর গ্রহণ করা, বাঙালির পক্ষে শাপে বর হয়েছিল। তিনি এই সময়ে চাকরীতে ইস্তফা যদি না দিতেন, তাহলে পরবর্তী কালে আমরা সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগরকে পেতাম কি না সন্দেহ। যাই হোক, স্বাস্থ্যের অবনতি, পদোন্নতি সম্পর্কে আশাভঙ্গ আর উপরিতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ—বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের মূল কারণ এই তিনটি। তিনি অবলীলাক্রমে পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরী ছেড়ে দিয়েছিলেন বললে সত্যের অপলাপ করা হয়।

বিদ্যাসাগরের এই চাকড়ী ছাড়ার প্রসঙ্গ স্বভাবতই আমাদের আশুতোষের ভাইস-চ্যান্সেলারী ছেড়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দেয়। আশুতোষ সেদিন এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগরীয় মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন হয়ে কাজ করা, বা কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন করে চলা যেমন সেই নির্লোভ, নিস্পৃহ ব্রাহ্মনের প্রকৃতিতে ছিল না, ঠিক সেই নির্ভীকতা বাঙালি অনেককাল পরে দেখবার সুযোগ পেল যখন আশুতোষ লাট লিটনকে তাঁর পত্রের সমুচিত উত্তর দিয়ে লিখেছিলেন—"আপনি যে অপমান সূচক

প্রস্তাব করিয়া ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ আমাকে দিতে চাহিয়াছেন, তাহা আমি প্রত্যাখ্যান করিতেছি।" স্বাধীন-চিত্ততায় ও নির্ভীকতায় বীরসিংহের সিংহের পরেই নর-শার্দূল আশুতোষেব নামই বাঙালির মানসপটে চিরজাগ্রত।

সংস্কৃত কলেজের চাকরী ছেড়ে দেবার এক মাস পরের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগরের কোনো জীবন-চরিতকারই এটির উল্লেখ করেন নি। বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। একদিন বিদ্যারত্ন এলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বললেন—বলিহারি যাই তোমার বুকের পাটা।
বিদ্যাসাগর বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ এই কথা ? ব্যাপার কি ?
—বাঙালির তুমি মুখ রেখেছ, ভাই ? বললেন বিদ্যারত্ন।
—ও, চাকরী ছাড়ার কথা বলছ ? তা বিদ্যারত্ন তুমি কি বলো, কাজটা ভালো করলাম, না মন্দ করলাম ?
তখন বিদ্যারত্ন বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, বাঙালি হয়ে ইংরেজ রাজপুরুষগণের সামনে এই যে তুমি মাথা উচু করার দৃষ্টান্ত দেখালে ভাই, পরের যুগের লোকেরা এর মূল্য বুঝবে।"
তবু একজনের কাছ থেকে সমর্থন পেলেন জেনে বিদ্যাসাগর খুব খুশি হলেন। আর সে একজন যেমন তেমন কেউ নয়—একবারে গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। আজকের বাঙালি-সন্তান রাজপুরের বিদ্যারত্নকে হয়ত বিস্মৃত হয়েছে, কিন্তু ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে, সেদিন বিদ্যাসাগর বলতে বাংলা দেশে যেমন একজনকেই বোঝাত, তেমনি বিদ্যারত্ন বলতেও একজনকে বোঝাত। তিনি গিরিশচন্দ্র। দুজনাই কাছাকাছি বাস করতেন। বিদ্যাসাগর সুকিয়া স্ট্রীটে আর বিদ্যারত্ন থাকতেন পার্শি বাগানে। বিদ্যারত্ন ছিলেন বিদ্যাসাগরের চেয়ে তিন বছরের ছোট। বিদ্যাসাগরের মত তাঁরও ছাত্রজীবন প্রতিভাদীপ্ত। পাণ্ডিত্য ও দানে বিদ্যারত্ন ও একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। দুজনেই মাতৃভক্ত ও দেশহিতৈষী। বদান্যতা দুজনেরই অতুলনীয় ছিল—অর্থদানে ও শিক্ষাদানে কেউই কম ছিলেন না। বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, বিদ্যারত্ন তখন সেখানকার একজন অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিক।

বিদ্যারত্ন তাঁর উপার্জিত অর্থের বেশীর ভাগই দরিদ্রদের দিয়েও তৃপ্তিলাভ করতে পারেন নি। তাঁর একটি দানের কথা স্মরণীয়। মৃত্যুকালে তিনি সতেরো হাজার টাকার একটি ফাণ্ড একটি কমিটির হাতে দিয়ে যান। এই ফাণ্ড প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল অনন্যোপায়, অন্নভাবে ক্লিষ্ট দরিদ্র বিধবাদের মাসিক বৃত্তি দেওয়া। বর্তমানে এই ফাণ্ডের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে চল্লিশ হাজার টাকা এবং এই টাকার সুদ থেকে আজো কোদালিয়া, চাংড়িপোতা, হরিনাভি ও রাজপুর গ্রামের দরিদ্র বিধবারা মাসিক নিয়মিত বৃত্তি পেয়ে থাকেন।

সেদিনকার বাংলার ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হওয়া যেমন একটা বিশেষ ঘটনা ছিল, তাঁর এই চাকরী ছাড়ার ব্যাপারটিও তেমনি একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ছিল সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে আত্মীয়বর্গের পরামর্শ তাঁর গ্রাহ্য হয় নি। লোকের কথায় তাঁর মত পরিবর্তন ঘটে নি বা ভবিষ্যতের ভাবনায় তাঁর হৃদয় অবসাদে ভেঙে পড়ে নি। লোকে বলল—বামুন এবার নিজের একগুঁয়েমিতে নিজেই মারা পড়ল। আত্মীয়েরা ভাবল—বিদ্যাসাগরের এবার অন্নাভাব ঘটবে। কিন্তু অভিমান-সম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ কারো কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি পরের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু পরের মনস্তুষ্টির জন্যে আত্মসম্মান বিসর্জন দেন নি; তিনি পরের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু পরের কাছে আত্মবিক্রয় করেন নি; তিনি পরের আদেশ পালনে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু পরের অন্যায় ও অসঙ্গত আদেশ অনুসারে কাজ করতে সম্মত হয়ে আত্মাভিমানের মর্যাদা নষ্ট করেন নি। তাঁর হৃদয় এই রকম অটল, এই রকম শক্তি সম্পন্ন ছিল। বহু অনুনয়েও তাঁর অভিমান অন্তহিত, তেজস্বিতা বিচলিত বা কর্তব্যবুদ্ধি আনত হয় নি।

চির অবনত বাঙালির মধ্যে বিদ্যাসাগরের এই তেজস্বিতা চিরদিনের বিস্ময়।
এই অনমনীয় ব্যক্তিত্ব চিরদিনের প্রেরণা।
এই অখণ্ড পৌরুষ চিরদিনের সম্পদ।

পিতা ঠাকুরদাসকে লেখা বিদ্যাসাগরের পত্র

Benares

॥ ষোলো ॥

এইবার আমরা সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগরের কথা বলব।

বলব বাংলার ইতিহাসের সেই মাহেন্দ্রক্ষণের কথা, যে সময়ে একটার পর একটা ঘটনা বাংলা দেশকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছিল। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ, 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও হরিশ্চন্দ্রের আবির্ভাব, নীল বিদ্রোহ, 'সোমপ্রকাশের' অভ্যুদয়, মধুসূদনের আবির্ভাব, দেশীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা—এই সব ঘটনার প্রত্যেকটিই সগৌরবে স্মরণীয়। এই ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম বিধবা-বিবাহ আন্দোলন। এর নায়ক ও প্রবর্তক বিদ্যাসাগর। তাঁর জীবনের কর্মকীর্তির মধ্যে এই আন্দোলন বাংলার সমাজ-জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার তুলনা নেই।

প্রসঙ্গক্রমে এইখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার।

বাংলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস রচনা করতে বসে শুধু কয়েকজন ব্যক্তির বা মহাপুরুষের জীবন-বৃত্তান্ত এককভাবে আলোচনা করে ক্ষান্ত হলে চলে না। তাঁদের দেশে ও কালে এক-একটা সমষ্টির অঙ্গ হিসেবে দেখে, এক-একটা সভা, সঙ্ঘ বা সমাজের স্রষ্টারূপে বিচার করে তবে আমরা ইতিহাসের পূর্ণতর পরিচয় পেতে পারি। ব্যক্তিগত মনের মত সমষ্টিগত মনেরও একটা বাস্তব ভিত্তি আছে। রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, ডিরোজিও, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন জীবনীর আলোচনায় ইতিহাসের যে ছবি পাওয়া যায়, আত্মীয় সভা, ব্রহ্মসভা, একাডেমিক এসোসিয়েসন, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, তত্ত্ববোধিনী সভা প্রভৃতির সমষ্টিগত ইতিহাসগুলিকে ঠিকভাবে ধরতে পারলে সেই সময়ের সমগ্র ইতিহাসের একটা বাস্তব চেহারা এবং এই সমস্ত বিভিন্ন সংঘ-মনের পরস্পর সংঘাতের ফলে একটা পরিপূর্ণ যুগমন চোখের সামনে অনেকখানি

স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাজেই বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সফলতা-বিফলতার কাহিনীমাত্র হিসেবে না দেখে, সঙ্ঘমন বা সঙ্ঘ-চেতনার একটা অভিব্যক্তি হিসেবে দেখলেই ঠিক দেখা হয়। পূর্ণতর ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও বোধের অভাবেই মহৎলোকের জীবনী অনেক সময়েই কাহিনী বা কিংবদন্তীতে পরিণত হয় এবং কালক্রমে তাঁদের প্রকৃত জীবন-চরিত ইতিহাসের জীবলোক থেকে চলে যায় পুরাণের কল্পলোকে।

বিদ্যাসাগরের জীবনে আমরা দেখতে পাই তাঁর যখন আট বছর বয়স, তখনই কলকাতা শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মসমাজ। সে যুগের সর্বপ্রধান ও সকলের চেয়ে শক্তিশালী, বেগবান ছিল এই ব্রাহ্মসমাজ। ধর্মে, সমাজ-সংস্কারে, নারী ও ছাত্র আন্দোলনে, জাতীয়তা ও স্বাধীনতার বিকাশে, রাষ্ট্রে, শিল্পে ও সাহিত্যে, জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে এই সমাজের প্রচেষ্টার প্রভাব বহু দূর বিস্তৃত। তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজেরই একটি বিশেষ উদ্যম। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার এগার বছর পরে এই সভার জন্ম। তত্ত্ববোধিনীর যুগে, রাষ্ট্র ও ধর্ম থেকে শুরু করে, শিক্ষা ও সাহিত্যে পর্যন্ত জাতির সমস্ত বিভাগে, সভার, সঙ্ঘ-মন, ইতিহাসের যুগমনকেই উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। এই যুগের প্রবলতম সঙ্ঘজাত যুগমনই সেদিন বাংলাকে ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় করে তুলেছিল। তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল। এই সভা বেঁচে ছিল কুড়ি বছর। নবজাগ্রত বাংলার যে প্রথম যুবকদল বা ইয়ং বেঙ্গল এই সভাকে ব্যক্তিগত ভাবে উদ্দীপনা জুগিয়েছিলেন এবং সমষ্টিগত ভাবে তত্ত্ববোধিনী সভার কাছ থেকে নিজ নিজ জীবন পাত্রে নব উদ্দীপনা বহন করে নিয়ে সাহিত্য, সংবাদপত্র ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা সমস্ত দেশময় সভার সেই আদর্শগত বৈশিষ্ট্য সঙ্ঘমনকে দেশময় ছড়িয়ে দিয়ে একটা স্পষ্ট যুগমন গঠন করে তুলেছিলেন, তাঁদের চৌষট্টি জনের মধ্যে বিদ্যাসাগর একজন। তত্ত্ববোধিনীর আরম্ভের প্রায় গোড়া থেকেই তিনি এর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন, এ কথা আগেই বলেছি। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনি এবং পরবর্তী কালে তাঁর হাত থেকে সম্পাদকীয় দপ্তরের ভার নিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেন। এই সংঘের অধিনায়ক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষায়, সাহিত্যে ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনীর সমষ্টিগত দান চিরস্মরণীয়। বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবনের চিন্তাধারার

অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করলে পরে দেখা যায় যে, তাঁর ব্যক্তি-মনের ওপর এই তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যমনের ও তত্ত্ববোধিনী-যুগমনের প্রভাব কত গভীর। অবশ্য এ কথা তাঁর প্রায় প্রত্যেক সমসাময়িকদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

বিদ্যাসাগরের বয়স যখন ন বছর তখন নিষিদ্ধ হলো সতীদাহ প্রথা। এই নিষেধাজ্ঞা হিন্দু বিধবাকে জীবন্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলো সত্য, কিন্তু জীবনের পথ তখনো অনাবিষ্কৃত। এ কথা সত্য যে, সমাজ-বিধান ও দেশাচারের কণ্টকাকীর্ণ পথ পরিষ্কার করে জীবন-তীর্থে পৌছানর উদ্যম বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই আরম্ভ হয়েছিল—কিন্তু তাঁরই প্রত্যক্ষ কর্মে সেই উদ্যম যেন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তে কৃষ্ণনগরের মহারাজ শ্রীশচন্দ্র ও কলকাতার দু'চারজন প্রশস্ত হৃদয় ব্যক্তি বিধবা-বিবাহের চেষ্টা চরিত্র করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের প্রতিরোধ করে দাঁড়িয়ে ছিল দেশাচারের বিভীষিকা, পণ্ডিত সমাজের প্রবঞ্চনাময় পাণ্ডিত্য ও ভ্রূকুটি। যে পণ্ডিতেরা সমাজের শাসক ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের এই যে বিদ্রোহ, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজকে এই যে তাঁর আঘাত—বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের সামাজিক ইতিহাসে তা যেন বিস্ফোরণের মত কাজ করেছিল। বস্তুতঃ এই একটি মাত্র ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের দুঃসাহসিকতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। পুরোপুরি সফল হোক বা না হোক, এ কথা সত্য যে, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রবল বেগ বাঙালিকে সংস্কারমুক্তির পথে অনেকখানি অগ্রসর হতে সহায়তা করেছিল।

বিধবাবিবাহ আন্দোলন বিদ্যাসাগরের জীবনের এক অক্ষয় কীর্তি।

আন্দোলন নয়—আলোড়ন।

তাঁর পূর্বসূরীদের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার ছিন্ন সূত্র অবলম্বন করে এই যজ্ঞের সূচনা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বাংলার পণ্ডিত-সমাজের কাছ থেকে কোনো সাহায্য বা সহযোগিতা লাভ করেন নি। তখনকার পণ্ডিতদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতে এই ভাবে ধরা পড়েছিল: জ্ঞান ও সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও অনুরাগের অভাব; চিত্তের ঔদার্য ও বিনয়ের অভাব; চরিত্রের সততা ও একাগ্রতার অভাব; জ্ঞান, কর্ম, আদর্শ ও ব্যবহার সম্পর্কে

একতা ও অভিন্নতাবোধের অভাব এবং দেশাচার প্রীতি ও কুসংস্কারের প্রতি অন্ধ অনুরাগ। এই জন্যেই বোধ হয় বিদ্যাসাগর প্রায়ই বলতেন: "যদি কেহ আমাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাবে, তাহাতে আমার যৎপরোনাস্তি অপমান বোধ হয়।" এই জন্যেই তাঁর শিক্ষাগুরু শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি যখন বৃদ্ধ বয়সে আবার দারপরিগ্রহ করেন, তখন হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—"এ ভিটায় আর জলস্পর্শ করব না।" বিদ্যাসাগর বাংলার পণ্ডিত সমাজের অনুদার হৃদয়ের পরিচয় নানা ভাবেই পেয়েছিলেন বলেই এত বড় একটা দুঃসাহসিক কাজে হস্তক্ষেপ করবার সময় তিনি এঁদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। বিদ্যাসাগর এই আন্দোলন শুরু করবার আগেও দুটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য।

কলকাতার শ্যামাচরণ দাস জাতে কামার। সে তার বাল-বিধবা মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। মতামত প্রার্থনা করল পণ্ডিত সমাজের কাছে। তখনকার দিনে ধর্মশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন: মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত। এঁরা সকলেই বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে বিধান দান করেন; কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁদের প্রায় সকলেই বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেন। ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করে, নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে তর্কবিচারে পরাজিত করেন এবং পুরস্কারস্বরূপ শোভাবাজারের রাজদরবার থেকে একজোড়া শাল উপহার লাভ করেন। অথচ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তিনি সর্বত্র তার বিরোধিতা করেন। পাণ্ডিত্যের এইরূপ শঠতা, ব্যবস্থা ও আচরণের এই বৈপরীত্য, ধর্মভীরু মানুষকে স্বভাবতই বিমূঢ় করে রেখেছিল। সেই সময়ে অভাব ছিল শুধু সাহসের, সংকল্পের এবং সত্যাশ্রয়ী নির্মল পাণ্ডিত্যের—পাণ্ডিত্যাভিমানীর প্রবঞ্চনাময় ভ্রূকুটিকে যা অবহেলায় জয় করতে পারে। বাংলা সমাজ-জীবনের ক্ষেত্রে সে অভাব পূরণ করলেন বিদ্যাসাগর। মন তাঁর এ বিষয়ে অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের প্রথম পুরুষ এবং অন্যতম চিন্তানায়ক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত এ বিষয়ে প্রাগ্রসর মনের পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করেছিলেন। পুত্র রবীন্দ্রনাথের উপনয়নের সময়ে বন্ধুপুত্র রাজনারায়ণ বসুর উপনয়ন-স্থলে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল—এমন সংরক্ষণশীল মনের পরিচয়ও

তিনি দিয়েছিলেন। তাই বিদ্যাসাগর যখন এই বিরাট আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ যদি এগিয়ে এসে তাঁর পাশে দাঁড়াতে পারতেন, তাহলে এই আন্দোলনের তীব্রতা আরো ব্যাপক হতো—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তো দূরের কথা, সেদিনের কোন বাঙালি-প্রধানই বিধবাবিবাহ আন্দোলনে শক্তি জোগাবার জন্যে বিদ্যাসাগরের পাশে এসে দাঁড়ান নি। এ আন্দোলন তাঁর একার। সতীদাহ আন্দোলনের সময়ে রামমোহন যেমন দেশাচারের বিরুদ্ধে একাকী সংগ্রাম করে, শেষে সরকারী সাহায্যে আইন পাশ করিয়ে সফলতা লাভ করেন, বিদ্যাসাগরও তেমনি বিধবা আন্দোলনের জন্য একাই সংগ্রাম করেছিলেন এবং দু'বছরের মধ্যেই গভর্ণমেণ্টকে দিয়ে বিধবাবিবাহ আইন পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের একটা নেপথ্য ইতিহাস আছে।
বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার সেই ইতিহাস এইভাবে ব্যক্ত করেছেন।
"বিধবাবিবাহ-প্রচলনের প্রবৃত্তি কেন হইল, তৎসম্বন্ধে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার স্বগ্রামবাসী স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিংহ মহাশয়কে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এখানে উদ্ধৃত হইল; 'বীরসিংহগ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি বাল্যসহচরী ছিল। সেই সহচরী তাঁহার কোন প্রতিবেশী কন্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। বালিকাটি বাল্যকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ে নিকট সর্বদা থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলিকাতায় পড়িতে আসিলেন, তখন বালিকার বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের কয়েক মাস পরে তাহার বৈধব্য ঘটে। বালিকাটি বিধবা হইবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের ছুটিতে বাড়িতে গিয়াছিলেন। বাড়ি যাইলে তিনি প্রত্যেক প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কে কি খাইল? ইহাই তাঁহার স্বভাব ছিল। এবার গিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার বাল্যসহচরী কিছু খায় নাই। সেদিন তাহার একাদশী; বিধবাকে খাইতে নাই। এ কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেইদিন হইতে তাঁহার সংকল্প হইল, বিধবার এ দুঃখ মোচন করিব; যদি বাঁচি তবে যাহা হয় একটা করিব। তখন বিদ্যাসাগরের বয়স মাত্র তেরো-চৌদ্দ বৎসর মাত্র হইবে।"

তাই বলছিলাম এ বিষয়ে বহু পূর্ব থেকেই বিদ্যাসাগরের মন প্রস্তুত হয়েছিল। কেবলমাত্র আন্দোলন হিসেবে তিনি একে গ্রহণ করেন নি। "বিধবা বিবাহের পক্ষ সমর্থন, বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা, এবং বিধবা বিবাহ দেওয়া তাঁহার জীবনের মহাব্রত। সেই ব্রত পালন ও উদ্‌যাপন করিতে তিনি জীবনের বহুমূল্য সময় ক্ষয় করিয়াছেন, উপার্জিত অর্থের প্রায় সমগ্র অংশ ব্যয় করিয়াছেন।" এই আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বিদ্যাসাগর যেভাবে নিজকে প্রকাশ করেছিলেন, তার সম্যক বর্ণনা ভাষায় সম্ভব নয়। এই সম্পর্কে তাঁর এক চরিতকার যথার্থই লিখেছেন যে বিদ্যাসাগরের দয়া, প্রতিভা, পাণ্ডিত্য, মাতৃভক্তি—সব কিছুর কথা লোকে বিস্মৃত হতে পারে, "কিন্তু ভারতে হিন্দু বিধবার বিবাহ প্রচলন ভারতবাসী কোন দিন ভুলিতে পারিবে না। হিন্দু সংসারের ইতর ভদ্র, স্ত্রীপুরুষ, বালক বৃদ্ধ চিরদিন এই অনুষ্ঠানের জন্য তাঁহাকে চিনিবে, তাঁহাকে জানিবে, তাঁহার কার্যকলাপ শুনিবার জন্য উৎকর্ণে অপেক্ষা করিবে। এই বিধবা বিষয়ক আন্দোলনে তিনি জনসমাজ সমক্ষে প্রকৃত আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার শরীরের কত শক্তি ছিল, তাঁহার মনের বল কত অপরিমেয় ছিল, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি এবং এতাদৃশ জটিল সামাজিক প্রশ্ন বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও তাঁহার রণনৈপুণ্য কতদূর বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেছে—তাহা চিরদিনই ভাবী বংশের গবেষণার বিষয় ও চিরগৌরবস্থল হইয়া থাকিবে। এই যে এক কার্য তিনি করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি সমগ্র দেশবাসীর নিকট পরিচিত।"

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদে প্রতিষ্ঠিত হবার তিন বছর পরে একদিন।
রাত্রিবেলায় খাওয়া দাওয়ার পর বিদ্যাসাগর স্তূপীকৃত পুঁথিপত্র ও শাস্ত্রীয় পুস্তক নিয়ে বসেছেন। ভৃত্য এসে নিঃশব্দে গড়গড়া রেখে গেল। বিদ্যাসাগর হাত বাড়িয়ে গড়গড়ার নলটা তুলে নিলেন। এমন সময় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন।

—কী ব্যাপার, রাজ্যের পুঁথি নিয়ে বসেছেন! বিস্মিত হয়ে বললেন তিনি।

—এসো রাজকৃষ্ণ, তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। বসো। বললেন বিদ্যাসাগর।

—তা বসছি; কিন্তু এ আপনি কী করছেন?

—উঁহুঁ, এখন বলছি না। তুমি বরং বসে বসে এই মৃচ্ছকটীকখানা পড়; এই বলে বিদ্যাসাগর রাজকৃষ্ণ বাবুর হাতে একখানা মৃচ্ছকটীক তুলে দিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু বই পড়তে লাগলেন, বিদ্যাসাগর পুঁথির পাতা উল্টোতে লাগলেন। রাজকৃষ্ণবাবু দেখলেন পুঁথিখানা পরাশর-সংহিতা। পাতা উল্টোতে উল্টোতে হঠাৎ তিনি আনন্দে অধীর হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। বললেন—পেয়েছি, পেয়েছি।

—কী পেয়েছেন? জিজ্ঞাসা করলেন করলেন রাজকৃষ্ণবাবু।

—কী পেয়েছি, শুনবে? তারপর বিদ্যাসাগর এই শ্লোকটা আওড়ালেন:

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্য বিধিয়তে।

বুঝলে রাজকৃষ্ণ, এই হলো অকাট্য প্রমাণ।

—কিসের অকাট্য প্রমাণ?

—বিধবা বিবাহের।

—আপনি কি বিধবার বিয়ে দেবেন?

—হঁ্যা, আমি বিধবা বিয়ে দেব। শাস্ত্রে এর সমর্থন আছে।

রাজকৃষ্ণ শুনলেন, শুনলো সারা বাংলা দেশ। বিদ্যাসাগর বললেন—আমি বিধবার বিয়ে দেব। এমন নতুন কথা রামমোহনের পর বাঙালি অনেক দিন শোনে নি। বাংলার আকাশ বাতাস সহসা যেন সচকিত হয়ে উঠল। বাঙালির সামাজিক ইতিহাসে দেখা দিল এক নতুন চেতনা।

তারপর সারা রাত ধরে লিখলেন। আচ্ছন্নের মতো লিখে চলেছেন বিদ্যাসাগর। সেই অবস্থায়ই সকাল হলো। অক্ষয়কুমার প্রায় প্রতিদিন সকালে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। সেদিন তিনি আসতেই বিদ্যাসাগর তাঁর হাতে একতাড়া কাগজ দিয়ে বললেন—এই নাও অক্ষয়, তোমার তত্ত্ববোধিনীর জন্যে কিছু খোরাক দিলাম।

অক্ষয়বাবু হাত পেতে সাগ্রহে নিলেন লেখাগুলো। কি লেখা, কি বৃত্তান্ত কোন প্রশ্ন নয়। বিদ্যাসাগরের লেখা—এই-ই যথেষ্ট।

তত্ত্ববোধিনীতে বেরুলো বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধ।

বিষয়: "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?"

পুস্তিকা আকারে শীঘ্রই তা প্রকাশিত এবং বিতরিত হলো।

শহরে আগুন জ্বলে উঠল।

কলকাতার নিস্তরঙ্গ সমাজে সে যেন এক অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণ, এক অভূতপূর্ব আলোড়ন।

চারদিকে বাদ-প্রতিবাদের ধূম লেগে গেল।

বিদ্যাসাগর ভ্রূক্ষেপহীন। তাঁর জীবনের মন্ত্র: "কর্তব্য বুঝিব যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা।"

এই মহামন্ত্রেই দীক্ষিত হয়ে তিনি সংসারের পথে এক এক পা করে অগ্রসর হয়েছেন। এই মন্ত্রের বলেই ব্রাহ্মণ এই জাতির পুঞ্জীভূত জঞ্জালের ভার একা স্বহস্তে সরিয়ে গিয়েছেন।

আজ এই মন্ত্রেই উদ্বুদ্ধ বিদ্যাসাগর সূচনা করলেন বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের। জীবনে যখন এল চরম আহ্বান, তখন তাঁর সমগ্র সত্তাই যেন সাড়া দিয়ে উঠল। জীবনে নেমে এল যখন মহা-পরীক্ষা, তখন চরম দুঃসাহসে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে পণ করলেন বিদ্যাসাগর। অলক্ষ্যে আশীর্বাদ জানালেন তাঁর জীবনের ভাগ্যবিধাতা।

নিন্দা, প্রশংসা, তিরস্কার ও পুরস্কার, অনাদর ও সম্মান, সব কিছু উপেক্ষা করে বিদ্যাসাগর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই বিরাট আন্দোলনের আবর্তের মধ্যে।

এইখানে একটা কথা বলা দরকার যে, এই ভয়ঙ্কর আন্দোলনে প্রবৃত্ত হবার আগে বিদ্যাসাগর সকলের আগে তাঁর মা এবং বাবার অনুমতি নিয়েছিলেন। ভগবতী দেবী ও ঠাকুরদাস তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ ছিলেন। তাঁদের অমতে তিনি কখনো কোন কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না। একবার দেশে গেলে পরে ভগবতী দেবী সজল নয়নে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন—হ্যাঁ রে ঈশ্বর, তুই তো খুব পণ্ডিত; একবার বিচার করে দেখবি বিধবাদের বিয়ে দেওয়া যায় কিনা? ঠাকুরদাস কাছেই বসেছিলেন। তিনিও বললেন—ঠিক কথা বলেছ। শাস্ত্রগুলো একবার উল্টেপাল্টে দেখ তো—এ বিষয়ে কোন বিধান পাওয়া যায় কি না?

—যদি পাই, তা হলে? জিজ্ঞাসা করলেন বিদ্যাসাগর।

—বিধবাদের বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবি, বললেন ভগবতী দেবী।

মায়ের এই কথায় বিধবার দুঃখ দূর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর। ঠিক করলেন কলকাতায় ফিরে গিয়ে তিনি এই কাজে হাত দেবেন।

বিদ্যাসাগরের যে কথা সেই কাজ।

সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে যত হাতে-লেখা পুঁথি ছিল সব আদ্যোপান্ত পাঠ করলেন। আগে থেকেই তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন যে দেশাচারের চেয়ে শাস্ত্রের ওপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা যদি দেশের লোকের থাকে, যদি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সত্যই শাস্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা থাকে, তাহলে তিনি এ বিষয়ে তাঁদের সমর্থন পাবেন। বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের শরণাপন্ন হলেন।

নিজে যেভাবে শাস্ত্র বুঝলেন, সেই ভাবেই সাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। এইখানেই বিদ্যাসাগরের সরলতার সম্যক পরিচয়।

পর পর দু'খানা বই লিখলেন। বই নয় পুস্তিকা—আয়তনে ক্ষুদ্র, কিন্তু বিষয়ের গুরুত্বে সাঙ্ঘাতিক।

বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?—এই প্রশ্নই তুললেন বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করে। এই ছোট্ট বই দুখানি তাঁর অসামান্য গবেষণা, —পাণ্ডিত্য ও বিচার-নৈপুণ্যের অসামান্য নিদর্শন। এই ক্ষুদ্র-কলেবর বই দুখানা লিখতে তিনি যে রকম অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা শুনলে বিস্মিত হতে হয়। সংস্কৃত পুঁথির পাঠোদ্ধার ও তার অর্থসঙ্গতি করতে তাঁকে অনেক পরিশ্রম করতে হতো। তিনি সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে বসে, শাস্ত্রের বচন সংগ্রহ ও তার অর্থ লিখতেন। শোনা যায়, একদিন অনেক ভেবেও কোন শ্লোকের অর্থ পরিগ্রহ করতে পারলেন না। এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। অগত্যা লেখায় নিরস্ত হয়ে, ভাবতে ভাবতে বাসার দিকে চললেন। কিছু দূর গেলে, সহসা তাঁর মুখমণ্ডল প্রসন্ন হয়ে উঠল। অন্ধকারে পথিক সহসা আলো দেখতে পেলে যেমন প্রফুল্ল হয়, বিদ্যাসাগরও তেমনি সেই শ্লোকটির অর্থ উপলব্ধি করে প্রফুল্ল হলেন। বাসায় যাওয়া হলো না। কলেজেই ফিরে এলেন। লাইব্রেরীতে এসে আবার লিখতে বসলেন। লিখতে লিখতে রাত শেষ হয়ে গেল। হিন্দু বিধবার দুঃখ তিনি এমন গভীর ভাবেই অনুভব করেছিলেন বলে বিদ্যাসাগর এই রকম অধ্যবসায়ের সঙ্গে শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনে উদ্যত হয়েছিলেন।

বৃহদায়তন বই না লিখে ছোট একখানি বই লেখার উদ্দেশ্য ছিল যে, লোককে অল্প কথার মধ্যে প্রকৃত বিষয়টা বুঝিয়ে দিতে হবে। সেই জন্যে বিদ্যাসাগর অল্পের মধ্যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথাগুলি দিয়ে বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা

প্রমাণ করলেন। কথিত আছে যে, বই লিখে প্রথমেই তিনি প্রচার করেন নি বা মুদ্রিত করেন নি। এই সম্পর্কে তাঁর এক জীবন-চরিতকার উল্লেখ করেছেন: "পুস্তক রচনা করিলেন বটে, কিন্তু এখনো প্রচার করেন নাই। পুস্তক রচনা করিয়া সর্বাগ্রে পিতার নিকট গেলেন, পিতাকে গিয়া বলিলেন, 'দেখুন, আমি শাস্ত্রাদি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থনের জন্য এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছি। আপনি শুনিয়া এ বিষয়ে আপনার মত না দিলে, আমি ইহা প্রকাশ করিতে পারি না।' ঠাকুরদাস পুত্রকে বলিলেন, 'যদি আমি এ বিষয়ে মত না দিই, তবে তুমি কি করিবে?' ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, 'তাহা হইলে আমি আপনার জীবদ্দশায় এ গ্রন্থ প্রচার করিব না। আপনার দেহ ত্যাগের পর আমার যেরূপ ইচ্ছা হইবে সেইরূপ করিব।' পিতা পুত্রকে বলিলেন, 'আচ্ছা, কাল একবার নির্জনে বসিয়া মনোযোগ সহকারে সমস্ত শুনিব, পরে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিব।' পরদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতার নিকট বসিয়া গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। পিতা সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'তুমি কি বিশ্বাস কর, যাহা লিখিয়াছ, তাহা সমস্ত শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে?' পুত্র অমনি বলিলেন, 'হাঁ, তাহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।' উদার-হৃদয় ঠাকুরদাস বলিলেন, 'তবে তুমি এ বিষয়ে বিধিমতে চেষ্টা করিতে পার, আমার তাহাতে আপত্তি নাই।'"

প্রথম বইখানি বাইশ পাতার। ছাপিয়ে যখন বেরুল তখন দেখা গেল যে সাত দিনেই সংস্করণ শেষ। বই ছাপাবার পর বিদ্যাসাগর একদিন এলেন শোভাবাজারে রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে। সমাজে, রাজদরবারে সর্বত্র রাধাকান্তের প্রতিপত্তির কথা তাঁর অজানা ছিল না। এই আন্দোলনের পক্ষে যদি তাঁর মত প্রভাবসম্পন্ন লোকের সমর্থন পাওয়া যায়, তাহলে আন্দোলন সফল হতে পারে—এই রকম আশা ছিল বিদ্যাসাগরের মনে। এই প্রসঙ্গে রাধাকান্তের দৌহিত্র, বিদ্যাসাগরের বন্ধু, আনন্দকৃষ্ণ বসু বলেন: "বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কি না, এই সম্বন্ধে পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া, বিদ্যাসাগর আমাদের বাড়িতে আসেন। তাঁহার পুস্তিকার সুন্দর লিপিচতুরতা ও তর্ক-প্রখরতা দেখিয়া আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম। আমরা বলিলাম, 'এখন তুমি পুস্তিকা প্রচার করিয়া তোমার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা কর।'

বিদ্যাসাগর বলিলেন, 'যখন এ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন ইহার জন্য প্রাণপণ জানিও। ইহার জন্য যথাসর্বস্ব দিব। তবে তোমার মাতামহ যদি সহায় হন, তবে একার্য অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও সহজে সিদ্ধ হইবে। সমাজে ও রাজ-দরবারে তাঁহার যেরূপ সম্মান, তিনি সহায় হইলে, সমাজে সহজে আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবে।' আমি বলিলাম, 'দাদা মহাশয়ের সম্মুখীন হইয়া একথা বলিতে সাহস হয় না; তুমি স্বয়ং একখানি পত্র লিখিয়া একখণ্ড পুস্তিকা তাঁহার নিকট প্রেরণ কর।'"

বিদ্যাসাগর তাই করলেন।

বন্ধুর প্রস্তাব অনুযায়ী একখানি চিঠি ও সেই সঙ্গে একখণ্ড পুস্তিকা রাধাকান্ত দেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন তিনি। বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত বইখানা পড়ে খুশি হলেন। বিদ্যাসাগরকে তিনি একদিন ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে পরে রাজাবাহাদুর বললেন, পণ্ডিত, তোমার বই পড়লাম; তুমি যে সব শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখিয়েছ তা সুন্দর। তবে আমি বিষয়ী লোক, শাস্ত্রের কী বা বুঝি; কাজেই এ বিষয়ে কোন মত দেওয়া আমার পক্ষে সাধ্যাতীত এবং অসঙ্গত।

—আপনি সমাজপতি এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি; কোন মত দেবেন না? বললেন বিদ্যাসাগর।

—সমাজপতি কিন্তু শাস্ত্রপতি তো নই, হেসে বললেন রাধাকান্ত। একদিন পণ্ডিতদের ডেকে এ বিষয়ে বিচার করাই। তুমি যদি সম্মত হও, তাহলে দিন ঠিক করে পণ্ডিতদের ডাকি।

বিদ্যাসাগর রাজী হলেন।

শোভাবাজারের রাজবাড়ি।

বাংলার পণ্ডিতদের বিচারসভা বসেছে এখানে।

বিচারের বিষয়—বিধবাবিবাহ।

সেই পণ্ডিতসভার মাঝখানে বসে আছেন বিদ্যাসাগর। পরণে থানধুতি, গায়ে শুভ্র উত্তরীয়, সৌম্য অথচ তেজঃপুঞ্জ মূর্তি। তাঁর দুই চক্ষে উদ্বেলিত করুণার সাগর, হৃদয়ে স্পন্দিত যুগ-চেতনা। যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। পণ্ডিতদের প্রত্যেকের হাতে একখানা করে বিদ্যাসাগরের

বই—'বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কি না'। বিচার আরম্ভ হলো। বিপক্ষ পণ্ডিতের দল শাস্ত্র থেকে বচন আওড়ালেন ; বিদ্যাসাগরও শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়ে প্রত্যেকের যুক্তি খণ্ডন করলেন। কিন্তু কোন মীমাংসা হলো না। বিদ্যাসাগরের তর্কপ্রণালীতে পরিতুষ্ট হয়ে রাধাকান্ত তাঁকে একখানা দামী শাল উপহার দিলেন।

বিদ্যাসাগরকে এইভাবে পুরস্কৃত করতে দেখে সমাজপতিরা সিদ্ধান্ত করলেন, রাধকান্ত দেব বোধ হয় বিধবাবিবাহ-প্রচলনের পক্ষপাতী। কলগুঞ্জন উঠল পণ্ডিতদের মধ্যে। পরবর্তী কাহিনী আনন্দকৃষ্ণ বসু এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

"একদিন বড়বাজারের গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের প্রধান ব্যক্তিপ্রমুখ সমাজপতিরা মাতামহ মহাশয়ের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'আপনি কি সর্বনাশ করিলেন? আপনি কি হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহরূপ পাপ প্রথার প্রচলন করিতে চাহেন? বিদ্যাসাগরকে পুরস্কৃত করিলেন কেন?' ইহাতে মাতামহ উত্তর দিলেন, 'আমি বিধবাবিবাহ প্রচলনের পক্ষপাতী নহি। আমার তাহাতে অধিকার কি? আমি বিষয়ী লোক, শাস্ত্র-বিচারের কি বা জানি। তবে বিদ্যাসাগরের তর্ক-প্রণালীতে তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে শাল পুরস্কার দিয়াছিলাম। ভাল, এতৎসম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর সভা করিয়া, আর একদিন বিচার করাইলেই হইবে।"

তারপর শোভাবাজারের রাজবাড়িতে পণ্ডিতদের আর একটা সভা বসল। এই সভায় অন্যান্য পণ্ডিতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। বাংলার পণ্ডিতসমাজের শিরোমণি তিনি। এ দিনের বিচারেও কিছু মীমাংসা হলো না। অনুস্বর-বিসর্গের একটা তুমুল কোলাহল উঠল মাত্র। এইদিন রাধাকান্ত দেব বিদ্যারত্ন মহাশয়কে শাল পুরস্কার দিলেন। তখন বিদ্যাসাগর বুঝলেন, রাধাকান্ত দেবের কাছে তিনি কোন সাহায্য পাবেন না। সেদিন রাধাকান্ত দেবের নবরত্নের নাট-মন্দির থেকেই বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী বিরোধিতা করা হয়েছিল। ব্রাহ্মণ তাতেও বিচলিত হলেন না। "তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, অটুট বিক্রমে, অটল সাহসে, আপন কর্তব্য সাধনে আত্মসমর্পণ করেন। সমাজে বিধবাবিবাহের প্রচলন করাই তাঁহার অটল প্রতিজ্ঞা। সে বিরাট পুরুষের সে প্রতিজ্ঞা কে ভঙ্গ করিতে পারে?"

লোকে মুখে মুখে এখন দুটি কথা—বিদ্যাসাগর আর বিধবাবিবাহ।
বাইশ পাতার বই জাগিয়ে তুললো বিপুল আলোড়ন।
সাত দিনের মধ্যেই দু'হাজার বই নিঃশেষ হয়ে গেল। আবার তিন হাজার ছাপান হলো। তাও হু হু করে প্রচারিত হলো।
দেশময় প্রবাহিত হলো সমাজ-বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গ।
বিধবা-বিবাহের সমর্থক এবং বিরোধী পক্ষের কণ্ঠকে আশ্রয় করে এই বার্তা দেশে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। মাঠে ময়দানে, শহরে-গ্রামে সর্বত্র শোনা গেল দুটি কথা—বিদ্যাসাগর আর বিধবাবিবাহ।
শান্তিপুরের কাপড়ের পাড়ে, চাষীর কণ্ঠে, গ্রাম্যচারণের সঙ্গীতে বিদ্যাসাগর আর বিধবাবিবাহ ; আর শত সহস্র নারীর নীরব কণ্ঠে অযুত আশীর্বাদ।
চারিদিকের পণ্ডিত-সমাজ থেকে অসংখ্য প্রতিবাদ-পুস্তক প্রকাশিত হলো। এমন কি, কাশীর পণ্ডিতরাও নীরব থাকলেন না। রাজা ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা দেশে যত হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী সভা ছিল, যত ধর্মসভা ছিল—সেই সব সভার মঞ্চ থেকে প্রবল প্রতিবাদ উঠল বিদ্যাসাগরের এই ক্ষুদ্র বইখানাকে উপলক্ষ্য করে। যেখানে যত মহামহোপাধ্যায় ছিলেন, সকলেই সবেগে টিকি নেড়ে বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয় ও অকর্তব্য বলে বক্তৃতা করতে লাগলেন। মোট কথা, বাইশ পাতার বইখানা প্রকাশিত হবার সঙ্গে গোটা ভারতবর্ষেই যেন দাবানল জ্বলে উঠল—সমগ্র দেশ এই সংস্কারকে কেন্দ্র করে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। চারদিক থেকে প্রতিবাদের শরজাল বিদ্যাসাগরকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হতে লাগল ; ভাল-মন্দ বিচার বড় একটা কেউ করে দেখল না, বিধবাবিবাহের পক্ষে বিদ্যাসাগরের যুক্তিগুলো কেউই স্থিরচিত্তে আলোচনা করল না—খালি রব উঠল—হিন্দুধর্ম রসাতলে গেল। কোন কোন অতি পণ্ডিত আবার বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগের ভুল দেখাতে চেষ্টা করলেন।
বিদ্যাসাগর এইসব বাদ-প্রতিবাদ এবং বিরূপ সমালোচনা সমস্তই লক্ষ্য করলেন। তিনি বুঝলেন মৌচাকে ঢিল পড়েছে, শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের স্বার্থে আঘাত লেগেছে। এমনটি যে হবে, বিদ্যাসাগর তা অনুমান করেছিলেন। কেননা, তাঁর সামনে ছিল শ্যামাচরণ কামারের দৃষ্টান্ত। তিনি জানতেন যে এই কর্মকারের বিধবা মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা যে পণ্ডিতরা দিয়েছিলেন,

তাঁরাই আবার রাধাকান্ত দেবের কাছ থেকে শাল পুরস্কার পেয়ে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধপক্ষীয়দের সহায়তা করেছেন। ফলে, শ্যামাচরণ দাস তার সেই বিধবা মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন নি। ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের আচরণে ও কাজে এই যে বৈপরীত্য, এই যে কপটাচার, বিদ্যাসাগরের মত সরল অথচ কঠিন মানুষ তা কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। তাই তিনি তার বিধবা বিষয়ক বইখানির ভূমিকায় এই কপটাচারের উল্লেখ করে গভীর দুঃখের সঙ্গে লিখেছিলেন: "আমার পুস্তক সঙ্কলিত মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবার কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার অন্তঃপাতী পটলডাঙা নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দাস, নিজ তনয়ার বৈধব্য দর্শনে দুঃখিত হইয়া, মনে মনে সঙ্কল্প করেন, যদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দেন, পুনরায় কন্যার বিবাহ দিব। তদনুসারে তিনি সচেষ্ট হইয়া বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদক এক ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন। উহাতে ৺কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ (এই ব্যবস্থাপত্র বিদ্যাবাগীশের নিজের রচিত এবং স্বহস্ত লিখিত) প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে। ...ইঁহারা সকলেই বহুজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া গণ্য। ইঁহারা সকলেই ঐ ব্যবস্থায় স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, এক্ষণে প্রায় সকলেই বিধবাবিবাহের বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহারা পূর্বেই কি বুঝিয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; আর এক্ষণেই বা কি বুঝিয়া বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার নিগূঢ় মর্ম ইঁহারাই বলিতে পারেন।...... কিছুদিন পরে যখন ঐ ব্যবস্থাপত্র উপলক্ষে বিচার উপস্থিত হয়, তখন শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা পক্ষ রক্ষার নিমিত্ত নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত শ্রীযুত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্যের সহিত বিচার করেন, এবং বিচারে জয়ী হইয়া একজোড়া শাল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। একজন (অর্থাৎ মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ) পরিশ্রম করিয়া ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন, আরেকজন বিরোধী পক্ষের সহিত বিচার করিয়া ঐ ব্যবস্থার প্রামাণ্য রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে, ইঁহারা উভয়েই এক্ষণে বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ...যদি বিধবা বিবাহ বাস্তবিক অশাস্ত্রীয় বলিয়া তাঁহাদের বোধ

থাকে, অথচ কেবল তৈলবটের লোভে শাস্ত্রীয় বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে যথার্থ ভদ্রের কর্ম করা হয় নাই। আর, যদি বিধবা-বিবাহ বাস্তবিক শাস্ত্রসম্মত কর্ম বলিয়া বোধ থাকে, এবং সেই বোধ অনুসারেই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া তদ্বিষয়ে বিদ্বেষ পোষণ করাও যথার্থ ভদ্রের কর্ম হইতেছে না।"

বাংলার পণ্ডিত-সমাজকে এইভাবে ধিক্কার দিয়ে বিদ্যাসাগর শেষে এই বলে আক্ষেপ করেছেন যে, "যাঁহাদের এইরূপ রীতি, সেই মহাপুরুষেরাই এ দেশে ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসা-কর্তা এবং তাঁহাদের বাক্যে ও ব্যবস্থায় আস্থা করিয়াই এ দেশের লোকদিগকে চলিতে হয়।"

বিদ্যাসাগরের এই ধিক্কার ও আক্ষেপবাণী আজো সত্য। আজকের এই প্রাগ্রসর এবং আলোকিত যুগেও সামাজিক বহু বিষয়ে এই সব পণ্ডিতদের অনুদারতা ও শাস্ত্রীয় গোঁড়ামি আমাদের সামনে প্রবল প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সেই কঠোর ধিক্কার বাণীতে সেদিন যেমন, আজো তেমনি তাঁদের কিছুমাত্র চৈতন্য হয় নি। এই ব্রাহ্মণতন্ত্রের বিরুদ্ধেই ছিল ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরের বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহই সেদিন আত্মপ্রকাশ করেছিল এই বিধবা-বিবাহ অন্দোলনকে উপলক্ষ করে।

এই সব বাদ-প্রতিবাদের উত্তর দিয়ে ন মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক বের করলেন। যে-সব পণ্ডিত বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন, এই বইতে তাঁদের অনেকেরই মত খণ্ডনে প্রয়াস আছে। প্রতিবাদকারীদের ভাষার মতো বিদ্যাসাগরের এই বইয়ের ভাষা কোথাও বিদ্বেষপূর্ণ কিম্বা কটূক্তিপূর্ণ নয়। এ বইয়ের ভাষা গাম্ভীর্যপূর্ণ। এ পুস্তিকাখানিও, প্রথম পুস্তিকার ন্যায়, পাণ্ডিত্য ও গবেষণায় পূর্ণ। দ্বিতীয় পুস্তকের বিচার-নৈপুণ্য বিরোধীদলের পণ্ডিতদেরও বিস্মিত করেছিল। পরাশর সংহিতার 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে'-শ্লোকটির যে স্বাভাবিক, সহজ ও সরল অর্থ বিদ্যাসাগর করলেন, তা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবন-চরিতকার লিখেছেন :

"বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে যেরূপে পরাজিত করিয়াছেন, যেরূপ শ্লোকের পর শ্লোক ধরিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, কি উদ্দেশ্যে

কোন্ শ্লোকের সৃষ্টি এবং ঐ সকল পণ্ডিতদের দ্বারা সে সকলের কিরূপ অন্যায়ার্থ সংসাধিত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহার বুঝাইবার পদ্ধতি এত সহজ ও সুন্দর যে, যে ব্যক্তি লেখাপড়া কিছুই জানে না, তাহাকেও উক্ত গ্রন্থাবলম্বনে সমস্ত কথা বেশ বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ...এইরূপ গুরুতর বিষয়ে বিচারস্থলে যেরূপ ধীরতা ও শান্ত ভাব অবলম্বন করা আবশ্যক, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই।"

প্রথম পুস্তিকা প্রচারের সময়ে বিদ্যাসাগরের আশঙ্কা ছিল যে, বিষয়টি হয়ত উপেক্ষিত কিম্বা অবজ্ঞাত হবে। কিন্তু এর বিপরীত কাণ্ড লক্ষ্য করে অর্থাৎ দেশব্যাপী প্রতিবাদের কলগুঞ্জন শুনে তিনি মনে মনে বরং উৎসাহই বোধ করলেন। দ্বিতীয় পুস্তকের গোড়াতেই তিনি সেই বিষয়ের উল্লেখ করে লিখলেন: "আহ্লাদের বিষয় এই যে, কি বিষয়ী, কি শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, অনেকেই অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক, উক্ত প্রস্তাবের (বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না—এই প্রস্তাব) উত্তর লিখিয়া, মুদ্রিত করিয়া, সর্বসাধারণের গোচরার্থে প্রচারিত করিয়াছিলেন। যে বিষয়ে সকলে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন বলিয়া আমার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, সেই বিষয়ে অনেক শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিলেন, ইহা অল্প আহ্লাদের বিষয় নহে। বিশেষতঃ, উত্তরদাতা মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই পদ বিভব ও পাণ্ডিত্য বিষয়ে এতদ্দেশে প্রধান বলিয়া গণ্য। ...কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে সকল মহাশয়েরা উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কি প্রণালীতে এরূপ গুরুতর বিষয়ের বিচার করিতে হয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা বিশিষ্টরূপে অবগত নহেন। কেহ কেহ 'বিধবাবিবাহ'—এই শব্দ শ্রবণ মাত্রেই ক্রোধে অধৈর্য হইয়াছেন, এবং বিচারকালে ধৈর্য লোপ পাইলে তত্ত্ব নির্ণয়কল্পে যে অল্প দৃষ্টি থাকে, অনেকের উত্তরেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ স্বেচ্ছাপূর্বক যথার্থ অযথার্থ বিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া, কেবল কতকগুলি অলীক অমূলক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকই শাস্ত্রজ্ঞ নহেন।...এই সুযোগ দেখিয়া, অনেক মহাশয়ই, স্বীয় অভিপ্রেত সাধনার্থে, অনেকস্থলে স্ব স্ব ধৃত বচনের বিপরীত অর্থ লিখিয়াছেন, এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গও তাঁহাদের লিখিত অর্থকেই প্রকৃত অর্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।... অধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে, উত্তরদাতা মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই

উপহাস-রসিক ও কটূক্তিপ্রিয়। এ দেশে উপহাস ও কটূক্তি যে ধর্মশাস্ত্র বিচারের এক প্রধান অঙ্গ, ইহার পুর্বে আমি অবগত ছিলাম না।...প্রতিবাদী মহাশয়েরা স্ব স্ব উত্তরপুস্তকে বিস্তর কথা লিখিয়াছেন; কিন্তু সকল কথাই প্রকৃত বিষয়ের উপযোগিনী নহে। যে সকল কথা প্রকৃত বিষয়ের উপযোগিনী বোধ হইয়াছে, সেই সকল কথার যথাশক্তি প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি এই বিষয়ে বিস্তর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি।"

এই অপূর্ব যুক্তিধারা বিশ্লেষণ করলে আমাদের স্বভাবতই সক্রেটিসের কথা স্মরণ হয়। বিদ্যাসাগর বাংলার সক্রেটিস। সেই তীক্ষ্ণ মনীষা আর বিশুদ্ধ যুক্তিনিষ্ঠ বিচার-প্রণালী। সেদিন বাংলার পণ্ডিতরা যদি তাঁর এই যুক্তিনিষ্ঠ মনের নাগাল পেতেন, তা'হলে আমার মনে হয়, তাঁরা কখনই এ ভাবে বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করতেন না।

প্রথম পুস্তিকাখানিতে বিদ্যাসাগর বিষয়টি মাত্র উত্থাপন করেন; সমগ্র বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি এই বইতে বিচার করেন নি। এই পুস্তিকার উপসংহারে তিনি লিখেছেন: "পরিশেষে সর্বসাধারণের নিকট বিনয়বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া, এবং বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহার আদ্যোপান্ত বিশিষ্টরূপ আলোচনা করিয়া দেখুন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না।"

দ্বিতীয় পুস্তক আর পুস্তিকা নয়—একেবারে দুশো পাতার বই—যুক্তি, বিচার ও বিশ্লেষণের একেবারে ঠাসবুনুনী। এই বইখানির পঁচিশটি অধ্যায়ের ছত্রে ছত্রে বিদ্যাসাগর যে অতুলনীয় শাস্ত্রজ্ঞান ও সুগভীর বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তা বাংলাসাহিত্যে এবং বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসে চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিস্ময়ের সঙ্গে স্বীকৃত হবে। এই বইখানিতে বিদ্যাসাগরের মনীষা যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যে অকাট্য যুক্তিজাল বিস্তার করে বিরোধীদলের সমস্ত আপত্তি তিনি যেভাবে খণ্ডন করেছেন, যেভাবে শাস্ত্রব্যবসায়ীদের যুক্তি ও তর্কের ফাঁকি দেখিয়ে দিয়েছেন, তা ইতিহাসের সমস্ত গুরুত্ব নিয়েই আজো আমাদের সামনে উপস্থিত। কী সূক্ষ্ম চিন্তা, কী প্রগাঢ় বিশ্লেষণী ক্ষমতা আর শাস্ত্রবচনের মর্ম ব্যাখ্যায়, কী তীক্ষ্ণ পাণ্ডিত্যই না বিদ্যাসাগর তাঁর এই বইখানিতে দেখিয়েছেন!

এর ভাষা যুক্তিনিষ্ঠ, প্রয়োগের যথাযথ্যে লক্ষ্যভেদী এবং বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা ও স্বচ্ছতা—দুই-ই লক্ষণীয়। বলতে গেলে, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রই অক্লান্তভাবে মন্থন করে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তকে নির্ভুলভাবে দাঁড় করিয়েছেন। আর কিছু না হোক, হিন্দুশাস্ত্রে বিদ্যাসাগরের জ্ঞানের গভীরতা কত বেশী, তারই নিদর্শন এই বইখানি। এই বই তাঁর অদ্ভুত পরিশ্রম ও অদ্ভুত শাস্ত্রার্থ বিচারশক্তি—এই দুইয়েরই প্রমাণস্বরূপ রয়েছে। এমন শাস্ত্রীয় মীমাংসা রামমোহনের পর কেউ কখনো করে নি। তবু বিদ্যাসাগর দেখলেন শুধু শাস্ত্র-বচনে কুলবে না—লোকভয় দূর করার জন্যে অন্য কিছু দরকার; বুঝলেন লোকভয় আছে বলেই এ দেশে দেশাচারের এত প্রবলতা। এই বইখানির উপসংহারে তিনি তাই এই বলে আক্ষেপ করলেন:

"ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস। তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্মের মর্মভেদ করিয়াছিস, হিতাহিতবোধের গতি রোধ করিয়াছিস, ন্যায়-অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে, শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে; ধর্মও অধর্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্মও ধর্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্বধর্ম-বহিষ্কৃত দুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে, সর্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে; আর দোষস্পর্শ-শূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও, তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিক রক্ষায় অযত্নপ্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই, সর্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্মিকের শেষ, সর্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর অধিকারে, যাহারা জাতি-ভ্রংশকর, ধর্মলোপকর কর্মের অনুষ্ঠানে সতত রত হইয়া, কালাতিপাত করে, কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার, আদান প্রদানাদি করিলে ধর্মলোপ হয় না; কিন্তু যদি কেহ সতত সৎকর্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও কেবল লৌকিক রক্ষায় তাদৃশ যত্নবান না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে থাকুক, সম্ভাষণ মাত্র করিলেও, এককালে সকল ধর্মের লোপ হইয়া যায়। হা ধর্ম! তোমার মর্ম বুঝা ভার। কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার

লোপ হয়, তা তুমিই জান! হা শাস্ত্র! তোমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে!... হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্বতন সন্তানগণের আচারগুণে, পুণ্যভূমি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে, কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা, স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, সর্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কতকালে তোমার দুরবস্থা বিমোচন হইবেক, তোমার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া, ভাবিয়া স্থির করা যায় না। হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যাভিচার দোষেরও ভ্রূণ-হত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে।.....তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কারের বিসর্জন, দেশাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে।...হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশে পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।”

দেশাচারের প্রতি বিদ্যাসাগরের এই যে গভীর মর্মভেদী আক্রোশ, এর কারণ তিনি অল্প দিনের মধ্যেই অনুভব করলেন যে, দেশাচারই তাঁর পথে পাষাণ-প্রাচীরের মতো পথ আবরণ করে দাঁড়িয়ে। দেশের বর্তমান সমাজ-জীবনের দিকে তাকিয়ে মনে হয় এক শো বছর আগে উচ্চারিত এই ধিক্কার-বাণী, আজো মর্মান্তিকভাবে সত্য। এ তো হৃদয়ের গভীর আক্ষেপ-উক্তি নয়, এ যেন অশ্রুজল। কালের প্রান্তরে সাগরের এই উত্তপ্ত অশ্রুপ্রবাহ আজো একেবারে বিশুষ্ক হয়ে যায়নি। আজকের দিনের বাঙালি-সন্তানকে বলব—যদি পারো, সাগরের এই অশ্রুকণায় একবার স্নান কর। দেশাচার যে তাঁর সংস্কার-কার্যের গতিরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে, দেশাচার যে শাস্ত্র থেকে ভিন্ন পথে চলে গিয়েছে—এ কথা সেদিন বিদ্যাসাগর যেমন অনুভব করেছিলেন, তেমন আর কেউ করে নি।

বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন পণ্ডিতদের কপটাচার—বিচারকালে তাঁরা শাস্ত্রের দোহাই দিতেন, কিন্তু কাজের সময়ে দেশাচারকেই মান্য করে চলতেন। তাঁর কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হলো ধিক্কার—সমাজের পুঞ্জীভূত গ্লানির বিষ নীলকণ্ঠের মতো আপন কণ্ঠে ধারণ করে, তিনি এসে দাঁড়ালেন শাস্ত্র ও দেশাচার-লাঞ্ছিত অসহায় নারীজাতির পাশে। বিরুদ্ধবাদীদের সংশয় ও আপত্তি ছেদনে বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য কত স্থির ও শর-নিক্ষেপ কত অব্যর্থ, তারই নজির হয়ে রইল বিধবাবিবাহ সম্পর্কে তাঁর লেখা এই দ্বিতীয় বইখানি। প্রত্যেক বাঙালি সন্তানের এই বইখানি পড়া উচিত। এই বইতে তিনি বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করে, শাস্ত্রের বিরোধের মীমাংসা করে বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা দেখালেন যে, তাঁর প্রস্তাবিত বিধবা-বিবাহ ষোল আনা শাস্ত্র-সম্মত ও হিন্দু আচারানুমোদিত। পরাশর-সংহিতার শ্লোক তিনটির বিরুদ্ধে * যত রকম আপত্তি উঠেছিল, এবং আরো যত রকমের আপত্তি হতে পারে, সেইসবের শাস্ত্রসম্মত মীমাংসা করে বিদ্যাসাগর পরাশর বচনের তাৎপর্য প্রবল ও অক্ষুণ্ণ রাখতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছিলেন।

এই যুগান্তকারী বইখানা সম্পর্কে সে সময়ের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন: "শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইতিপূর্বে বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহা প্রচারিত হইয়া অবধি ঐ প্রস্তাব লইয়া হিন্দুসমাজে ঘোরতর আন্দোলন হইতেছে। এতদ্দেশীয় অনেক পণ্ডিত ও প্রধান বিষয়ী লোকদিগের মধ্যে অনেকে উক্ত বিষয় অপ্রচলিত রাখিবার অভিপ্রায়ে এক এক পুস্তক প্রচার করিয়া তাঁহার ঐ মতে বিস্তর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। সেই সকল আপত্তি যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্প্রতি ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকটন করিয়া প্রতিবাদীগণের সমুদয় পুস্তকের একত্র উত্তর দিয়াছেন।...তন্মধ্যে উপক্রম ভাগ

---

* নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥
মৃতে ভর্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥
তিস্রঃ কোট্যোঽর্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্তারং যানুগচ্ছতি॥

পাঠ করিলে এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের বিচার-প্রণালী অত্যন্ত দোষাবহ বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, তাঁহারা তত্ত্বনির্ণয় পক্ষে সবিশেষ মনোযোগী না হইয়া অমূলক আপত্তি উপস্থিত করিতেই উদ্যত থাকেন। আর দেশাচার ও কুসংস্কার যে এতদ্দেশের কিরূপ ভয়ঙ্কর শত্রু হইয়া উঠিয়াছে, ঐ পুস্তকের উপসংহার ভাগে তাহা সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা আবৃত্তি করিলে, পাষাণতুল্য কঠিন হৃদয়ও দ্রব হইয়া যায়।...যাঁহারা বিদ্বেষবুদ্ধিশূন্য হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিস্তৃত বিধবাবিবাহ গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহারা যে কেবল বিধবা-বিবাহের আবশ্যকতা ও শাস্ত্রীয়তা সম্যক অনুভব করিবেন তাহা নহে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিষ্ঠাসহকারে শাস্ত্রালোচনার পদ্ধতি সন্দর্শন করিয়া, কটূক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ গ্রন্থসমূহের যেরূপে শান্তভাবে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিয়া, তাঁহাকে অসাধারণ ধৈর্যশীল, ক্ষমতাশালী, ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত বোধে অবনতমস্তকে প্রণাম করিবেন।"

দুঃখের বিষয়, তত্ত্ববোধিনীর এই অনুরোধের প্রতি অনুদার হিন্দুসমাজ কর্ণপাত করে নি।

ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার-মুক্ত, উদার ও বৈপ্লবিক ভাবধারায় পরিপুষ্ট বিদ্যাসাগর তাই ব্রাহ্মসমাজের দিকেই তাকালেন তাঁর এই সংস্কার আন্দোলনের সমর্থনের জন্যে।

হিন্দুসমাজের তীব্র বিষাক্তশরে বিদ্ধ বিদ্যাসার সেদিন যদি তাঁর ব্রাহ্মবন্ধুদের—বিশেষ করে, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির—সক্রিয় সংযোগিতা না পেতেন, তাহলে তাঁর সেই সংস্কার-প্রচেষ্টা যতটুকু সার্থক হতে পেরেছিল, ততটুকু সার্থক হতো কিনা সন্দেহ। বিধবাবিবাহ আন্দোলন বিদ্যাসাগরের একক মৌলিক পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টা নয়। এর একটা ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। সেটা জানা দরকার।

॥ সতেরো ॥

বিদ্যাসাগরই বাংলাদেশে বিধবা-বিবাহের প্রবর্তক—এ কথা ঠিক নয়। তাঁর অনেক আগে থেকেই এ বিষয়ে চেষ্টা হয়েছে।

বিদ্যাসাগর প্রথম যৌবনেই যে সংঘের সঙ্গে স্বেচ্ছায় ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, যে সঙ্ঘ বা সভা সেই যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মিলনভূমি ছিল এবং কুড়ি বছর পর্যন্ত বাংলাদেশের সামাজিক, সাহিত্যিক, ধর্ম-সম্বন্ধীয় প্রভৃতি সকল বিষয়ে যুগান্তর এনেছিল, তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিদ্যাসাগরকে অথবা সে যুগের কোন মহাপুরুষকেই বিচার করা ঠিক নয়। তাতে ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হয়। এই সঙ্ঘ বা সমিতির নাম তত্ত্ববোধিনী সভা। বিদ্যাসাগর-মানস তত্ত্ববোধিনীর ভাবধারাতেই পরিপুষ্ট —এ কথা আগেই বলেছি। বিধবাবিবাহ আন্দোলন সম্পর্কে এই কথা আর একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। তত্ত্ববোধিনী সভা সেই যুগকে কতখানি প্রভাবান্বিত করেছিল, সে কথা সমসাময়িক বহু মনীষীর রচনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই। আগেই বলেছি, বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারা ও সমাজ-সংস্কারমূলক প্রচেষ্টাকে এই তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না, তা হলে ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা।

বিদ্যাসাগর শুধু যে স্বেচ্ছায় এই সভার সভ্য হয়েছিলেন তাই নয়, কখনো এর গ্রন্থাধ্যক্ষ, কখনো এর মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' সম্পাদক, এবং কখনো মূল সভারই সম্পাদক হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই সভার পৃথক অস্তিত্ব যখন লুপ্ত হয় ও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মিশে যায়, তখন বিদ্যাসাগরের হাত থেকেই কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদকীয় দপ্তর গ্রহণ করেন। এর থেকে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী

সভার আদর্শ সর্বান্তঃকরণেই গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রচলিত হিন্দুধর্মের ওপর তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না। (এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের সেই বিখ্যাত উক্তিটি, "যদি কেহ আমাকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ভাবে, তাহাতে আমার যৎপরোনাস্তি অপমান বোধ হয়" বিশেষভাবেই স্মরণীয়।) তা যদি থাকতো, তা'হলে বলতে হয় তিনি কপটাচারী ছিলেন। কিন্তু আমরা জানি, কপটাচার বা ভণ্ডামী বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সঙ্গে আদৌ খাপ খায় না। যাঁরা বিদ্যাসাগরের কালের ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন, তাঁরাই জানেন যে, বিদ্যাসাগর তাঁর সমসাময়িক ব্রাহ্ম আন্দোলনেরই অঙ্গীভূত ছিলেন (আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম তিনি না হতে পারেন) এবং ছিলেন বলেই তাঁর সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা দেশকে অমন ভাবে আলোড়িত করে তুলেছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিদ্যাসাগরের সংস্কার-জীবনের আরম্ভ তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগ দেবার পরে, আগে নয়। যাঁরা বলেন, "বিদ্রোহের বীজ বিদ্যাসাগরের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যেই নিহিত ছিল, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে তার কোনো অনিবার্য যোগ খুঁজে পাওয়া যায় না." দুঃখের বিষয়, তাঁরা ঐতিহাসিক সত্যকেই অস্বীকার করেন।

লৌকিক ব্যবহারে যিনি কোন দিনই প্রচলিত হিন্দুধর্মের সংস্কার মেনে চলতেন না, সেই বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে বিদ্রোহের বীজ নিহিত থাকবে, এ বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। মহাপুরুষের মহাপুরুষত্বের একটি প্রধান লক্ষণই তাই। কিন্তু বীজের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকতার যোগসূত্র থাকবেই—এ বৈজ্ঞানিক সত্য। মাটীর সম্পর্কহীন শুষ্ক প্রস্তরে বা মরুভূমির বালির উপরে কিংবা জলবায়ুলেশ শূন্য আবদ্ধ কাচের আধারে খুব শক্তিশালী বীজ রাখলেও কি কোন কালে তার থেকে গাছ হবার সম্ভাবনা আছে? বিদ্যাসাগরের জীবনেই আমরা পাই, যতকাল শুধু সংস্কৃত কলেজের গোঁড়া আবহাওয়ার সঙ্গে বা গতানুগতিক জীবনযাত্রাকারী পিতামাতার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল, ততকাল পর্যন্ত তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির বিদ্রোহ বীজ অঙ্কুরিত হয় নি। প্রকাশ্যভাবে তত্ত্ববোধিনী সভাতে ভাল ভাবে যোগ দেবার পরেই ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে এই বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ সংস্কার কাজ বিধবা-বিবাহ।

এই বিধবা-বিবাহের চেতনা রামমোহন রায়ের জীবিত কালেই।

'সুরধনী কাব্যে' দীনবন্ধু স্পষ্ট করেই বলেছেন রামমোহন সম্পর্কে—"করেছিল বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠান"। বিদ্যাসাগরের জন্মের এক বছর আগের একটি সমসাময়িক ইংরেজি পত্রে (বেঙ্গল হরকরা ও ইণ্ডিয়া গেজেট) প্রকাশ; "রামমোহন রায়ের শিষ্যবর্গের একটি সভার বিবরণ…এই সভায় বালবিধবাদের আজীবন বাধ্যতামূলক বৈধব্যের বিরুদ্ধে, বহুবিবাহের ও সহমরণের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা হয়।" রামমোহন রায়ের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম এবং প্রধানতম ছিলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার দশ বছর আগে ব্রাহ্মণ বিদ্যাবাগীশ শাস্ত্র থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে বিধবাবিবাহকে সমর্থন করেছিলেন এবং এর সপক্ষে ব্যবস্থাও দিয়েছিলেন। সমাজ-সংস্কারক হিসাবে বিদ্যাবাগীশ বিদ্যাসাগরের অগ্রগামী। ঐতিহাসিক ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অকাল মৃত্যুর ন বছর পরে তাঁরই অসমাপ্ত কাজ বিদ্যাসাগর গ্রহণ করলেন। বিদ্যাবাগীশ ও বিদ্যাসাগর দুজনেই তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর যখন ঐ সভার একজন তরুণ সভ্য, সেই সময়ে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তার প্রবীণ নেতা, প্রধানতম আচার্য ও পণ্ডিত। শাস্ত্রীয় মত ও ব্যবস্থায় তত্ত্ববোধিনী সভায় সে সময়ে বিদ্যাবাগীশের সিদ্ধান্তই সকলের চেয়ে বেশী প্রামাণ্য লাভ করত। এই পারিপার্শ্বিকতা কী বিদ্যাসাগরের মনকে স্পর্শ ও পরিপুষ্ট করে নি?

এখানে আরো একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার অন্তত নবছর আগে প্রকাশ্যভাবে বিধবাবিবাহের উদ্দেশ্য নিয়ে সমিতি পর্যন্ত গঠন করা হয়ে গিয়েছে। এই সমিতির নাম 'সোসাইটি ফর দি রিম্যারেজ অব হিন্দু উইডোজ'। পূর্ব-লিখিত হরকরা পত্রের এই সময়কার এক সংখ্যায় প্রকাশ, "আমরা জানতে পারলাম যে বৌবাজারের কয়েকজন যুবক কয়েকটি বুদ্ধিমান ও উদার মতাবলম্বী পণ্ডিতদের সঙ্গে একযোগে যুক্ত হয়ে হিন্দু বিধবাদের বিবাহের জন্য উপায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠন করেছেন।" আবার দেখতে পাই, তত্ত্ববোধিনীর অক্ষয়কুমার, কিশোরীচাঁদ মিত্র. প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতিরা মিলে 'সুহৃৎ সমিতি' নামে যে সমিতি স্থাপন করেছিলেন সেই সমিতিতে কিশোরীচাঁদ প্রস্তাব করেন এবং অক্ষয়বাবু সমর্থন করেন যে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জন, এবং বহুবিবাহ প্রচলন রোধের জন্য সুহৃৎ সমিতির শক্তি বিশেষভাবে নিয়োগ করা উচিত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিধবা-বিবাহের পরিকল্পনা বিদ্যাসাগরের একক অবদান নয়। এমন কি, উপায় নির্ধারণের চিন্তা পর্যন্ত ঐ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের ন বছর আগে পৌঁছে গেছে। ঐ হরকরা কাগজেরই একটি সংখ্যায় প্রকাশ: "আমরা জানতে পারলাম যে বিধবা-বিবাহ সমিতির আর একটি অধিবেশন হয়ে গেছে। এই অধিবেশনে প্রস্তাব করা হয়, মতিলাল শীলকে একখানা চিঠি লেখা হোক এই মর্মে যে, তিনি যে ঘোষণা করেছিলেন, যে-কোন হিন্দু ভদ্রলোক বিধবা বিবাহ করতে রাজী হবেন তাঁকে তিনি কুড়ি হাজার টাকা দেবেন, সেই টাকাটা তিনি উক্ত সমিতিকে দিতে প্রস্তুত আছেন কিনা—যদি তাঁরা এই উদ্দেশ্যে কোন হিন্দু ভদ্রলোককে রাজী করাতে পারেন।" খবরটি সেই সময়ে ইংলিশম্যান পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছিল।

তা ছাড়া, ভারত সভা, বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রভৃতি সমিতির মঞ্চ থেকে বিদ্যাসাগরের দশ বছর আগে বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব উত্থিত হয়। এই পারিপার্শ্বিকতাই কি বিদ্যাসাগরের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে নিহিত বিদ্রোহের বীজকে পরিস্ফুট করে নি? রামমোহন রায় ও আত্মীয় সভা থেকে আরম্ভ করে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, এবং বিদ্যাবাগীশ থেকে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির মারফৎ, গোড়া থেকেই তত্ত্ববোধিনী সভায় বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে বেশ একটি প্রবল আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল। এই পরিমণ্ডলের মধ্যেই এসে পড়লেন বিদ্যাসাগরের মতো শক্তিশালী চরিত্রের মানুষ। বিদ্যাসাগর জড় প্রকৃতির লোক ছিলেন না, বিদ্রোহী সংঘ-মনের প্রভাবকে গ্রহণ করবার মতো বিদ্রোহী মন ছিল তাঁর। ডিরোজিও যাঁদের চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেছিলেন এবং যাঁদের তিনি শিক্ষা দিয়ে বিদ্রোহী শিষ্য হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই (তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ,রাধানাথ শিকদার, চন্দ্রশেখর দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি) তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগ দিয়েছিলেন, এবং যোগ দেবার সময়ে তাঁরা বিদ্রোহের বীজ সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিলেন।

বিধবা-বিবাহের এই পটভূমিটি মনে রাখলে পরে এ কথা কিছুতেই বলা চলে না যে, সামাজিক একটি কুপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর প্রথম একাই সংগ্রাম ঘোষণা করেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষে একটি আলোড়ন আনয়ন করেন। সমাজে

আলোড়ন অবশ্য উঠেছিল, কিন্তু সেটাও তাঁর একার জন্যে নয়। সেই আলোড়নের পিছনে গোড়া থেকেই ব্রাহ্ম আন্দোলন ছিল, কোন সময়েই এই আন্দোলন বিদ্যাসাগরের একার ছিল না। প্রথম বিধবাবিবাহ আন্দোলন যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা গোড়ায় বিদ্রোহী তত্ত্ববোধিনী সভার সংশ্লিষ্ট লোক ছিলেন এবং পরের যুগে ব্রাহ্মসমাজের লোকেরাই দেশের মধ্যে এই আলোড়ন তুলেছিলেন। হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা যখন একযোগে তাঁর বিরোধিতা করলেন, তখন বিদ্যাসাগর যাঁদের সমর্থন পেলেন তাঁদের বেশীর ভাগই ব্রাহ্মসমাজের। লৌকিক ব্যবহারের প্রচলিত হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণরা তাঁর বিরুদ্ধেই ছিলেন, বরাবরই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ও সপক্ষে ছিলেন বিদ্রোহী ব্রাহ্মসমাজের লোকেরাই। বিদ্রোহীর মর্যাদা সকল যুগে ও সকল দেশে বিদ্রোহীরাই দিয়ে এসেছে, কারণ তারাই বিদ্রোহের মূল্য বোঝে। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরাই জানে—শুধু কথা দিয়ে নয়, নিজ জীবনের মূল্য দিয়ে—বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব কত প্রকাণ্ড ছিল। বিদ্যাসাগর বৃক্ষহীন দেশে এরণ্ড বৃক্ষ ছিলেন না—তিনি ছিলেন বনস্পতি। তথাপি সেই বনস্পতির মহত্ত্বকে বুঝতে হলে, সমষ্টির পটভূমি বাদ দিলে চলে না। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের বিদ্রোহকে 'একক ব্রাহ্মণের বিদ্রোহ' বললে ইতিহাসকে যেমন ক্ষুণ্ণ করা হবে, তেমনি ছোট করা হবে বিদ্যাসাগর-চরিত্রকে। তবে বিদ্যাসাগরের কি কোন বৈশিষ্ট্য নেই? আছে বৈ কি। এই সংস্কার-আন্দোলনে তাঁর একাগ্রতা, আন্তরিকতা এবং অকুতোভয়তাই তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং এই আন্দোলন যে প্রবলতম হয়ে উঠেছিল, তা শুধু এই কারণেই।

বিদ্যাসাগরের এই সংস্কার-প্রচেষ্টাকে বিদেশী প্রভাবের ফল বলে সেদিন অনেকে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু সাগর-চরিত্র গভীরভাবে অনুশীলন যাঁরা করেছেন তাঁরাই বলবেন যে বিদ্যাসাগর বিধবাদের বিয়ে দেবার জন্যে যে চেষ্টা করেছিলেন, তা একেবারেই বিদেশী প্রভাবের ফলে নয়; এমন কি, তাঁর এই উদ্যম নব্য-সংস্কারকের সমাজ ভেঙে-চুরে বিদেশী আদর্শে গড়বার চেষ্টা-প্রসূত নয়। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে তিনি নিজেই বহু শাস্ত্র ঘেঁটে প্রাচীন সত্যকে উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে, আগে এই সমাজে ভাগ্যবিড়ম্বিতা মেয়েদের জন্যে মানুষের মনে সহানুভূতি ও করুণা ছিল এবং পূর্বসূরিগণ এজন্যে

সামাজিক ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রাচীন যুগের সত্যকেই তিনি নতুন করে প্রতিষ্ঠা করলেন, তাঁর উদ্যমে বার্ধক্যের মধ্যে যৌবনের তরুণ প্রভা ক্ষরিত হয়েছে।

আরো একটা কথা। এই আন্দোলনে ভগবতী দেবীর নেপথ্য প্রভাবও স্মরণীয়। তিনি বিদ্যাসাগরকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তাঁরই চরিত্রে দয়াধর্মের ও সংস্কারমুক্ত সত্যের বীজ ছিল। ছেলেকে যখন তিনি ইঙ্গিত দিলেন ("তুই তো এত বড় পণ্ডিত, এই মেয়েদের এই রকম দুর্গতি দূর করার কি কোন উপায় নেই ?"—এই কথাই একদিন বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন ভগবতী দেবী প্রতিবেশীর সদ্য বিধবা হওয়া একটি আট বছরের মেয়ের সম্পর্কে), তখন বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে করুণার বন্যা বয়ে গেল। তাঁর অন্তরে আগুন ছিল, প্রতীক্ষা ছিল একটি স্ফুলিঙ্গের। মায়ের কথা সেই স্ফুলিঙ্গের কাজ করল। অগ্নিশিখার উপাদান বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মধ্যেই ছিল, এবার অনুকূল বায়ুতে তা জ্বলে উঠল। সত্যের তাড়নাতেই তিনি এই সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। এই আন্দোলন তাঁর কাছে সত্যের কঠিন রূপ নিয়েই এসেছিল। সত্যাশ্রয়ী বিদ্যাসাগর তাই নিজের সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করলেন না। বিরুদ্ধবাদিদের আক্রোশ হেলায় উপেক্ষা করে তিনি বললেন, সত্যের চেয়ে বড় কিছু নেই। আমার কাছে বিধবা-বিবাহ সত্য। এর জন্য আমি সর্বস্বান্ত হতেও প্রস্তুত। এমনি করেই সেদিন ব্রাহ্মণ সত্যের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

বিপক্ষদলের প্রতিবাদের স্রোত অবিরাম বয়ে চললো।

বিদ্যাসাগর ভীষ্মের মতো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ঐকান্তিক একাগ্রতা নিয়ে তিনি আন্দোলন পরিচালনা করতে লাগলেন। সহস্র কাজের মধ্যে এই কাজই এখন তাঁর কাছে প্রধান হয়ে উঠল। একদিন বিদ্যাসাগর বর্ধমান থেকে কলকাতায় ফিরছেন। তিনি গাড়ির যে কামরায় ছিলেন, পাণ্ডুয়া ষ্টেশন থেকে সেই কামরায় একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উঠলেন। ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরকে চিনতেন না। তখন পথেঘাটে আলোচনার একমাত্র বিষয়—বিধবা-বিবাহ। "কোথাকার কে বিদ্যাসাগর, বামুনের ঘরে কালাপাহাড়—বিধবা বিয়ের হুজুগ এনেছে"—এই বলে সেই

ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ করলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর সামনেই বসে নির্বিকার চিত্তে সেই গালমন্দ শুনলেন, কিছু বললেন না। পরে হুগলী ষ্টেশনে নেমে ব্রাহ্মণ জানতে পারেন যে, বিদ্যাসাগরের সাক্ষাতেই বিদ্যাসাগরকে গাল দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ এই ব্যাপার বুঝতে পেরে ব্রাহ্মণটি কেমন যেন সংজ্ঞাহীন হয়ে ষ্টেশনের প্লাটফর্মে পড়ে গেলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর শুশ্রূষা করলেন এবং পাথেয় স্বরূপ কিছু অর্থ সাহায্যও করলেন।

আর একদিন।

স্কুল-ইনস্পেক্টর প্র্যাট সাহেব সংস্কৃত কলেজে এলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে। কথায় কথায় প্র্যাট সাহেব বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার বইয়ের যেসব প্রতিবাদ বেরিয়েছে, তার মধ্যে কার প্রতিবাদ ভালো? যে লোক বেশী গাল দিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর রহস্য করে তাঁর নাম করলেন। প্র্যাট সাহেব, কথাটা সত্যি ভেবে তাঁর নাম টুকে নিলেন। পরে তিনি সেই লোকটিকে ডেপুটি ইনসপেক্টরের পদে নিযুক্ত করলেন। সেই লোকটি একদিন প্রকৃত ব্যাপার জানতে পেরে বিদ্যা-সাগরকে বললেন, যা হবার হয়ে গেছে, দেখবেন যেন চাকরিটি না যায়। বিদ্যাসাগর হেসে বললেন, তা হলে আর চাকরি হতো না।

এমনি উদার আশ্চর্য প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর।

দ্বিতীয় পুস্তক বেরুলো।

বিধবা বিবাহ ষোল আনা শাস্ত্রসম্মত—প্রমাণ করলেন বিদ্যাসাগর।

বিরুদ্ধ পণ্ডিত সমাজ স্বীকার করতে চাইলেন না সে প্রমাণ।

সংস্কৃত কলেজ হয়ে উঠল বাদবিতর্ক ও আলোচনা-সমালোচনার রণ-রঙ্গভূমি।

সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর মতই বিদ্যাসাগর একাই নিরস্ত করেন সবাইকে।

টাকা দিয়ে যাঁরা টিকি কিনতে পারতেন সেই সব বড় লোকেরা ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণদের দিয়ে আরো বই লিখিয়ে প্রকাশ করতে লাগলেন। সেইসব বইয়ের বক্তব্য একই—বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয়।

শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ কটূক্তি বর্ষণের বিরাম ছিল না। প্রায় সকল সংবাদপত্র তাঁর বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল। জয় ঘোষণা করলো কেবল ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরা।

বিদ্যাসাগর ভ্রূক্ষেপহীন। বিদ্যা, বুদ্ধি, কৌশল ও বহুদর্শিতা—এই নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন। তিনি বুঝেছেন এবং বুঝিয়েছেন যে বিধবাবিবাহ সর্বাংশে শাস্ত্রসিদ্ধ ও সদাচার-সঙ্গত। কার সাধ্য এই আগ্রহ ও উৎসাহের স্রোত রোধ করে? বিধবার বিয়ে দেবার জন্য চারদিকে আয়োজনের সাড়া পড়ে গেল। বিদ্যাসাগর দেখলেন, শুধু শাস্ত্রসম্মত হলেই যথেষ্ট হবে না, আইনসিদ্ধও হওয়া চাই, নতুবা বিধবাদের বিয়ের পর তাঁদের গর্ভজাত সন্তানদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। দায়ভাগ দাঁড়িয়ে আছে উদ্যত দণ্ড নিয়ে—পৈতৃক সম্পত্তিতে তারা স্বত্ববান নাও হতে পারে। বিদ্যাসাগর তখন এক আবেদন-পত্র রচনা করলেন এবং সেই আবেদন-পত্র তিনি পাঠালেন ব্যবস্থাপক সভায়। বিদ্যাসাগরের প্রবল বিরোধিতা করতে অগ্রসর হলেন কলকাতার শক্তিশালী সর্বোন্নত সমাজপতি রাধাকান্ত দেব। তিনি বিধবা বিবাহের অযৌক্তিকতা প্রমাণের জন্যে বহু বিখ্যাত পণ্ডিতের ব্যবস্থা কাঞ্চনমূল্যে সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁরই প্ররোচনায় তখনকার হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় ধর্মসভা বিদ্যাসাগরকে ম্লেচ্ছ অনাচারী ও শাস্ত্রবিরোধী কালাপাহাড় বলে ঘোষণা পর্যন্ত করলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে বিদ্যাসাগর তিনজনকে পেয়েছিলেন যাঁরা এই আন্দোলনে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ বাচস্পতি ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—তাঁদের সমর্থন ও সাহায্য বিদ্যাসাগর সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তকের প্রতিবাদস্বরূপ যে-সব পুস্তিকা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় সেগুলির মধ্যে প্রসন্নকুমার দানিয়াতী ও ভট্টপল্লীর পঞ্চানন তর্করত্নের পুস্তিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের বক্তব্যে মূল কথা এই ছিল যে, বিদ্যাসাগর পরাশরের 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' শ্লোকের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ স্বকপোল-কল্পিত, শাস্ত্রানুমোদিত নয়। বিদ্যাসাগর আর প্রতিবাদের মধ্যে গেলেন না, আইনের দিকে তাকালেন। তিনি দেখলেন শাস্ত্রের চেয়ে যেখানে লোকাচারের প্রাধান্য সেখানে আর বাগ্‌যুদ্ধ নিষ্ফল। বিদ্যাসাগর দেখলেন দেশ জুড়ে যে রকম আন্দোলন উঠেছে, সর্বত্র যে রকম সাড়া পড়েছে, যে সকল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, এর দিকে রাজপুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। নইলে এ আন্দোলনে সফলতা অনিশ্চিত। তিনি পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ করলেন। আনন্দকৃষ্ণ, শ্রীনাথ প্রভৃতি তার বন্ধুরা এই কাজে তাঁকে সাহায্য

করলেন আর অনুবাদ মুদ্রিত হবার সময়ে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এর প্রুফ দেখে দিলেন।

অনুবাদ-গ্রন্থ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের ব্যাপকতা গভীর হলো। ইংরেজি অনুবাদ পড়ে, হিন্দু বিধবাদের বড় কষ্ট, তাদের বিয়ে হওয়া উচিত এবং এ বিষয়ে আইন-সংক্রান্ত বাধা দূর হওয়া উচিত, রাজপুরুষদের মনে এই রকম একটা সুদৃঢ় ধারণা হলো। ইংরেজি অনুবাদ প্রচারিত হবার পর, বিদ্যাসাগর প্রধান প্রধান রাজপুরুষদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। বিধবা-বিবাহকে আইন-সিদ্ধ বলে ঘোষণা করবার জন্যে তিনি এক হাজার লোকের এক আবেদন-পত্র ব্যবস্থাপক সভায় পাঠালেন। আবেদন-পত্রে সর্বাগ্রে স্বাক্ষর করলেন উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া, স্বতন্ত্রভাবে আরো দুখানি আবেদন-পত্র প্রেরিত হয়। তার একখানায় সই করেন প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, প্যারিচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি বহুসংখ্যক সম্রান্ত ব্যক্তি; এবং অপরখানি পাঠিয়েছিলেন বর্ধমানের মহারাজ মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর। তারপর নবদ্বীপের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র, ঢাকার জমিদার ও অন্যান্য ধনী হিন্দুগণ, মৈমনসিংহের জমিদারদের অনেকে সমবেত হয়ে আলাদা আলাদা আবেদন-পত্র পাঠালেন। বর্ধমানের মহারাজা অগ্রণী হয়ে বিধবা-বিবাহ সমর্থন করে আবেদন-পত্র পাঠিয়েছেন শুনে বিদ্যাসাগর আনন্দিত হলেন। এই ভাবে মোট পঁচিশ হাজার লোক বিধবা-বিবাহ আইনের জন্যে প্রার্থনা জানাল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিদ্যাসাগর তাঁর আবেদন-পত্রের সঙ্গে আইনের একটি পাণ্ডুলিপিও পাঠিয়েছিলেন।

আবেদন ইংরেজিতে হয়েছিল। এই আবেদনে বিদ্যাসাগর লিখলেন: "বহুদিন প্রচলিত দেশাচারানুসারে হিন্দুবিধবাদিগের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ। আবেদনকারিগণের মত এবং দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক দেশাচার নীতিবিরুদ্ধ এবং সমাজের বহুতর অনিষ্টকারক। ...দেশাচার প্রবর্তিত প্রথা শাস্ত্রসঙ্গত নয় কিংবা হিন্দু অনুশাসন বিধির প্রকৃত অর্থসঙ্গতও নয়। ...বিধবা বিবাহে হিন্দুর এমন কোন বাধা নাই যাহা বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধ। .. এই বিবাহের আইনসঙ্গত বাধা অন্তর্হিত হওয়া আবেদনকারিগণের একান্ত অভিপ্রেত। ..যাহাতে হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্বিবাহ পক্ষে বাধা না থাকে

এবং সেই বিবাহজাত সন্তান-সন্ততি যাহাতে বিধি-সম্মত সন্তান-সন্ততি বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তাহার জন্য আইন প্রচলন করিবার সঙ্গতি বিষয়ে মহামান্য ব্যবস্থাপক সভা আশু বিবেচনা করুন।"

আগেই বলেছি, বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে বাংলায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বাক্যে ও ব্যবস্থায় বৈপরীত্য দেখে বিদ্যাসাগর গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবন-চরিতকার লিখেছেন: "ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার অধ্যাপকগণের এইরূপ আচরণ দেখিয়া উত্তরকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় গভীর দুঃখের সহিত বলিতেন, 'আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি; আমার বিশ্বাস ছিল যে, এ দেশের লোক শাস্ত্রানুগত, কিন্তু শেষে দেখিলাম, এ দেশের লোক শাস্ত্র মানিয়া চলে না, লোকাচারই ইহাদের ধর্ম।' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতৃদেব বলিয়াছিলেন, 'বাবা ধরিবার পূর্বে ভাবা ও বুঝা উচিত, যখন বুঝে ধরেছ, তখন ছেড় না; কথায় ও কাজে যেন মিল থাকে।"

যেমন পিতা তেমনি পুত্র।

কোন কাজে হাত দিয়ে ঠাকুরদাস কখন পশ্চাদ্‌পদ হতেন না।

তাঁর এঁড়ে বাছুরটির স্বভাবও তাই। ছেলেকে তিনি ঠিক সেইভাবেই মানুষ করে তুলেছিলেন।

বিদ্যাসাগরও তাই ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন-পত্র প্রেরণ করবার পর থেকে তাঁর সমস্ত কর্মশক্তি নিয়োগ করলেন আন্দোলনকে সফল করে তুলবার জন্যে। এত বড় একটা আন্দোলন—অথচ প্রকাশ্যে তিনি আদৌ বক্তৃতা না করে যেভাবে সে যুগে এর অনুকূলে জনমত গঠন করেছিলেন, তা তাঁর প্রতিভারই পরিচায়ক। হাতে ছিল শাণিত লেখনী—সেই লেখনী অবিশ্রান্তভাবে পরিচালনা করে তিনি আন্দোলনের বেগ এবং আবেগ দুই-ই বাড়িয়ে তুলেছিলেন।

দেখতে দেখতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হলো বাংলা দেশে।

জেগে উঠল মহা আবর্ত, প্রচণ্ড সংঘর্ষ।

সেই কেশরী-হুঙ্কার—আমি বিধবার বিয়ে দেব—যে শুনলো সেই সচকিত হয়ে উঠল।

অভূতপূর্ব আলোড়ন বাংলার হিন্দুসমাজে। বিক্ষোভিত হয়ে উঠল ঘুমন্ত সমাজ। আলোড়িত হলো সারা দেশ।

সে আলোড়ন-বিলোড়ন আজ এই সুদূর কালের ব্যবধানে ধারণা করা আদৌ সম্ভব নয়। পুঁথিপত্রে তার যা বিবরণ আমরা পাই তাতে মনে হয় সেই আন্দোলনে সত্যই যেন বিস্ফোরণ ছিল।

সেই আলোড়নের ফেনশীর্ষে একটিমাত্র নাম—বিদ্যাসাগর।

আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখে দুটি কথা—বিধবাবিবাহ আর বিদ্যাসাগর।

সে আন্দোলনের তরঙ্গ-তুফানে ভেসে বিখ্যাত গায়ক দাশু রায় বিধবা-বিবাহ নিয়ে রচনা করলেন পাঁচালি। রচিত হলো বিধবা-বিবাহ নাটক—অভিনীত হলো সেসব নাটক রঙ্গমঞ্চে।

ছড়া ও গানে ছেয়ে গেল বাংলার পল্লীর পথঘাট মাঠ।

তাঁতী তাঁত বোনে, চাষী লাঙল চালায়, গাড়োয়ান গাড়ি হাঁকায় সেইসব ছড়া গেয়ে গেয়ে।

শান্তিপুরের কাপড়ের পাড়ে সেই ছড়া :

> সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হয়ে।
> সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥

গুপ্তকবিও বাদ গেলেন না। তাঁর ব্যঙ্গময়ী লেখনী থেকে নির্গত হলো :

> বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
> বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল॥

দাশুরায় ছড়া বাঁধলেন :

> বিধবার বিবাহ কথা কলির প্রধান স্থান কলিকাতা,
> নগরে উঠেছে অতি রব।

সুদূর পল্লীগ্রামের নিরক্ষর চাষীর মুখে বিদ্যাসাগরের পরিচয় দাঁড়াল—"বিধবার বিয়ে-দেওয়া-বিদ্যেসাগর।"

এই আন্দোলনকে প্রবল রাখার জন্যে নাটক পর্যন্ত তৈরি হয়েছিল। রমেশচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর উমেশচন্দ্র মিত্র বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে সমর্থন করে লিখলেন 'বিধবা-বিবাহ নাটক'। প্রথমে সিন্দুরিয়াপটীর গোপাল মল্লিকের বাড়ি এবং পড়ে বেলগাছিয়ার পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে এই নাটকের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। বিদ্যাসাগরের জন্মের আঠারো বছর পরে কেশবচন্দ্রের জন্ম। ব্রাহ্ম-সমাজের এই তরুণ নেতা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুযোগ্য সহকারী কেশবচন্দ্র

যৌবনেই বিদ্যাসাগরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার তিনি একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। বহু বিষয়ে মতবিরোধ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর কেশবচন্দ্রকে দেশের একজন হিতকামী বলে বিশ্বাস করতেন এবং প্রীতির চক্ষে দেখতেন। কেশবচন্দ্রও বিদ্যাসাগরকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন, তিনি প্রায়ই বিদ্যাসাগরের বাড়িতে আসতেন। তাই কেশবচন্দ্র এই নাটকের অভিনয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। হলবাইন সাহেব নাটকের দৃশ্যপট এঁকেছিলেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন নরেন্দ্রনাথ সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কুঞ্জবিহারী সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্রাহ্ম ভদ্রলোক। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'কেশব-চরিত' গ্রন্থে লিখেছেন, "বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের নায়ক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বিধবা-বিবাহ নাটকের' অভিনয় দেখিতে একাধিকবার আসিয়াছিলেন এবং সে সম্বন্ধে উৎসাহ দিতেন। অভিনয় দেখিতে দেখিতে, চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-প্রচলন প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মদিগের উৎসাহ ও সহযোগিতা বিশেষভাবেই ছিল।

প্রাগ্রসর বাঙালি জননায়কদের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র নিস্ফল হলো না। আবেদন-পত্র পাঠাবার এক মাসের মধ্যেই ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য মিঃ জে. পি. গ্রান্ট বিধবা-বিবাহ আইনের একটি খসড়া সভায় উত্থাপন করলেন। আইন সভায় বিধবা-বিবাহ আইনের প্রস্তাবক মিঃ গ্রান্ট বললেন : "এই আইন কারো বিশ্বাস-অবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করবে না, কিন্তু একদল হিন্দু আরেক দল হিন্দুর ওপর যে অত্যাচার উৎপীড়ন করেন তা নিবারণ করবে।"

অবস্থা এতদূর দাঁড়াল যে, লোকে বিদ্যাসাগরের জীবনের ওপর পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে উদ্যত হলো ; কিন্তু বিধবা-বিবাহের দাবীর কাছে জীবনের আর সব দাবী তুচ্ছ হয়ে গেল—বিদ্যাসাগরের অকুতোভয় চিত্ত এর জন্যে আজীবন সংগ্রাম করে গেল।

দুর্জয় সংকল্প আর সুকঠিন অধ্যবসায়—এইমাত্র ভরসা করে বিদ্যাসাগর আন্দোলনকে স্তরে স্তরে ব্যাপক করে তুললেন। যুগ যুগ ধরে চলতে-থাকা একটা সামাজিক আদর্শের বিরুদ্ধে এমনি বিদ্রোহ ও সংগ্রাম যে কোনো দেশের সামাজিক সংস্কারের ইতিহাসে দুর্লভ।

ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ গ্রান্টের প্রস্তাব সমর্থন করলেন স্যর জেমস্ কলভিন।

দু'মাসের মধ্যেই আইনের খসড়া সিলেক্ট কমিটিতে গেল।

বাংলার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তখন রাধাকান্ত দেবকে সম্মুখে রেখে শেষবারের মতো এর বিরোধিতা করলো। প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন-পত্র পেশ হলো। এর পর আইনের বিরুদ্ধে নদীয়া, ত্রিবেণী, ভট্টপল্লী, কলকাতা ও অন্যান্য স্থানের বহু পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষরিত আবেদন-পত্রও প্রেরিত হলো।

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, ত্রিবেণী থেকে একমাত্র পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ তর্কতীর্থ বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেছিলেন। ইনি প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের প্রপৌত্র। এঁরই কাছে স্যর উইলিয়ম জোন্স সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন। একবার বিদ্যাসাগর ত্রিবেণীতে এসে তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বাড়ি দেখে বলেছিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়ের ভদ্রাসন বঙ্গের একটি তীর্থ বলিয়া আমি মনে করি। আমি ইহার ধূলি শ্রদ্ধাবনত মস্তকে ধারণ করি।'

সকলেরই এক কথা—বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র-সঙ্গত নয়।

কিন্তু সংখ্যার ভারে সত্যের কণ্ঠরোধ করা সম্ভব হলো না।

যথাসময়ে আইন পাশ হয়ে গেল। বিধবাবিবাহ বিল লর্ড ডালহৌসির আমলে আইনসভায় উত্থিত ও আলোচিত হয়, কিন্তু এই সম্পর্কে যথারীতি আইন পাশ হলো ১৮৫৬-র জুলাই মাসে।

লর্ড ক্যানিং তখন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল।

আন্দোলন আরো প্রবল হয়ে উঠলো।

গ্রাণ্ট অভিনন্দিত হলেন। সমাজপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র স্বহস্তে গ্রাণ্ট সাহেবকে একখানা অভিনন্দন-পত্র দান করলেন। দায়ভাগের বাধা অপসারিত হলো। এই বছরই আইন-সিদ্ধ আন্দোলনকে সর্বপ্রযত্নে বাস্তবের রূপ দিতে অগ্রসর হলেন বিদ্যাসাগর।

॥ আঠারো ॥

স্থান : সংস্কৃত কলেজ। সময় : শ্রাবণের এক অপরাহ্ন।

বিদ্যাসাগর তাঁর ঘরে বসে নদীয়ার মহারাজকে একখানি চিঠি লিখছেন। এমন সময়ে এসে উপস্থিত হলেন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ। বিদ্যাসাগরের পূজনীয় অধ্যাপক তিনি। তর্কবাগীশ মহাশয় আসতেই তিনি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন।

বিদ্যাসাগর। আসুন, আসুন, কি সৌভাগ্য আমার।

তর্কবাগীশ। নিজেই এলাম তোমাকে অভিনন্দিত করতে। আইন তা'হলে সত্যই পাশ হয়েছে?

বিদ্যাসাগর। আপনাদের আশীর্বাদে তা হয়েছে। গেজেটেও প্রকাশিত হয়েছে।

তর্কবাগীশ। অতঃপর কি করবে?

বিদ্যাসাগর। এইবার বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানে ব্রতী হব। পিতৃদেব বলেছেন, কথায় ও কাজে যেন মিল থাকে।

তর্কবাগীশ। ঈশ্বর, প্রবল জনরব বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান হচ্ছে। কতদূর কি হয়েছে জানি না, আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, দেশের বিজ্ঞ ও বৃদ্ধদের স্বমতে রেখেছ কি না?

বিদ্যাসাগর। দেশের বিজ্ঞ ও বৃদ্ধ বলতে আপনি কাদের লক্ষ্য করছেন? রাধাকান্ত দেব ও তাঁর দলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের? আমি তাঁদের অনেক উপাসনা করেছি। অনেককেই নেড়েচেড়ে দেখেছি, সকলেই ক্ষীণবীর্য ও ধর্মকঞ্চুকে সংবৃত।

তর্কবাগীশ। শুনেছি তাঁদের অনেকেই তোমার এই আন্দোলনে সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর। তা করেছিলেন, এমন কি, মুক্ত কণ্ঠেই করেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁদের আচরণ দেখে নিতান্ত বিস্মিত হয়েছি। আমি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি, এখন আমায় আর প্রতিনিবৃত্ত করবার কথা বলবেন না।

তর্কবাগীশ। সে কথা আমি বলতে আসিনি, ঈশ্বর। বাল্যাবধি তোমার প্রকৃতি, তোমার অদম্য মানসিক শক্তি আমি লক্ষ্য করে আসছি, তোমায় ভগ্নোদ্যম বা প্রতিনিবৃত্ত করা আমার সংকল্প নয়।

বিদ্যাসাগর। শুনে আশ্বস্ত হলাম। প্রীত হলাম।

তর্কবাগীশ। তুমি যে কাজটিকে লোকের হিতকর বলে জ্ঞান করেছ এবং যার অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তা করেছ, সে কাজের গোড়াটা যাতে দৃঢ়তর হয় এবং তা অর্ধসম্পন্ন হয়েই বিলীন না হয়, এই আমার বলার কথা।

বিদ্যাসাগর। কর্তব্য বলে যা বুঝেছি, প্রাণপণে তা সম্পন্ন করব জানবেন। দেখুন, ছাত্রজীবনে আমার শিক্ষাগুরু বাচস্পতি মশাই যখন বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করলেন এবং তার অল্পকাল পরেই তাঁর সেই তরুণী স্ত্রী যখন বিধবা হলেন—সেদিন আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, যদি কখন সময় পাই তবে এই সামাজিক কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করবই। তারো আগে আমাদের দেশের একটা ঘটনা বলি আপনাকে। সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় যখন মাঝে মাঝে বাড়ি যেতাম, তখন বিধবা-জীবনের শোকপূর্ণ হৃদয়-বিদারক অনেক ঘটনার কথা মায়ের কাছে শুনতাম। শুনে আমার হৃদয় ভেঙে যেত। একবার গিয়ে শুনলাম, আমাদের পরিচিত কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের এক বিধবা কন্যা সকলের অজ্ঞাতসারে কলঙ্কের পথে পদার্পণ করে। এর ফলস্বরূপ যখন সেই মেয়েটি সন্তান-সম্ভবা হলো, তখন তার বাপ-মা, মান-সম্ভ্রম ও জাতি রক্ষার জন্য যৎপরোনাস্তি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এমন অবস্থায় সচরাচর যা হয়, এ ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হলো না। যথাকালে সেই হতভাগিনী এক পুত্র-সন্তান প্রসব করল। সমাজপতিদের উৎপীড়নের ভয়ে ভীত গৃহকর্তা ও গৃহিণী, চক্ষের জল মুছতে মুছতে সেই সদ্যঃ-প্রসূত শিশুকে হত্যা করে কুল মান রক্ষা করলেন।

এই ঘটনা বর্ণন করতে করতে বিদ্যাসাগর কেঁদে ফেললেন। সহসা মুখের কথা মুখে রয়ে গেল, মনের গ্লানি ও যন্ত্রণার পরিচায়ক উত্তেজনা তাঁর সমস্ত শরীরে ফুটে উঠল। তর্কবাগীশ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন—অনুভব

করলেন এই মানুষটির মর্মানুভূতির গভীরতা কত বেশী। অনেকক্ষণ নীরবে অশ্রুজল মোচন করে শেষে পরিধেয় বস্ত্রে মুখ মুছে বিদ্যাসাগর বললেন, আমি অরণ্যে রোদন করছি। এ কি মানুষের দেশ? মানুষের দেশ হলে, এতদিন এর প্রতিবিধান হতো।

তর্কবাগীশ। আইন যখন পাশ করিয়েছ, এইবার প্রতিবিধান নিশ্চয়ই হবে তবে আমি একটা কথা বলছিলাম।

বিদ্যাসাগর। বলুন।

তর্কবাগীশ। এই রকম সমাজ-সংস্কার করা কেবল রাজার সাধ্য। এতে বিপুল অর্থ ও লোকবল আবশ্যক।

বিদ্যাসাগর। ঠিক কথাই বলেছেন। তবে তার চেয়েও দরকার মনোবল।

তর্কবাগীশ। ঠিক কথা। মনোবল তোমার অসীম। কেবল কলিকাতায় কয়েকটি বৃদ্ধ আমার লক্ষ্য নয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যেখানে হিন্দুধর্ম প্রচলিত, তত দূর দৌড়তে হবে। ধর্মলোপ ও লোকমর্যাদার অতিক্রম করা হচ্ছে বলে যাঁরা মনে করছেন, তাঁদের ভালো করে বোঝাতে হবে। কেবল বাংলাদেশে না হয়ে সমস্ত ভারতবর্ষে যাতে এক সময়ে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হয়, তোমাকে সেই চেষ্টা করতে হবে।

এই বলে তর্কবাগীশ বিদায় নিলেন।

বিদ্যাসাগরের আনন্দ ধরে না।

রাধাকান্ত দেবের পরম পূজনীয় তর্কবাগীশ মহাশয়ও যে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা স্বীকার ও বিধি প্রচলনে সম্মত হয়েছেন—এতেই তাঁর আনন্দ। এই রকম মনোভাব যদি সকলের হতো, ভাবলেন বিদ্যাসাগর।

এত বড় একটা সমাজ-সংস্কারের কাজে হাত দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর পূর্বসূরী রামমোহনের জীবনের দিকে স্বভাবতই দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে পারেন নি এবং লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, রাজার সতীদাহ আন্দোলন আর বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পদ্ধতিটা একই। রাজবিধি রহিত করবার জন্যে সেদিনও যেমন বহু সহস্র বিরোধীদলের লোকের স্বাক্ষরিত আবেদন-পত্র কোম্পানীর সরকারে প্রেরিত হয়েছিল, আমরা দেখলাম

বিদ্যাসাগরের সময়েও তার ব্যতিক্রম হয় নি। শাস্ত্রানুসারে সহমরণ যে হিন্দু বিধবার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য নয়, তা প্রমাণ করবার জন্যে রামমোহন যেমন লেখনী ধারণ করেছিলেন, ইংরেজি ও বাংলায় পুস্তিকা লিখে প্রচার করেছিলেন, বিদ্যাসাগরও তাই করলেন। সমাজ দুজনের ওপরই খড়্গহস্ত হয়েছিল। দুজনেই আইনের সাহায্য নিয়ে সংস্কারকে চালু করেন। দুজনেরই জন্ম এক শতাব্দীর মধ্যে—তাই বোধ হয় দুজনের কর্মে ও চিন্তায় এতটা মিল। রামমোহনের নামে গান বেঁধে লোকে পথে পথে গাইত, বিদ্যাসাগরের নামেও লোকে ছড়া বেঁধে গাইত। রক্তচক্ষু-সমাজের বিদ্রূপ ও ভ্রূকুটীকে দুজনাই সমান সাহসের সঙ্গে উপেক্ষা করেছিলেন।

বিধবা বিয়ের আইন পাশ হলো।

এই রাজবিধি রহিত করার জন্যে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে বিরুদ্ধ আন্দোলনও বড়ো কম হয় নি।

আইনে একটা জিনিস স্বীকৃত হলো না।

যে বিধবার বিয়ে হবে, মৃত স্বামীর বিষয়-সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার থাকবে না।

না থাকুক—বিধবাবিবাহ এখন আইনতঃ সিদ্ধ, এতেই শহরে তুমুল উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল। সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে কবে কোথায় প্রথম বিবাহটি হবে।

বিদ্যাসাগরের এক মুহূর্তের বিশ্রাম নাই। গুরুভার দায়িত্ব এখন তাঁর মাথায়। তবু এর জন্যে তিনি ধনীদের দ্বারস্থ হলেন না।

আইন পাশ হবার চার মাস বাদেই প্রথম বিধবাবিবাহের আয়োজন হলো বিদ্যাসাগরের যত্নে এবং উদ্যোগে। স্থান—সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। পাত্র—যশোহরের প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র এবং বিদ্যাসাগরের অন্যতম বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন; পাত্রী—নদীয়া জেলার পলাশডাঙা গ্রামের ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা মেয়ে কালীমতি। এই বিয়ের ঘটক ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। বহরমপুরে জজ-পণ্ডিতের পদ থেকে তর্কালঙ্কার অবসর গ্রহণ করলে পরে তাঁর শূন্য পদে মনোনীত হন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। কালীমতী তার বিধবা মায়ের সঙ্গে

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শ্বশুরবাড়িতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতো। মদন-মোহনেরই বিশেষ যত্নে কালীমতি ও তার মা-কে কলকাতায় পাঠান হয়। মা ও মেয়ে এসে উঠলেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। শ্রীশচন্দ্র এসে উঠলেন রামগোপাল ঘোষের বাড়িতে।

কন্যাপক্ষ থেকে মেয়ের মায়ের স্বাক্ষরে যথারীতি লাল কালিতে ছাপা নিমন্ত্রণ পত্র কন্যাযাত্রিদের কাছে পাঠান হয়েছিল। নিমন্ত্রণপত্রের মুসাবিদা করেন বিদ্যাসাগর স্বয়ং। পত্রের ভাষা ছিল এই রকম: "সবিনয় নিবেদনম্, ২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার আমার বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ হইবেক। মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্বক কলিকাতার অন্তঃপাতী শিমুলিয়া সুকেস ষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকর্ম সম্পন্ন করিবেন, পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ, ১২৬৩।"

সেদিন ছিল রবিবার। সন্ধ্যা হতেই নানা স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী ও শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিয়ে বাড়িতে এসে সমবেত হয়েছেন। পুরস্ত্রীরা কন্যাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে বরাগমনের প্রতীক্ষা করছেন। সুকিয়া ষ্ট্রীট ও তার নিকটবর্তী রাজপথ লোকে লোকারণ্য। পরিচিত, অপরিচিত ইতরভদ্র গায়ে গায়ে মাথায় মাথায় দাঁড়িয়েছে। এত বড় একটা ব্যাপারে বিপুল জনসমাবেশ হবে এবং বাধাবিঘ্নও ঘটতে পারে—এই আশঙ্কা করে পূর্বাহ্ণেই বিদ্যাসাগর পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। সরকারী মহলে তাঁর অখণ্ড প্রতিপত্তি। তাই যথেষ্ট পুলিশের ব্যবস্থা হয়েছে; সুকিয়া ষ্ট্রীটে এবং যে পথে বর আসবে সে পথে, প্রত্যেক দু'হাত অন্তর পুলিশ পাহারা রাখা হয়েছে। এমন বরযাত্রা শহরে কেউ কখনো দেখে নি। লগ্নের সময় নিকটবর্তী হলো। বর ও বরযাত্রীরা যথাসময়ে এসে পৌঁছলেন। শহর যেন ভেঙে পড়ল বর দেখতে। পাল্কী আর অগ্রসর হওয়া কঠিন। বরের দক্ষিণে ও বামে পাল্কী ধরে আছেন রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি বিদ্যাসাগরের অনুরাগী বন্ধুগণ। বিরাট সমারোহ আর উদ্বেলিত জনতার ভেতর দিয়ে বর ও বরযাত্রী বিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করলেন। বিবাহ-সভায় উপস্থিত পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও অন্যান্য টোলের বহু অধ্যাপক। আর

সম্ভ্রান্তদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা দিগম্বর মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। শুভলগ্নে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে কন্যার বিধবা মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী মেয়েকে সম্প্রদান করলেন। বিয়ের চেলী, গহনা ও অন্যান্য খরচ দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন সফল হলো। বাংলার-সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসে ২৩শে অগ্রহায়ণ, রবিবার (১২৬৩) (ইংরেজি ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৫৬) চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

শুভ্র থান-ধুতি আর উত্তরীয় গায়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর যখন সেই বিবাহ-বাসরে এসে দাঁড়ালেন, তখন সকলের বিস্মিত ও বিমুগ্ধ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেই ব্রাহ্মণের ওপর। উত্তরীয়ের ভেতর দিয়ে দেখা যায় শুভ্র উপবীত—যেন মহাদেবের গলায় সাপ। ক্ষণেকের জন্যে সকলের মানসপটে ভেসে ওঠে নীলকণ্ঠ মহাদেবের মূর্তি—সেই মূর্তিই যেন আজ তারা প্রত্যক্ষ করলো বিদ্যাসাগরের মধ্যে। এই আন্দোলনের ফলে যা কিছু বিষ উঠেছে, সে সবই তো এই দৃঢ়চেতা ব্রাহ্মণ মহাদেবের মতো নিঃশঙ্কচিত্তেই পান করেছেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন এই বিয়ের প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে একজন। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের তরুণ ছাত্র। তাঁর আত্মচরিতে শাস্ত্রী মহাশয় এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন এই ভাবে: "যেদিন প্রথম বিধবা বিবাহ দেওয়া হয় সেদিন আমি বাসার লোকের সঙ্গে সে বিবাহ দেখিতে গিয়াছিলাম। সে কি ভিড়! সুকিয়া স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে ঐ বিবাহ হয়। অন্য একখানি বইতে শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "এই বিবাহে বঙ্গদেশে যে আন্দোলন উঠিল, তাহার অনুরূপ জাতীয় উত্তেজনা আমরা অল্পই দেখিয়াছি।"

এই বিয়ের একটি সুদীর্ঘ বিবরণ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে: "আমরা পরমাহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমাদিগের চিরবাঞ্ছিত বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমত: গত ২৩ অগ্রহায়ণ রবিবাসরে দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত রামধন তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্যের সহিত পলাশডাঙা গ্রামনিবাসী ভদ্রবংশোদ্ভব ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশমবর্ষীয়া বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই কন্যার যখন চার বৎসর বয়ঃক্রম তৎকালে ইহার সহিত নবদ্বীপাধিপতি

রাজার গুরুবংশীয় শ্রীযুক্ত রুক্মিণীপতি ভট্টাচার্যের পুত্র হরমোহন ভট্টাচার্যের প্রথমতঃ বিবাহ হইয়াছিল; ঐ বিবাহের ২ বৎসর পরে অর্থাৎ ৬ বৎসর বয়সে ইহার বৈধব্য হয়। এই কন্যা পতিকুলে বাস করিত, ইহার স্বীয় জননী দুহিতার অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আপন আত্মীয়বর্গের সম্মতি অনুসারে তাহার পুনঃ পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদনার্থে অতীব যত্নশীলা হয়েন এবং সেই যত্নানুসারে সেই শুভকার্য সম্পন্ন হয়। এই কন্যার পিতা লোকান্তরিত হওয়াতে ইহার মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ও দেশ প্রচলিত ব্যবহার অনুযায়ী উল্লিখিত পাত্রে ইহাকে সম্প্রদান করেন। ব্রাহ্মণবর্গের বিবাহ উপলক্ষে এ দেশে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদি যে যে ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এ বিবাহে সে সমস্তই হইয়াছিল, তাহার কোন প্রকার অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি হয় নাই। এই বিবাহে ন্যূনাধিক আটশত নিমন্ত্রণ পত্র মুদ্রিত হয়, তদ্ভিন্ন অধ্যাপক ভট্টাচার্যদিগের নিমন্ত্রণের জন্য কতকগুলি পত্র পৃথকরূপে সংস্কৃত কবিতায় মুদ্রিত হইয়াছিল। এই মহৎ ব্যাপার সম্পাদন উপলক্ষে মহাসমারোহ হইয়াছিল··· বিবাহ-সভায় প্রায় প্রধান প্রধান সমস্ত ভদ্র পরিবারেরই অধিষ্ঠান হইয়াছিল... কন্যাসম্প্রদানের বাটীর নিকটস্থ রাজপথ শকটাদি দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রব্যবসায়ী অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও উক্ত বিবাহের সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া শুভকর্ম সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।···এই মহাব্যাপারে আমরা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঋণ জীবনসত্ত্বেও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অদ্বিতীয় নাম এই অসাধারণ কীর্তির সহিত মহীতলে চিরকাল জীবিত থাকিবে। এই মহাব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি যে পর্যন্ত পরিশ্রম ও যে পর্যন্ত যত্ন স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা শতবর্ষেও বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারিব না। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, অদ্বিতীয় তিতিক্ষা ও তুলনারহিত ধীশক্তিই এই মহাব্যাপার সম্পন্ন হইবার প্রধান কারণ। তিনিই অসাধারণ বুদ্ধিবলে হিন্দুদিগের সমস্ত ধর্মশাস্ত্র সমন্বয় করিয়া তাহার শেষ সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন এবং বিধবাবিবাহ যে হিন্দুধর্মবিরুদ্ধ নহে, তিনি স্বীয় বিচার-কৌশলে তাহা সকল লোককে শিক্ষা প্রদান করিলেন।···তিনি এই শুভসংকল্প সিদ্ধ করণার্থে নিন্দাকে নিন্দা বোধ করেন নাই, অপমানকে অপমান জ্ঞান করেন নাই, এবং কটুকাটব্য ও উপহাসাদির প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার এই অসামান্য কীর্তি যেন নিত্যকাল পৃথিবীর

মধ্যে জগদীশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান করে, অবশেষে এই আমাদিগের প্রার্থনা।"

এই ঘটনার উল্লেখ করে 'ইংলিসম্যান' পত্রিকা লিখেছিলেন: "এই বিবাহ অনুষ্ঠানে শহরের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর যেমন সমাবেশ হইয়াছিল, তেমনি বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সমাগমে ইহা সাতিশয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইয়াছিল। ইহাদের সমুপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি যেরূপ সমর্থন লাভ করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না যে ইহা বিধবা কন্যার বিবাহ না কুমারী কন্যার বিবাহ। বিবাহের যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান ও মাঙ্গলিক নিখুঁতভাবেই সম্পন্ন হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সকল বাধাবিঘ্ন জয় করিয়া এই সংস্কার-আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারই জয়ধ্বনি চারিদিকে। নিঃসন্দেহে এই একটি মাত্র কার্য দ্বারা তিনি অমরত্ব অর্জন করিলেন। সমাজের হিতাকাংখী সকলেরই ইহাই প্রার্থনা যে তিনি যেন দীর্ঘজীবী হইয়া সমাজকল্যাণকর আরো সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন এবং আরো যশের ভাগী হন।"

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, সেই সময়কার হিন্দু-পরিচালিত প্রভাকর প্রভৃতি অন্যান্য পত্রিকা এই বিবাহ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যই করেছিল; শ্লেষ ও বিদ্রূপ করতেও দ্বিধা বোধ করে নি। এইসব কাগজের বক্তব্য ছিল যে এই বিবাহ সাধারণ হিন্দুসমাজ-সম্মত হয় নি। বলাবাহুল্য, এইসব বিরূপ সমালোচকদের নেপথ্য প্রেরণা জুগিয়েছিলেন সংস্কার-বিরোধী দলের নেতা রাধাকান্ত দেব।

সবচেয়ে বিরূপ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিম কোনো দিনই বিদ্যাসাগরকে সহ্য করতে পারেন নি। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন বিদ্যাসাগরের জীবনের সবচেয়ে বড়ো কাজ। কিন্তু সেকালের সমাজপতিদের অনেকেই তাঁর এই কাজ সমর্থন করেন নি। রাধাকান্ত দেব তো তাঁর দলবল নিয়ে এই আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। যতদূর জানা যায়, সাহিত্য-সম্রাট বিধবা-বিবাহ সমর্থন করতে পারেন নি। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে তিনি তাঁর অন্তরের বিষ সূর্যমুখীর চিঠির ভেতর দিয়ে কি ভাষায় উচ্চারণ করেছিলেন, তা সকলেরই জানা আছে। দাম্ভিক বঙ্কিম বিদ্যাসাগরকে মূর্খ পর্যন্ত বলতে দ্বিধা করেন নি। বঙ্কিম এখানেই ক্ষান্ত হন নি। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের 'বহু বিবাহ গ্রন্থের সমালোচনা' এবং 'তুলনায় সমালোচনা' ও 'দ্বিতীয়বার বিবাহ'

প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি থেকে শুধু বিধবা-বিবাহই নয়, অন্যান্য বিষয়েও টুলো ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরের ওপর বঙ্কিমচন্দ্রের কিরূপ মনোভাব ছিল, তাও বেশ জানা যায়। 'তুলনায় সমালোচনা' প্রবন্ধটি অবশ্য লিখেছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম সংখ্যায়। এই প্রবন্ধটিতে বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-সাধনার প্রতি যে ভাষায় কটাক্ষ করা হয়েছিল তা জঘন্য কুরুচির পরিচায়ক। বিদ্যাসাগরের জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনা কিছুই নয়—প্রবন্ধটিতে অক্ষয় সরকারের এই ছিল বক্তব্য। বঙ্গদর্শনের ১ম বৎসরের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'দ্বিতীয়বার বিবাহ' প্রবন্ধ। এটি বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে লেখা। লেখা নয়—যুক্তিহীন বিষোদ্গার। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখন সঞ্জীবচন্দ্র হলেও আসলে বঙ্কিমচন্দ্রই তখনো এর সব কিছুই ছিলেন। স্বাক্ষর-বিহীন প্রবন্ধের অন্তরালে থেকেই তিনি বিদ্যাসাগরের প্রতি তীক্ষ্ণ ও বিরূপ সমালোচনার বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন। বাইরে শ্রদ্ধাভক্তি দেখালেও বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের কোনো মতকেই সমর্থন করতে পারেন নি।

বিদ্যাসাগরের কোনো কোনো মতের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এই যে মনোভাব, এ সংবাদ বিদ্যাসাগর জানতেন। তিনি বিষবৃক্ষে এবং বঙ্গদর্শনে তাঁর বিরুদ্ধে লেখা পড়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিরূপ সমালোচনার কথা তিনি অনেকদিন পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করব। বিদ্যাসাগর যখনই বর্ধমানে আসতেন, তখন তিনি প্যারীচাঁদ মিত্রের বাড়িতেই থাকতেন, তবে প্রায়ই বঙ্কিমের বন্ধু দিগম্বর বিশ্বাসের বাসায় বেড়াতে আসতেন। বিদ্যাসাগর বর্ধমানে এলে দিগম্বর বাবু সময়ে সময়ে তাঁকে ভোজ দিতে অনুরোধ করতেন। শরীর সুস্থ থাকলে অনুরোধ প্রায়ই রক্ষিত হতো। রন্ধনপটু বিদ্যাসাগর নিজের হাতে রেঁধে লোককে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। একদিন দিগম্বর বিশ্বাসের বাসায় এই ভোজসভার আয়োজন হলো। বিদ্যাসাগরের একটা নিয়ম ছিল যে, তিনি যা নিজে রান্না করতে পারতেন, তার বেশী কোনো জিনিস ভোক্তারা আহার করতে পেতেন না। কাজেই আহারের তালিকা অতি সামান্যই হতো। এই দিনের ভোজের তালিকায় ছিল ভাত, পাঁঠার ঝোল এবং আম-আদা দিয়ে পাঁঠার মেটের অম্বল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সেদিন ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র।

খেতে খেতে সকলেই রান্নার প্রশংসা করছেন। দেবহৃদয় বিদ্যাসাগর উপবীত গলায় জড়িয়ে সহাস্তে পরিবেশন করছেন। বঙ্কিমবাবু বললেন, এমন সুস্বাদু অম্বল তো কখনো খাই নি। সঞ্জীববাবু হেসে বললেন, হবে না কেন, রান্নাটা কার জানো তো? বিদ্যাসাগরের। অমনি বিদ্যাসাগর হেসে উত্তর দিয়ে বললেন, না হে না, বঙ্কিমের সূর্যমুখী আমার মতো মূর্খ দেখে নি। কথিত আছে, বঙ্কিমচন্দ্র কোনো উত্তর দেন নি। তিনি নীরবে নতমস্তকে সেদিন এই বিদ্যাসাগরী খোঁচা হজম করেছিলেন।

বিবাহ বাসরে বিদ্যাসাগরের ব্রাহ্ম বন্ধুদের প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। অনুপস্থিত ছিলেন শুধু দু'জন। বিদ্যাসাগরের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু অক্ষয় কুমার আর রমাপ্রসাদ রায়। শিরঃপীড়া অসুখের জন্যে অক্ষয় কুমার তখন এলাহাবাদে। সেখান থেকেই তিনি শ্রীশচন্দ্র ও কালীমতীর বিয়ের খবর পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করে বিদ্যাসাগরকে এক চিঠিতে লিখলেন: "আমি এখানে পদার্পণ করিয়াই বিধবা বিবাহের শুভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইয়াছি। ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোকে এ বিষয়ের নিমিত্ত আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে চিরকাল বদ্ধ রহিল।"

কিন্তু রমাপ্রসাদ ইচ্ছে করেই আসেন নি। রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায় বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গদের মধ্যে একজন ছিলেন। বাঙালির মধ্যে হাইকোর্টের প্রথম বিচারপতি হিসেবে তিনিই নিযুক্ত হয়েছিলেন; দুর্ভাগ্যক্রমে বিচারপতির আসনে বসবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় সখ্য ছিল—এই সখ্যের কারণ তিনি রামমোহন রায়ের পুত্র এবং বিদ্যাসাগর রামমোহন রায়কে ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে স্বীকার করতেন এবং সমাজ-সংস্কারে তাঁকেই তাঁর গুরুস্থানীয় মনে করতেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে গোড়ার দিকে বিদ্যাসাগর রমাপ্রসাদের কাছ থেকে অনেক সহানুভূতি পেয়েছিলেন। কিন্তু কার্যকালে তিনিও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন—বিশেষ করে প্রথম বিবাহ-বাসরে উপস্থিত থাকবেন বলেও থাকেন নি। এতে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত দুঃখিত হন, অথচ সেই রমাপ্রসাদের মৃত্যুসংবাদে তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। এই সম্পর্কে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ এই রকম:

সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি
(এই বাড়িতেই প্রথম বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান হয়)
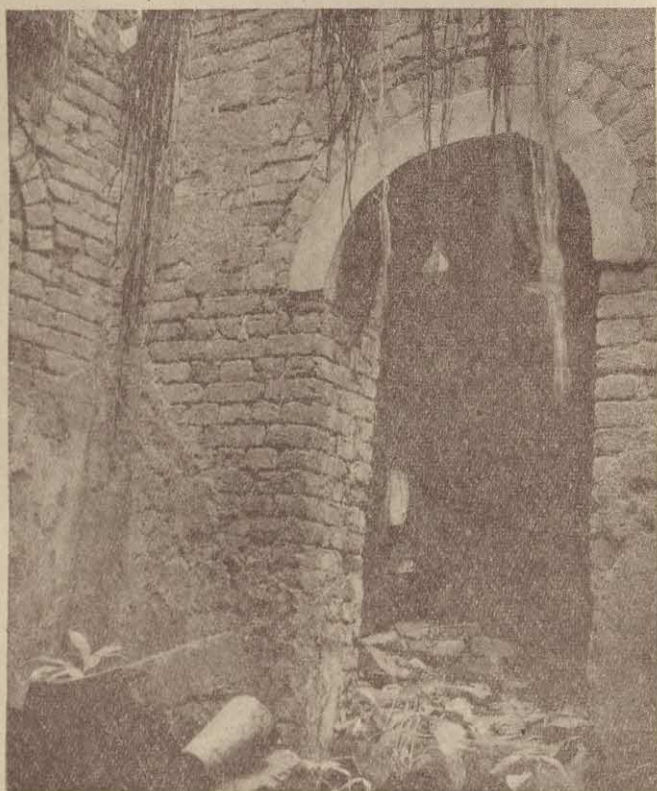
বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে বিদ্যাসাগরের বসতবাড়ির
কতকাংশের বর্তমান অবস্থা

"শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সর্বপ্রথম বিধবাবিবাহ হয়। তখন কলিকাতার অনেক বড় লোক এ বিষয়ে সাহায্য করিতে এবং বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে প্রতিশ্রুত থাকিয়া একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন। লজ্জার বিষয় এই যে কেহই উপস্থিত হন নাই। এ বিবাহের পুর্বে তিনি (বিদ্যাসাগর) মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। রমাপ্রসাদ রায় বলিলেন, 'আমি ভিতরে ভিতরে আছিই তো, সাহায্যও করিব, বিবাহস্থলে নাই গেলাম!' এই কথা শুনিয়া ঘৃণা এবং ক্রোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিয়ৎক্ষণ কথা বাহির হইল না। তাহার পর দেওয়ালে স্থিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ছবির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন, 'ওটা ফেলে দাও, ফেলে দাও।' এরূপ বলিয়া চলিয়া গেলেন।"

একদিন। গভীর রাত।

ঠনঠনিয়া কালীতলা দিয়ে চলেছেন বিদ্যাসাগর।

সঙ্গে শ্রীমন্ত। তাঁর বিশ্বস্ত পাইক। হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, ক'জন দুর্বৃত্ত তাঁকে আক্রমণ করবার জন্যে এগিয়ে আসছে। আশ্চর্য, বিদ্যাসাগর এতটুকু ভয় পেলেন না, কিংবা বিস্ময় বোধ করলেন না। বিদ্যাসাগর জানতেন যে দেশের মধ্যে ধর্ম-বিপ্লবের তিনি সূচনা করেছেন, এতে প্রতিপদে তাঁর প্রাণ যাবার ভয় আছে। বিদ্যাসাগর একবার মাত্র ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—কই রে ছিরে, সঙ্গে আছিস্ কি?

—তুমি চলো না, কে আসে যায় আমি দেখব, পেছন থেকে উত্তর দিল শ্রীমন্ত সর্দার। সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাতের পাকা বাঁশের লাঠিটা বেশ করে বাগিয়ে ধরে। বিদ্যাসাগর নির্ভয়ে পথ চলেন। শ্রীমন্ত যেরকম গম্ভীর গলায় কথা বললো, তাতে আক্রমণকারীরা বুঝতে পারল যে বিদ্যাসাগর সুরক্ষিত হয়েই চলেছেন। তারা আর অগ্রসর হলো না। ফিরে গেল। বিধবা বিবাহের সূচনা করতে গিয়ে সেদিন এই রকম অবস্থাই দাঁড়িয়েছিল।

প্রতিপদেই তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছিল।

গোপনে তাঁর প্রাণ-সংহারের চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়েছিল। উদ্বিগ্ন ঠাকুরদাস তাই তাঁদের বিশ্বস্ত পাইক শ্রীমন্তকে ছেলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর যখন কোথাও যেতেন পথে সেই শ্রীমন্ত সর্বদা

সঙ্গে থাকত; বিশেষ করে রাত্রিতে তাকে সঙ্গে না নিয়ে তিনি কোথাও যেতেন না। সত্যই বিধবা-বিবাহের জন্য বিদ্যাসাগরকে অনেক লাঞ্ছনা ও তাড়না সহ্য করতে হয়েছিল। বিদ্যাসাগর বিচলিত হন নি এতটুকু। এই সম্পর্কে তখনকার 'হিতবাদী' পত্রিকা থেকে একটি বিবরণ এখানে তুলে দিলাম:

"বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইলে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিত। কেহ পরিহাস করিত, কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার করিবার—এমন কি, মারিয়া ফেলিবারও ভয় দেখাইত। বিদ্যাসাগর এ সকলে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। একদিন শুনিলেন, মারিবার চেষ্টা হইতেছে। কলিকাতার কোনও বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি, বিদ্যাসাগরকে মারিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। দুর্বৃত্তেরা প্রভুর আজ্ঞাপালনের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। বিদ্যাসাগর কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না। যেখানে বড় মানুষ মহোদয় মন্ত্রিবর্গ ও পারিষদগণে পরিবৃত হইয়া প্রহরীরক্ষিত অট্টালিকায় বিদ্যাসাগরের ভবিষ্যৎ-প্রহারের উদ্দেশে কাল্পনিক সুখ উপভোগ করিতেছিলেন, বিদ্যাসাগর একেবারে সেইখানে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলেই অপ্রস্তুত ও নির্বাক হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ গত হইলে একজন পারিষদ্ বিদ্যাসাগরের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, লোক পরম্পরায় শুনিলাম, আমাকে মারিবার জন্য আপনাদের নিযুক্ত লোকেরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আমার সন্ধানে ফিরিতেছে ও খুঁজিতেছে; তাই আমি ভাবিলাম, তাহাদিগকে কষ্ট দিবার আবশ্যক কি, আমি নিজেই যাই। এখন আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। ইহার অপেক্ষা উত্তম অবসর আর পাইবেন না। লজ্জায় সকলে মস্তক অবনত করিলেন।"

পরবর্তীকালে রমেশচন্দ্র দত্ত যখন ঋগ্বেদের অনুবাদ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের কাছে যেতেন, সেই সময়ে একদিন বিদ্যাসাগর কথা-প্রসঙ্গে তাঁকে বলেছিলেন, জানো রমেশ, এই বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে লোকে আমাকে চরিত্রহীন পর্যন্ত বলতে দ্বিধা করে নি।

যখন আমরা ভাবি, সেই দেব-চরিত্রের মানুষকেও এমন জঘন্য অপবাদের বোঝা মাথা পেতে নিতে হয়েছিল, তখন এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে

পরে যে, কালের নির্দেশ মেনে নিতে বিদ্যাসাগর দ্বিধা বোধ করেন নি কখনো। কালের অন্তর-প্রেরণা তাঁর কর্মে গতি দিয়েছে বরাবর। শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন, সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেও তেমনি এই বিধবা-বিবাহ উপলক্ষ করে বিদ্যাসাগর হ্রদের মতো গতিহীন বাংলা সমাজে বন্যা বয়ে আনার প্রাণচাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছিলেন। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হারিয়ে-যাওয়া জীবনবোধকে তিনি খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। কুসংস্কার ও দেশাচারের দুর্গম পথ সমান করে দিয়ে হিন্দু বিধবাদের জীবন-তীর্থে পৌঁছে দেবার উদ্যম যদিও এখানে ওখানে দেখা দিয়েছিল, তবু কালের ব্যবধানে এ সত্যই আজ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যে, সেদিন সেই পথের পথপ্রদর্শক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বাংলার এই বিরাট পুরুষ বিদ্যাসাগর। আমরা দেখলাম যে, কী দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে বিদ্যাসাগর শাস্ত্র থেকে উদ্ধার করেছিলেন বিধবা-বিবাহের প্রমাণ; কেননা, বিরোধী কণ্ঠকে তিনি নিরস্ত্র করতে চেয়েছিলেন তাদেরই অস্ত্র দিয়ে। শাস্ত্রের নামে দেশাচারের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছেন ইয়ং বেঙ্গলের মতো জাতি বা ধর্মকে নিন্দনীয় বলে ত্যাগ করে নয়, তাকে যুক্তি ও তর্কের পথে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা করে। বিধবা-বিবাহকে আইন-সিদ্ধ করে তোলার জন্যে যখন তিনি আন্দোলন আরম্ভ করলেন, আমরা দেখলাম, তখন রক্ষণশীল সমাজ নিশ্চেষ্ট হয়েছিল না—প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মধ্বজীদের কাছ থেকে বাধা পেয়েছিলেন তীব্র ভাবে; কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা এও দেখলাম যে, এই বজ্রকঠিন মানুষটিকে টলানোর মত কোন শক্তি তখন ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বুকে সঞ্চিত হয় নি। বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য তাঁর আন্দোলন অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আর ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে। তাই বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে, শহরে মাঠে ছড়িয়ে পড়েছিল বিদ্যাসাগর আর বিধবা-বিবাহের কথা। শান্তিপুরের তাঁতীরা শাড়ির পাড় বুনে অভিনন্দন জানিয়েছিল বিদ্যাসাগর আর বিধবা-বিবাহকে—হাজার নারীর নীরব কণ্ঠ সেদিন আশীর্বাদ জানিয়েছিল বিদ্যাসাগরকে।

বিদ্যাসাগর নিজে শতাধিক বিধবার বিয়ে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া, সে সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগেও অনেকগুলি বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বিধবার বিয়ে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হতেন না। কথিত আছে, অনেক ক্ষেত্রেই তিনি

পুনর্বিবাহিত দম্পতীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানেও তৎপর থাকতেন, তারা যাতে নিরুদ্বেগে সংসার-জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হয়, সেদিকেও বিদ্যাসাগরের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বহু ক্ষেত্রেই পুত্র হয়ত পিতার অমতে বিয়ে করল, পিতা-পুত্রে বিচ্ছেদ হলো, সেখানেও বিদ্যাসাগর এসে দাঁড়িয়েছেন। এইরকম একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মচরিতে। কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম উকীল শ্রীনাথ দাসের বড় ছেলে উপেন্দ্রনাথ দাস, প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর পিতার অমতে একটি বিধবাকে বিয়ে করেন। উপেন্দ্রনাথ গৃহ থেকে বিতাড়িত হলেন এবং টাকা পয়সার অভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে নানারকম অসুবিধায় পড়েন। এই উপেন্দ্রনাথের স্বভাব-চরিত্রের জন্য বিদ্যাসাগর নিজেও তাঁর ওপর বিরূপ ছিলেন। কিছুকাল বাদে তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হলেন। তারপরের ঘটনা শাস্ত্রী মহাশয় এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

"সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সদাশয়তার এক নিদর্শন পাই, তাহা স্মরণ রাখিবার যোগ্য। আমার বাড়িতে আসিয়া উপেনের পীড়া বৃদ্ধি পাইল। এমন কি তাহার জীবন সম্বন্ধে আমরা নিরাশ হইতে লাগিলাম। এই অবস্থাতে উপেন একদিন আমাকে বলিল, যদি আমার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে পার, বড় ভাল হয়। আমি বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচব না।...অবশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। আমি বলিলাম, আপনি বাপ-বেটায় দেখা করিয়ে না দিলে আর কারু দ্বারা হবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, মরণকালে বাপকে দেখতে চেয়েছে, শুভবুদ্ধি হয়েছে। দেখি, কিছু করতে পারি কি না। তৎপর দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় যে করিয়া শ্রীনাথ দাসকে আমার বাসাতে আনিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়।

"তাহার বিবরণ এই : সেইদিন প্রাতে সাতটার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের ভবনে গিয়া উপস্থিত। উপস্থিত হইয়া শ্রীনাথ বাবুকে বলিলেন, শ্রীনাথ! তোমার গাড়ি যুত্‌তে বলো দেখি, তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। শ্রীনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন জায়গায়? বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, আঃ চল না, রাস্তায় বলব। শ্রীনাথ বাবু গাড়ি যুতিতে আদেশ করিলেন। দুইজনে গাড়িতে বসিয়া শ্রীনাথ বাবুদের গলি হইতে বাহির

হইয়া বড় রাস্তায় আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, কোথায় নিয়ে যাচ্ছি জান? তোমার ছেলে উপেন পীড়িত হয়ে কাশী থেকে এসে এক বন্ধুর বাসায় উঠেছে। তার ব্যারাম বড় শক্ত, বাঁচে কি না সন্দেহ। সে মৃত্যুশয্যায় পড়ে তোমাকে দেখতে চেয়েছে। তাই তার বন্ধুর অনুরোধে তোমাকে নিতে এসেছি। এই কথা শুনিয়া শ্রীনাথ বাবু রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন, কোচম্যান গাড়ি ফেরাও। তাহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, গাড়ি থামাও, আমি নামব। কোচম্যান গাড়ি থামাইলে তিনি যখন নামিতে যান, তখন, শ্রীনাথ বাবু তাঁর হাত ধরিলেন—এ কি, তুমি নাম যে? বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, আমায় ছাড়, ছাড়! তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ বন্ধুতা। ছেলে যতই বিরাগভাজন হোক, সে মৃত্যুশয্যার পড়ে বাবাকে দেখতে চেয়েছে। তুমি কিরূপ বাপ যে এমন সময়েও দেখা দিতে চাও না! এই কথা শুনিয়া শ্রীনাথ বাবু ধীর হইয়া বসিলেন এবং কোচম্যানকে গাড়ি চালাইতে বলিলেন। ক্রমে তাঁহারা আমার বাড়িতে আসিলেন। পিতা-পুত্রে দেখা হইল। শ্রীনাথ বাবু পুত্রকে দেখিয়া চলিয়া গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে এই বিবরণ শুনিলাম।...শ্রীনাথ বাবু চলিয়া গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয় দাঁড়াইয়া আমাকে উপেনের আর্থিক অবস্থার বিষয় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাহার কপর্দক মাত্র সম্বল নাই শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমার হাতে ১৫০৲ টাকা দিয়া বলিয়া গেলেন, দেখিস. ওর স্ত্রী-পুত্র যেন ক্লেশ না পায়। টাকার অভাব হলে আমাকে বলিস। যাহার প্রতি এত জাতক্রোধ ছিলেন, তাহারই দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষে জলধারা পড়িল। কি দয়া!"

বিদ্যাসাগর-চরিত্রের কোমলতা ও হৃদয়বত্তা সম্বন্ধে এই রকম অজস্র দৃষ্টান্ত তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। তার বেশীর ভাগই আমরা পাই জনশ্রুতি ও কিম্বদন্তীর ভেতর দিয়ে। দুঃখের বিষয়, সেই সব জনশ্রুতিও সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত এবং লিপিবদ্ধ হয় নি। বাঙালীর সাগর-সন্ধান আজো তাই অসমাপ্ত। বিদ্যাসাগরের কোনো বস্‌ওয়েল ছিল না, থাকলে পরে সেই মহামানবের জীবনের অনেক ঘটনাই আমরা জানতে পারতাম। প্রসঙ্গতঃ আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পিতামহ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল দুর্গামোহন দাস বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় তাঁর

বালিকা বিমাতার বিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁর বড় ভাই কালীমোহন দাস এই বিয়ের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁর আপত্তি যখন প্রবল হয়ে উঠল, তখন দুর্গামোহন ব্যর্থ হয়ে বিদ্যাসাগরকে একখানা আক্ষেপপূর্ণ চিঠি লেখেন। বিধবা বিবাহের প্রবর্তনের চেষ্টা করতে করতে বিদ্যাসাগরকে প্রতিপদে বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলতে হয়েছে, কিন্তু তবুও তিনি হতাশ হন নি। তাই দুর্গামোহনকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদ্যাসাগর লিখলেন:
"...সাংসারিক বিষয়ের এইরূপই নিয়ম। সদভিপ্রায়সকল, সকল সময়ে সম্পন্ন হইয়া উঠে না। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' শুভকার্যের নানা বিঘ্ন।...যাহা হউক এই চেষ্টা বিফল হইয়াছে বলিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হইবেন না। কত বিষয়ে কত চেষ্টা, কত উদ্যোগ করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সে সকল সফল হইয়া উঠিবে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, যাহাদের অভিপ্রায় সৎ ও প্রশংসনীয় এরূপ লোক অতি বিরল এবং শুভ ও শ্রেয়স্কর বিষয়ে বাধা ও ব্যাঘাত জন্মাইবার লোক সহস্র সহস্র।"

এই বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে যাঁরা আন্তরিকভাবে বিদ্যাসাগরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সকলের আগে নাম করতে হয় রাজনারায়ণ বসুর। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন: "১৮৫১ সালে আমি মেদিনীপুরে যাই। ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন উঠে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বিধবাবিবাহ উচিত কি না', একটি ক্ষুদ্র চটী প্রকাশ করাতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। হিন্দুসমাজ-রূপ বিস্তীর্ণ হ্রদ স্থির ছিল, এই চটি বাহির হওয়াতে মহা আন্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে ও ভয়ানক তরঙ্গ সকল উঠাইতে থাকে। যাঁহারা এই আন্দোলন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই উহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হওয়াতে আন্দোলন আরো চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল। যেরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার পুস্তকে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা অতীব সন্তোষজনক। ... সমস্ত ইংরেজিওয়ালা বাঙালি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে ছিলেন। ...যেমন বিধবা-বিবাহ আইন করা হইল, অমনি কার্যারম্ভ হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্যের গতিকই এইরূপ। ... যেদিন বিবাহ হয় সেদিন কলিকাতায়

লোক এমন চমকিত হইয়াছিল যে যুগ উল্টানর ন্যায় একটা কি ভয়ানক ঘটনা হইতেছে। ...দ্বিতীয় বিবাহ পানিহাটির মধুসূদন ঘোষ করেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বিধবা-বিবাহ আমার জেঠতুতো ভাই দুর্গামোহন বসু ও আমার সহোদর মদনমোহন বসু করেন। এই বিধবা-বিবাহ দেওয়াতে আমার খুড়া মহাশয় বোড়াল হইতে আমাকে লিখেন যে, তোমার দ্বারা কায়স্থকুল হইতে বহিষ্কৃত হইলাম। দুর্গানারায়ণ যখন বিধবা-বিবাহ করিতে যাইতেছিলেন, তখন গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখুযোও তাঁহার পাল্কির ভিতরে মুখ দিয়া বলিলেন, দুর্গা তোর মনে এই ছিল, একেবারে মজালি। ...বোড়ালের লোক বলিয়াছিল যে রাজনারায়ণ বাবু গ্রামে আসিলে আমরা ইট মারিব।"

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, বয়সে ছোট হলেও বিদ্যাসাগর রাজনারায়ণের প্রতি চিরকাল শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। সে যুগের ইনিও একজন কৃতী সন্তান—একাধারে ইনি ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিজ্ঞ, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাগুরু ও ধর্মপ্রচারক। ডিরোজিওর প্রিয় ছাত্র, মধুসূদনের সুহৃদ ও সহপাঠী, 'ইয়ং বেঙ্গলের' কর্ণধার রাজনারায়ণ ছিলেন জাতীয়তার পিতামহ। তাঁর আদর্শ শিক্ষকতা, স্বজাতীয় সাহিত্য সাধনা, যশোলাভহীন দেশসেবা, শিশুসুলভ সরলতা ও উদার ধর্মপরায়ণতা বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের আন্তরিক সমর্থন ও পরম শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করেছিল। ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরের অনুরাগীদের মধ্যে অন্যতম এবং তাঁর সংস্কার-আন্দোলনের সমর্থনকারীদের মধ্যে প্রধানতম ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরেকজন মহাপ্রাণ বাঙালী-সন্তানের নাম করব। তিনি কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেব। বয়সে তিনি বিদ্যাসাগরের চেয়ে কিছু বড় ছিলেন। তাঁর বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন শিবচন্দ্র। তাঁর জীবনচরিতে আছে: "পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন এদেশে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, তখন তাঁহার বন্ধু, হিন্দুকলেজের অন্যতম প্রতিভাবান ছাত্র শিবচন্দ্রের নিকট এ বিষয়ে পূর্ণ সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিবচন্দ্র উক্ত সমাজ সংস্কারের প্রথম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তজ্জন্য কোন্নগরে কিছুকালের জন্য সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন।"

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের ঢেউ সেদিন প্রায় সমগ্র ভারতেই পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ পুস্তিকার মারাঠী ভাষায় অনুবাদ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল এবং কলকাতায় প্রথম বিধবা-বিবাহের ঠিক ছ বছর পরে মহারাষ্ট্রে প্রথম বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। একটি সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারে এক তরুণী বিধবার বিয়ে দিলেন মহারাষ্ট্রের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক জ্যোতিবা ফুলে। সে দেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রথম প্রবর্তকও তিনি। কলকাতায় বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হবার ঠিক এক বছর আগে তাঁরই প্রচেষ্টায় পুনা শহরে প্রথম বে-সরকারী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

বিধবা-বিবাহের চিন্তা যেন শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো হয়ে দাঁড়াল বিদ্যাসাগরের। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'মেন আই হ্যাভ সিন" বইতে এই প্রসঙ্গে একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ করেছেন। "আমার অন্যতম সহপাঠী যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ যখন বিপত্নীক হলেন, তখন তাঁর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করবার জন্যে পরামর্শ দিলেন। আমরা দুই বন্ধুতে মিলে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করলাম। বিধবা-বিবাহ বিষয়টি তখন আমাদের চিন্তার অনেকখানি জুড়ে ছিল। ঠিক হলো যোগেন একটি বিধবাকেই বিয়ে করবে। একটি মনোমত পাত্রীও পাওয়া গেল। তখন আমরা বিদ্যাসাগরের সাহায্য প্রার্থনা করলাম। তিনি শুধু টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেই ক্ষান্ত হলেন না, বিবাহ-সভায় স্বয়ং উপস্থিত থেকে বর-কনেকে আশীর্বাদ করলেন এবং বিবাহ-কার্য সমাধা করবার জন্যে একটি পুরুত পর্যন্ত ঠিক করে দিলেন। নিমন্ত্রিতদের খাওয়ার সমুদয় ব্যয় বহন করলেন এবং কনেকে মূল্যবান যৌতুকও দিলেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে তাঁর এক বন্ধু ছিলেন। সেই বন্ধুটি সঙ্গে করে তাঁর ন'দশ বছরের একটি মেয়েকে এনেছিলেন। কন্যার পিতা কন্যাকে বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করতে বললেন। মেয়েটি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে যখন প্রণাম করলো তখন বিদ্যাসাগর তাকে এই বলে আশীর্বাদ করলেন—'দীর্ঘ জীবন লাভ কর, ভালো বরে বিয়ে হোক এবং তারপর তুমি বিধবা হও, আমি তখন তোমার আবার বিয়ে দেবার সুযোগ পাব।' মেয়েটি এই কথা শুনে খুব হাসলো, বিদ্যাসাগরও সেই হাসিতে যোগ

দিলেন এবং বললেন তাঁর বন্ধু-কন্যারা যদি বৈধব্য অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাহলে কেমন করে তিনি তাঁর এই প্রিয় কাজ—পবিত্র ব্রতটি উদযাপন করবেন?"

বিধবা-বিবাহের আন্দোলনে বিদ্যাসাগরকে ঋণগ্রস্ত হতে হয়েছিল।
তিনি নিজে প্রায় শতাধিক বিয়ে দিয়েছিলেন এবং প্রত্যেকটি বিয়ে হিন্দু-পদ্ধতি অনুসারেই দিয়েছিলেন।
প্রত্যেকটি বিয়েতে কন্যাপক্ষে থাকতেন বিদ্যাসাগর এবং প্রত্যেকটি বিয়েই তিনি মহাসমারোহে সম্পন্ন করাতেন। কেউ যেন না বলে যে বিধবার বিয়ে, তাই যেমন তেমন করে সারা হলো। কথিত আছে, এক একটি বিয়েতে তিনি কম করে দশ হাজার টাকা করে খরচ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর একজন চরিতকার লিখেছেন: "তাঁহার সমারোহের ভাব সহজে সকলের বোধগম্য হইবে না। তিনি নিজে একখানি থান ধুতি পরিয়া একখানি মোটা চাদর গায়ে দিয়া নিতান্ত দীন ব্যক্তির ন্যায় অথবা একান্ত সংযমী পুরুষের মতো কালাতিপাত করিতেন, কিন্তু অন্যের বেলা ঠিক ইহার বিপরীত আচরণ করিতেন। বিধবা-বিবাহে কন্যাকে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া সম্প্রদানার্থে উপস্থিত করিতেন, এবং বিবাহ-সংসৃষ্ট অন্যান্য অনুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ আয়োজন জন্য অনেক টাকা খরচ করিতেন।"
গোড়ার দিকে এ ব্যাপারে অনেকেই তাঁকে সাহায্য করতে আরম্ভ করেছিলেন উৎসাহের ঝোঁকে, কিন্তু বাঙালির উৎসাহ উত্তেজনারই নামান্তর মাত্র, তাই আন্দোলন যেমন দানা বাঁধতে লাগল, তাঁদের অনেকেই এক এক করে অদৃশ্য হতে লাগলেন। সুতরাং ক্রমে সমগ্র ব্যয়ভার বিদ্যাসাগরেরই ওপরে এসে পড়ল। বন্ধুদের মধ্যে কেউ যদি বলতো—"দেশে এত লোক থাকতে, তুমি কেন একা এ কাজে অগ্রসর হলে?" উত্তরে বিদ্যাসাগর অমনি বলতেন, "কাজ যখন আরম্ভ করি, তখন কি একা ছিলাম?" কিন্তু সত্যিকারের পুরুষ-সিংহ ছিলেন বিদ্যাসাগর। সর্বস্বান্ত হয়েও তিনি পশ্চাদপদ হন নি। যে কাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তার গুরুত্ব ও আবশ্যকতা বুঝেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে কাজেই তিনি লিপ্ত ছিলেন।
এইখানেই বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব।
এইখানেই তাঁর অসাধারণত্ব।

এই আন্দোলনের অনেক বছর পরে একদিন। বিদ্যাসাগর তখন জীবন-সায়াহ্নে। স্যর গুরুদাসের মাতৃবিয়োগ হয়েছে। তিনি এসেছেন মাতৃশ্রাদ্ধে বিদ্যাসাগরকে নিমন্ত্রণ করতে। বিস্মিত বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করেন, বলো কি গুরুদাস, তোমার মায়ের শ্রাদ্ধে আমাকে নিমন্ত্রণ করছ ?

—আজ্ঞে মাতৃদেবী মৃত্যুর পূর্বে সেইরকম নির্দেশ আমাকে দিয়ে গেছেন।

—বলো কি, এতো আরো আশ্চর্যের ব্যাপার ; তোমার মা, রামকানাই ন্যায়বাচস্পতির মেয়ে, তিনি এই কথা বলে গেছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিই বরং মা-কে বলেছিলাম যে, তাঁর শ্রাদ্ধে আপনাকে নিমন্ত্রণ করলে, আর কোন ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধসভায় আসবেন না।

—ঠিক কথাই বলেছিলে। তাতে তোমার মা কি বলেছিলেন ?

—মা বলেছিলেন যে, আর কোন ব্রাহ্মণ আসুন বা না আসুন তাতে ক্ষতি নেই, বিদ্যাসাগর মশাই এলেই আমার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হবে জানিস আর আমার আত্মারও তৃপ্তি হবে।

বিদ্যাসাগর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ কখনো গ্রহণ করতেন না, শ্রাদ্ধের দানও নিতেন না। কিন্তু এই নিমন্ত্রণ তিনি স্বীকার করেছিলেন এবং স্যর গুরুদাসের মাতৃশ্রাদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং রূপার একটি গেলাস শ্রাদ্ধের দান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। না গিয়ে পারেন নি, কারণ এর মধ্যে তিনি বিধবা-বিবাহের স্বপথে এক নিষ্ঠাবতী হিন্দুবিধবার অন্তরের অনুভূতির পরিচয় পেয়েছিলেন। গুরুদাসের মায়ের এই কথা শুনে তিনি আনন্দ বোধ করেছিলেন এবং বন্ধুদের বলতেন—বিধবা-বিবাহের আন্দোলন আমার সার্থক।

বাংলাদেশে মুষ্টিমেয় যে কয়জন মহাপুরুষের মাতৃভাগ্য স্মরণ করবার যোগ্য, স্যর গুরুদাস তাঁদেরই একজন। বিদ্যাসাগর যেমন মায়ের মত মা পেয়েছিলেন, তেমনি মা পেয়েছিলেন স্যর গুরুদাস। তাঁর মা সোনামণি দেবী উনবিংশ শতকের বাংলার মহীয়সীদের মধ্যে অন্যতমা। গুরুদাস তাঁর একমাত্র পুত্র এবং আড়াই বছরের ছেলেকে নিয়ে তিনি বিধবা হন। জীবনের সুদীর্ঘ কাল আদর্শ বৈধব্যজীবন যাপন করেছিলেন বলেই না সোনামণি দেবী হিন্দুর সংসারে বালবিধবার দুঃখ বিশেষভাবে বুঝতেন। তাই তিনি বিদ্যাসাগরের এই সংস্কার-আন্দোলনকে এইভাবে সমর্থন জানিয়ে

গেলেন জীবনের শেষ যাত্রার সময়। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে মায়ের অন্তিম আদেশ অমান্য করা সম্ভব হয় নি। গুরুদাসের এই মাতৃভক্তি দেখে বিদ্যাসাগরও মুগ্ধ হয়েছিলেন। বলতেন, মা তো গুরুদাসের মা আর মাতৃভক্ত ছেলে তো গুরুদাস।

বিদ্যাসাগরের এই সংস্কার-আন্দোলন বাঙালিকে সংস্কার-মুক্তির পথে অগ্রসর হতে সেদিন অনেকখানি সহায়তা করেছিল। বিধবা-বিবাহ আইনের ষোল বছরের মধ্যেই এলো হিন্দুবিবাহের বিশেষ আইন। এর পেছনে ছিল কেশবচন্দ্রের উদ্যম। দেশশুদ্ধ বালবিধবাদের বিয়ে হয়ে যায়নি সত্য, বা এই আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়নি, কিন্তু সমাজকে যেভাবে গতিশীল করে দিয়ে গেল, নিঃসাড় হিন্দুসমাজকে যেভাবে ধাক্কা দিয়ে গেল, তার মূল্য কি কম? বিদ্যাসাগরের যুগেও আমরা কি দেখেছি? সেই গতানুগতিক শাস্ত্রচিন্তার অবসন্ন স্রোত কোনক্রমে চিরন্তন পথ বয়ে চলেছে; এমন সময়ে বিদ্যাসাগর তাঁর প্রদীপ্ত মনীষা আর অখণ্ডনীয় যুক্তির সাহায্যে প্রাচীন ধারাকে এত স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত করলেন। এখানে দেখতে পাই বিদ্যাসাগর যেন বাংলার দ্বিতীয় জীমূতবাহন। নারীর ধনাধিকার প্রতিষ্ঠায় ও বিধবার উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় জীমূতবাহনের স্বাধীন মত সে যুগের সমাজের পক্ষে খুবই অসামান্য ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলায় অনাথা বিধবার ধনাধিকার সমর্থনে জীমূতবাহনের উদ্যম তাঁর অতুলনীয় কীর্তি। তাঁর 'দায়ভাগ' বাংলার বিধবাদের জীবনে এনে দিয়েছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমরা বিদ্যাসাগরের মধ্যে পাই সেই বলিষ্ঠ ধীশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য আর উদার মনোবৃত্তি—সেই সংস্কার-প্রয়াসী বৈদগ্ধ্যের অপূর্ব সংযোগ।

আজ শতবর্ষের ব্যবধানে এই আন্দোলনের প্রকৃতি আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্তিকে গ্রহণ করলেন। শাস্ত্রকেও যুক্তিসঙ্গত করবার চেষ্টা করলেন। এক হাতে শাস্ত্র এবং অন্য হাতে যুক্তি নিয়ে তিনি সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন রামমোহনের দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে। তারপর যখন শাস্ত্রে কুলোয় না, তখন আইনের

সাহায্য গ্রহণ করলেন। কিন্তু আইন দিয়ে মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা যায় না। বিধবা-বিবাহ আইন হলো, কিন্তু বাংলার হিন্দুসমাজের মানসিক পরিবর্তন পুরোপুরি আমরা দেখতে পেলাম কি? একজন আশুতোষ তাঁর বিধবা মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করলেন, কিন্তু সমাজের এক বৃহৎ অংশই এ বিষয়ে অবশ, অনড়, অচল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীতে এই প্রসঙ্গে যথার্থই লিখেছেন: "এই বিধবা-বিবাহ আন্দোলন বিশাল হিন্দু-সমাজের উপর বিশেষ কোন রেখাপাত করতে পারে নি। আমার পিতামহ ছিলেন এর বিরুদ্ধে, পিতা স্বপক্ষে। গোঁড়ামিরই জয় হয়েছিল শেষ পর্যন্ত এবং বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের প্রবর্তককে নৈরাশ্যের বেদনা বুকে নিয়েই মরতে হয়েছিল—প্রাগ্রসর মানুষদের জীবনে এই-ই ঘটে থাকে। বিদ্যাসাগর তাঁর পরবর্তী বংশধরদের জন্যে এই দায় রেখে গেছেন—এ কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।"

আজ শতবর্ষের ব্যবধানে সেই আন্দোলনের প্রবর্তক ও পরিচালক সেই সিংহবীর্য ও পৌরুষের প্রচণ্ড অবতার বিদ্যাসাগরের কথা যখনই চিন্তা করি তখনই আমাদের মনে হয়: "সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বাধীন, একক একজন মানুষ এই সাতকোটি বাঙালির মধ্যে হঠাৎ একদিন অভ্রভেদী পর্বতের মতো গর্বিত শির লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার মুখের কথায় সত্যই আমরা ভয় পাইলাম। দূরে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহাকে সহ্য করিবার মত ক্ষমতা আমাদের ছিল না, আজিও নাই। ··· আমরা তাঁহার কথা—তাঁহার ব্যথা বুঝিলাম না। সমুন্নত গর্বিত শির লইয়া জীবনের কঙ্করময় পথে সিংহ একাই চলিয়া গেলেন। কেহ তাঁহার সঙ্গী হইল না। বঙ্গ-বিধবার কত জন্মজন্মান্তরের শোকাশ্রু, যাহা কেহ চাহিয়া দেখে নাই, তাহা তাঁহারই পঞ্জরাস্থির মধ্যে সঞ্চিত হইয়া একদিন তাঁহারই বুক ফাটাইয়া দিয়া ঋষিকেশের গঙ্গার মত বিরাট প্লাবনে বাংলাদেশের উপর দিয়া বহিয়া গর্জিয়া চলিয়া গেল।"

সেই গর্জন আমরা আবার কবে শুনব?

॥ উনিশ ॥

বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে সমগ্র দেশ যখন আলোড়িত, ঠিক সেই সময়ে সিপাহী বিদ্রোহের দাবানল জলে উঠল। আন্দোলন কিছু দিনের জন্য স্থগিত থাকল। বৎসরাধিক কাল পরে যখন সমস্ত দেশ স্থির ও শান্তভাব ধারণ করল, বিদ্যাসাগর আবার নতুন উদ্যমে বিধবা বিবাহের আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বিদ্যাসাগরের নিজের জীবনে এক দারুণ বিপর্যয় ঘটে গেল। তিনি ইনস্পেক্টর ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কাজে ইস্তফা দিলেন—সে কাহিনী আগেই বলেছি। হ্যালিডে তখন বাংলার ছোট লাট। তিনি বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন, যদি পণ্ডিত তাঁর পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর অটল, অচল। যাকে তিনি হাতে করে কাজ শিখিয়েছেন, সেই ইয়ং সাহেবই তাঁর সকল কাজের বিরোধী এবং প্রতিবাদী, অথচ তার প্রতীকারের আর পথ নেই। তাই হ্যালিডের অনুরোধ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। যেদিন ছোটলাট তাঁকে শেষবারের মতো ডেকে পাঠালেন, তখন মর্মবেদনার প্রচণ্ড উগ্রতাপে জর্জরিত বিদ্যাসাগর তাঁকে স্পষ্টই বললেন—"সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছি; আর ফিরিবার পথ দেখিনা—ক্ষমা করুন। আমি আর চাকুরী করিব না।"

এইভাবে বিদ্যাসাগর পাঁচশো টাকা মাইনের দুর্লভ চাকরি এক কথায় ছেড়ে দিলেন।

ছেড়ে দিলেন জীবনের এক অত্যন্ত সঙ্কট সময়ে।

আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই বললো—চলবে কিসে?

বিদ্যাসাগর হেসে উত্তর দিলেন—"আমার কাছে সম্ভ্রমই বড়, চাকরি নয়। চলবার কথা বলছ? এর আগে যখন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগ করেছিলাম, তখন আমার কি ছিল? এখন তবু বইয়ের আয় আছে।

কিন্তু প্রকৃত দুশ্চিন্তা তাঁর নিজের জন্য ছিল না। একটা বিরাট সংস্কার-কাজে তখন তিনি হাত দিয়েছেন। সে কাজ তাঁকে চালিয়ে যেতেই হবে। সিপাহী যুদ্ধের অবসান ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘটল। আরম্ভ হলো মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন। সেক্রেটারি স্যর সিসিল বিডন বিদ্যাসাগরের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি মহারাণীর ঘোষণাপত্র বাংলায় অনুবাদ করাবার জন্য বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠালেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, মহারাণীর ঘোষণার ঠিক একমাস আগে বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন।

এই পদত্যাগ-প্রসঙ্গে আর একটু কথা বলার আছে। পরবর্তী কালে একদিন কথায় কথায় শিবনাথ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এত বড় একটা চাকরী আপনি যে সেদিন এক কথায় ছেড়ে দিয়েছিলেন, তার সত্যিকারের প্রেরণা কে জুগিয়েছিল আপনাকে? বিদ্যাসাগর বললেন, গিরিশও (গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন) আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। গিরিশকে যা জবাব দিয়েছিলাম, তোকেও সেটা বলি। অনেকে মনে করে আমার চাকরী ছাড়ার ব্যাপারটা পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রভাবের ফল। এটা ঠিক কথা নয়। আমার আগে বুনো-রামনাথ এই রকম তো বারংবার দেখিয়েছিলেন। বুনো রামনাথের গল্প জানিস তো? শিবনাথ বললেন, কিছু কিছু জানি।

কৃষ্ণনগরের মহারাজা শিবচন্দ্র বুনো-রামনাথকে তাঁর বেতনভুক্ সভাপণ্ডিত করতে প্রয়াসী হয়ে, তাঁর কাছে যে রকম গঞ্জনা পেয়েছিলেন, তাতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রাচীন সাত্বিক আদর্শ সকলের চক্ষে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই 'বুনোকে' কলকাতার মহারাজা নবকৃষ্ণ প্রমুখ বিখ্যাত ধনী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি বহু অর্থ-সম্পদের লোভ দেখিয়ে একবার কলকাতায় আনতে চেষ্টা করে ভৎসিত হয়েছিলেন। তিনি কখনো এক কপর্দকও দান গ্রহণ করতেন

না, অথচ সেদিনের নদীয়া তথা সমগ্র বাংলার যা কিছু গৌরব তা ছিল এঁরই পাণ্ডিত্যের জন্যে। এমন কি, কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়-বাসী পণ্ডিতেরা 'বুনোর' অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতেন। বিদ্যাসাগর নিজে এই ঘটনার উল্লেখ করে বলতেন—সামান্য তণ্ডুল ও তিন্তিড়ী বৃক্ষের পাতার ঝোল আহার করে তৃপ্তির সঙ্গে জীবন কাটিয়ে দেওয়া—এ কি কম তেজের কথা। আমার চাকরি ছাড়ার সময়ে এই বুনো রামনাথের আদর্শই আমার সম্মুখে ছিল।

বুনো-রামনাথের প্রসঙ্গে আর একজন ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়ে। ইনি পণ্ডিত গর্গ। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পণ্ডিত-প্রবর মহামনা বৃদ্ধ গর্গ শৈশব কাল থেকে চণ্ডাল গৃহে পালিত জাতিচ্যুত এক ব্রাহ্মণকুমারকে সমাজে তুলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। যখন পাঁচ বছরের ছেলে তার চণ্ডালিনী ধর্ম-মায়ের শ্মশানে তিন দিন পর্যন্ত অনাহারে পড়ে থেকে আর্তনাদ করছিল এবং ব্রাহ্মণদের তো কথাই নেই, অপরাপর বর্ণের হিন্দুরাও এই অস্পৃশ্য বালকের ছায়া মাড়াতে স্বীকৃত হন নি—তখন সর্বশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ কুলোজ্জ্বল, ঋষিতুল্য গর্গ নিজের নামাবলী দিয়ে চণ্ডালিনীর চিতা-ধূলি-ধূসর এই বালকের গা মুছিয়ে তাকে কোলে করে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। বালক যখন তাঁর কৃপায় শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল, গর্গ তাকে সমাজে তুলতে গিয়ে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন।

কে জানে, বিদ্যাসাগর এই গর্গ আর বুনো-রামনাথের কাহিনীর মধ্যে জ্বলন্ত ব্রাহ্মণ্য তেজের শিখা দেখতে পেয়েছিলেন এবং বিলায়মান সেই ব্রাহ্মণ্য তেজের শিখাকেই তিনি তাঁর চরিত্রের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির সামনে সেদিন নতুন করে তুলে ধরেছিলেন।

বিদ্যাসাগর এখন স্বাধীন, সরকারী কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত।

কিন্তু এক বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের মধ্যে তিনি এমনভাবে জড়িয়ে পড়লেন যে, তাঁর ঋণের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। কোন এক সময়ে তিনি তাঁর বন্ধু দুর্গাচরণ ডাক্তারের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে ছিলেন এই বিধবা-বিবাহের ব্যাপারেই। কিছুকাল বাদে অর্থাভাবে বিপন্ন হয়ে দুর্গাচরণ যখন টাকা চেয়ে পাঠালেন, তখন বিদ্যাসাগর নিজেই ঋণভারে

বিপন্ন। দুর্গাচরণের চিঠির উত্তরে তিনি লিখলেন: "আমি ক্রমাগত কয়েক দিনই চেষ্টা দেখিলাম, কিন্তু উপায় করিতে পারিলাম না। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার টাকা লই নাই। বিধবা-বিবাহের ব্যয় নির্বাহার্থে লইয়াছিলাম। কেবল তোমার নিকট নহে, অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এই সকল টাকা এই ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবা-বিবাহ পক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহায্য দান অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্য দানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। উত্তরোত্তর এ বিষয়ের ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু আয় ক্রমে খর্ব হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং আমি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি।...যাহা হউক আমি এই ঋণ পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি। অন্য উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন সর্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে তোমার প্রয়োজনের সময়ে দিতে পারিলাম না, এজন্য অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবা-বিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।"

এই চিঠিতে মাত্র দুটি কথায় বিদ্যাসাগর যেভাবে বাঙালি-চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন তার তুলনা নেই। অসার ও অপদার্থ—এই ধিক্কারবাণী আজকের দিনেও প্রযোজ্য। সত্যই, যাকে বলে গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া, বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটেছিল। বহু লোক তাঁকে অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, পরে বেমালুম পৃষ্ঠভঙ্গ করেন। বিদ্যাসাগর এই রকম অনেকেরই প্রতিশ্রুতির ওপর যথেষ্ট আশা স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাদের বিপরীত আচরণ দেখে যারপর নাই বিস্মিত ও মর্মাহত হয়েই না বললেন—অসার ও অপদার্থ! অথচ তিনি নিজে ঋণ করে, ঋণশোধ দিয়ে এবং আবার ঋণ করে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কৃষ্ণনগরের ভূতপূর্ব মহারাজার কাছ থেকে যে আঠার শো টাকা তিনি বিধবাবিবাহের জন্য এক সময়ে ধার নিয়েছিলেন, তাঁর পুত্র সতীশচন্দ্রকে তিনি যথাসময়ে সেই টাকা পরিশোধ করেন। কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্বজ্ঞানের এমন দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল।

সংস্কৃত কলেজের চাকরী ছেড়ে দেবার পর অনেকে পরামর্শ দিলেন ওকালতী করতে। স্যার জেমস্ কলভিন সাহেব তখন কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক। তিনিও তাঁকে ঐ পরামর্শ দিলেন। এই সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের একটি বৃত্তান্ত থেকে জানতে পারা যায় যে, উকীল হওয়া যুক্তিসঙ্গত কি না সেটা স্থির করবার জন্যে বিদ্যাসাগর প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যাবেলায় দ্বারকানাথ মিত্রের বাড়িতে যেতেন। দ্বারিকানাথ তখন বড়ো উকীল। পরবর্ত্তী কালে ইনিই হাইকোর্টের জজ হন। বিদ্যাসাগর যে সময়ে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতল গৃহে বাস করতেন, সেই সময়েই দ্বারকানাথ মিত্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। দ্বারকানাথ মিত্রের সহপাঠী দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য তাঁকে সঙ্গে করে একবার বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম আলাপেই বিদ্যাসাগর মুগ্ধ হয়েছিলেন। কথিত আছে, "নব্য মিত্র মহাশয়কে বিদায় দিয়া বিদ্যাসাগর দ্বারিক বাবুকে বলিয়াছিলেন, 'এ কা'কে এনেছিলে হে, এ ছেলে চোখেমুখে কথা কয়, আমাকে থ করিয়া দিল। আমি ত জানিতাম যেখানে আমি সেখানে আর কেহ কথা কহিতে পারে না। এ যে আমার উপর যায়।' এই সময় হইতে দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত তাঁহার আত্মীয়তার সূত্রপাত হয়।" সাত বছর ধরে ইনি হাইকোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময়ে দ্বারকানাথ যে রকম তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তর্কশক্তি ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা কেবল বাঙালির পক্ষে কেন, অনেক ইংরেজ বিচারপতির পক্ষেও দুর্লভ। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর সতেরো বছর আগে মাত্র আটত্রিশ বৎসর বয়সে দ্বারকানাথ পরলোক গমন করেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন।

দ্বারকানাথ মিত্রের বাড়িতে এসে বিদ্যাসাগরের উকীলের পেশার চিত্র প্রত্যক্ষ করেন। "দেখিয়া শুনিয়া ওকালতী কর্মে তাঁহার ঘৃণা জন্মে। পরে তিনি কলভিন সাহেবকে গিয়া আপনার অভিমত প্রকাশ করেন।" যাই হোক শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের ওকালতী করা হলো না। মক্কেলদের কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তিনি পড়াশুনা করবার সময় পাবেন না, সম্ভবত এই আশঙ্কাতেই বিদ্যাসাগর আইন ব্যবসায়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন নি।

এই সময়ে বিদ্যাসাগরের পিতামহীর মৃত্যু হলো।

সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করবেন, দুর্গাদেবী এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কৃতী পৌত্র বিদ্যাসাগর ঠাকুমা'র সেই অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে তাঁকে বীরসিংহ থেকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। এখানে গঙ্গার তীরে, সালকের ঘাটে একখানা ঘর ভাড়া করা হলো তাঁর জন্যে। বৃদ্ধা কুড়ি দিন গঙ্গাজল মাত্র পান করে বেঁচে ছিলেন। বিদ্যাসাগর সাড়ম্বরে বীরসিংহ গ্রামে পিতামহীর শ্রাদ্ধ করলেন। বইয়ের আয় ছিল বটে, কিন্তু দেনাও ছিল বিস্তর। কেননা, সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দিলেও, দানের তো ত্রুটি ছিল না। তাই পিতামহীর শ্রাদ্ধ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর ঋণ করতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করলেন না। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, বিধবা-বিবাহ আন্দোলন উপলক্ষে কলকাতার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের এক শ্রেণীর লোক বিদ্যাসাগরের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং এই সামাজিক কাজে তাঁরাই শত্রুতা করেছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য হন নি। এই প্রসঙ্গে শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন: "শ্রাদ্ধোপলক্ষে এ প্রদেশের বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের সমাগম হইয়াছিল। অনেকে মনে করিয়াছিল, বিদ্যাসাগরের পিতামহীর শ্রাদ্ধে কোনও ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে আসিবে না; তাহা হইলেই পিতৃদেব মনোদুঃখে দেশত্যাগী হইবেন। যাহারা এরূপ মনে করিয়াছিল তাহারা অতি নির্বোধ। স্বগ্রামে তিনি সাধারণের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এবম্বিধ লোকের পিতামহীর শ্রাদ্ধে কেমন করিয়া শত্রুপক্ষ বিঘ্ন জন্মাইতে পারে?"

পিতামহীর মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর খুবই শোক পেয়েছিলেন, কারণ পিতামহী তাঁর এই পৌত্রটিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন; তিনিও পিতামহীকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বালক বিদ্যাসাগর যখন কলকাতায় পড়তে এসে অসুস্থ হন, তখন দুর্গাদেবীই বীরসিংহ থেকে ছুটে এসে পৌত্রের সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার লিখেছেন যে, "বিদ্যাসাগর মহাশয় যা কিছু আদর-আব্দার তাঁহারই নিকট করিতেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে এতই ভালবাসিতেন যে, কোনও গুরুতর বিষয়ে অবাধ্য হইলেও, তিনি বিদ্যাসাগরের উপর রাগ করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বংশের নিয়ম ছিল—পিতা, মাতা, পিতামহ বা

পিতামহী, মন্ত্র-দীক্ষা দিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা পুত্রকে দুই একবার মন্ত্র দিবার প্রস্তাব করিয়া, বড় সুবিধা বিবেচনা করেন নাই ; সুতরাং তিনি সে বিষয়ে ক্ষান্ত হয়েন। পরে তাঁহার জননী বিদ্যাসাগরকে মন্ত্র দিবার প্রস্তাব করেন। বিদ্যাসাগর বিবেচনা করিয়া লইব বলিয়া স্বীকার করেন। একদিন পিতামহী পীড়াপীড়ি করাতে, বিদ্যাসাগর মহাশয় মন্ত্রগ্রহণের একান্ত অব্যাহতি নাই ভাবিয়া পিতামহীকে নানা যুক্তি প্রদর্শন করিবার প্রয়াস পান। মন্ত্রগ্রহণে বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা বা মত নাই বুঝিয়া, পিতামহী আর মন্ত্র লইবার কথা বলেন নাই।"

এই ঘটনাটি সাগর-চরিত্রের একটি বিশেষ দিকের ওপর আলোকসম্পাত করে।

মন্ত্রগ্রহণ তো তিনি করেনই নি, এমন কি ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম সন্ধ্যা-আহ্নিকেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। নিজে এসব বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু অপরের বিশ্বাসে কখনো আঘাত দিতেন না, কাউকে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে দেখলে, তিনি নাসিকা সঙ্কুচিত করতেন না। নিজের পরিবারের কাউকে তিনি এসব বিষয়ে নিষেধও করতেন না। ব্রত-স্বস্ত্যয়নের বিধান নিতে যদি কেউ কখনো বিদ্যাসাগরের কাছে আসতো, তিনি বাধা দিতেন না। সন্ধ্যা-আহ্নিক আচারানুষ্ঠানে বিরত থাকলেও, হিন্দুর আচার-সম্মত খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর অনেকটা বিচার করতেন। রোস্ট-গোস্তভোজী অনেকে তাঁর বন্ধুত্ব লাভ করলেও, তাঁকে নিমন্ত্রণ করে, তাঁরা কখনো তাঁদের বাড়িতে খাওয়াতে পারতেন না। ইংরেজ মহলে খাতির ছিল, লাট-দরবারে খাতির ছিল। কিন্তু তাই বলে কোথাও তিনি জলস্পর্শ করেছেন, এমন কথা তাঁর কোন চরিতকারই লিপিবদ্ধ করেন নি। একে গোঁড়ামি বলব না, বলব তাঁর স্বধর্মনিষ্ঠা। হেমচন্দ্র হাজার বার বিদ্যাসাগরকে 'ইংরেজির ঘিয়ে-ভাজা সংস্কৃত ডিস্' বলে শ্লেষ করুন না কেন, ব্রাহ্মণোচিত নিষ্ঠা পালনে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। এই নিষ্ঠা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁর আধুনিকতা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। অথচ এই মানুষই আবার মুদী দোকানে বসে স্বচ্ছন্দে তামাক খেতেন।

এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেই বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর স্বাধীন ব্যবসায়ে লিপ্ত হলেন।

ছাপাখানার ব্যবসা এবং পুস্তক প্রকাশের ব্যবসা।

পুস্তক ব্যবসায়ে লিপ্ত আজকের বহু বাঙালি প্রকাশক বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিক্ষা করতে পারেন। তাঁর জীবনের এই অধ্যায়টি সম্পর্কে তাই একটু বিস্তারিত ভাবেই আলোচনা করব। বিদ্যাসাগরের সকল কাজের সফলতার মূলে ছিল হৃদয়ের অনুরাগ। যখন যে কাজে হাত দিতেন তখন হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগটুকু তিনি তার ওপর ঢেলে দিতেন। পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরিতে ইস্তফা দেবার সময়ে বিদ্যাসাগর ইয়ং সাহেবকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "আমি যাঁহাদিগের অধীনে কর্ম করি, তাঁহাদিগের নিকট এ কথা গোপন করিতে পারি না যে, যে কাজ আমি করিতেছি, তাহাতে আর আমার হৃদয়ের অনুরাগ নাই। এই অনুরাগের অভাবে আমার কার্যকুশলতারও অভাব ঘটিবে।" এই অনুরাগের অভাব বোধ করেছিলেন বলেই বিদ্যাসাগর মন্ত্র-গ্রহণ ব্যাপারে পিতা, মাতা এবং পিতামহীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি। এই অনুরাগই ছিল তাঁর সমস্ত কর্মের মূল প্রেরণা; এই অনুরাগকে আশ্রয় করেই আবর্তিত হতো তাঁর সমস্ত ভাবনা-চিন্তা। বিদ্যাসাগরের আর একটি বিশেষ গুণ ছিল—যোগ্য লোক খুঁজে নেবার ক্ষমতা। কোন্ লোককে কোন্ কাজের ভার দিলে কি রকম কাজ হবার সম্ভাবনা—এ তিনি বেশ বুঝতেন এবং কিরূপ উপযুক্ত লোককে কত টাকা বেতন দিলে, ভাল দেখায়, এও তিনি বিলক্ষণ বুঝতেন। আর বিশ্বাসী লোকের ওপর তাঁর ছিল ষোল আনা নির্ভর—এটি তাঁর চরিত্রের গুণ বা দোষ বলা যায়। সংস্কৃত যন্ত্র নাম দিয়ে তিনি ছাপাখানা আগেই আরম্ভ করেছিলেন।

সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবার প্রায় এগার বছর আগে বিদ্যাসাগর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগে, সংস্কৃত প্রেস স্থাপন করেন; সঙ্গে সঙ্গে বই বেচা-কেনার জন্য সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী চালাতে থাকেন। প্রেসে যে সব বই ছাপা হতো, ডিপজিটরীতে বিক্রীর জন্যে সেই সব বই মজুত থাকতো। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর নিজেই বলেছেন, "যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত ছিলাম, তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানায় তিনি ও আমি সমাংশভাগী ছিলাম।" কথিত আছে, বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধু নীলমাধব

মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে দু'শো টাকা ধার করে একটি প্রেস কেনেন। সময় মত এই দেনা পরিশোধ করতে না পেরে বিদ্যাসাগর বড়ো বিব্রত হন। তখন মার্শাল সাহেবের পরামর্শে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের একটি ভালো সংস্করণ তিনি প্রকাশ করেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে এই বইয়ের দুশো কপি কেনা হয়। এই ভাবে বিদ্যাসাগর প্রেসের ঋণ পরিশোধ করেছিলেন। কৃষ্ণনগরের রাজবাটী থেকে তিনি পুরাতন ও মূল অন্নদামঙ্গল আনিয়ে তারই নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন।

প্রেস ভালই চলতে লাগল। এমন সময়ে শারীরিক অসুস্থতার জন্যে তর্কালঙ্কারকে কলকাতা ছাড়তে হয়। অবশেষে দুজনের মধ্যে সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে দেখা দিল মনোমালিন্য। বিদ্যাসাগর নিজেই বলেছেন: "ক্রমে ক্রমে এরূপ কতকগুলি কারণ উপস্থিত হইল যে, তর্কালঙ্কারের সহিত কোন বিষয়ে সংস্রব রাখা উচিত নহে। এজন্য পটলডাঙানিবাসী বাবু শ্যামাচরণ দে দ্বারা তর্কালঙ্কারের নিকট এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাই, হয় তিনি আমার প্রাপ্য আমায় দিয়া ছাপাখানার সম্পর্ক ছাড়িয়া দিউন, না হয় তাঁহার প্রাপ্য বুঝিয়া লইয়া ছাপাখানার সম্পর্ক ছাড়িয়া দিউন, অথবা উভয়ে ছাপাখানার যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া লইয়া যাউক। তদনুসারে তিনি আপন প্রাপ্য লইয়া, ছাপাখানার সম্পর্ক ত্যাগ স্থির করেন।" তারপর সালিশি নিযুক্ত হয় এবং খাতাপত্র দেখে, হিসাব-নিকাশ ও দেনাপাওনার মীমাংসা হয়। তখন থেকে বিদ্যাসাগর প্রেসের সমগ্র স্বত্বের অধিকারী হলেন এবং প্রেসের কাজ নিজের পছন্দ মতো চালাতে লাগলেন।

কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট নামে যে রাস্তাটি আছে, তা এই শ্যামাচরণ দে-র স্মৃতিকেই জাগিয়ে রেখেছে। সংস্কৃত কলেজের ঠিক সামনেই এঁর বাড়ি ছিল। বিদ্যাসাগরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ইনি। শ্যামাচরণ দে-র বাড়ির বৈঠকখানায় অধ্যক্ষ জীবনে কলেজের কাজের পর এবং তারপরেও বিদ্যাসাগর প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় আসতেন। পাশা ও দাবা খেলা হতো সেখানে। দে-বাবুর মজলিশ তখনকার কলকাতায় একটি বিখ্যাত মজলিশ ছিল। সংস্কৃত কলেজের প্রবীণ ও তরুণ অধ্যাপকেরাই এই মজলিশের সভ্য ছিলেন। মাইকেল, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি কখনো কখনো এখানে আসতেন।

স্বনামখ্যাত কাউয়েল সাহেবও মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ডক্টর জি. বি. কাউয়েলের মতো সুপণ্ডিত, বিনয়ী ও বাঙালি-হিতৈষী ইংরেজ খুব কমই এদেশে এসেছেন। একই সঙ্গে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। বহু টাকা আয় করলেও তাঁর অশন-বসন দরিদ্রের ন্যায় সাদাসিধা রকমের ছিল। তিনি বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং কলেজের পরিচালনা সম্পর্কে অনেক বিষয়ে অনেক সময়ে তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলোচনা করতেন। বিদ্যাসাগরও এই স্বভাব-বিনয়ী সুপণ্ডিত ইংরেজের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শ্যামাচরণ দে মহাশয়ের বৈঠকখানায় কাউয়েল সাহেব প্রধানত বিদ্যাসাগরের সঙ্গেই দেখা করতে আসতেন। সংস্কৃত কলেজের ভবিষ্যৎ অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নও এখানে আসতেন। কাউয়েল সাহেব এঁরই কাছে সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন।

এই প্রেস ও বইয়ের দোকানে অনেকগুলি লোক প্রতিপালিত হতো। কিন্তু যোগ্য লোকের অভাবে ছাপাখানা ও দোকানে বিশৃঙ্খলা ও হিসাবপত্রের যথেষ্ট গোলমাল হতে লাগল। তাঁর দৃষ্টি পড়ল রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ওপর। তিনি শুধু তাঁর যৌবনের বন্ধু নন, খুব কাজের লোকও ছিলেন তিনি। রাজকৃষ্ণ তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আশী টাকা মাইনের একটা চাকরি করতেন। বিদ্যাসাগর একদিন তাঁকে ডেকে বললেন, রাজকৃষ্ণ, চাকরি ছেড়ে আমার প্রেস আর বইয়ের দোকানটা দেখাশুনা কর, আমি তোমার ওপর এই ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। বিদ্যাসাগরের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল রাজকৃষ্ণের। তিনি তাই করলেন। তবে একেবারেই চাকরি ত্যাগ করলেন না, ছ মাসের ছুটী নিলেন। রাজকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে প্রেস ও বইয়ের দোকান সুশৃঙ্খলার সঙ্গেই চলতে লাগল। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের এক চরিত-কার লিখেছেন: "এই ছয় মাসের মধ্যে অসীম অধ্যবসায় সহকারে কার্য নির্বাহ করিয়া, তিনি ডিপজিটরীর সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খলতা করেন। তখন হিসাবপত্রও এরূপ সুশৃঙ্খল হইয়াছিল যে, আবশ্যক মত সকল সময়ে আয়-ব্যয়ের অবস্থা জানিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হইত না। ...অগত্যা রাজকৃষ্ণ বাবু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং ডিপজিটরীরই কার্যে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হন।

এ কার্যে তাঁহার বেতন দেড়শত টাকা হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সৌভাগ্য এবং রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রগাঢ় যত্নে প্রেস ও ডিপজিটরীর কার্য সবিশেষ সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত হইয়া অনেকটা লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।”

কিন্তু পরের উপকার করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে তাঁর এই প্রেসটি বিক্রী করতে হয়েছিল। সে কাহিনী পরে বলবো। যাই হোক, দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়ায় এবং রাজকৃষ্ণ বাবুর দক্ষ তত্ত্বাবধানের জন্যে ব্যবসাটি রীতিমত লাভজনক হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের স্বরচিত পুস্তক বিক্রয়ের আয় তখন মাসিক তিন-চার হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছিল। তাই চাকরির মোটা আয় কমে যাওয়াতে তিনি বিশেষ বিচলিত হন নি।

বিদ্যাসাগর কেন প্রেসের ও বই-বেচার ব্যবসা করতে গেলেন? পাঠ্যপুস্তক লেখা ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করাই তিনি শিক্ষাবিস্তারের পক্ষে যথেষ্ট মনে করতেন না। সেই সব বই যাতে সুন্দর ভাবে ছাপা হয় এবং সেই সব পাবার জন্যে যাতে কোনো প্রকার অসুবিধা না হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজন লোকও প্রতিপালিত হয়, এই উদ্দেশ্যেই বিদ্যাসাগর এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছিলেন।

বই বেচা ও ছাপাখানার কাজে বিদ্যাসাগরের আয় অনেকটা বাড়ল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বিধবা-বিবাহের খরচ ও নানা রকম দানের ব্যাপারে দেনার পরিমাণও বাড়ল। যে বছর তিনি সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছেড়ে দেন, সেই বছর এক হুগলী জেলার মধ্যে কয়েকটি গ্রামে নিজের খরচে পনরটি বিধবার বিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু বিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিলেন না; অনেক পুনর্বিবাহিত বিধবাদের ভরণ-পোষণের জন্যেও তাঁকে বিস্তর টাকা খরচ করতে হতো। ঋণগ্রস্ত হয়েও দানে এমন মুক্ত হস্ত—এক বিদ্যাসাগরকেই আমরা দেখেছি। তাঁর বরাবর একটা বিশ্বাস ছিল যে ঋণ যতই হোক, পরিশোধের পথ থাকবেই। সত্যই বিদ্যাসাগরের দান ও দয়া—দুই-ই যেন একটা ঐন্দ্র-জালিক ব্যাপার। কোথা থেকে টাকা আসে, কেমন করে দু হাতে দান করেন, আবার কেমন করেই বা তা পরিশোধ করেন—অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও তা অনেক সময়ে বুঝে উঠতে পারত না। যদি কেউ উপদেশ দিত যে এখন সরকারী চাকরি নেই, ব্যবসার ওপর নির্ভর, দানের মাত্রা একটু কমাও, অমনি আহত-অভিমান ব্রাহ্মণ বলে উঠতেন—বিপন্ন ও দরিদ্রের দুঃখই যদি দূর করতে না পারলাম, তাহলে জন্মেছি কেন? তাঁর ঋণ করার মধ্যেও

একটা মৌলিকতা ছিল। টাকার দরকার হলে, তিনি বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে কোম্পানীর কাগজ নিয়ে বন্ধক দিতেন। তখন থেকেই মধ্যবিত্ত ধনী বাঙালিরা কোম্পানীর কাগজে উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগ করতে শিখেছেন। পরে তিনি সময়মত টাকা সংগ্রহ করে, সুদে-আসলে সব পরিশোধ করতেন।

সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত থাকবার সময়ে দেশে ইংরেজি-শিক্ষা প্রসারের জন্যে বিদ্যাসাগর যেমন অনন্যমনা ছিলেন, সরকারী চাকরি ছেড়ে দেবার পরও তিনি এই কাজ থেকে বিরত হন নি। দেশের সর্বত্র শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত—সেই ব্রত-উদ্যাপনে তিনি কোনও দিনই শৈথিল্য বা অবহেলা প্রদর্শন করেন নি। এখন বরং এ বিষয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করবার পথ প্রশস্ত হলো ভেবে, তিনি দ্বিগুণতর উৎসাহে ও উদ্যমে শিক্ষা-বিস্তারের কাজে আত্মোৎসর্গ করলেন। কেননা তাঁর সুদৃঢ় ধারণা ছিল যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হবে। সেই জন্য সারা জীবন তিনি ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা করে গেছেন। অধ্যক্ষ ও ইন্‌সপেক্টার হিসেবে বিদ্যাসাগর যেমন নানা স্থানে নানা স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, চাকরি ছেড়ে দেবার পরেও তাঁর যত্নে এবং অর্থব্যয়ে বাংলা দেশের নানা স্থানে অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে কাহিনীও বিরাট এবং তার সম্পূর্ণ উল্লেখ অসম্ভব। বিদ্যাসাগরের যদি বৈষয়িক বুদ্ধি থাকত, তাহলে সরকারী চাকরি ছেড়ে দেবার পর তিনি এসব কাজে নিজেকে নাও জড়াতে পারতেন এবং জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি নিশ্চিন্ত বিশ্রামে ভরিয়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু সংসারে বে-হিসাবী মানুষের জীবনে বিশ্রাম-সুখ কদাচিৎ ঘটে থাকে। বিদ্যাসাগর এই বেহিসাবীদেরই একজন ছিলেন।

পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বিদ্যাসাগরের অন্যান্য অনুরাগীদের মধ্যে একজন।

প্রতাপচন্দ্রের জন্মস্থান মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দী গ্রামে।

সেই গ্রামে একটা স্কুল নেই—এই কথা যখন বিদ্যাসাগরের কানে এল, তিনি তখনই এগিয়ে উদ্যোগী হলেন। প্রতাপচন্দ্রকে একদিন বললেন—কলকাতায় আপনার প্রাসাদতুল্য বাড়ি, কিন্তু আপনার স্বগ্রামে একটা স্কুল নেই, এ কেমন কথা? রাজা বাহাদুর বুদ্ধিমান লোক। তাঁকে আর বেশী বলতে হলো না।

নিজের খরচে কান্দীতে তিনি একটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রতিষ্ঠার দিন বিদ্যাসাগর স্বয়ং উপস্থিত থেকে প্রতাপচন্দ্রকে বলেছিলেন—এই আপনার সত্যিকারের শিব-প্রতিষ্ঠা হলো। সমস্ত বাংলাদেশে আপনার মত বড়মানুষেরা যদি এই রকম শিব-প্রতিষ্ঠা করত তাহলে দেশের যে কী উন্নতি হতো, তা বলা যায় না। এ যুগে বিদ্যা দানই শ্রেষ্ঠ দান। রাজা বাহাদুরের অনুরোধে বিদ্যাসাগর কান্দী স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক হতে সম্মত হলেন। এইখানে আর একটি বিয়োগান্ত ঘটনার উল্লেখ করব।

বিদ্যাসাগর কান্দী এসেছেন। রাজ-বাড়িতেই উঠেছেন। এইখানেই রাই-মণির সঙ্গে তাঁর হঠাৎ দেখা। রাইমণি তাঁর এবং তাঁর পিতার আশ্রয়দাতা জগদ্দুর্লভ সিংহের মেয়ে এবং এই রাজবাড়ির ভাগিনেয় বধূ। নানা কারণে তাঁর অবস্থা তখন খুব খারাপ। বিদ্যাসাগর এসেছেন শুনে রাইমণি একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ছেলেবেলার সেই ঈশ্বর আজ বিদ্যাসাগর—এক ডাকে চেনা যায় এমন মানুষ। শুনেছেন তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা। তাঁর মামা-শ্বশুররা তাঁকে কী শ্রদ্ধাই না করেন। তিনি কি এখন তাঁর সেই দিদিকে চিনতে পারবেন? খুব সংকোচের সঙ্গে রাইমণি এসে দাঁড়ালেন বিদ্যাসাগরের সামনে।

—ঈশ্বর, আমায় চিনতে পারো? বললেন রাইমণি।

রাজাবাহাদুরের বৈঠকখানা ভর্তি লোক। সকলেই বিস্মিত।

—দিদি, না? এই বলে বিদ্যাসাগর মুখ তুলে চাইলেন রাইমণির দিকে।

—হ্যাঁ ঈশ্বর, আমি। আমি এই বাড়ির ভাগ্নী-বৌ, কিন্তু আমার অবস্থা বড় খারাপ। আমায় কিছু সাহায্য কর, ঈশ্বর, নইলে আর বাঁচিনে।

সভাশুদ্ধ লোক দেখলো বিদ্যাসাগরের দুই চক্ষু অশ্রুতে পরিপূর্ণ।

—দিদি, আমি তোমাকে মাসে দশ টাকা করে দেব। বললেন বিদ্যাসাগর।

বুক থেকে দুঃখের বোঝা নেমে গেল রাইমণির।

বিদ্যাসাগরের এই মহানুভবতা দেখে রাজবাহাদুরের শির শ্রদ্ধায় নত হলো তাঁর চরণে।

১৮৬১, ১৪ই জুন হরিশ্চন্দ্র মারা গেলেন।

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর খবর পেলেন বিদ্যাসাগর।

'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর হরিশ্চন্দ্র। বিদ্যাসাগরের পরম বন্ধু হরিশ্চন্দ্র। দেশাত্মবোধের মূর্তবিগ্রহ হরিশ্চন্দ্র কিভাবে সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশের সেবা করেছেন, সে কথা বিদ্যাসাগরের অজানা ছিল না। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের অগ্নিগর্ভ লেখনী কিভাবে নীলকর অত্যাচার নিবারণ করেছিল, বিদ্যাসাগর তা জানতেন। আরো জানতেন যে, তাঁর মতনই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে এই হরিশ্চন্দ্র দারিদ্রের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করেই জীবনের পথে এক পা করে অগ্রসর হয়েছেন। স্কুলে না পড়েও নিজের চেষ্টায় মানুষ যে এমন বিদ্যাবুদ্ধি ও গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারে—এর দৃষ্টান্ত সেদিন একমাত্র হরিশ্চন্দ্রই ছিলেন। বিদ্যাসাগর তাই হরিশ্চন্দ্রের গুণগ্রাহী ছিলেন। গুণীর গুণ বুঝতে বিদ্যাসাগরের অতুলনীয় শক্তি ছিল। পেট্রিয়টের অফিস ও প্রেস তখন ভবানীপুরে। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর পাছে ঐ কাগজ ও প্রেস উঠে যায় এবং হরিশ্চন্দ্রের পরিবারবর্গ নিঃসহায় হয়ে পড়ে, এই জন্যে বিদ্যাসাগর কালীপ্রসন্ন সিংহকে অনুরোধ করলেন ঐ প্রেস কিনে নিতে। সকল রকম দেশহিতকর কাজে কালীপ্রসন্নের মুক্তহস্তে দানের কথা বিদ্যাসাগরের অবিদিত ছিল না। মাইকেলের 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' ও দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' তাঁরই অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর এইজন্যেই কালীপ্রসন্নকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারকার্যে তিনি ছিলেন একজন প্রধান সহায়ক। বিদ্যাসাগর অনুরোধ করা মাত্র কালীপ্রসন্ন পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে পেট্রিয়টের স্বত্ব কিনে নিয়ে কাগজ চালাতে লাগলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর পরবর্তী ইতিহাস এই :

'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর স্বত্ব ক্রয় করিয়া কালীপ্রসন্ন প্রথমে সুপণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ইহার পরিচালন ভার প্রদান করেন। হরিশ্চন্দ্রের অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ ও সহচর, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের জন্মদাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পরেই তাঁহার শোকাকুলা জননী ও নিরাশ্রয়া সহধর্মিণীর সাহায্যার্থে পত্রখানির সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শম্ভুচন্দ্র পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটরের পদ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু গিরিশচন্দ্রই তাহার প্রধান সম্পাদক রহিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই।" পাঁচ মাস পরে গিরিশচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র দুজনেই পত্রিকার পরিচালন ও সম্পাদন ভার ত্যাগ করলেন। কালীপ্রসন্ন তখন বিপদে পড়লেন। হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিপূত

'পেট্রিয়ট' বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। তিনি তখন বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হলেন।—আপনি কাগজ চালাবার ভার না নিলে, 'পেট্রিয়ট' তো বিলুপ্ত হবার অবস্থা, এই বলে কালীপ্রসন্ন কাগজখানা বিদ্যাসাগরের হাতে তুলে দিলেন। বিদ্যাসাগর এগিয়ে এলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে কুঞ্জদাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন ও দ্বারকানাথ মিত্রকে দিয়ে কয়েক সংখ্যা সম্পাদন করিয়ে দেখলেন যে, সংবাদপত্র-পরিচালনে অনভ্যস্ত লোকের এ কাজ নয়। অবশেষে তিনি নবীনকৃষ্ণ বসু, কৈলাসচন্দ্র বসু ও কৃষ্ণদাস পাল, এই তিনজনের ওপরে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সম্পাদন ভার প্রদান করলেন। এঁদের তিনজনের সহযোগিতায় কাগজখানা কিছুদিন ভালোভাবেই চললো। কিছুদিন পরে নবীনকৃষ্ণ ও কৈলাসচন্দ্র ছেড়ে দিলেন। তখন বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি পড়ল কৃষ্ণদাস পালের ওপর।

কৃষ্ণদাস পাল তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কেরানী। বিদ্যাসাগর তাঁকেই উপযুক্ত বিবেচনা করে 'হিন্দুপেট্রিয়ট'-এর সম্পাদক পদে নিযুক্ত করলেন। স্বত্বাধিকারী কালীপ্রসন্নই রইলেন।

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস পালের জীবনী-লেখক লিখেছেন: "এই মাহেন্দ্র যোগে কৃষ্ণদাস পালের উপর বিদ্যাসাগরের দয়া হইল। কৃষ্ণদাসকে ডাকাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' চালাইতে অনুরোধ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণদাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া নিজের ইচ্ছানুরূপ প্রবন্ধাদি তাঁহাকে দিয়া লিখাইয়া লইয়া 'হিন্দু পেট্রিয়ট' চালাইতে লাগিলেন।...বিদ্যাসাগরের এই অনুগ্রহ না হইলে হয়ত কৃষ্ণদাসকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় চাকরি করিয়া জীবন শেষ করিতে হইত।" দুঃখের বিষয়, কৃষ্ণদাস এই অনুগ্রহের মর্যাদা রাখেন নি। সম্পাদক হবার পর, তিনি হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজখানি গোপনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করেন। এমন কি, কালীপ্রসন্ন সিংহের কাছেও প্রস্তাব করেন যে কাগজখানি বিদ্যাসাগরের অধীনে না রেখে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন অথবা একটি ট্রষ্টির হাতে দেওয়া হোক। বিদ্যাসাগর যখন সমস্ত বিষয় জানতে পারলেন, তখন সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণ এই লুকোচুরির মধ্যে রইলেন না। অবিলম্বে তিনি পেট্রিয়টের কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করলেন। সেদিন থেকে কৃষ্ণদাস তাঁর চক্ষে হয়ে দাঁড়ালেন 'দুমুখো সাপ'। অবশেষে কালীপ্রসন্ন

কয়েকজন ট্রাষ্টির উপর 'পেট্রিয়ট'-এর প্রথম ট্রাষ্টিগণের মধ্যে ছিলেন : প্রতাপচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রমানাথ ঠাকুর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

'সোমপ্রকাশ' বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের আরেক কীর্তি।
জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে হলে সংবাদপত্র দরকার—বিদ্যাসাগর এ কথা ভালো করেই বুঝেছিলেন। কিন্তু দেশে শিক্ষা বিস্তার, বিধবা-বিবাহ আন্দোলন প্রভৃতি সহস্র রকম কাজের মধ্যে জড়িয়ে থেকে তিনি, ইচ্ছা সত্ত্বেও, খবরের কাগজ প্রকাশ করার কাজ থেকে বিরত ছিলেন। তারপর সরকারী চাকরি ছেড়ে দেবার ঠিক দু বছর আগে তিনি এই ব্যাপারে অগ্রসর হলেন। এরও একটু নেপথ্য ইতিহাস আছে। সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় নামে বিদ্যাসাগরের এক পরিচিত ছাত্র ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র এবং ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়ে বৃত্তিও পেয়েছিলেন। সারদাপ্রসাদ বধির ছিলেন বলে কোথাও কোন কাজকর্মের স্থবিধা করতে না পেরে অবশেষে বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হন। মুখ্যতঃ তাঁরই উপকারের জন্তে বিদ্যাসাগর 'সোমপ্রকাশ' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। সারদাকে কাজে লাগান যাবে, দেশের লোকেরও উপকার হবে—এই চিন্তা করেই তিনি এই কাজে হস্তক্ষেপ করেন। প্রতি সোমবার প্রকাশিত হতো বলে নাম দেওয়া হয়েছিল 'সোমপ্রকাশ'। কাগজ বের করবেন ঠিক করে বিদ্যাসাগর প্রথমে এ বিষয়ে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে পরামর্শ করেন। দ্বারকানাথ তাঁরই সহপাঠী এবং তাঁরও ছাত্রজীবন কৃতিত্বে সমুজ্জল ছিল। প্রকৃতপক্ষে 'সোমপ্রকাশ'-এর সহিত এই দ্বারকানাথের নামই বিশেষ ভাবে জড়িত। সে কথা পরে বলছি।
চাঁপাতলা, ১নং সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন থেকে ১২৬৫ সাল ১লা অগ্রহায়ণ, সোমবার (১৮৫৮, নভেম্বর ১৫) 'সোমপ্রকাশ' প্রথম বেরুলো। বের হবার অল্প কিছুদিন পরেই বিদ্যাসাগরের স্থপারিশে বর্ধমান রাজার বাড়িতে একটা ভালো চাকরি (মহাভারত অনুবাদের কাজ) পেয়ে সারদাপ্রসাদ চলে যান। সারদাপ্রসাদ চলে গেলে পরে কাগজ সময়মত বের করার অস্থবিধা দেখে,

বিদ্যাসাগর তখন দ্বারকানাথকেই যোগ্য মনে করে ঐ কাগজের সম্পূর্ণ ভার দিয়ে দেন। এরপর থেকে বিদ্যাভূষণই 'সোমপ্রকাশের' সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হলেন। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি এই কাগজে নিয়মিত ভাবে লিখতেন। বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ' সংবাদপত্র-জগতে এক যুগান্তর নিয়ে এলো। অধ্যাপনার অবসর কালে (দ্বারকানাথ তখন সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক) দ্বারকানাথ পত্রিকাখানি সম্পাদনা করতেন এবং এই কাজে তাঁর নিষ্ঠা ও শক্তি অল্প দিনের মধ্যেই সোমপ্রকাশকে শীর্ষস্থানীয় করে তুললো। সোমপ্রকাশের আগে বাংলা কাগজ অনেক ছিল—ছিল কতো প্রভাকর-দিবাকর-দর্পণ ও চন্দ্রিকা-জাতীয় কাগজ। এই সব কাগজে থাকতো ধর্মের কথা আর সমাজ-বিষয়ক আলোচনা। যুগ তখন বদলাতে শুরু করেছে; যুগের প্রয়োজন বুঝলেন দ্বারকানাথ—নিয়ে এলেন রাজনীতি। অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় রাজনীতির যে আলোচনা হতো না তা নয়, তবে সোমপ্রকাশের মতো উচ্চতর গভীর প্রণালীতে নয়। ক্রমে সোমপ্রকাশ আদর্শ সংবাদপত্র হয়ে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের ভাষা, রুচি ও ভাব পর্যন্ত বদলে গেল। এ কৃতিত্ব অবশ্য সম্পাদক দ্বারকানাথেরই—কারণ 'সোমপ্রকাশ' প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অক্ষয় কীর্তি। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন ঃ

"'সোমপ্রকাশ সম্পূর্ণরূপে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের উপরেই পড়িয়া গেল। তিনি অধ্যাপকতা বাদে যে কিছু অবসর কাল পাইতেন, তাহা সমুদয় সোমপ্রকাশ সম্পাদনে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় কর্তব্যপরায়ণ মানুষ অল্পই দেখিয়াছি।...যখন গৃহে 'সোমপ্রকাশের' জন্য রাশীকৃত দেশী ও বিলাতী সংবাদপত্র, গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট ও গ্রন্থাদি পাঠে মগ্ন থাকিতেন, তখন কোথা দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাইত তাঁহার জ্ঞান থাকিত না।... দেখিতে দেখিতে 'সোমপ্রকাশের' প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। প্রভাকর ও ভাস্কর প্রভৃতি বঙ্গসমাজের নৈতিক বায়ুকে দূষিত করিয়া দিয়াছিল, 'সোমপ্রকাশের' প্রভাবে তাহা দিন দিন বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। সোমবার আসিলেই লোকে সোমপ্রকাশ দেখিবার জন্য উৎসুক থাকিত। যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তিযুক্ততা,

তেমনি নীতির উৎকর্ষ। প্রথম কয়েক বৎসর ইহা কলিকাতার চাঁপাতলার এক গলি হইতে বাহির হইত। তখন সেই ভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বদা পদার্পণ করিতেন ; এবং পরামর্শাদি দ্বারা সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা করিতেন।"

সুতরাং সোমপ্রকাশ ছিল বিদ্যাসাগরের প্রেরণা ও বিদ্যাভূষণের লেখনীর যুগ্ম ফল। দুই বন্ধুর মিলিত প্রয়াস সোমপ্রকাশ দুজনেরই প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পর সোমপ্রকাশ ছিল বিদ্যাসাগরের সাংবাদিক রচনার প্রকাশের দ্বিতীয় ক্ষেত্র। 'সোমপ্রকাশের' প্রথম শ্রী সম্পাদনের মূলে ছিল বিদ্যাসাগরের লেখনী। তাঁরই রচনা এই কাগজ খানিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলেছিল ; এর থেকেই প্রমাণ হয় সাংবাদিক হিসেবেও তিনি কম দক্ষ ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক চরিতকার লিখেছেন : "বেতাল যেমন বর্তমান বাংলা পদ্যগ্রন্থ রচনার পথ-প্রদর্শক, 'সোমপ্রকাশ' সেইরূপ সুরুচিসঙ্গত উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসারে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত সংবাদপত্র প্রচারের পথ-প্রদর্শক। 'সোমপ্রকাশ' প্রচার ও তত্ত্ব-বোধিনীর সহায়তা করা ভিন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় আরো কোন কোন সংবাদ-পত্রে লিখিয়াছেন। তিনি যখনই যাহাতে লিখিতেন, সেই সংবাদপত্রই লোকের আদরের জিনিস হইত।"

এই কোনো কোনো পত্রিকার মধ্যে কাশীর ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের হিন্দীপত্রিকা 'কবিবচনসুধা'-র নাম উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর এই পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং হিন্দীতেই লিখতেন। এমন কি, পরবর্তীকালে ভাটপাড়ার পণ্ডিত মধুসূদন স্মৃতিরত্নের বড় ছেলে পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী যখন একখানা সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা বের করলেন, বিদ্যাসাগর সে কাগজেও লিখতেন। হৃষীকেশ শাস্ত্রী ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং তাঁর সম্পাদিত 'বিদ্যোদয়'-ই বাংলাদেশে প্রথম সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা। এ ছাড়া সমসাময়িক অনেক কাগজই বিদ্যাসাগরের রচনা লাভ করে ধন্য হতো। বিদ্যাসাগরের রচনার একটা বড় অংশ এইভাবে নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে এবং অদ্যাবধি সেসব রচনা সংগৃহীত হয় নি।

সোমপ্রকাশ ও দ্বারকানাথের কথা আর একটু বলা দরকার। ১৮৬২ সালে কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্র দুইই চাংড়িপোতায় স্থানান্তরিত হয়। চাংড়িপোতা

দ্বারকানাথের জন্মস্থান। দ্বারকানাথের সম্পাদনায় দীর্ঘ দশ বছর এই কাগজখানি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে প্রভাব বিস্তার করে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। সোমপ্রকাশের উৎসাহে দক্ষিণাঞ্চলে অনেক সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়েছে, অনেক অত্যাচার নিবারিত হয়েছে। সোমপ্রকাশ কখনো অন্যায়ের সমর্থন করেনি। কারো মুখ চেয়ে সোমপ্রকাশে কোনো প্রবন্ধ কখনো লেখা হতো না। লোকের নিন্দা-স্তুতি সম্পাদককে কখনো বিচলিত করে নি। দ্বারকানাথ মনেপ্রাণে যা বিশ্বাস করতেন তা হৃদয়-নিঃসৃত অকপট ভাষায় ব্যক্ত করতেন। তাই-ই ছিল কাগজখানির সর্বপ্রধান আকর্ষণ। সেদিন সোমপ্রকাশের মতামত জানবার জন্যে গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত উন্মুখ হয়ে থাকতেন। রাজ্যশাসন, বিশেষতঃ কারাগার প্রভৃতি সংস্কারে সোমপ্রকাশ যে মতামত প্রকাশ করেছে, তা তখনকার দিনে অত্যন্ত দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। এর সামাজিক যুক্তি বহুলোকের মত পরিবর্তনে সহায়তা করেছে। এর লেখায় অনেক কুসংস্কার দূর হয়েছে। স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি বিতর্কে সোমপ্রকাশ সর্বদা উদার মতের পরিচয় দিয়েছে। তা সত্ত্বেও দ্বারকানাথের হিন্দু সমাজ-শাসন ও ধর্মের উপদেশের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। দ্বারকানাথ তাঁর লেখনী মাহাত্ম্যে যতদূর সম্ভব সমাজের অকল্যাণ রোধ করবার চেষ্টা করতেন। ১৮৭৪ সালে দ্বারকানাথের অসুস্থতার জন্য তাঁর ভাগিনেয় স্বনামধন্য আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েক মাস পত্রিকাখানির সম্পাদনা করেন। কাগজ তখন পুনরায় কলিকাতায় ভবানীপুরে স্থানান্তরিত হয় এবং এক ফর্মা ইংরেজি সংযোজিত হয়। ১৮৭৮ সালে ভার্ণাকুলার প্রেস আইন পাশ হলো। সোমপ্রকাশের লাহোরের সংবাদদাতা প্রেরিত এক তথ্য প্রকাশিত হলো। গভর্নমেণ্ট দ্বারকানাথের কাছ থেকে মুচলেকা ও এক হাজার টাকা জামীন দাবী করলেন। দ্বারকানাথ রাজী হলেন না। কাগজ বন্ধ হয়ে গেল। দ্বারকানাথের তেজস্বী মন নতুন আইনের অপমানকর বিধি মেনে নেওয়ার চেয়ে এই পথ শ্রেয় বলে গ্রহণ করলেন। স্যর রিচার্ড টেম্পল তখন বাংলার ছোটলাট। তিনি সোমপ্রকাশের স্বাধীন ও পক্ষপাতশূন্য চিন্তাশীল মতের পোষক ছিলেন। তাই তিনি কাগজ বন্ধ না করবার জন্য নিজের বাড়িতে দ্বারকানাথকে ডেকে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু যা দেশের সম্মান ক্ষুণ্ণ করছে তা মেনে নেওয়া তাঁর কাছে অসম্ভব মনে হলো। সোমপ্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকে সাড়া পড়ে গেল।

পাঠকদের পক্ষ থেকে পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি দেবার জন্যে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হলো। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে লালমোহন ঘোষ সোমপ্রকাশের পক্ষে বিপুল বিতর্ক তুললেন। বিব্রত গভর্ণমেণ্ট মতের পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন। ১৮০০, ১৯শে এপ্রিল, মির্জাপুর দপ্তরীপাড়ার কল্পদ্রুম প্রেস থেকে সোমপ্রকাশ আবার বেরুতে লাগল। কিন্তু তখন অন্য মালিক—তাই সোমপ্রকাশ আর তার পূর্ব গৌরব ফিরে পায়নি। কাগজ হস্তান্তরিত হবার পর অল্প দিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। দ্বারকানাথের পরবর্তী প্রচেষ্টা হলো কল্পদ্রুম মাসিক পত্রিকা। কল্পদ্রুম দু'বছর চলেছিল।

প্রসঙ্গত বিদ্যাসাগর ও বিদ্যাভূষণ সম্পর্কে দু'একটা কথা বলব। দুজনেই সহাধ্যায়ী ও বন্ধু। দুই বন্ধুর গুণেরও বহু মিল। নৈতিক ও মানসিক বলে দুজনেই শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। দুজনেরই দয়ায় গ্রামের দরিদ্র পুষ্ট হয়েছে, দুর্বল সাহস পেয়েছে, অত্যাচারী সন্ত্রস্থ হয়েছে—অন্যায় নিরস্ত হয়েছে। অকুণ্ঠ শ্রম, অধ্যবসায় আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দুজনকেই জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে জয়যুক্ত করেছে। সত্যের প্রতি অনুরক্তি দুজনের প্রসিদ্ধ—এমন কি উভয়ের দৈহিক শক্তি কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। শিক্ষা-বিস্তারে উভয়ের ত্যাগ রূপকথায় পরিণত হয়েছে। কর্তব্যনিষ্ঠা ও একাগ্রতাগুণে দুজনেই সমান। মতের উদারতায় দুজনেই প্রসিদ্ধ এবং সামাজিক ব্যাপারে তাঁদের দুজনের মত অত্যন্ত উদার ছিল। গ্রামের এক কলঙ্কিনী বিধবার শবদেহ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বিদ্যাভূষণ নিজেই শ্মশানঘাটে নিয়ে গিয়ে দাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। জ্ঞানস্পৃহা ও পাণ্ডিত্য দুজনেরই অসাধারণ। উভয়েই স্বদেশবৎসল। তাই মনে হয় এই সকল বিষয়ে বিদ্যাসাগর ও বিদ্যাভূষণ যেন অভেদাত্মা পৃথক দেহ। সংস্কৃতে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকলেও, বিদ্যাভূষণ বাংলাভাষায় বহু পুস্তক রচনা করেছেন্।

তত্ত্ববোধিনীর অক্ষয়কুমার যেমন, সোমপ্রকাশের দ্বারকানাথও তেমনি বিদ্যাসাগরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এই বন্ধুত্ব কেবলমাত্র তাঁদের দুজনের মৃত্যুতে শেষ হয়। এরা তিনজনে একই বছরে জন্মগ্রহণ করেন।

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনে অক্ষয়কুমার ও দ্বারকানাথের সাহচর্য শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়।

সেদিনের বাঙালির মানস-পরিমণ্ডল রচনায় এই তিনজনই ছিলেন সমর্থ শিল্পী।

॥ কুড়ি ॥

সিপাহীযুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে।

এমন সময়ে কলকাতার বাজারে দেখা দিল 'মেঘনাদবধ কাব্য'।

মাইকেলের 'মেঘনাদ'।

বিদ্যাসাগরের প্রিয় কবি মধুর স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ।

শহরের বিদগ্ধ সমাজে সে কী তুমুল উত্তেজনা।

প্রথম বিধবা-বিবাহের পাঁচ বছর পরের এই ঘটনা। বেগে এবং আবেগে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের আন্দোলনেরই প্রায় সমতুল্য বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসের এই ঘটনাটি। তেমনি বাদ-প্রতিবাদ ও বিতর্কের তুমুল ঝড়—যার পরিসমাপ্তি 'ছুছুন্দরীবধ কাব্যে'। এই 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' প্রকাশিত হয় অমৃতবাজার পত্রিকায়। এর লেখক ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ। প্রগতিশীল কোনো কিছুকেই বরদাস্ত করবার মতো প্রতিভা বা উদারতা এই 'মহাত্মার' ছিল না। বিদ্যাসাগর তাই চিরকাল শিশিরকুমার ঘোষের প্রতি বিরূপ ছিলেন।

শিশিরকুমার প্রমুখ রক্ষণশীলেরা 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে ব্যঙ্গ করলেন। কিন্তু এগিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর, এগিয়ে এলেন কালীপ্রসন্ন, এগিয়ে এলেন রাজনারায়ণ এবং তাঁদের মত মাইকেলের আরো অনেক গুণগ্রাহী। প্রকাশ্যে তাঁরা অভিনন্দন জানালেন কবিকে বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে কবিকে দেওয়া হলো একখানি মানপত্র এবং সেই সঙ্গে দেওয়া হলো মূল্যবান একটি পানপাত্রও। সেই ঐতিহাসিক মানপত্র রচনা করলেন বিদ্যাসাগর। মানপত্রের আরম্ভেই লিখলেন: "আপনি বাংলা ভাষায় যে অনুপম অশ্রুতপূর্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি

আমরা পূর্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাংলা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে···বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারে নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না।' সম্বর্ধনার উত্তর মাইকেল বাংলাতেই দিলেন।

মাইকেলের অন্তরঙ্গ সুহৃদ মনীষী রাজনারায়ণ লিখলেন: "স্বদেশে একটি মহাকবির উদয় জাতি-সাধারণের আনন্দের কারণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্তব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই শ্রেণীর কবি···যে বঙ্গভূমিকে তিনি 'শ্যামাজন্মদে' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই বঙ্গভূমি তাঁহাকে প্রসব করিয়া প্রকৃত গৌরবাস্পদই হইয়াছেন।...বহু শতাব্দী পরে যখন কবি ও তাঁহার সমালোচক উভয়েই অন্তর্হিত হইবেন, তখনো মনুষ্যগণ অক্লান্ত অনুরাগের সহিত 'মেঘনাদ' পাঠ করিবে।"

বিদ্যাসাগরের জন্মের চার বছর পরে মধুসূদনের জন্ম।
তাঁর বিচিত্র জীবন-কথা জানে না এমন বাঙালি বিরল।
অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে মধুসূদন বাংলার সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। প্রকৃতিদত্ত শক্তি, প্রতিভা এবং অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ের সাহায্যে বাংলার এই নবীন কবি (এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও প্রধান কবি) পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে নানা উপকরণ সংগ্রহ করে মাতৃভাষাকে পরিপুষ্ট করেন এবং গাম্ভীর্য ও ভাববৈচিত্র্যে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। মধুসূদনই প্রথম দেখান যে, বাংলাভাষায় কেবল বাঁশীর মৃদুমধুর গুঞ্জরণ অথবা বেণু-বীণা নিক্কণ ধ্বনিত হয় না, প্রতিভাশালী লেখকদের হাতে এর ভেতর দিয়ে ভেরীর সুগম্ভীর রবও প্রকাশিত হতে পারে। মধুসূদনই প্রথম প্রমাণ করলেন যে, বাংলা ভাষা নির্জীব নয়, এ সজীব ভাবধারার বাহন হতে পারে, দৃঢ়তায় ও স্থিতিস্থাপকতায় এ অন্য যে কোনো উন্নতিশীল ভাষার সমকক্ষ। মধুসূদনই বাংলা কাব্য-সাহিত্যে সেদিন আধুনিকতার দীক্ষা দিয়েছিলেন—যেমন দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর শিক্ষা ও সংস্কারের ক্ষেত্রে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আধুনিক যুগের উন্মেষে বাংলা গদ্যের শক্তি আবিষ্কার করেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর

অক্ষয়কুমার এবং পরে বঙ্কিমচন্দ্র। আর মধুসূদন আবিষ্কার করেন বাংলা কাব্য সাহিত্যের অন্তর্নিহিত শক্তি।

আগেই বলেছি, যে যুগে বিদ্যাসাগর, মাইকেল প্রভৃতির জন্ম, সে যুগ ছিল সাহসের যুগ, বন্ধন ছিন্ন করার যুগ, সংস্কারমুক্ত হওয়ার যুগ। তাই এই যুগের কোলে জন্মগ্রহণ করে, আর সব যুগপুরুষদের মতই মধুসূদনও এই যুগের ভাবধারায় পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন এবং যুগের ধর্ম তাঁকে যেমন আকৃষ্ট করেছিল, তেমনি তাঁর প্রতিভার উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রভাব বিস্তার করেছিল সত্য, কিন্তু প্রভাবিত করতে পারে নি—বাঙালি মধুসূদনকে ইংরেজি শিক্ষা খৃষ্টান করলেও একেবারে ইংরেজ বানাতে পারেনি। বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতাকে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যেমন আত্মসাৎ করেছিলেন, মধুসূদনও তেমনি তাকে আত্মসাৎ করে বাংলা কাব্যে যুগান্তর ঘটালেন।

সেই যুগান্তরের বার্তা বহন করে নিয়ে এলো 'মেঘনাদবধ কাব্য'। বাংলার বিদগ্ধসমাজ সবিস্ময়ে উপলব্ধি করল যে, দৈববাণীর মতো অমোঘ মধুসূদনের কবিতা। এর গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও ঝংকারে চিরাচরিত কবিতার মোহময় কল্লোল যেন চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। পয়ারের পদ্মমধু পান করে বঙ্গভারতীর যে বিতৃষ্ণা হয়েছিল তা দূর হয়ে গেল মধুর অমিত্রাক্ষর ছন্দের অমৃতধারায়।

বাঙালি কবি খৃষ্টান হয়েও যে আপন ভাষাকেই বুকে টেনে নিয়েছেন—এতেই বিদ্যাসাগর মধুসূদনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের বিরূপ সমালোচনায় যখন কলকাতা শহর ও বাংলার হাট-মাঠ-ঘাট মুখরিত, তখন সহস্র কর্মের মধ্যে জড়িত থেকেও বিদ্যাসাগর এর মহিমা প্রচারে অগ্রণী হয়েছিলেন। তাঁরই আগ্রহে এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে ১৮৬১-র ১২ই ফেব্রুয়ারী কবিকে প্রকাশ্যে সম্বর্ধিত করা হয়। বিদ্যাসাগরের এই উদারতা, এই আধুনিক মন মাইকেলকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে তুলছিল সেদিন। সেই শ্রদ্ধা কবি চিরদিন এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্পর্কে পোষণ করতেন। আর বাংলার এই ভাগ্য-বিড়ম্বিত কবি বিদ্যাসাগরের অন্তর যে কতখানি জুড়ে ছিলেন, তা বাঙালি মাত্রেই জানে।

মেঘনাদবধ কাব্যের পর মধুসূদন লিখলেন 'ব্রজাঙ্গনা' আর 'বীরাঙ্গনা' কাব্য। শেষোক্ত কাব্যখানি কবি উৎসর্গ করলেন বিদ্যাসাগরকে। উৎসর্গ-লিপি এই রকম, "বঙ্গকুলচূড়া শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিরস্মরণীয় নাম—এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে স্থাপিত করিয়া কাব্যকার ইহা উক্ত মহানুভবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ করিল।"

ব্যারিষ্টারি পড়বার জন্যে মধুসূদন বিলেত গেলেন। একা নয়, সপরিবারে। প্রবাসে দারুণ অর্থকষ্টের জন্যে কবির জীবনে এক বিষম সংকট দেখা দিয়েছিল। তাঁর সেই চরম লাঞ্ছনার দিনে তিনি স্মরণ করলেন বিদ্যাসাগরকে। কবির সেই ঘোর দুর্দিনে একমাত্র বিদ্যাসাগরই তাঁকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের হৃদয়বত্তার সেই অত্যাশ্চর্য কাহিনী এইবার বলব।

মধুসূদন তখন ফরাসীদেশের ভার্সাই নগরে। যাঁদের ওপর ভরসা করে ব্যারিষ্টারি পড়তে গিয়েছিলেন, তাঁর যেসব বন্ধু তাঁর বিলেত যাওয়ার সমস্ত ভার গ্রহণ করেছিলেন, মাইকেল তাঁদের কাছে বার বার চিঠি লিখে টাকা পাওয়া দূরে থাক, চিঠির জবাব পর্যন্ত পেলেন না। এমন কি, যাঁর ওপর তার জমি-জমার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন এবং যিনি প্রয়োজন মত টাকা পাঠাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তিনিও পর্যন্ত প্রবাসী-কবিকে চরম দুর্ভাগ্যের মুখে ঠেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। পাইকপাড়ার রাজা থেকে কলকাতার সকল সম্ভ্রান্ত লোকই প্রবাসে কবির এই দুর্দশার কথা জানতেন, কিন্তু কেউই তাঁকে সাহায্য পাঠবার কথা একবারও চিন্তা করলেন না। সপরিবারে অনশন—এ কথা জেনেও তাঁরা স্থির ছিলেন। কবি কারো কাছ থেকে কোনো সাড়া পেলেন না। চক্ষে অন্ধকার দেখলেন। কারাবাসের উপক্রম—তবু কারো হৃদয় টলল না। তারপর?

"নিরবচ্ছিন্ন নিরাশার ঘন অন্ধকার যখন তাঁহার গভীর চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন করিল, তখন সেই অন্ধকার পথে তাড়িতালোকে কোন্ মূর্তি অঙ্কিত হইল? সেই প্রবাসী মধুসূদনের বিষাদের অন্ধকার ভেদ করিয়া কোন্ মহাপুরুষের মধুর মূর্তি তাঁহার হৃদয় প্রান্তে উদিত হইয়া আশার সঞ্চার করিয়াছিল?"

তিনি বিদ্যাসাগর।

নিরুপায় কবি সকরুণ বাক্য বিন্যাসে বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখলেন :

"আপনি শুনিয়া চমকিত ও গভীর দুঃখে অভিভূত হইবেন যে, দুই বৎসর পূর্বে উচ্ছ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে আপনার নিকট যে ব্যক্তি বিদায় লইয়াছিল, আজ এইক্ষণে আমি সেই সবলকায় ও প্রশান্ত চিত্ত ব্যক্তির ভগ্নাবশেষ মাত্র, এবং কয়েকজন লোকের নিষ্ঠুরতা, বোধাতীত নির্মম ব্যবহারের জন্য আমি এইরূপ দুর্বিপাক মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি; আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইহাদের মধ্যে একজন আবার আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃৎ।...আমার চারি হাজার টাকা স্বদেশে পাওনা, তবু আমি অর্থাভাবে বিদেশের কোনো কারাগারে যাইতেছি, আর আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা কোনো অনাথ আশ্রমে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইল। যে দুরবস্থায় মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, ইহা হইতে উদ্ধার করিতে আপনি একমাত্র সুহৃৎ···একটি দিনও বিলম্ব করিলে চলিবে না। আপনাকে যে ক্লেশ দিতেছি, সে জন্য কি ক্ষমা প্রার্থনা করিব? আমি তাহা আবশ্যক বোধ করি না, কারণ আপনাকে বেশ জানি ও সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, একজন বন্ধু ও স্বদেশীয়কে আপনি এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া মরিতে দিবেন না: ...আপনার করুণা ভিন্ন বাঁচিবার অন্য কোনো সম্ভাবনা নাই।"

কথিত আছে, মাইকেলের এই চিঠিখানা পড়তে পড়তে, বিদ্যাসাগর রুদ্ধকণ্ঠে অশ্রুবিসর্জন করেছিলেন। অথচ তাঁর নিজের হাতেও তখন একটি কপর্দক ছিল না।

কিন্তু মধুসূদনের চিঠি পেয়ে তাঁর দুর্ভাবনার আর কূল কিনারা রইল না।

তাঁর নিজের তখন দারুণ অসচ্ছলতা। ঋণ-জালে জড়িত।

তবু চোখের সামনে বার বার ভেসে ওঠে প্রবাসী কবির অসহায় অবস্থা।

সেই সঙ্গে মধুসূদনের বন্ধুদের এই হৃদয়হীন আচরণে বিদ্যাসাগর যারপর নাই ক্ষুব্ধ ও ক্ষুব্ধ হলেন। এই কী বাঙালির চরিত্র! নিজের জীবন দিয়ে বিদ্যাসাগর অনুভব করলেন এই সত্য। তাঁর প্রতি তাঁর স্বদেশবাসীর আচরণের কথা, নতুন করে স্মরণ হলো বিদ্যাসাগরের। বাঙালি এমনি হৃদয়হীন, এমনি অকৃতজ্ঞ। জাতীয়-চরিত্রের এই কলঙ্ক মোচন করতে এগিয়ে এলেন মহামানব বিদ্যাসাগর। মধুসূদনকে বাঁচাতে হবে—তাকে এমন অসহায়ভাবে বিদেশে মরতে দেওয়া হবে না কিছুতেই।

আর সব কাজ ফেলে তিনি কবিকে বাঁচাবার জন্য সচেষ্ট হলেন।
প্রথমে গেলেন মধুসূদনের বন্ধুদের কাছে, বললেন তাঁর বিপদের কথা। কোনো ফল হলো না। চেষ্টা করলেন আরো নানা স্থানে—সকরুণ আবেদন জানালেন তাদেরই কাছে যারা মধুসূদনের সখ্য-গর্বে গর্ব বোধ করতো।
সে আবেদনও নিষ্ফল হলো।
"একটি দিনও বিলম্ব করিলে চলিবে না"—মহাসাগরের তরঙ্গমালা অতিক্রম করে প্রতিধ্বনিত হয় কবির এই সকরুণ আর্তনাদ বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে। উদ্বেলিত হয় সেই হৃদয়। অস্থির হন তিনি। কেউ এক পয়সা দিল না। উপায়? উপায়—ঋণ করা। ঋণ করেই তিনি বাঁচাবেন বাংলার কবিকে। তাকে কিছুতেই মরতে দেবেন না এ ভাবে। তখনি দেড় হাজার টাকা ধার করে পাঠিয়ে দিলেন এবং সেই সঙ্গে পরামর্শ দিলেন, মধুসূদন যেন ইংলণ্ডে গিয়ে তাঁর প্রয়োজনীয় কাজে ব্যাপৃত হন।
ওদিকে মাইকেল আশা পথ চেয়ে বসে আছেন।
প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে মন্থর গতিতে—হাতে আছে মাত্র তিন ফ্রাঙ্ক। অশ্রুপূর্ণ নয়নে কবি-পত্নী হেনরিয়েটা স্বামীকে বললেন—আর ক'দিন চলবে এই ভাবে? মধুসূদন আশ্বাস দিয়ে স্ত্রী-কে বলেন—ভেবো না, এবার যাঁকে চিঠি লিখেছি তিনি আর কেউ নন—বিদ্যাসাগর। উপায় হবেই। কারণ যে লোকের নিকট অবস্থা জানিয়ে পত্র লিখেছি, "তিনি আর্য ঋষির ন্যায় প্রতিভাশালী ও বিজ্ঞ, ইংরেজের ন্যায় কার্যকুশল ও বাঙালি মায়ের ন্যায় কোমল-হৃদয়।"
মধুসূদন মিথ্যা আশ্বাস দেন নি।
এক ঘণ্টা পরে বিদ্যাসাগরের সাহায্য গিয়ে পৌছলো।
নিশ্চিত অনাহার থেকে মধুসূদন সপরিবারে রক্ষা পেলেন।
কবির মৃত দেহে যেন জীবন-সঞ্চার হলো। হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আনন্দ-বিগলিত চিত্তে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে বিদ্যাসাগরকে তিনি চিঠি লিখলেন।
কবির এই কৃতজ্ঞতা কেবল মাত্র চিঠিতেই শেষ হয়নি—পরবর্তী কালে একটি অনবদ্য সনেটে এর শাশ্বত স্বীকৃতি রেখে গেছেন।
কিন্তু আরো টাকা দরকার।

অথচ কোথাও টাকা পাবার উপায় নেই।

বিদ্যাসাগর নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করলেন না—তাঁর সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা আচ্ছন্ন করে আছেন এখন মধুসূদন। ঋণের পর ঋণ করে তিনি কবিকে টাকা পাঠাতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর এক চিঠিতে সব কথাই খুলে লিখলেন, কি ভাবে টাকা পাঠাচ্ছেন, তাও জানালেন। বেহিসাবী মাইকেলের কাছ থেকে এলো শুধু ধন্যবাদ। আর সবশেষে একটি প্রার্থনা—"এ শরণাগত জনকে রক্ষা করিতে হইবে, এ কথাটি যেন সর্বদা স্মরণ থাকে।"

শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের অর্থানুকূল্যে মধুসূদন ব্যারিষ্ট্যারি পরীক্ষা পাশ করে দেশে ফিরলেন। সবশুদ্ধ তিনি মাইকেলকে ছয় হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন। মধুসূদন দেশে ফিরছেন ব্যারিষ্টার হয়ে। বিদ্যাসাগরের আনন্দের সীমা নেই। তিনি একখানা তিনতলা বাড়ি তাঁর জন্যে সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক করে রাখলেন। বিদ্যাসাগর বলেছেন: "মাইকেল আসিয়া সুখে বাস করিতে পারেন, এরূপ একখানি পছন্দসই বাড়ি পূর্ব হইতে ভাড়া লইয়া, বিলাত-প্রত্যাগত ও সম্ভ্রান্ত লোকের বাসোপযোগী করিয়া সাজাইয়া রাখিলাম: বড় সাধ মধুসূদন আসিয়া সেই বাড়িতে বাস করিবেন, কিন্তু আমার নির্বাচিত ও সুসজ্জিত গৃহ পড়িয়া রহিল, মধুসূদন আসিয়া স্পেন্স হোটেলে উঠিলেন।"

বিদ্যাসাগর কবির এই আচরণে অত্যন্ত বিস্মিত ও ব্যথিত হলেন। তাঁকে ফিরিয়ে আনতে নিজেই হোটেলে গেলেন। মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে নিরাশ করলেন। মধু-বিদ্যাসাগরপ্রসঙ্গের বা সম্পর্কের এইখানেই কিন্তু শেষ নয়। বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতেই ভাগ্য-বিড়ম্বিত কবির জীবনান্ত হয়; এবং ব্যারিষ্টারি পাশ করে ফেরবার পর যে সাত বছর মধুসূদন বেঁচেছিলেন, তাঁর অভিশপ্ত জীবনের সেই সাতটি বছরের প্রতি দিনের ইতিহাস বিদ্যাসাগরেরই করুণার ইতিহাস। কবি সেই জন্যেই তাঁর জীবন-দাতাকে বলেছিলেন—করুণার সিন্ধু তুমি!

বিদ্যাসাগর নিজে আকণ্ঠ ঋণের মধ্যে ডুবে থেকে, ঋণ করে মাইকেলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। "কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যিনি এত অসুবিধা ভোগ করিয়া এরূপ বিপুল ঋণভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে দেশে আনাইয়াছিলেন, স্বদেশে পদার্পণ করা অবধি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এক-দিনের জন্য তিনি বিদ্যাসাগর হেন সুহৃদের পরামর্শে কিংবা উপদেশে চলিতে

প্রয়াস পান নাই।" এমন কি, যে টাকা বিদ্যাসাগর ধার করে পাঠিয়েছিলেন সেই টাকা পর্যন্ত পরিশোধ করেন নি মধুসূদন। তবু কী যে দুর্জ্জেয় আকর্ষণ বোধ করতেন বিদ্যাসাগর, তাই কবিকে তিনি বারবার নিজের স্নেহের পক্ষপুটে রেখেছেন, বারবার তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। অমিতব্যয়ী মধুসূদনকে মিতব্যয়ী করে তোলা অসম্ভব জেনেও, মধুসূদন যখনই তাঁর দাক্ষিণ্যের দুয়ারে এসে হাত পেতে দাঁড়িয়েছেন, বিদ্যাসাগর তাঁকে 'না' বলতে পারেন নি। এমনই মধু-অন্ত প্রাণ ছিলেন বিদ্যাসাগর; এমনই গভীর ভালোবাসা ছিল তাঁর ভাগ্যবিড়ম্বিত এই কবির প্রতি! মধুসূদনের এক জীবন চরিতকার লিখেছেন:

"যে মহাত্মা তাঁহার প্রবাসকালে সাহায্য করিয়া অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখনও তাঁহার দয়ার বিরাম ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, মধুসূদনের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য পূর্ব হইতে সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এবং অন্যান্য বন্ধুগণের সাহায্যে নানা প্রকার প্রতি-বন্ধক অতিক্রম করিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন।"

মধুসূদন আইন ব্যবসায় আরম্ভ করলেন।

বিদ্যাসাগর ভাবলেন, এইবার বোধ হয় কবি তাঁর ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করবেন।

কিন্তু নিজের পরিবার পালন করবার মতো রোজগার তাঁর ভাগ্যে ঘটল না, তার উপর ছিল অমিতব্যয়িতা, দেনা শুধবেন কি করে। যখন তখন বিদ্যা-সাগরের কাছে টাকার জন্যে চিঠি আসত মধুসূদনের, কখনো বা কবি সশরীরে এসে উপস্থিত হতেন। বিদ্যাসাগরের বিরক্তি নেই, ক্লান্তি নেই। ব্রজাঙ্গনার কবি, মেঘনাদবধের কবি খেতে পাবেন না, অনাহারে থাকবেন—এ চিন্তা বিদ্যাসাগরের কাছে অসহ্য, তাতে তাঁর যত অসুবিধাই হোক না কেন। কথিত আছে, একদিন মাইকেল বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দেখলেন টেবিলের উপর থাকে থাকে টাকা সাজান। মধুসূদন হাত বাড়ালেন। বিদ্যাসাগর বলিলেন.—মধু, ও টাকা নিও না, এসব অন্য লোককে দেবার জন্যে রয়েছে। কিন্তু বলবার আগেই মুঠা ভরে মাইকেল টাকা তুলে নিলেন,—যাবার সময় বলে গেলেন—পণ্ডিত, তুমি সত্যিই দয়ার সাগর।

বিদ্যাসাগর বিরক্ত হলেন না। কার ওপর বিরক্ত হবেন? সরল ও সংযমহীন এই মানুষটির উপর? কবির আচরণ দেখে তিনি একটু হাসলেন মাত্র।
বিলিতি হোটেলে থাকেন, বিলিতি চালচলন, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং নিজে বিলাত-ফেরৎ—তবু মধুসূদনকে বিদ্যাসাগর ভালোবাসতেন—ঠিক মা যেমন তার সন্তানকে ভালোবাসে। সময়ে সময়ে মধুসূদনের ভালোবাসার অত্যাচার হয়তো ব্রাহ্মণের সহিষ্ণুতার সীমা লঙ্ঘন করেছে, তথাপি বিদ্যাসাগর মধু বলতে অজ্ঞান; মধুর অসুবিধা হচ্ছে শুনলে পরে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। দুই যুগ-বিপ্লবীর মধ্যে এ এক বিচিত্র অনুরাগ-ভরা সম্পর্ক। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার কমনীয় কান্তির মধ্যে এসে পড়েছিল মধুসূদনের প্রদীপ্ত রশ্মি—তাই কী এই আকর্ষণ?

যারা দয়ার দান গ্রহণ করে, তাদের মাথা দাতার কাছে নিচু থাকে। কিন্তু তেমন ভাবে বিদ্যাসাগরের কাছে মাইকেল কোনো দিন মাথা নিচু করেন নি। বিদ্যাসাগরকে তিনি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন; কিন্তু কোনো দিন তাঁর কাছে মেজাজ খাটো করেন নি। ঠিক এইজন্যেই বিদ্যাসাগর উচ্ছৃঙ্খল, অমিতব্যয়ী কবিকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ দয়াপরবশ হয়ে বিদ্যাসাগর মাইকেলের পেছনে দাঁড়ান নি; তিনি দাঁড়িয়েছিলেন একটি প্রতিভাকে রক্ষা করতে। মধু-বিদ্যাসাগর সম্পর্কের এই হলো নিগূঢ় কথা।
দিন যায়।
বিদ্যাসাগর দেখলেন, মধুসূদনের কাছ থেকে টাকা আদায় হওয়া কঠিন। অথচ পাওনাদারেরা টাকার জন্যে তাগাদা দিচ্ছে। বিলেতে মধুসূদনকে তিনি প্রথমবার যে টাকা পাঠিয়েছিলেন সে টাকা তিনি জজ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ধার করে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মধুসূদন ফিরে এলেই পরিশোধ করবেন। দ্বিতীয়বার টাকা পাঠিয়েছিলেন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছ থেকে কোম্পানির কাগজ ধার করে। এক চিঠিতে বিদ্যাসাগর মাইকেলকে এইসব কথা খুলে লিখলেন এবং পরিশেষে এই কথা লিখলেন: "কিন্তু উভয় স্থলেই আমি অঙ্গীকারভ্রষ্ট হইয়াছি এবং শ্রীশচন্দ্র ও অনুকূল বাবুর টাকা সত্বর না পাইলে বিলক্ষণ অপদস্থ ও অপমানগ্রস্থ হইব, তাহার কোন সংশয় নাই।"

উত্তরে মাইকেল লিখলেন:

"প্রিয় বিদ্যাসাগর, এই মাত্র তোমার পত্র পাইলাম; এই পত্রপাঠে প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ পাইলাম। তুমি জানো, পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ নাই, যা আমি তোমার জন্য করিতে কুণ্ঠিত হইব। এই অপ্রীতিকর ঋণভার হইতে মুক্তিলাভের জন্য তুমি যাহা আবশ্যক বোধ কর তাহাই করিবে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। আমার সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া শ্রীশ একুশ হাজার টাকা ঋণদানে সম্মত আছেন। তুমি কি মনে কর, অনুকূল উক্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া আরো কিছু বেশী টাকা ঋণ দিতে পারেন না? ...এইরূপে যদি সম্পত্তিটা বাঁচান যায় ভালই, না হয়তো শেষ পর্যন্ত ছাড়িয়া দিব।"

টাকা আদায় হলো না।

অবশেষে মধুসূদনের ঋণ পরিশোধ করতে বিদ্যাসাগরকে সর্বস্বান্ত হতে হলো। তিনি তাঁর প্রেসের অর্ধেক বিক্রী করে দিলেন। শ্রীশচন্দ্রের কাছ থেকে টাকা ধার করে বিদ্যাসাগর মাইকেলকে বাঁচিয়েছিলেন। পাওনা টাকার জন্যে শ্রীশচন্দ্র যখন পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তখন নিরুপায় বিদ্যাসাগর তাঁর প্রেসের এক তৃতীয়াংশ রাজকৃষ্ণবাবুকে চার হাজার টাকায় এবং কালীচরণ ঘোষকে এক তৃতীয়াংশ চার হাজার টাকায় বিক্রী করতে বাধ্য হলেন। দেনার দায়ে তাঁর সাধের ছাপাখানা বিক্রী হয়ে গেল। এর সংগঠনে তাঁকে কম পরিশ্রম করতে হয় নি। মধুসূদনের জন্যে তাঁর এই অসামান্য ত্যাগের দৃষ্টান্ত থেকে অনেক কিছু শিখবার আছে।

বিদ্যাসাগর দেনা শোধ করলেন, কিন্তু ওদিকে অমিতব্যয়ী কবির ঋণের পরিমাণ বেড়েই চললো। সেই বিপুল ঋণভার থেকে মুক্ত হবার জন্যে তিনি বিদ্যাসাগরকে যে শেষ চিঠি লেখেন, তার উত্তরে বিদ্যাসাগর ইংরেজিতে কবিকে এই মর্মে লিখলেন: "তোমার আর আশাভরসা নাই। আর কেহই অথবা আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। তালি দিয়া আর চলিবে না।"

তালি দিয়ে আর চলেও নি। রোগের যন্ত্রণা, ঋণের যন্ত্রণা কবির শেষ জীবনকে অশান্তিময় করে তুলল। এর ন মাস পরেই ভাগ্য-বিতাড়িত কবির বেদনা-বিধুর জীবন-নাট্যের উপর চিরদিনের মতো যবনিকা পড়লো। মেঘনাদবধ কাব্যের কবি কপর্দকহীন অবস্থায় হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মধু-বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক কিন্তু এইখানেও শেষ নয়।
এর পরেও একটু কাহিনী আছে।
বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার লিখেছেন: "মধুসূদনের লোকান্তর গমনের দীর্ঘকাল পরে সিটী কলেজের অধ্যক্ষ—বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক আহুত মধ্যবাংলা ও যশোহর খুলনা সম্মিলনীর মিলিত সভার উদ্যোগে মধুসূদনের অস্থিপঞ্জর রক্ষা ও তদুপরি কোন প্রকার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের চেষ্টা হয়। উক্ত সভার অনুরোধ ক্রমে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি বহু আলাপ ও বিলাপের পর অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিয়াছিলেন, 'দেখ, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যাহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারি নাই, তাহার হাড় রাখিবার জন্য আমি ব্যস্ত নই। তোমাদের নূতন উৎসাহ ও আগ্রহ আছে, তোমরা করগে'।"

বিদ্যাসাগর মধুসূদনকে কেন এমন গভীরভাবে ভালোবাসতেন?
কেন তিনি অমিতব্যয়ী কবির ঋণশোধ করতে তাঁর প্রেস বিক্রী করলেন?
মাইকেল সম্পর্কে তাঁর প্রাণ সত্যই বাঙালি মায়ের প্রাণের মতো ছিল—করুণা ও কোমলতায় ভরা।
তাঁর সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও কেন বিদ্যাসাগর মাইকেলের প্রতি এমন আকর্ষণ বোধ করতেন?
মাইকেল তাঁর ঋণ পরিশোধ করতে পারেন নি সত্য কিন্তু এজন্যে বিদ্যাসাগর কখনো তাঁকে ভর্ৎসনা করলেও অনুযোগ করেন নি। কেননা, একমাত্র বিদ্যাসাগরই জানতেন যে এই অমিতব্যয়ী কবির কাছে বাঙলা সাহিত্যের ঋণের শেষ নেই। জানতেন, মধুসূদনের প্রতিভার বিমল রশ্মি বাংলার সাহিত্যাকাশকে অপূর্বরাগে রঞ্জিত করেছে। বিপ্লবী বিপ্লবীকে যেমন বুঝতে পারে, চিনতে পারে, এমন আর কেউ পারে না। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। বাংলা কাব্যে পয়ারের শৃঙ্খল ভেঙে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করে মাইকেল তাঁর বিপ্লবী-মনের পরিচয় দিয়েছিলেন, যেমন শিক্ষা-বিস্তারে বাধা ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে বিপ্লবী-মনের পরিচয় দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বাংলা গদ্য সাহিত্যে তিনি যেমন যুগান্তর নিয়ে এসেছিলেন, মধুসূদনের নেতৃত্বে বাংলা পদ্যসাহিত্য স্বপ্নাতীত এক অভাবনীয় পথে

পরিচালিত হয়ে, সেই একই যুগান্তর এনেছিল। বিদ্যাসাগর মেরুদণ্ডহীন বাঙালিকে শিখিয়েছিলেন পৌরুষ; মধুসূদনও তাই করেছেন কাব্যে। তাঁর কাব্যে সেই যুগের যে বাণীমন্ত্রটি তাঁর ছন্দকে এমন স্পন্দিত, এবং প্রাণময় করেছিল, তা হলো পৌরুষ, তা হলো নবযৌবনের আগ্নেয় অভিব্যক্তি। বিদ্যাসাগরের কাজে আমরা যা দেখতে পাই, মধুসূদনের কাব্যেও আমরা সেই পৌরুষের যৌবনদৃপ্ত রূপ ও মহিমময় বন্দনা শুনতে পাই। এইখানে বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের মধ্যে আশ্চর্য মিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন যেমন শক্তিধর পুরুষ, সমাজসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে, আমরা দেখেছি, তেমনি শক্তিধর পুরুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর। বিপ্লবীর সকল গুণই দুজনার মধ্যে ছিল। দুজনাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে যুগ-প্রবর্তক। নিন্দা, অবজ্ঞা এবং উপহাস অজস্রধারে দুজনের উপরেই বর্ষিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর তাই সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও মধুসূদনের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেন নি। বিদ্যাসাগর-মধুসূদনের এই গভীর অনুরাগ-ভরা সম্পর্ক নিঃসন্দেহে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর এই দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালির মধ্যে যে যোগাযোগ ঘটেছিল, সেই ইতিহাস প্রত্যেক বাঙালির কাছে বিশেষ চিত্তাকর্ষক। বিদ্যাসাগর ও মাইকেল ছিলেন প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত পথের পথিক; অথচ দুজনের জীবনে এমন বন্ধুত্ব ও মিলন ঘটেছিল, যা আমাদের দেশে বড় একটা চোখে পড়ে না। মাইকেল খাঁটি সাহেব। এ দেশে তিনিই প্রথম খাঁটি য়ুরোপীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, খাঁটি ইংরেজি সাজপোষাক চালু করেন এবং প্রথম সিগারেট মধুসূদন শুরু করেন। এ দেশের ঢিলে জীবন-যাত্রা ও সাধারণ লোকের মনোভাবকে তিনি বিদ্রূপ করতেন। অথচ তাঁর হৃদয়ের গোপন কোণে সুরবীণায় স্বদেশের ইতিহাসগুলিই কবিতা হয়ে বেজে উঠত। আর ধুতি-চাদর ও চটিজুতা পরিহিত বিদ্যাসাগর ছিলেন খাঁটি ভারতীয়; এ দেশের য়ুরোপীয় সমাজেও তিনি মেনে চলতেন ভারতীয় আচার-ব্যবহার। অথচ তাঁর অধিকাংশ চিন্তাধারা ও কাজ ছিল শিক্ষিত ইংরেজের মত। বিদ্যা-সাগরের জন্ম অখ্যাত দরিদ্র পরিবারে, ছাত্রজীবন কাটে কঠিন সংগ্রাম ও কষ্টসহিষ্ণুতার মধ্যে। মাইকেলের জন্ম খ্যাতনামা ধনী পরিবারে, ছাত্রজীবন অতিবাহিত চরম বিলাসিতার মধ্যে। সংযম ও অধ্যবসায় সাগর-চরিত্রের

প্রধান বৈশিষ্ট্য আর অসংযম ও অমিতাচার মাইকেলের জীবনের প্রধান কথা। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সংস্কৃতে, মাইকেলের শিক্ষা ইংরেজী ও প্রাচীন য়ুরোপীয় ভাষায়। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের একজন পথিকৃৎ; মাইকেল বাংলা কাব্যের একজন পথপ্রদর্শক। বিদ্যাসাগরের পিতৃমাতৃভক্তির তুলনা নেই, মাইকেল পিতামাতার বুকে হেনেছিলেন চরম আঘাত। মাইকেল উদ্দাম, গতিসম্পন্ন ও অধৈর্য, বিদ্যাসাগর স্থির মস্তিষ্ক ও সংকল্পে অটল। মাইকেলের বিকাশ সাহিত্য-সৃষ্টিতে ও অধ্যয়নে, বিদ্যাসাগরের বিকাশ চিন্তায় ও কাজে। বিদ্যাসাগর দান করতেন দশ হাতে, মাইকেল ইনাম ও বকশিস দিতেন তেমনি ভাবেই। কিন্তু দুজনে দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন কি করে? স্বীয় প্রতিভায় সমুজ্জ্বল মাইকেল তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাতেন কেবলমাত্র তাঁরও চেয়ে বৃহত্তর প্রতিভার অধিকারীকে। এই শ্রদ্ধা তিনি জানিয়েছিলেন ইংরেজি, গ্রীক ও লাতিন ভাষার মহাকবিদের। কিন্তু ধুতিচাদর-পরিহিত বাঙালি বিদ্যাসাগরকে তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা ও সম্মান। কেন? মাইকেল বুঝেছিলেন, এ দেশে মানুষের মত মানুষ থাকে তো সে ঐ বিদ্যাসাগর। মাইকেলের কাছে বিদ্যাসাগর ছিলেন আদরের 'বিদ্'। তিনিই ছিলেন তাঁর প্রিয়তম সুহৃদ আর সবচেয়ে শুভাকাঙ্ক্ষী। বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন মাইকেলের মধ্যে এক বিদ্রোহীকে। দূরদ্রষ্টা, মহাজ্ঞানী, যুগপ্রবর্তক বিদ্যাসাগরই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সঠিক বুঝেছিলেন, মধুসূদনের প্রতিভা কোন্ শ্রেণীর। তাইতো তিনি বলেছিলেন: "মধু বাংলাদেশের অলঙ্কার।" তিনি জানতেন, এ দেশে একটি বিরাট প্রতিভা থাকে তো সে হচ্ছে ঐ মাইকেল। প্রতিভা না হলে প্রতিভাকে চিনতে পারে না। বিরাট প্রতিভাবান্ পুরুষ বিদ্যাসাগর তাই মাইকেলকে চিনেছিলেন সকলের চেয়ে বেশী করে। দুজনের বন্ধুত্বের এই হলো প্রকৃত ইতিহাস।

এমনি আরো একজন কবিকে বাঁচিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় কবি নবীনচন্দ্র সেন।

নবীনচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় এলেন উচ্চশিক্ষার জন্যে। ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। সেই সময়ে তরুণ নবীনচন্দ্রের মাথায়

অকস্মাৎ ভেঙে পড়লো দুর্যোগের মেঘ। বি, এ, পরীক্ষার যখন প্রায় তিন মাস বাকি, সেই সময় নবীনচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হলো। নবীনচন্দ্রের পিতা গোপীমোহন অজস্র উপার্জন করতেন, কিন্তু ব্যয়ও করতেন দু'হাতে। দানশীলতার জন্যে তিনি বিশেষ কিছুই সঞ্চয় করতে পারেন নি। তাই মৃত্যুকালে গোপীমোহন ছেলের জন্যে রেখে গেলেন ঋণের বোঝা ও একটি নিরাশ্রয় বৃহৎ পরিবার। নবীনচন্দ্র পথের কাঙাল হলেন। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে নবীনচন্দ্রকে কি রকম দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং কে তাঁকে সেই দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করেছিলেন, তার মর্মস্পর্শী বিবরণ কবি তাঁর 'আত্মচরিতে' এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন:

"একটি কিশোরবয়স্ক কলিকাতার পথের কাঙাল কেমন করিয়া কূল পাইবে? সকল অবলম্বন ভাসিয়া গিয়াছে, সকল আশা নিবিয়া গিয়াছে। একমাত্র আশা সেই বিপদভঞ্জন হরি। ভক্তিভরে, অবসন্ন প্রাণে, কাতর অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিলাম। তিনি প্রহ্লাদের মত আমাকেও তাঁহার নরমূর্তিতে দেখা দিলেন। সেই নর-নারায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পরদিন প্রাতে তাঁহারই শরণ লইতে চলিলাম। বলিলাম—আমি পিতৃহীন, ঘোরতর বিপদগ্রস্ত। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করিলেন—বিপদ কি? আমি তখন ভগ্নকণ্ঠে আমার দুঃখের কাহিনী তাঁহার কাছে নিবেদন করিলাম। তিনি অধোমুখে নিবিষ্ট মনে শুনিতে লাগিলেন। আর তাঁহার কপোলযুগল বহিয়া ধীরে ধীরে গোমুখী হইতে সুরধুনী ধারার মত দুটি সন্তাপহারিণী প্রেমধারা ঝরিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—তুমি এখনও বালক, আর তোমার উপর এ বিপদ! কিন্তু তুমি কাতর হইও না। আমিও একদিন তোমার মত দুঃখী ছিলাম। সংসারে দুঃখই অধিক। তোমার মাসিক খরচ কি লাগে?"

সেদিন এই বিদ্যাসাগর না থাকলে নবীনচন্দ্রের কি হতো বলা যায় না।

উত্তরকালে বিদ্যাসাগরের দয়ার ঋণ স্মরণ করে কবি তাঁর 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য তাঁকে উৎসর্গ করেন এবং বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর 'মানব-ঈশ্বর' শীর্ষক একটি সুন্দর কবিতায় বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর অন্তরের নির্মল শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। নবীনচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁর 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য উৎসর্গ করে লিখেছিলেন:

"দেব! যে যুবক দুঃখের সময়ে অশ্রুজলে একদিন আপনার চরণ অভিষিক্ত

করিয়াছিল, আজি সেই যুবক আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইল। আপনার আশীর্বাদে, ততোধিক আপনার অনুগ্রহে, আজি তাহার বদন, হৃদয় প্রসন্ন আনন্দে পরিপূর্ণ। আপনার দয়ার সাগরের বিন্দুমাত্র সিঞ্চনে দরিদ্রতা-দাবানল হইতে যেই মানস-কানন রক্ষা পাইয়াছিল, আজি সেই কানন-প্রসূত একটি ক্ষুদ্র কুসুম আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইল…"

বিদ্যাসাগরকে নবীনচন্দ্র শুধু মানব-ঈশ্বর বলে ক্ষান্ত হননি—নর-নারায়ণ বলে পুজা করেছিলেন। বিপন্ন অবস্থায় তিনি যে উপকার পেয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে, তা নবীনচন্দ্রের চিরদিন মনে ছিল। পরবর্তী কালে সকৃতজ্ঞচিত্তে কবি তাই লিখলেন: "সেই নর-নারায়ণ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সেই ভগবদ্বাক্য—ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে—মানবের একমাত্র সান্ত্বনার কথা। "পুণ্যং পরোপকারশ্চ পাপঞ্চ পরপীড়নে"—এই মহাধর্ম সংস্থাপন করিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অবতার।...তাঁহার মৃত্যু নাই। তিনি চিরজীবী। তিনি চিরদিন শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই থাকিবেন!"

কলকাতায় পড়তে এসে বিদ্যাসাগরকে প্রথম দেখে নবীনচন্দ্র তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন: "এই কি খ্যাতনামা বিদ্যাসাগর? সমস্ত বঙ্গদেশ যাঁহার বেতালে আমোদিত, শকুন্তলায় মোহিত, এবং সীতার বনবাসে আর্দ্রিত হইতেছে, এই কি বঙ্গভাষার স্থষ্টিকর্তা সেই বিদ্যাসাগর? যাঁহার নাম প্রত্যেক নর-নারীর মুখে, যিনি মৃত হিন্দুসমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছেন, ইনিই কি সেই বিদ্যাসাগর? এই খর্বাকৃতি, চক্রাকারে মুণ্ডিত মস্তক, নিমজ্জিত তীক্ষ্ণ নেত্র, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক অধরভঙ্গি, গগনপথ-উচ্চ প্রশস্ত ললাট, প্রশস্ত উরস, বলিষ্ঠ শরীর, কৃষ্ণবর্ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর? চরণে চটি, পরিধানে সামান্য ধুতি, গলায় বিশদ অমল-ধবল মুক্তাহারসন্নিভ যজ্ঞোপবীত, হস্তে ক্ষুদ্র রজতনলসংযুক্ত একটি হুকা, মুখে হাসি, মূর্তিতে শান্তি, হৃদয়ে অমৃতরাশি—আমাদের ন্যায় বালকের সঙ্গে পর্যন্ত সমানভাবে চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত সস্নেহ আলাপ করিতেছেন—এই কি সেই বিদ্যাসাগর! আমরা বিস্মিত, স্তম্ভিত, মোহিত হইলাম।"

কলকাতায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তরুণ নবীনচন্দ্রের এই প্রথম পরিচয়। তারপর পিতৃহীন নবীনচন্দ্রের বিপদের কথা শুনে বিদ্যাসাগর তাঁর যে উপকার করেছিলেন, কবি তারই সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি স্বরূপ লিখলেন: "এই উত্তাল

বিপদর্ণবের ঘোরতর অন্ধকার মধ্যে সেই নরনারায়ণ মূর্তি দেখিলাম।... ক্রমে ক্রমে সকলকে বিদায় দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আমার বিপদ কি? আমি তখন অতি কষ্টে ও কণ্ঠবাষ্প অবরোধ করিয়া ভগ্নকণ্ঠে আমার দুঃখের কাহিনী তাহার কাছে নিবেদন করিলাম। তিনি অধোমুখে বিনিষ্টমনে শুনিতে লাগিলেন।"...পরবর্তী কাহিনী সুপরিচিত।

এমনি করেই সেদিন বাংলার এই দুই কবি—মধুস্থদন ও নবীনচন্দ্র মানব-দরদী বিদ্যাসাগরের করুণা লাভ করে কৃতার্থ হয়েছিলেন।

এক কবি আখ্যা দিলেন—করুণার সিন্ধু।

অপর কবি বন্দনা করলেন নর-নারায়ণ ও মানব-ঈশ্বর বলে।

॥ একুশ ॥

সমাজ-সংস্কার বা জনসেবার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা প্রধানত তিন দিকে প্রকাশ পেয়েছিল : বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ নিরোধ এবং সুরাপান নিবারণ। প্রথমটির কথা বলেছি, এইবার অন্য প্রচেষ্টা দুটির কথা বলব। তাহলেই জনসেবার ক্ষেত্রে তাঁর সমগ্র মূর্তিটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বহুবিবাহের কথাই আগে বলি।

"বিধবাবিবাহের আন্দোলন ও আইন পাশ লইয়া যে সময়ে সমগ্র দেশবাসী বিব্রত, কেহ বা স্বপক্ষতা কেহ বা বিপক্ষতা করিতে বদ্ধপরিকর, ঠিক সেই সময়েই বঙ্গদেশীয় কুলীনগণের অনুষ্ঠিত বহুবিবাহ-প্রথা রহিত করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুলোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন-পত্র গভর্ণমেণ্টের সদনে প্রেরণ করেন।

ঘটনাটা ঘটে বিধবাবিবাহের ঐতিহাসিক আবেদন-পত্র পাঠাবার ঠিক আড়াই মাস পরেই। সুতরাং দুইটি কাজে তিনি একসঙ্গেই হাত দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রেও প্রায় হাজার লোকের সই-করা চিঠি গেল সরকারের কাছে। এ ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর শাস্ত্র থেকে প্রমাণ তুলে দেখালেন যে বাংলা দেশে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত বহুবিবাহ প্রথার কোন সমর্থনই নেই হিন্দুশাস্ত্রে। এই কৌলীন্যপ্রথা বাংলার সমাজ জীবনের পক্ষে কি রকম ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং অবিলম্বে এর উচ্ছেদ যে প্রয়োজন তা বিদ্যাসাগর বিশেষভাবে উপলব্ধি করলেন। তিনি চেয়েছিলেন এই কৌলীন্যপ্রথার মূলে আঘাত করতে; তিনি চেয়েছিলেন ব্রিটিশ আইনের সাহায্যে এই প্রথা-আশ্রয়ী সামাজিক কলুষ থেকে বাংলা দেশকে উদ্ধার করতে।

বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত দ্বিতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগর পরিষ্কার ভাবেই দেখালেন এই বহু-নিন্দিত প্রথা বাংলার ব্রাহ্মণসমাজে কতদূর স্থান পেয়েছে এবং এর ফলে সমাজ-জীবন কত দূর কলুষিত হয়ে উঠেছে। তাঁর এক চরিতকার এই সম্পর্কে লিখেছেন: "তিনি উক্ত সুবৃহৎ গ্রন্থে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর উৎপত্তি, উন্নতি ও অবনতির ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ইহাতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মধ্যকালে বঙ্গদেশের কুলীন ব্রাহ্মণগণ আপন আপন পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণকে গৃহপালিত পশু অপেক্ষা অধিক যত্নের পাত্রী বলিয়া মনে করেন নাই। কোন কোন স্থলে তদপেক্ষাও দীনভাবে স্ত্রীলোকদিগকে জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে, এবং এখনও যে তাহাদের সে দুঃখের অবসান হইয়াছে এরূপ মনে হয় না।" বিদ্যাসাগরের যুগ-চেতনা স্পষ্টভাবে তাঁকে দেখিয়ে দিল যে "মন্ত্রপ্রণীত সনাতন সুব্যবস্থার অনুগত হইয়া চলিতে চলিতে সমাজস্রোত বিপথগামী হইয়াছে, তাহা নহিলে বল্লালের কৌলীন্য-প্রথা ও দেবীবরের মেলবন্ধন কিরূপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও আচার-ব্যবহারের উপর রাজত্ব করিতে পাইল?" বিদ্যাসাগর গভীরভাবে চিন্তা করলেন এ বিষয়ে এবং প্রশ্ন তুললেন "অশেষ অকল্যাণ, অনাচার ও অন্যায় আচরণের নিদানস্বরূপ" বহুবিবাহ প্রথা কেন রহিত হবে না? কৌলীন্য-প্রথা ও দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধনের কল্যাণে কী পরিমাণ সামাজিক অনাচার, দুর্নীতি, ব্যভিচার এবং আনুষঙ্গিক নারীনির্যাতন জমে উঠেছে, কয়েকটি অঞ্চলের কুলীন ব্রাহ্মণের ইতিহাস থেকে অশেষ পরিশ্রম সহকারে বিদ্যাসাগর তা জনসমক্ষে তুলে ধরলেন। এই কলুষ-চিত্রের পশ্চাতে বিদ্যাসাগরে হৃদয়ের কী আর্তি, কী অপরিসীম বেদনা, সামাজিক অচলায়তন বিনষ্ট করে আধুনিককাল-সম্মত মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার কী সুমহান্ আগ্রহ, তার পরিচয় আছে তাঁর বহুবিবাহ সম্পর্কিত বিখ্যাত পুস্তকে।

'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না' বইয়ের সূচনায় বিদ্যাসাগর লিখছেন: "স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়মদোষে, পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন। এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, তাঁহারা পুরুষজাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছ প্রবৃত্ত হইয়া অত্যাচার ও অনাচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, সেই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান করেন।...বহু-

বিবাহপ্রথা এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছে। এই অতি জঘন্য, অতি নৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে স্ত্রীজাতির দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই। এই প্রথার প্রবলতাযুক্ত তাঁহাদিগকে যে সমস্ত ক্লেশ ও যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে, সে সমুদায় আলোচনা করিয়া দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। ফলতঃ এতন্মূলক অত্যাচার এত অধিক ও এত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে যাঁহাদের কিঞ্চিৎমাত্র হিতাহিত-বোধ ও সদসদ্বিবেচনাশক্তি আছে, তাদৃশ ব্যক্তিমাত্রেই এই প্রথার বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠিবেন। তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা, এই প্রথা এই দণ্ডে রহিত হইয়া যায়।…এ বিষয়ে, কোন কোন পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। যথাশক্তি সেই সকল আপত্তির উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি।"

বিধবাবিষয়ক পুস্তকে যেমন, বহুবিবাহ সম্পর্কিত বই রচনাতেও বিদ্যাসাগর তেমনি তাঁর গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, বহুদর্শন ও লোকহিতৈষণার প্রচুর পরিচয় দিয়েছেন। বহু যত্নে তিনি পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার নানা জায়গা থেকে বহু-বিবাহকারীদের তালিকা সংগ্রহ করেছিলেন। কোনো কাজই তিনি অসম্পূর্ণ-ভাবে করতেন না—প্রত্যেক কাজই তিনি এইরকম নিখুঁতভাবে করতেন। তাঁর রীতিই ছিল এই। সস্তায় নাম কিনবার জন্যে কাজ করতেন না, কাজ করবার জন্যেই কাজ করতেন। এই গুণেই বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর।

বহুবিবাহ সম্পর্কিত প্রথম পুস্তক প্রকাশিত এবং প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রত্যুত্তরে অনেকে অনেক রকম বই লিখলেন—যেমন হয়েছিল বিধবাবিবাহ পুস্তকের বেলায়। তারানাথ বাচস্পতি, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত ক্ষেত্রনাথ স্মৃতিরত্ন, মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা কবিরাজ গঙ্গাধর কবিরত্ন প্রমুখ অনেকেই এর প্রতিবাদ করেন। সারা বাংলাদেশেই আলোড়ন উঠল। গান ও ছড়াও বাঁধা হয়েছিল বিদ্যাসাগরের নামে। এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত 'কুলীন-কামিনীর উক্তি' নামে একটি কবিতা এই সময়কার একটি বিখ্যাত রচনা। বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন বিদ্যাসাগর, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর বিচারে যে তর্ক-নিপুণতা, মীমাংসাপটুতা, অনুসন্ধিৎসা এবং বিদ্যাবুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, দুঃখের বিষয় তাঁর প্রতিবাদকারীদের কেউই সে রকম বিচার-নৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি; তাঁরা শুধু অধৈর্যভাবে বিদ্যাসাগরকে লেখনীমুখে আক্রমণ করেছিলেন। সে সব গালিগালাজের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বিদ্যাসাগর এই বহুবিবাহ আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নানা আকারে এই আন্দোলন চলেছিল কুড়ি বছর। সরকারী কাজে ইস্তাফা দেবার ঠিক দুবছর আগে তিনি এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। প্রথম আবেদন পত্রের দশ বছর পরে পাঠান হলো দ্বিতীয় আবেদনপত্র। এতেও সই ছিল একুশ হাজার লোকের। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সমর্থন করেন নি, এই বহুবিবাহ আন্দোলনের সময় তাঁর পক্ষ সমর্থন করেন এবং দ্বিতীয় আবেদনপত্রের তিনিও ছিলেন অন্যতম স্বাক্ষরকারী। বাংলার জনমত সেদিন বিদ্যাসাগর এমন ভাবেই তাঁর এই প্রচেষ্টার অনুকূলে গঠিত করেছিলেন যে কৃষ্ণনগরের মহারাজা থেকে শুরু করে তখনকার বাংলার বহু বিশিষ্ট জননায়ক ও স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষরকারী ছিলেন নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ স্মার্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ; বিধবাবিবাহ আন্দোলনে ইনিই ছিলেন বিদ্যাসাগরের একজন প্রবল বিরুদ্ধবাদী। তখনকার সামাজিক পরিবেশে এই একুশ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করা খুব সহজ কাজ ছিল না। এ ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের সংগঠনী প্রতিভা আশ্চর্যভাবে কাজ করে গেছে।

বিদ্যাসাগর পুস্তক লিখেই নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি জানতেন এ দেশের লোক দেশাচারের দাস, শাস্ত্রের নয়। আইন ভিন্ন এ দেশে সমাজসংস্কারের পথ নেই। বহুবিবাহ রদ করবার জন্যে তিনি সরকারকে দিয়ে একটা আইন পাশ করাবার চেষ্টা করেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে, তখনকার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, কাশীর রাজা দেবনারায়ণ সিংহকে দিয়ে আইন সভার এই সম্পর্কে একটা বিল আনবার জন্যে উদ্যোগীও হয়েছিলেন। কিন্তু সে উদ্যোগ কাজে পরিণত হয়নি। তারপর তিনি ছোটলাটের কাছে পূর্বোক্ত আবেদনপত্র পাঠালেন।

বহুবিবাহ আন্দোলন অল্পদিনের মধ্যে এমন তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, আন্দোলনের এক বছর পরেই একে কেন্দ্র করে রচিত হলো 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক'। এই নাটক রচনা করলেন সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্করত্ন এবং এর অভিনয় হলো রামজয় বসাকের বাড়ি। বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে এই নাটক একটি স্মরণীয় ঘটনা। দেশী নাটকের সূত্রপাত এখান থেকেই, বিশেষভাবে প্রহসনের একটি প্রধান পথ নির্দেশ করে দিল রামনারায়ণের এই 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক'। এই নাটক রচনা করে রামনারায়ণ অর্থ ও যশ

দুই-ই লাভ করেন। এই নাটক রচনার একটি নেপথ্য ইতিহাস আছে। আগেই বলেছি, বিদ্যাসাগরের যুগে (ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদ থেকেই বিদ্যাসাগর-যুগের আরম্ভ) শিক্ষিত সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম সক্রিয় ফল দেখা দিয়েছিল সমাজ-সংস্কারে। আগে থেকেই যাত্রায়, কবিতায় ও নক্শায় সমাজ অথবা শ্রেণী বিশেষের ব্যঙ্গচিত্র জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের একটি প্রধান উপকরণ যুগিয়ে আসছিল। সাধুবেশী পাষণ্ডের ভণ্ডামী, মূর্খের ধনগর্ব ও কুলাভিমান, পণ্ডিতের বিদ্যামদ, ধনীর লাম্পট্য, অসতীর বিড়ম্বনা এবং সতীর দুর্দশা—এই ছিল সাধারণতঃ যাত্রার সঙের এবং নক্শা-চিত্রের প্রধান উপজীব্য। এর মধ্যে সমাজ-সচেতনতা কতটা সক্রিয় ছিল তা সঠিক বলা যায় না—কেননা তখনো পর্যন্ত কোন আন্দোলনকে আশ্রয় করে এই মনোভাব অভিব্যক্ত হয় নি; চিত্তবিনোদনই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। তবু একথা অস্বীকার করা চলে না যে ধীরে ধীরে এই চিত্তবিনোদন থেকেই শিক্ষিতদের মধ্যে একটা তীব্র সামাজিকবোধ জন্ম নিচ্ছিল। যুগ-পরিবর্তনের প্রণালীই এই; ইতিহাসের গর্ভে অলক্ষ্যে কোন্ মহাশক্তি জন্ম নেয়, তা সমসাময়িক কালের একাধিক ঘটনার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে বোধগম্য হয়। বহুবিবাহরূপ এই যে সামাজিক-কলুষ বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনধারাকে পঙ্কিল করে তুলেছিল তার চিত্রটা অনেকের সামনেই ছিল, কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন বিদ্যাসাগর, আর রামনারায়ণ তাকেই ফুটিয়ে তুললেন নাটকে। অবশ্য রামনারায়ণ স্বেচ্ছায় এই নাটক-রচনায় অগ্রণী হতেন কি না সন্দেহ, যদি না রংপুর কুন্তীগ্রামের জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী কাগজে বিজ্ঞাপন দিতেন। কালীচন্দ্র শিক্ষিত ছিলেন। তাঁর ধারণা হলো, নাটকের মাধ্যমে সমাজের এই কলঙ্কচিত্রের পরিণামটা দেখাতে পারলে সাধারণের চোখ ফুটবে। তিনি বিজ্ঞাপন দিলেন, "বল্লালসেনীয় কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীনকামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব সম্বলিত 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তিনি তাঁহাকে ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন।"

এই বিজ্ঞাপনটি নিয়ে রামনারায়ণ একদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বিজ্ঞাপনটি পড়ে বিদ্যাসাগর বললেন—রামনারায়ণ, তুমি এই নাটক লেখ।

তোমার ক্ষমতা আছে; তুমিই না 'পতিব্রতোপাখ্যান' বই লিখে এই কালী চৌধুরীর কাছ থেকে পারিতোষিক পেয়েছিলে ?

—হাঁা, তা পেয়েছিলাম। কিন্তু বল্লালী-বিধান নিয়ে নাটক রচনা করা—পারব কি ?

—আমি বলেছি; তুমি পারবে। আমি যে আন্দোলনে হাত দিয়েছি, তুমি নাটক লিখলে এ আন্দোলন আরো জোর হবে।

কালীচন্দ্রের বিজ্ঞাপনের উত্তরে আর বিদ্যাসাগরের উৎসাহে রামনারায়ণ রচনা করলেন 'কুলীনকুল-সর্বস্ব নাটক'। পুরস্কার তিনিই পেলেন এবং বহুবিবাহ আন্দোলনকে এই নাটকের অভিনয় যে অনেকখানি সহায়তা করেছিল তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। কথিত আছে, নাটকের পাণ্ডুলিপি রামনারায়ণ প্রথম বিদ্যাসাগরকে দেখিয়েছিলেন। তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করে এই মন্তব্য করেছিলেন: নাটক ভালোই হয়েছে, যদিও ভারতচন্দ্রের অনুকরণ সুস্পষ্ট এবং তোমার অভব্যচন্দ্রের ভূমিকায় মৃচ্ছকটিকের শকার অনুকৃত হয়েছে। বাংলাদেশে সেই সময়ে শহরে ও মফঃস্বলে এই নাটকের বহু অভিনয় হয়েছিল। এর সমাদরও হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রামনারায়ণের নাটকগুলির মধ্যে 'কুলীনকুলসর্বস্বই' শ্রেষ্ঠ রচনা। কৃত্রিম কৌলীন্য প্রথায় বাংলাদেশের যে দুরবস্থা ঘটেছে তারই কৌতুকাবহ ব্যঙ্গচিত্র এই নাটক। এই নাটকের বাস্তব সরলতা সত্যই উপভোগ্য। সামাজিক-কুপ্রথা-পেষণের যন্ত্ররূপে নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন রামনারায়ণ 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নিয়ে। দু'বছর পরে সেকালের সামাজিক নাটক প্রহসনের সবচেয়ে জনপ্রিয় বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে নাট্যের বিষয় করে উমেশচন্দ্র মিত্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে নতুন জোর দিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সংস্কার-বিরোধী পক্ষ থেকেও পাল্টা নাটক নিয়ে বিধবা-বিবাহের বিষময় ফল দেখান হয়েছিল। তবে সে সব নাটকের কোনটাই সার্থক রচনা হয় নি। রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের মতো উমেশচন্দ্রের 'বিধবা-বিবাহ নাটক'ও বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। সংরক্ষণশীল সমাজে এই দুখানা নাটকই সেদিন তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল এবং পরোক্ষে বিদ্যাসাগরের এই দুই আন্দোলনেই শক্তি জুগিয়েছিল।

বিদ্যাসাগর অশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে বাংলা দেশে কুলীন-প্রথা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেন এবং কুলীন-ব্রাহ্মণদের বিবাহের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেন। সেই তথ্য এবং তালিকা থেকে যে মর্মান্তিক চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় স্তন্যপায়ী শিশুর পর্যন্ত বিয়ের ব্যবস্থা ছিল। চার বছরের মেয়ের পাঁচটা স্বামী আবার চার বছরের ছেলের পঞ্চম পক্ষের পূর্ণযৌবনা স্ত্রী; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অল্প বয়সের বালিকাদের বৃদ্ধ, অসমর্থ, উপায়হীন ও হীনচরিত্র লোকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়; আজীবন পিতৃগৃহে কায়ক্লেশে যাদের জীবন-ধারণ করতে হতো, যাদের স্বামী অপরিজ্ঞাত বা কিম্বদন্তী মাত্র, তাদের পক্ষে গোপন ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক এবং ভ্রূণহত্যা সে ক্ষেত্রে অনিবার্য। বিদ্যাসাগর তাঁর হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন এইসব কুলীন-কামিনীদের উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস কি ভাবে সমাজ-দেহকে সন্তাপিত ও পাপভারাক্রান্ত করে তুলেছে; অনুভব করলেন এদের সন্তপ্ত হৃদয়ের অভিশাপ আর সেই অভিশাপজাত অশ্রুকণা কি ভাবে বাংলার সমাজ জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে; দেখলেন এই অভিশপ্ত প্রথার আশ্রয়ে অশীতিপর বৃদ্ধ তার মৃত্যুশয্যার উপরেই পূর্ণযৌবনা নারীকে নিয়ে বাসর-গৃহ রচনা করেছে; সুপ্রবীণ বৃদ্ধ কুলীনেরা মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়েও কুলীন কন্যার বরমাল্য গ্রহণ করে কৃতার্থ হতে ব্যগ্র। সমাজ কোথায় নেমে গেছে; দেশাচার কী জঘন্য ব্যভিচার সৃষ্টি করে চলেছে। বাংলার নারীর হৃদয়ের এই নিদারুণ মর্মবেদনাই বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে সমবেদনার সঞ্চার করেছিল। তাই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন তুষানল থেকে বাংলার মেয়েদের বাঁচাবার জন্যে; সমাজের এই দুর্নীতি নিবারণ করবার জন্যে। সত্যই সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের পর বিদ্যাসাগরই দ্বিতীয় ব্যক্তি যাঁর উদ্যম, আগ্রহ ও আন্তরিকতা আজো আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের বিষয়। হৃদয়ের সমস্ত তরল আগুন ঢেলে দিয়ে তিনি এই সামাজিক কুপ্রথা ভস্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি বলেই বিদ্যাসাগর আক্ষেপ করে বলেছিলেন—"আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি।" তবে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই, কালক্রমে কৌলীন্যপ্রথার অবসান ঘটেছে।

জাগতিক সম্পর্কের মধ্যে মানুষের মানবতার অম্লান স্বীকৃতি—মানুষকে স্বীকার করতে হবে ; এবং তাকেই সমস্ত কর্মের উৎস ও লক্ষ্য বলে উপলব্ধি করতে হবে। এই উপলব্ধি এবং বোধও কালের অন্তর-প্রেরণাসম্মত। কালের হৃদয়-সঙ্কেত বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণরূপেই ধরতে পেরেছিলেন, তাই না তাঁর পক্ষে এই সব সামাজিক কর্মে আত্মোৎসর্গ করা সম্ভব হয়েছিল। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের মানদণ্ডই হলো এই মানবিকতা-বোধ।

কৌলীন্য প্রথা দূর করবার উদ্দেশ্যে একুশ হাজার লোকের স্বাক্ষরিত দ্বিতীয় আবেদন-পত্রটি ছোটলাট স্যার সিসিল বিডনের হাতে দেওয়া হয়। কমিটির পক্ষ থেকে রাজা সত্যচরণ ঘোষাল লাটসাহেবের হাতে এটা দিয়েছিলেন। আবেদন-পত্রের উপসংহারে এই কয়টি কথা লেখা ছিল : "এই অতি ঘৃণিত ও অনিষ্টকর বহুবিবাহ প্রথা রহিত করণোদ্দেশে প্রায় নয় বৎসর পূর্বে ২৫০০০ লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন-পত্র সে সময়ের মাননীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হইয়াছিল। এই জঘন্য প্রথার অনিষ্ট-কারিতা বিষয়ে নূতন করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ইতিপূর্বে যে আবেদন-পত্র প্রেরিত হয়, তাহাতে অতি বিস্তৃত ভাবে সে সকল কথার আলোচনা হইয়াছে এবং আমরা অনেকেই সে আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। সুযুক্তি এবং ধর্মশাস্ত্রের অননুমোদিত এই সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদসাধন পক্ষে যে আপনি যত্নবান হইবেন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। বিশেষতঃ এইরূপ সংস্কার-কার্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া যখন এত লোক প্রার্থনা জানাইতেছে, তখন ইহার প্রয়োজনীয়তা এবং ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার যুক্তিযুক্ততা আরো প্রবল রূপে প্রমাণিত হইতেছে।" বর্ধমানের মহারাজা মহাতাপ চাঁদও স্বতন্ত্রভাবে এই সম্পর্কে একখানা আবেদন-পত্র পাঠালেন স্যার সিসিল বিডনের কাছে। আবেদন-পত্র লাট-সাহেবকে দেবার সময়ে সত্যচরণ ঘোষালের সঙ্গে ছিলেন বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, দ্বারকানাথ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, কৃষ্ণদাস পাল, দুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতি বাছাই করা কুড়িজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

কিন্তু সরকারী ভাবে বহু-বিবাহ প্রথার বিলোপ সাধন করবার জন্যে বিশেষ কোনো সাহায্য পাওয়া গেল না। অথবা কোনো আইনও পাশ হলো না।

বিফলমনোরথ হলেও বিদ্যাসাগর উদ্যম হারালেন না।
তিনি অন্য পথে প্রতিকারের উপায় চিন্তা করলেন।
কুলীনদের দিয়েই কৌলীন্য প্রথার মূল উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হলেন।
বিদ্যাসাগরের আহ্বানে দেবীবর ঘটকের কুখ্যাত মেলবন্ধন ভেঙে সর্বদ্বারী বিয়ে করতে এগিয়ে এলেন তারপাশার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। কুলীনদের মধ্যে তিনিই এই বিয়ে প্রচলিত করতে উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় এলেন এবং বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। কিন্তু নানা কারণে বিদ্যাসাগরের এ চেষ্টাও কার্যে পরিণত হয়নি। বিদ্যাসাগরের সম্মুখে লর্ড বেন্টিঙ্কের দৃষ্টান্ত ছিল—তিনিই রামমোহনের আন্দোলনের ফলে সহমরণ প্রথা রহিত করেছিলেন। দেশাচারের বিরুদ্ধে ইংরেজের এই মহত্বপূর্ণ সুবিচারের দৃষ্টান্ত সম্মুখে রেখেই বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ প্রথা রহিত করবার জন্যে সরকারী সাহায্য চেয়েছিলেন। বিফল মনোরথ হয়ে আক্ষেপের সুরে তিনি লিখলেন: "আমরা সেই ইংরাজ জাতির অধিকারে বাস করিতেছি। কিন্তু অবস্থার কত পরিবর্তন হইয়াছে। যে ইংরেজ জাতি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, রাজ্যভ্রংশভয় অগ্রাহ্য করিয়া, প্রজার দুঃখ-বিমোচন করিয়াছেন; এক্ষণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, প্রজারা বারংবার প্রার্থনা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিতেছে না। হায়! সে দিন গিয়াছে!"
বিদ্যাসাগরের সুদৃঢ় ধারণা ছিল, সর্বাংশে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনই ইংরেজের লক্ষ্য, রাজ্যভোগের লোভে আকৃষ্ট হয়ে ইংরেজ এ দেশে তাদের অধিকার বিস্তার করে নি। কিন্তু "আবেদিত বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন" করায় তাঁর এই ধারণা কিছুটা যে শিথিল হয়েছিল, এ কথা সহজেই অনুমান করতে পারা যায়। কথিত আছে, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ সঙ্কল্প ছিল যে, বহুবিবাহ-বিষয়ক গ্রন্থের ইংরেজিতে অনুবাদ করিবেন এবং একটিবার ইংলণ্ডে গমন পূর্বক" ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবে আবেদন করবেন। তাঁর এ শুভ সংকল্প কল্পনায় রয়ে গেল। এই সাধু সংকল্প কার্যে পরিণত করবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বিধবা-বিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ নিবারণের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সকল রকম সামাজিক উন্নতি

সাধনের কাজে অতন্দ্রভাবেই নিযুক্ত ছিলেন। সমাজ-সংস্কার বিদ্যাসাগরের বিলাসিতা ছিল না, সাময়িক উত্তেজনার বিষয়ও ছিল না—এ ছিল তাঁর জীবনের ব্রত এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ ব্রত উদ্‌যাপনে একনিষ্ঠ ছিলেন। বিদ্যাসাগর বাঙালি-চরিত্র ভালো করেই অধ্যয়ন করেছিলেন, এই জাতি যে কতখানি অসার ও অপদার্থ এবং এদের কাজে ও কথায় কতখানি বৈপরীত্য—বিদ্যাসাগর তা সবিশেষ জানতেন। জানতেন বলেই সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টায় অগ্রসর হবার পূর্বে তিনি একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেন এবং যাঁরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সমর্থন করবেন বলেছিলেন তাঁদের সকলকে দিয়ে তিনি এই প্রতিজ্ঞাপত্রটি সই করিয়ে নিয়েছিলেন। কথিত আছে, এই সুকঠিন প্রতিজ্ঞাপত্রে একশো পঁচিশ জনের বেশী লোক স্বাক্ষর দেন নি। সেই প্রতিজ্ঞাপত্রটি এই রকম: "আমি ধর্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি (১) কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইব। (২) একাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে কন্যার বিবাহ দিব না। (৩) কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রিয় অথবা মৌলিক ইত্যাদি গণনা না করিয়া স্বজাতীয় সৎপাত্রে কন্যা দান করিব। (৪) কন্যা বিধবা হইলে এবং তাহার সম্মতি থাকিলে, পুনরায় তাহার বিবাহ দিব। (৫) অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে পুত্রের বিবাহ দিব না। (৬) এক স্ত্রী থাকিতে আর বিবাহ করিব না। (৭) যাঁহার এক স্ত্রী বিদ্যমান আছে, তাহাকে কন্যাদান করিব না। (৮) যেরূপ আচরণ করিলে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, তাহা করিব না। (৯) মাসে মাসে স্ব স্ব মাসিক আয়ের পঞ্চাশতম অংশ নিয়োজিত ধনাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিব। (১০) এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া কোন কারণে উপরি নির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ হইব না।"

সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগরের বিপ্লবী মনের অভ্রান্ত নিদর্শন এই প্রতিজ্ঞাপত্র-খানি। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এ একখানি মূল্যবান দলিল। তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, অক্ষরে অক্ষরে এই প্রতিজ্ঞাপত্র অনুযায়ী কাজ করে গিয়েছেন। সাগর-চরিত্রের আচার ও আচরণের এই একনিষ্ঠতা থেকে বাঙালি আজো— এই সুদূর কালের ব্যবধানে—অনেক কিছুই শিখতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের কলকাতার নাগরিক জীবনের ইতিহাস যাঁদের জানা আছে, তাঁদের আর বলে দিতে হবে না যে, সে-জীবনের উপকরণের মধ্যে শেরি-স্তাম্পেন কতখানি স্থান জুড়ে ছিল। ডিরোজিওর ভবনে হিন্দু কলেজের প্রাগ্রসর ছাত্রদের হিন্দুসমাজ-নিষিদ্ধ পান-ভোজনের সান্ধ্য বৈঠকের চিত্র অনেকেরই জানা আছে। ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত্রের সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানীর আমলের বাঙালি বাবুদের হাতে মদের গেলাস ওঠে। এ কথা আজ ঐতিহাসিক সত্য যে, ইংরেজ যেমন শিক্ষিত বাঙালির হাতে সেক্সপীয়র মিলটন হোমর-দান্তে-মিল-বেকন তুলে দিয়েছে, তেমনি তারা তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছিল মদের গেলাস। ইংরেজি-শিক্ষিত মহলে কেমন করে সুরাপান প্রবেশ করেছিল তার ইতিবৃত্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এই ভাবে দিয়েছেন :

"সে সময়ে সুরাপান করা কুসংস্কার-ভঞ্জনের একটা প্রধান উপায়স্বরূপ ছিল। যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রম পূর্বক প্রকাশ্যভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তিনি সংস্কারকদের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। স্বয়ং রাজা রামমোহন রায় পরোক্ষ ভাবে সুরাপান শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন। ...রাত্রিতে ভোজন করিবার সময় রামমোহন রায়ের পরিমিত রূপে সুরাপান করিবার নিয়ম ছিল। ...রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, যখন তিনি হিন্দু কলেজে পাঠ করেন এবং তাঁহার বয়ঃক্রম ১৬।১৭ বৎসরের অধিক হইবে না, তখনি তিনি সুরাপান করিতে শিখিয়াছিলেন। ...সে সময়কার সংস্কার পথে অগ্রসর ব্যক্তিগণ সুরাপানকে হীন চক্ষে দেখিতেন না।"

এর থেকেই বুঝতে পারা যায় যে এ দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে সুরাপান কিভাবে প্রবেশ করেছিল। ডিরোজিওর একাডেমিক এসোসিয়েসনে সুরাপান ও প্রচলিত হিন্দুধর্মকে আক্রমণ দুই-ই একসঙ্গে চলতো। সুরাপানকে শিক্ষিত বাঙালি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার একটা অঙ্গ বলে গ্রহণ করলো।

দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় আত্মজীবন-চরিতে 'ইয়ং-বঙ্গলের' এই সুরাপান সম্পর্কে লিখেছেন : "আমাদের দেশে বহুকাল হইতে সুরাপান বিশেষ দোষকর ও পাপজনক বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে ; এবং মদ্য স্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস এদেশস্থ লোকের মনে জন্মিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে

এই স্থির হইল যে, যখন এমন বুদ্ধিমান্‌, বিদ্বান ও সভ্যজাতীয়েরা ইহা আদর পূর্বক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিত-জনক কখনই নহে। অতএব ইহা পান না করিলে সভ্যতাই বা কিরূপে হইবে আর পূর্ব কুসংস্কারই বা কিরূপে যাইবে? হিন্দু কলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা এ দেশের সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুরাপান করিতেন।"

বাঙালি ভদ্রলোকের মধ্যে মদ খাওয়াটা এই ভাবেই শুরু হয় এবং ইংরেজের নতুন শহর এই কলকাতার নতুন ইংরেজি-শেখা বাঙালিরাই এই পথের প্রথম পথিক। দেব-দ্বিজে তাদের বিন্দুমাত্র ভক্তি ছিল না; অনুরাগ ছিল খৃষ্টান ধর্মের প্রতি, বিরাগ ছিল হিন্দুধর্মের প্রতি, হিন্দু আচারের প্রতি। শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে গিয়েছিল এই মদিরাপান অভ্যাস। এই গরল সেবন করিয়া মত্ততা-জনিত অলীক আমোদে লোক যখন উন্মত্ত এবং সেই আমোদের প্রলোভনে আকৃষ্ট লোকের সংখ্যা যখন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যখন সুরাসেবনে অর্থ, মান, সম্ভ্রম, পরিশেষে জীবন-নাশ হইতে লাগিল, তখন বঙ্গীয় সমাজে আর এক সুহৃৎ প্যারীচরণ সরকার মহাশয় মাদক সেবন নিবারণে অগ্রসর হইলেন।"

প্যারীচরণ সরকার ছিলেন বিদ্যাসাগরের পরম বন্ধু। বিদ্যাসাগরের চেয়ে তিনি বয়সে তিন বছরের ছোট ছিলেন।

হেয়ার স্কুলের শিক্ষক-জ্যোতিষ্কের সূর্য-স্বরূপ ছিলেন প্যারীচরণ। নম্র-প্রকৃতি প্যারীচরণের গাম্ভীর্যে নিতান্ত দুর্বিনীত ছাত্ররাও সন্ত্রস্ত থাকতো। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে ও চরিত্র-মাধুর্যে সকলেই মুগ্ধ হতো। তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ইংরেজ-মহলেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাঁরই প্রিয় ছাত্র বঙ্গ-গৌরব স্যর গুরুদাস তাঁর জীবন-স্মৃতিতে প্যারীচরণ সম্পর্কে লিখেছেন: "তিনি যখন বারাসত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, তখন হাইকোর্টের ভবিষ্যৎ বিচারপতি ট্রেভর তথাকার হাকিম ছিলেন। ট্রেভর তাঁহাকে কলিকাতায় কর্মপ্রচেষ্টার জন্য অনুরোধ করেন। ...প্যারীচরণের অন্তঃকরণে বিলাস, অহঙ্কার ও হুজুগ-প্রিয়তার কণামাত্রও ছিল না। উচ্চ বেতন ও পুস্তক-বিক্রয়লব্ধ অর্থ সত্ত্বেও তিনি কখনও গাড়ি-ঘোড়া করেন নাই; ছাতাটি হাতে করিয়া চাপকান আঁটিয়া প্রতিদিন বাটী হইতে কর্মস্থলে যাতায়াত করিতেন। প্যারীচরণকে সেকালে সকলেই ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ শিক্ষক আর্ণলড

সাহেবের সঙ্গে তুলনা করিয়া সেই নামেই অভিহিত করিতেন। তাঁহার সম্পর্কে আসিয়া আমার শিক্ষা এবং চরিত্র-গঠন দৃঢ় হয়।"

বাংলা 'বর্ণ পরিচয়' যেমন বিদ্যাসাগরের অক্ষয় কীর্তি, তেমনি ইংরেজি বর্ণ-পরিচয় হলো বাংলার দেবোপম শিক্ষক প্যারীচরণের অক্ষয় কীর্তি। শিক্ষা-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কার উভয়ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগরের কার্যকলাপের সঙ্গে প্যারীচরণের অক্ষুণ্ণ যোগ ছিল। সেই প্যারীচরণ যখন মাদক-নিবারণী সভা স্থাপন করলেন, তখন স্বভাবতঃ বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি পড়লো সেই সভার দিকে। কলকাতার বহু সম্ভ্রান্ত লোকের, এমন কি রাধাকান্ত দেবের পর্যন্ত সমর্থন ছিল এই প্রচেষ্টার পেছনে। এই সভারই নাম ছিল—বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি; প্যারীচরণ ছিলেন এর সম্পাদক। এই সোসাইটিই তাঁর কর্ম-কীর্তি। সোসাইটির প্রথম অধিবেশনে বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন। এই সম্পর্কে তাঁর চরিতকার লিখেছেন: "মাদক-সেবন নিবারণ সভার প্রথম অধিবেশন দিবসে বহুসংখ্যক শিক্ষিত বাঙালী এবং অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরেজ মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। প্রথম প্রতিষ্ঠার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া চিরজীবন বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সভার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রথম অনুষ্ঠানসভায় পাদ্রী ডাফ্ সাহেব, ইন্‌স্পেক্টর উড্রো প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।"

প্যারীচরণ সুরাপান-নিবারণী সভা স্থাপন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। সুরাপানের অপকারিতা বুঝাবার জন্য ইংরেজিতে 'ওয়েল-উইসার' ও বাংলায় 'হিতসাধক' নামে দুখানা মাসিক-পত্র প্রকাশ করেন। ঐ কাগজে অন্যান্য লেখকদের মধ্যে বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন।

একে একে সকলেই বক্তৃতা করলেন। করলেন না শুধু বিদ্যাসাগর। স্যর গুরুদাস তখন বিংশতিবর্ষীয় তরুণ যুবক মাত্র। তিনি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সম্পর্কে জীবন-স্মৃতিতে তিনি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তার থেকে জানতে পারা যায় যে, প্রথমে প্যারীচরণ সরকার বিদ্যাসাগরকে কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ করলেন; বিদ্যাসাগর বন্ধুর সে অনুরোধ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর ডাফ্ সাহেব, উড্র সাহেব, এমন কি শম্ভুনাথ পণ্ডিত পর্যন্ত সকলেই যখন বিদ্যাসাগরকে কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ করলেন, তখনো তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞায় অটল রইলেন, নীরবে

হাসিমুখে জানালেন তাঁর আপত্তি। এই ঘটনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, অন্য লোকে বিদ্যাসাগরকে যতটুকু বুঝতেন, তার চেয়ে তিনি নিজেকে নিজে বেশী জানতেন। সভায় উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করা বিদ্যাসাগরের স্বভাবের বাইরে, তা তিনি ভালো রকমেই জানতেন বলেই তিনি সেদিন সকলের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কোনো ক্ষেত্রেই অন্য লোকের প্রাপ্য হরণ করতে কিংবা নিজের অনুপযুক্ততার পরিচয় দিতে বিদ্যাসাগর কখনো প্রয়াস পান নি। এই ছিল তাঁর জীবনের বিশেষত্ব।

প্যারীচরণ ও বিদ্যাসাগর দুজনেই আমরণ একত্রে সমাজ-সংস্কারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

প্যারীচরণ তাঁর কত বড়ো বন্ধু ছিলেন তা প্রকাশ পেয়েছিল একটি ঘটনায়। ঋণগ্রস্ত বিদ্যাসাগরকে ঋণমুক্ত করবার জন্যে প্যারীচরণ তাঁর সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় জনসাধারণের উদ্দেশে একটা আবেদন প্রকাশ করেন এবং এ কাজ তিনি বিদ্যাসাগরের মত না নিয়েই করেছিলেন। তিনি নিজে বড়লোক ছিলেন না, কিন্তু সমাজে ছিল তাঁর অসামান্য সম্মান ও সম্ভ্রম এবং এই ভরসা করেই তিনি বন্ধুর জন্যে অর্থ সাহায্যে আবেদন জানাতে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু দেশের লোক চাঁদা দিয়ে তাঁর ঋণ পরিশোধ করবে—বিদ্যাসাগরের কাছে এ চিন্তা ছিল অসহ্য; তাই তিনি বীরসিংহ থেকে প্যারীচরণকে অনুরোধ করে পাঠালেন যে, তাঁর ঋণ পরিশোধের জন্যে দেশের লোককে যেন বিব্রত করা না হয়।

প্যারীচরণ বন্ধুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে আর বেশী অগ্রসর হন নি।

প্রসঙ্গত 'এডুকেশন গেজেট' সম্পাদনা করবার সময় প্যারীচরণের জীবনের একটা ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী ব্যয়ে 'গেজেটের' প্রথম আবির্ভাব। সাত বছর পরে কাগজখানি সরকারী মুখপত্র হিসেবে পুনর্গঠিত হয়। ১৮৬৩, ৩রা মার্চ প্যারীচরণ 'গেজেটের' সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং তাঁর সুষ্ঠু পরিচালনা গুণে পত্রিকার বিশেষ উন্নতি হয় ও গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তখনকার পূর্ববঙ্গ রেলপথের শ্যামনগর ষ্টেশনের কাছে এক দুর্ঘটনার ফলে অনেক লোক মারা

যায়। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মৃত ও আহতদের প্রকৃত সংখ্যা গোপন করার ফলে সমসাময়িক পত্রে, বিশেষ করে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় তুমুল আন্দোলন হয়। প্যারীচরণও বুঝলেন কর্তৃপক্ষের বিবরণ সত্য নয় এবং এইজন্য জনসাধারণের মনে সংশয়ের উদ্রেক হয়েছে। তিনি সংবাদের সত্যতা নির্ধারণের জন্যে স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তথ্য সংগ্রহ করলেন। তাঁরই ধারণা হলো, কর্তৃপক্ষ শুধু যে হতাহতের সংখ্যা গোপন করেছেন তা নয়, স্থানীয় কর্মচারীরাও আহতদের সম্পর্কে অত্যন্ত উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এই অনুসন্ধানের এক সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশ করলেন গেজেটে। স্যর উইলিয়ম গ্রে তখন ছোটলাট। তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং সম্পাদকের কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠালেন। প্রখর আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল প্যারীচরণের এবং বিদ্যাসাগরের মত তিনিও ছিলেন স্বাধীনচেতা। তিনি ছোটলাটকে এক চিঠিতে লিখলেন, "গভর্ণমেণ্ট আমার কার্য দূষণীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, ইহা জানিয়া আমি দুঃখিত। যাহা সত্য, আমি তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। বিনা অনুসন্ধানে ইহা আমি করি নাই। ইহার ব্যতিক্রম আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি 'এডুকেশন গেজেট'-এর সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিলাম।" ব্যাপারটি যখন বিদ্যাসাগর জানতে পারলেন তখন তিনি প্যারীচরণের বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করে বলেছিলেন, প্যারীচরণ, তুমি ঠিকই করেছ। প্যারীচরণ হেসে বলেছিলেন, 'মহাজনো গত যঃ সঃ পন্থা'। এই অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর এমনই মর্মাহত হয়েছিলেন যে রোগশয্যা থেকে তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন: "প্যারীচরণের মৃত্যুতে আমার প্রাণে যে কি দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা অপর কাহারও বুঝিবার সামর্থ্য নাই।...তাঁহার লোকান্তর গমনে যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পুরণ হইবে না। জনসমাজের হিত-সাধনে তাঁহার নিষ্ঠাপুর্ণ একাগ্রতা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।"

বিদ্যাসাগর ও প্যারীচরণের বন্ধুত্বও বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এমনি আর একজনের অকালমৃত্যুতে গভীর শোক পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৭০-এ মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে কালীপ্রসন্ন সিংহ মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ শুনে বিদ্যাসাগর সিংহীবাড়ি গিয়ে মৃতের প্রতি শেষ সম্মান

প্রদর্শন করলেন। বাংলার এই প্রতিভাবান ধনীর সন্তানকে তিনি জন্মাতে এবং মরতে দেখলেন, বিদ্যাসাগরের কাছে এ খুবই শোকের বিষয়। বড় স্নেহ করতেন তিনি কালীপ্রসন্নকে। বলতেন, আমি আর কি এমন দাতা, দাতা বটে কালীসিংহী। নিজের জমিদারী বিকিয়ে দিয়ে লাখ লাখ টাকা খরচ করে মহাভারত বের করল—একি কম দান! মহাভারতের অনুবাদ করিয়ে কালীপ্রসন্ন বাংলা সাহিত্যের যে কি অশেষ উপকার করে গেলেন, এখন না বুঝলেও, লোকে পরে বুঝবে।' বিদ্যাসাগরকেও কালীপ্রসন্ন বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন এবং একরকম তাঁরই আশীর্বাদ নিয়ে তিনি মহাভারত অনুবাদ-যজ্ঞে হাত দিয়েছিলেন—সে কথা আগেই বলেছি। বয়সে অনেক ছোট হলেও, বিদ্যাসাগর গুণীর গুণ স্বীকার করতে কখনো কুণ্ঠিত হতেন না। বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী এই ধনীর দুলাল সেদিন নিঃস্বার্থভাবেই তাঁর স্বদেশের সেবা করে গিয়েছেন—এই কথা বিদ্যাসাগর কালীপ্রসন্নের শ্রাদ্ধবাসরে বলেছিলেন। বলেছিলেন, কালীপ্রসন্ন মরল না তো, আমার বুকের একখানা পাঁজর খসে গেল।

কে বলবে, ব্রাহ্মণের এই আন্তরিকতার উৎস কোথায়? হৃদয়ের কোন্ গভীরতম প্রদেশ থেকে উৎসারিত হতো তাঁর মর্মানুভূতি?

॥ বাইশ ॥

মেরী কার্পেণ্টার কলকাতায় এলেন।

বিদ্যাসাগর তখন বাংলাদেশের জেলায় জেলায় একটা করে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন। বীরসিংহেও একটা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। এই স্কুলের জন্যে তাঁর মাসিক খরচ হতো ত্রিশ টাকা। তিনি এই ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। এই স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের কাজে বিদ্যাসাগরের আগ্রহ ও উৎসাহের সীমা ছিল না, এ কথা আমরা বেথুন-বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের অনুরাগী ইংরেজ বন্ধুরা তাঁকে খুবই অর্থ সাহায্য করেছিলেন। বাংলার ছোটলাট স্যর সিসিল বিডন পর্যন্ত তাঁর বালিকা বিদ্যালয় ফাণ্ডে মাসিক পঞ্চাশ টাকা করে চাঁদা দিতেন ; এই চাঁদা তিন বছর ধরে দিয়েছিলেন। এই রকম আরো অনেক ইংরেজ-রাজপুরুষই দিতেন। স্ত্রী-শিক্ষার অগ্রণী নায়ক হিসাবে বিদ্যাসাগরের নাম তখন সারা বাংলাদেশে। সরকারী চাকরি ছেড়ে দেবার পর দীর্ঘ আট বৎসর কাল আমরা দেখতে পাই বিদ্যাসাগর নিজেকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই মফঃস্বলে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত রেখেছিলেন। এ কাজেও তিনি বাধা কম পান নি, কিন্তু কোনো কাজের ভার নিয়ে প্রতিকূল ঘটনার জন্যে সেই কাজ অর্ধপথে ছেড়ে দেওয়া বিদ্যাসাগরের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। আগেই বলেছি, হৃদয়ের সকল অনুরাগ ঢেলে দিয়ে কাজ করাই ছিল তাঁর রীতি—কখনো কোনো অবস্থায় এই রীতির ব্যতিক্রম হয়েছিল বলে শোনা যায় নি। বিদ্যাসাগর যখন বহু বাধাবিঘ্ন এবং অসুবিধার মধ্য দিয়ে নিজের খরচে এবং স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে এই সব বালিকা-বিদ্যালয়গুলির অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছেন, এই সময়ে কলকাতায় এলেন মিস কার্পেণ্টার। এ ঘটনা তাঁর সরকারী চাকরি ত্যাগ করার আট বছর

পরের কথা। কলকাতায় এসে তিনি বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষার নায়ক বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

এ কালে স্বামী বিবেকানন্দ যেমন আইরিশ-দুহিতা মিস এলিজাবেথ মার্গারেট নোবলকে (ভগিনী নিবেদিতা) ভারত সেবায়, বিশেষ করে ভারতের নারী-জাতির সেবায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন, সেকালে তেমনি রাজা রামমোহন রায়কে দেখে এবং তাঁর কথা শুনে নিতান্ত বালিকা বয়সেই কুমারী মেরী কার্পেন্টার ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে আরম্ভ করেন। রাজার চিন্তাধারাই তাঁর মনে ভারতের হিতসাধনেচ্ছা প্রথম উদ্দীপ্ত করে দিয়েছিল এবং পরবর্তী কালে লণ্ডনে কেশবচন্দ্র সেনের বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে মিস কার্পেন্টার এ দেশের নরনারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আগ্রহ পোষণ করতে আরম্ভ করেন। সেই আগ্রহ ও শ্রদ্ধাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত এ দেশে টেনে আনে। ভারতের বহু স্থান ঘুরে মিস কার্পেন্টার অবশেষে এসে পৌঁছলেন কলকাতায়। বিদ্যাসাগর তখন বেথুন স্কুলের সেক্রেটারী। আর ডব্লিউ. এস্. এ্যাটকিন্‌সন তখন শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর। কুমারী কার্পেন্টার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে চান শুনে এ্যাটকিনসন এক চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে লিখলেন: "মিস্ কার্পেন্টার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও ভারতে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিষয়ে আলাপ ও সে সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে চান। আপনি কি আগামী বৃহস্পতিবার সাড়ে এগারোটার সময় বেথুন স্কুলে আসিতে পারেন? আমি তাঁহাকে সেই সময়ে, বেথুন বিদ্যালয় প্রথম দেখাইবার জন্য লইয়া যাইব।"

এই চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি যে, মিস কার্পেন্টার স্কুল কমিটির অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে আলাপ করবার আগে এর সম্পাদক বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিদ্যাসাগর ভিন্ন স্ত্রীশিক্ষার অগ্রণীদের মধ্যে আর যাঁরা ছিলেন—কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—মিস কার্পেন্টার তাঁদের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে, স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতের উদারতা দেখে এবং বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্যে বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত চেষ্টার পরিচয় পেয়ে মিস কার্পেন্টার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠলেন। তখন কলকাতায় বেথুন স্কুলের পর উত্তরপাড়ার বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টির খুব নাম

মিস্ কার্পেন্টার সেই স্কুলটি একবার দেখতে চাইলেন। সঙ্গে গেলেন বিদ্যাসাগর, মিঃ এ্যাটকিন্‌সন আর ইনস্‌পেক্টার উড্রো সাহেব। স্কুল দেখে মিস্ কার্পেন্টারের খুব ভালো লাগলো। পথে যেতে যেতে বিদ্যাসাগরের জনপ্রিয়তার পরিচয় পেয়ে তিনি যারপরনাই বিস্মিত হলেন। বুঝলেন, ভারতবর্ষে এসে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত না হলে তাঁর এ দেশে আসা ব্যর্থই হতো। পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে মিস্ কার্পেন্টার লিখেছিলেন: "ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম শুনিয়াছি। যখন যে দেশে গিয়াছি, সেখানেই লোকের মুখে শুনিয়াছি, 'মানুষ যদি দেখিতে চাও, তবে কলিকাতায় গিয়া বিদ্যাসাগরকে দেখ।' দেখিলাম, জনসাধারণের নিকট তিনি একটিমাত্র নামে পরিচিত—বিদ্যাসাগর। ইহা যে তাঁহার নাম নহে, উপাধি, অসাধারণ কৃতিত্বে সমুজ্জল ছাত্রজীবনের গৌরব নিশান—ইহাও অনেকে জানে না। যাই হোক, অবশেষে কলিকাতায় আসিয়া পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। কী সেই সৌম্য স্নিগ্ধ মূর্তি। ধুতি ও চাদরে মণ্ডিত যেন তেজস্বিতার একটি বিগ্রহ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অথচ ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে তাঁহার কী আগ্রহ, ভারতীয় নারীদের উন্নতিকল্পে তাঁহার কী আন্তরিকতা। শুনিলাম বেথুন সাহেবের তিনি একজন অনুরাগী বন্ধু ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টির পরিচালনায় পণ্ডিতের কৃতিত্বের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। স্ত্রী-স্বাধীনতার এমন একজন নেতৃস্থানীয় মহান্ চরিত্রের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়।"

উত্তরপাড়া থেকে স্কুল দেখে সকলে ফিরছেন। এ্যাটকিন্‌সন, উড্রো আর মিস্ কার্পেন্টার ছিলেন এক গাড়িতে আর বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্য একখানা গাড়িতে। বগি গাড়ি। সঙ্গে ছিলেন একজন ভদ্রলোক। বিদ্যাসাগর সাধারণতঃ পাল্কী করে যাওয়া-আসা করতেন। তাই গাড়িতে উঠবার সময়ে সঙ্গের ভদ্রলোককে বিশেষভাবে বলে দিলেন, তিনি যেন সাবধানে গাড়ি চালান। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তিনি এক দুর্ঘটনায় পড়লেন। এই তাঁর জীবনের মারাত্মক দুর্ঘটনা। বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"দুর্ভাগ্যের বিষয় গাড়িখানি কিছুদূর আসিয়া মোড় ফিরিবার সময় একেবারে উল্টাইয়া পড়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখনই পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া যান। তাঁহার যকৃতে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। পথের লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল, কিন্তু কেহই তাঁহার সহায়তায় অগ্রসর হয় নাই। মিস্ কার্পেন্টারের গাড়ি আসিলে পর, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সত্বর পদে নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং রুমাল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া অনেক কষ্টে কলিকাতার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ বাসায় ফিরিয়া আসেন। এই দৈব-দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া, তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে দেখিতে যান। রাজকৃষ্ণ বাবু তাঁহাকে সুকিয়া ষ্ট্রীটে নিজের বাটীতে লইয়া যান। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার চিকিৎসা করেন। একমাসের সুচিকিৎসায় তিনি একরকম সারিয়া উঠেন, কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল।"

এই স্বাস্থ্য বিদ্যাসাগর আর ফিরে পাননি। যকৃৎ চিরদিনের জন্যে জখম হয়ে যায়। তাঁর হজম শক্তি কমে যায়, আহার লঘু হয়ে পড়ে। দুধ পর্যন্ত সহ্য হতো না। শেষ পর্যন্ত রাত্রির আহার দিনান্তের দুমুঠো মুড়িতে দাঁড়ায়। পরবর্তী কালে এই দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করে এবং মিস্ কার্পেন্টারের শুশ্রূষার কথা স্মরণ করে বিদ্যাসাগর বলতেন: "যখন আমার চেতনা হইল, আমার বোধ হইল যেন আমার মাতৃদেবী আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়াছেন, আর স্নেহভরে পুত্রের সেবা করিতেছেন। সশরীরে সেই একবার স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়াছিলাম। সেই দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও মিস কার্পেন্টারের সেই স্নেহপূর্ণ বাৎসল্য লাভ করিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম।"

এক বিদেশিনীর প্রতি বিদ্যাসাগরের এই কৃতজ্ঞতা লক্ষ্য করবার বিষয়। মিস কার্পেন্টার অনেকদিন কলকাতায় ছিলেন এবং সর্বদা শয্যাশায়ী বিদ্যাসাগরের সংবাদ নিতেন। কলকাতা থেকে চলে যাবার সময় তিনি বিদ্যাসাগরকে এই চিঠিখানা লিখেছিলেন: "প্রিয় মহাশয়, আপনি পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম; এবং সেজন্য আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, আগামী বুধবার সকালবেলায় আমার কলিকাতা ত্যাগের পূর্বে আপনার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। আমি আগামী কল্য অপরাহ্ন

চারিটার সময়, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য অনেকগুলি দেশীয় বন্ধুকে আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, সম্পূর্ণরূপে সুস্থ থাকিলে, আশা করি, আপনিও আসিবেন।"

যে বিদ্যাসাগর মিস কার্পেন্টার সম্বন্ধে এমন প্রীতিপূর্ণ ধারণা পোষণ করতেন, সেই বিদ্যাসাগরই আবার কার্পেন্টারের মতের বিরোধিতা করতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নি। ব্যাপারটা এই। মেরী কার্পেন্টার প্রস্তাব করলেন যে, বাংলাদেশে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা যে রকম বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে আরো শিক্ষয়িত্রী দরকার এবং এই শিক্ষয়িত্রী তৈরী করার জন্যে বেথুন স্কুলে স্বতন্ত্রভাবে একটি নর্মাল স্কুল বা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা দরকার। বিদ্যাসাগর এই প্রস্তাবের বিরোধী হয়েছিলেন, একথা আগেই বলেছি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মতো স্ত্রীশিক্ষার অনুরাগী লোক কেন যে মিস কার্পেন্টার তথা গভর্ণমেন্টের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন তা জানা দরকার। মিস কার্পেন্টারের প্রস্তাব সমর্থন করে গভর্ণমেন্ট থেকে যখন নর্মাল স্কুল স্থাপন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মত চেয়ে পাঠান হলো তখন তিনি যে যুক্তিপূর্ণ চিঠিখানি লিখেছিলেন তা পড়লেই বিদ্যাসাগরের দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রীশিক্ষার তিনি একজন ঘোরতর সমর্থক ছিলেন সত্য, কিন্তু "স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের সেই প্রথম অবস্থায় দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া অতি মাত্রায় অগ্রসর হওয়ায় পাছে সমূলে সর্বনাশ সাধন হয়, এই আশঙ্কায় তিনি সর্বদা সতর্ক হইতে চেষ্টা করিতেন।" বিদ্যাসাগরের মতো আর কেউই সে যুগে হিন্দু সমাজের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না, তিনি নির্ভুলভাবে এর প্রাণস্পন্দন বুঝতে পারতেন। কত প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে তিনি একটির পর একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন; হিন্দু সমাজের বুকে স্ত্রীশিক্ষার শৈশবকালে যদি এর স্রোত প্রবল হয়, তা হলে এর উন্নতির পথ সুগম হবে না। বিদ্যাসাগরের এ যুক্তি অকাট্য। তাই বিদ্যাসাগর স্যার উইলিয়ম গ্রে-কে লিখলেন: "মিস কার্পেন্টারের প্রস্তাব আমি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছি। শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করার পথে বিষম অন্তরায় রহিয়াছে বলিয়া আমার যে ধারণা আছে, সে ধারণার পরিবর্তন করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে আমি যতই চিন্তা

করিতেছি, ততই আমার দৃঢ়রূপে এই প্রত্যয় জন্মিতেছে যে হিন্দুভাব ও হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থা এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিরোধী ; ইহার দ্বারা কোনও শুভ ফলের প্রত্যাশা নাই বলিয়াই, আমি গভর্ণমেণ্টকে সাক্ষাৎ ভাবে এই কার্যের ভার লইতে ন্যায়তঃ কোন পরামর্শ দিতে পারি না। .. বলা বাহুল্য যে আমি স্ত্রীজাতির সুশিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা ও গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকি এবং যদ্যপি আমার স্বদেশীয়-গণের সামাজিক সংস্কার এরূপ দুরতিক্রমণীয় বাধারূপে না দাঁড়াইত, তাহা হইলে সকলের অগ্রে আমিই এই কার্যের পোষকতা ও সহকারিতা করিতে অগ্রসর হইতাম।"

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যে তাঁর স্বাধীন মত ব্যক্ত করতে দ্বিধা করতেন না, তার প্রমাণ আরো একখানা চিঠিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা ও মফঃস্বলে তখন বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে ; এর জন্যে সরকারের বিশেষ অর্থব্যয় হতো না। কিন্তু বেথুন স্কুল খাস সরকারী অবৈতনিক প্রতিষ্ঠান। এখানকার ছাত্রী-পিছু সরকারকে কমবেশী বছরে দশ টাকা করে খরচ করতে হয়। অথচ এই স্কুল একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাই সরকার এই সময়ে ধুয়া তুললেন, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য এত খরচ করা মোটেই সমীচীন নয়। বিদ্যালয়ের সম্পাদক হিসাবে বিদ্যাসাগর সরকারের এই মনোভাবে বাধা দিতে দ্বিধা করলেন না। তিনি লিখলেন : "এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, বেথুন স্কুলের উন্নতিকল্পে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, ফল তাহার অনুরূপ হয় নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলি যে, তাই বলিয়া বিদ্যালয়টি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া আমার মতে কোন প্রকারেই যুক্তি সিদ্ধ নহে। ভারতে স্ত্রীজাতির জ্ঞানোন্নতির চিহ্নরূপে, যে পরসেবাব্রত-পরায়ণ মহাত্মার নামে উক্ত বিদ্যালয়ের নামকরণ হইয়াছে, তাহাতে আমার বিবেচনায় ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য করা নিতান্ত কর্তব্য।...হিন্দু সমাজের উপর বর্তমান বিদ্যালয়টির নৈতিক শক্তির প্রভাব অনেক। প্রকৃত প্রস্তাব এই বিদ্যালয়টিই ইহার নিকটবর্তী জেলাসমূহে স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সাধন করিয়াছে।...চেষ্টা করিলে, বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি না করিয়া বোধ হয় অর্ধেক ব্যয় কমান যাইতে পারে।" বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে

দীর্ঘকাল সরকারের তর্কবিতর্ক হয়। মতভেদ যখন প্রবল হয়ে উঠলো, তখন একরকম বিরক্ত হয়েই বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক ত্যাগ করলেন সত্য, কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে তাঁর অনুরাগ কখনো এতটুকু কমে নি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই কাজ করে গেছেন।

স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে বিদ্যাসাগরের অনুরাগ কত গভীর ছিল তার অজস্র দৃষ্টান্তের মধ্যে দু'একটির উল্লেখ করেই আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করব। আগেই বলেছি ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবের মুখের কথায় বিদ্যাসাগর মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী ও নদীয়া জেলার নানা স্থানে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সব স্কুলের ব্যয়ভার বিদ্যাসাগর নিজেই বহন করতেন। মেয়েরা বিনা বেতনে তো পড়তোই, তার উপর তাদের পড়ার বই, লিখবার কাগজ, শ্লেট, পেন্সিল সবই দিতে হতো। এই কাজে অবশ্য তাঁর ইংরেজ বন্ধুদের কেউ কেউ সাহায্য করতেন; কিন্তু সরকারী চাকরি ছেড়ে দেবার পর শুধু যে মাসিক পাঁচশো টাকার আয় কমে গেল তা নয়, সেই সঙ্গে সরকার মফঃস্বলের বালিকাবিদ্যালয়গুলিকে অর্থ সাহায্য করতে অসম্মত হলেন। তবু বিদ্যাসাগর নিরাশ হলেন না। বালিকবিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্যে তিনি এক নারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খুললেন। পাইকাপাড়ার রাজা প্রতাপ-চন্দ্র সিংহ প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোক এই ভাণ্ডারে নিয়মিত চাঁদা দিতেন।

বেথুন কলেজের প্রথম গ্র্যাজুয়েট দু'জন—চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী বসু। এই চন্দ্রমুখী যখন এম. এ. পাশ করলেন তখন বিদ্যাসাগরের কী আনন্দ। সেই আনন্দ তিনি প্রকাশ করলেন চন্দ্রমুখীকে নিজের স্বাক্ষরিত একখানা সেক্সপীয়রের বই উপহার দিয়ে। স্কুলের বার্ষিক পারিতোষিকের সময়ও বিদ্যাসাগর ভালো ছাত্রীদের বহুবার সোনার হার উপহার দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর এ দেশের মেয়েদের পরম বন্ধু ছিলেন। রামমোহনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তিনি তাদের উন্নতির জন্যে একটার পর একটা কাজ করেছেন। তাদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করেছেন, সামাজিক কুপ্রথার হাত থেকে তাদের রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। মনুর সেই উপদেশ—নারীরা যেখানে সম্মানিত ও সম্পূজিত, দেবতারা সেখানে বিচরণ করেন—এতকাল ছিল পুঁথির পাতায়—বিদ্যাসাগর সেই উপদেশকে বাস্তবে রূপায়িত করে দেশের

সামনে যে বিরাট আদর্শ স্থাপন করেন, উত্তরকালে তা অশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। মেয়েরা মায়ের জাত। তারা অকৃতজ্ঞ নয়। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর বাংলার মেয়েরাই প্রায় দু'হাজার টাকা চাঁদা তুলে বেথুন স্কুলের কমিটির হাতে দিয়েছিল। সেই টাকা থেকে বেথুন স্কুলের কোন একটি যোগ্য ছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই বৃত্তির নাম বিদ্যাসাগর স্কলারসিপ। বলতে গেলে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি ও কীর্তিকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে বাঙালি মেয়েদের এই প্রচেষ্টাই প্রথম। প্রচেষ্টা হয়ত সামান্য, কিন্তু সেদিন এরই মূল্য ছিল অনেক বেশী। বাঙালি মেয়েরা তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে সেদিন তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু করেছিল, সুশিক্ষিত বাঙালি ছেলেরা তার কিছুই করে নি। বিদ্যাসাগরের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা করা দূরে থাক, বাঙালি-সন্তান আজো বাংলার সেই প্রথম ও প্রধান শিক্ষাব্রতী এবং দেশহিত-প্রাণ ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ করতে অগ্রসর হলো না—এ কী কম দুঃখ ও লজ্জার কথা?

॥ তেইশ ॥

এইবার বলবো বিদ্যাসাগরের অতুলনীয় কীর্তির কথা।

সে কীর্তি মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন।

ট্রেনিং স্কুলের চিতা-ভস্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্যাসাগরের এই কীর্তিস্তম্ভ। বাঙালির নিজের প্রয়োজনে, নিজের চেষ্টায় এবং নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপিত উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠান এই মেট্রোপলিটান।

শিক্ষাপ্রচার বিদ্যাসাগরের কাছে সাধারণ কাজ ছিল না—এ ছিল তাঁর কাছে একটা সদনুষ্ঠান। এই সদনুষ্ঠানে তাঁর গভীর অনুরাগ তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি অধ্যায়েই দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষা-বিস্তারই ছিল তাঁর জীবনের জপতপ, ধ্যান-ধারণা। এ কাজে তাঁর ক্লান্তি ছিল না কোনো দিন। কথিত আছে, বীরসিংহ গ্রামে যখন তিনি প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তখন গৃহ-নির্মাণ কাজ আরম্ভ করবার দিনে মজুর পাওয়া যায়নি। বিদ্যাসাগর নিজেই ভাইদের সঙ্গে নিয়ে মাটি খুঁড়েছিলেন। স্বগ্রামে তিনি শুধু ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কুল করেন নি, বীরসিংহ ও তার নিকটবর্তী গ্রামগুলির শ্রমজীবী, রাখাল ও কৃষক বালকদের লেখাপড়া শিখবার জন্যে একটা নৈশ-বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। এ স্কুলের ছেলেরা দিনের বেলায় মাঠে কাজ করে, গরু চরিয়ে সন্ধ্যার সময় স্কুলে এসে লেখাপড়া শিখত। আজ আমাদের দেশে নিরক্ষরদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু কত আগে বিদ্যাসাগর এর সূচনা করে গিয়েছিলেন, তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক চরিতকার লিখেছেন: "বালক-বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয়, রাখাল-স্কুল প্রভৃতি জ্ঞান বিতরণের সকল দ্বার-গুলিই অবৈতনিক। সকলেই সর্বত্র বিনা বেতনে ও বিনা ব্যয়ে বিদ্যা উপার্জন করিতে লাগিল। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীগণের পুস্তক, কাগজ কলম, শ্লেট, পেনসিল, প্রভৃতিতে মাসে মাসে প্রায় ৩০০ টাকার অধিক ব্যয়

বিদ্যালয় কি স্থাপিত হইতে পারে না?" তারপর দেবেন্দ্রনাথ কি করলেন তা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন: "আমি তাহার পরে প্রতিদিন গাড়ি করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত ও মান্য লোকদিগের নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম যে হিন্দু-সন্তানদিগের যাহাতে পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে আর যাইতে না হয়, এবং আমাদের নিজের বিদ্যালয়ে তাহারা পড়িতে পারে, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে।...স্থির হইল যে, পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে বিনাবেতনে যেমন ছেলেরা পড়িতে পারে, তেমনি তাহাদেরও একটি বিদ্যালয় হইবে, তাহাতে বিনা বেতনে ছেলেরা পড়িতে পাইবে। ...সেই দিনই চল্লিশ হাজার টাকা স্বাক্ষর হইয়া গেল। তখন জানিলাম, আমাদের পরিশ্রমের ফল হইল।" তারপর স্থাপিত হলো 'হিন্দুহিতার্থী' বিদ্যালয়। এই অবৈতনিক স্কুলের প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে বিদ্যাসাগরের সামনে ছিল দেবেন্দ্রনাথের উদ্যমের দৃষ্টান্ত এবং বেসরকারীভাবে স্কুল করার ব্যাপারে তিনি দেবেন্দ্রনাথের এই দৃষ্টান্ত থেকে যে প্রেরণা লাভ করেছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বাঙালির দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলোর মধ্যে কলকাতার তখন গৌরমোহন আঢ্যির স্কুলের খ্যাতি সবচেয়ে বেশী ছিল। তখনকার দিনে আঢ্যির স্কুলে পড়া এবং পড়ানো দুই-ই সম্মানের বিষয় ছিল। কালক্রমে সেই স্কুলের গৌরব যখন ম্লান হলো, তখন বাঙালির পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত হয় আর একটি নতুন স্কুল। এরই নাম 'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল'। সরকারী স্কুল অপেক্ষা অল্প বেতনে মধ্যবিত্ত ঘরের হিন্দু-বালকগণকে ইংরেজি শিক্ষা দান করাই ছিল এই শিক্ষায়তনের উদ্দেশ্য। এটি বিদ্যাসাগরের চাকরি ছাড়বার এক বছর পরের ঘটনা। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক চরিতকার লিখেছেন: "কলিকাতার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক উদ্যোগী হইয়া সিমলার শঙ্কর ঘোষের লেনে 'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এই বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে ইহারা এবং অন্য কোন কোন সম্ভ্রান্ত লোক যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। পৃষ্ঠপোষকরূপে বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক

মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে এই বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন।"

এই সম্ভ্রান্তদের মধ্যে ছিলেন ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, যাদবচন্দ্র পালিত, বৈষ্ণবচরণ আঢ্য, মাধবচন্দ্র ধাড়া, পতিতপাবন সেন এবং গঙ্গাচরণ সেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই নব-প্রতিষ্ঠিত 'ট্রেনিং স্কুলের' প্রধান শিক্ষকতার ভার পেয়েছিলেন। বহুবাজারের দত্ত-পরিবার এই স্কুলের লাইব্রেরীর জন্যে অনেক বই দান করে ছিলেন। শিবহীন যজ্ঞ যেমন অসম্ভব, তেমন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অথচ সেখানে বিদ্যাসাগর নেই, এমন জিনিস সেদিন অসম্ভব ছিল। সরকারী কর্মের বাইরে এসে বিদ্যাসাগর এই নবগঠিত ট্রেনিং স্কুলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। উদ্যোক্তাদের বিশেষ অনুরোধে তিনি এই স্কুলের সম্পাদক হতে সম্মত হলেন। স্কুলটি পরিচালনার জন্যে একটি কমিটি-গঠিত হলো। এই কমিটিতে তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন। দু'বছর নির্বিঘ্নে স্কুলের কাজ চললো। তারপর কোন একটা ব্যাপারে কমিটির সভ্যদের মধ্যে দেখা দিল মনোমালিন্য। স্কুলের কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে এই রকম মনোমালিন্য ও অনাত্মীয়তা দেখে এক রকম বিরক্ত হয়েই বিদ্যাসাগর স্কুলের সেক্রেটারী পদ ছেড়ে দিলেন। জনসাধারণের কাজে স্বার্থ ভুলে আত্মনিয়োগ করা বাঙালি তখনো শেখেনি, আজো শিখেছে বলে মনে হয় না। ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কি ভাবে সাধারণের হিতসাধন করতে হয়, বিদ্যাসাগর বাঙালিকে তা শিখিয়ে গেছেন। দশে মিলে কাজ করতে গেলে কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, কিছু নতিও স্বীকার করতে হয়—এ বোধ তখনো জন্মেনি বলেই তিন বছরের মধ্যেই ট্রেনিং স্কুল দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তখন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, মাধবচন্দ্র ধর প্রভৃতি কয়েকজন সভ্য কমিটি থেকে বেরিয়ে গিয়ে 'ট্রেনিং একাডেমী' নাম দিয়ে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী স্কুল করলেন। ট্রেনিং স্কুলের অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতারা বিদ্যাসাগর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমানাথ ঠাকুর, হীরালাল শীল, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতিকে স্কুল পরিচালনের ভার নিতে অনুরোধ করলেন। বিদ্যাসাগর রাজী হলেন না। তাঁরা অনেক সাধ্য সাধনা করলেন। তখন বিদ্যাসাগর বললেন, স্বাধীন ভাবে যদি কাজ করতে পাই, তবেই থাকতে পারি, নইলে নয়। প্রতিষ্ঠাতারা বললেন—স্কুল আপনারই হলো, আমরা পৃষ্ঠপোষক মাত্র রইলাম।

বিদ্যাসাগর স্কুলের ভার নিলেন।

আবার নতুন কমিটি হলো। সভাপতি—প্রতাপচন্দ্র সিংহ। সম্পাদক বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের কাজ সর্বাঙ্গ সুন্দর। বেঙ্গল ব্যাঙ্কে স্কুলের নামে একটি একাউন্ট খোলা হলো। চেকে সই করবেন দুজন—বিদ্যাসাগর আর হরচন্দ্র ঘোষ। তিন বছর বাদে ট্রেনিং স্কুলের নাম বদলিয়ে নতুন নাম রাখা হলো 'হিন্দু মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন।' আরো দু'বছর বাদে, অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের সরকারী চাকরী ত্যাগ করার আট বছর বাদে মেট্রোপলিটানের সম্পূর্ণ ভার একা বিদ্যাসাগরের উপর পড়ল। ইতোমধ্যেই বিদ্যাসাগরের পরিচালনার গুণে মেট্রোপলিটানের ছাত্ররা প্রবেশিকা পরীক্ষায় অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাতে লাগল। এই বছরে প্রতাপচন্দ্র সিংহ মারা গেলেন এবং তার চার বছর বাদে হরচন্দ্র ঘোষও মারা গেলেন এবং এর আগে অন্যান্য তিন জন সদস্য কমিটি থেকে পদত্যাগ করার ফলে বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব এলো বিদ্যাসাগরের হাতে।

এরপর থেকে বিদ্যাসাগরের জীবনের অবশিষ্ট কাল এই বিদ্যালয়ই ছিল তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র।

শিক্ষাপ্রচার ও বিদ্যালয় পরিচালনে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব অসাধারণ।

এ ক্ষেত্রে তাঁর সংগঠনী প্রতিভা আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর তার অভ্রান্ত প্রমাণ রেখে গেছেন।

এই কৃতকার্যতার মূলে ছিল তাঁর নিঃস্বার্থপরতা।

নতুন কমিটি গঠন করেই বিদ্যাসাগর স্কুলের নানা রকম সংস্কারে হাত দিলেন; সুপরিচালনার জন্যে কতকগুলি নতুন নিয়ম তৈরি করলেন। স্কুলের উদ্দেশ্য হলো—হিন্দু ছেলেদের ইংরেজি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা।

ক্রমে ক্রমে স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। সুনামও ছড়িয়ে পড়লো। ছাত্র সংখ্যাও বাড়লো।

বিদ্যাসাগরের যত্নে ও অধ্যবসায়ে এবং অনন্যপূর্ব শিক্ষা-প্রণালী গুণে

মেট্রোপলিটান একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি বিদ্যালয়ের মধ্যে পরিগণিত হলো। লোকে বলতে লাগলো বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান।

"তাঁহার একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও অনুরাগের উর্বর ক্ষেত্রে অপর দশটি কার্য যেমন সবল হইয়াছিল, এ কার্যও সেইরূপ দ্রুত বেগে উন্নতিপথে অগ্রসর হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে আসিবার পর প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল অতি সুন্দর হইতে লাগিল।"

ক্রমে স্কুলটি স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠলো, স্কুলের আয় থেকেই স্কুলের খরচ নির্বাহ হতে লাগল। বিদ্যাসাগরকে এর জন্যে ঘরের পয়সা বার করতে হতো না। আবার স্কুলের পয়সা তিনি কখনো ঘরে নিয়ে যেতেন না। তিনি শিক্ষাব্রতীই ছিলেন, শিক্ষা-ব্যবসায়ী ছিলেন না।

চার বছর বাদে আবার নতুন কমিটি গঠিত হলো। এই কমিটিতে এলেন দ্বারকানাথ মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল। এইবার বিদ্যাসাগর আর এক ধাপ অগ্রসর হলেন। বিদ্যালয়ে যাতে বি. এ. পর্যন্ত পড়ান যায় সেজন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করলেন। "এই আবেদন পত্রে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, হরচন্দ্র ঘোষ এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বাক্ষর করিয়াছিলেন এবং ঐ আবেদন পত্রে অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের জন্য এফ. এ. ও বি. এ. পরীক্ষাদানের উপযোগী শিক্ষা দিবার আর্থিক ও অন্যবিধ সমগ্র দায়িত্ব ইঁহারা গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য রাজা রমানাথ ঠাকুর এবং রামগোপাল ঘোষ ইহাতে সেনেটের সদস্যরূপে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।"

এই আবেদনের ফলে বি. এ. পড়াবার অধিকার না পাওয়া গেলেও ফার্স্ট আর্টস পর্যন্ত পড়াবার অনুমতি পাওয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সেই সময়ে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এই মন্তব্যটি এখানে উল্লেখযোগ্য:

"এতদিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনটি কলেজে পরিণত হইল। আপাতত উহাতে এল. এ. কোর্স পর্যন্ত পড়ান হইবে। গভর্ণমেণ্ট উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত করিয়া লইতে স্বীকার করিয়াছেন। পাঁচ বৎসর হইল, এইরূপ একখানি আবেদন করা হয়, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তখন তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। দেশীয়দিগের দ্বারা স্বাধীনভাবে

প্রথম এই কলেজ স্থাপিত হইল।...আগামী জানুয়ারীর প্রথমেই কলেজটি খোলা হইবে। এল. এ. ক্লাসে আপাতত পাঁচ টাকা বেতন লওয়া হইবে। কলিকাতার মধ্যে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনটি একটি প্রধান স্কুল, সুতরাং কলেজ হইলে যে উহা উত্তম রূপে চলিবে তাহা বিলক্ষণরূপে আশা করা যাইতে পারে।"

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাসাগর আবেদন পত্র পাঠিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। মেট্রোপলিটানের অসামান্য সাফল্য অনেকেরই ঈর্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাঁর এই প্রচেষ্টার বিরোধিতা করবার জন্যে সেদিন ইংরেজ ও বাঙালি লোকের অভাব হয় নি। ই. সি. বেলি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। সিনেটের ইংরেজ সদস্যদের বিরোধিতা আশঙ্কা করেই বিদ্যাসাগর আবেদনপত্র পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বেলি সাহেবকে ব্যক্তিগত ভাবে একখানি চিঠি লিখলেন। সেই চিঠিতে তিনি লিখলেন, "আমাদের বিদ্যালয় হইতে এফ. এ. ও বি. এ. পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইবার প্রার্থনাসূচক পত্রখানি সিণ্ডিকেটের অদ্যকার সভায় উপস্থিত করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছি; এ কথা বলা বাহুল্য আপনার সহায়তা লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে, কখনই আমি এ বিষয়ে অগ্রসর হইতাম না। আমি জানি না সিনেটের অন্যান্য সদস্যগণ এই বিষয়ে কিরূপ মত পোষণ করেন, কিন্তু আপনাকে জানাই যে আমাদের পক্ষীয় একজন মিস্টার সর্টক্লিফ ও মিস্টার এ্যাটকিনসনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং এ্যাটকিনসন সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে যদিও প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসারে উচ্চ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা বিষয়ে তাঁহার আপত্তি আছে, তথাপি তিনি আমাদের প্রার্থনাপত্র মঞ্জুর হওয়ার পথে বাধা জন্মাইবেন না।...আমাদের এই বিদ্যালয়টিকে কলেজে পরিবর্তিত করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনাকে অধিক আর কি বুঝাইব? মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থগণ ১২৲ টাকা মাসিক বেতন দিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ছেলেদের পড়াইতে সম্পূর্ণ অক্ষম; অন্যদিকে ধর্ম বিষয়ে মত পরিবর্তনের আশঙ্কা নিবন্ধন তাঁহারা মিশনারী কলেজে বালকদিগকে পাঠান না। এরূপ উভয় সঙ্কটস্থলে অধিকাংশ বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করিবার ষোল আনা ইচ্ছা সত্ত্বেও কোথাও পড়িতে পায় না। তাহাদের

পক্ষে এই কলেজ মহোপকার সাধন করিবে। এই বিদ্যালয়ের পরিচালন ভার বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, বাবু কৃষ্ণদাস পাল এবং আমার উপর ন্যস্ত আছে।...আমি বিশ্বাস করি, বিশ্ববিদ্যালয় সন্তুষ্ট হইয়া কলেজ-ক্লাস খুলিবার অনুমতি দিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি পেয়ে এফ.এ. ক্লাস খোলা হলো। ছাত্রও অনেকগুলো হলো; কিন্তু বিদ্যাসাগর প্রতি পদে বাধা পেতে লাগলেন। এই সম্পর্কে তাঁর এক চরিতকার লিখেছেন: "প্রথম বাধা সর্বসাধারণের ধারণা যে এ চেষ্টায় কোন ফল হইবে না। কারণ উপযুক্ত শিক্ষক সে সময় পাওয়া সুকঠিন ব্যাপার ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় উদ্যোগী পুরুষের চেষ্টাতেও যে মেট্রোপলিটন প্রবল হইয়া উঠিতে পারিবে এ বিশ্বাস তাঁহার বন্ধুগণেরও ছিল না। সুতরাং ছাত্রগণের মন ভাঙিয়া যাওয়া অপরিহার্য।" ছাত্র ও অভিভাবকগণ জনরবে বিশ্বাস করে বিদ্যাসাগরের কাছে এসে তাঁদের আশঙ্কার কথা জানালেন। বিদ্যাসাগর জনরব উপেক্ষা করে সকলকে আশ্বাস দিলেন এবং নিজে প্রতিদিন অসীম আগ্রহের সঙ্গে কলেজের কার্যকলাপ পরিদর্শন করতে লাগলেন। এইভাবে সঙ্কল্পের সিদ্ধির জন্যে নানাবিধ বাধা বিঘ্নের মধ্যে ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে লাগলেন। সে বছরের (১৮৭৪) ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় মেট্রোপলিটন গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল। কারমাটারে বসে বিদ্যাসাগর এই সংবাদ পেলেন। গেজেট বেরুল। পরীক্ষার ফল দেখে বিদ্যাসাগর খুব আনন্দিত হলেন। তিনি তখনি কলিকাতার ফিরলেন।

ঝামাপুকুর।
যোগেন বসুদের বাড়ি।
এই যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুই সেবার মেট্রোপলিটান থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগর সোজা ঝামাপুকুরে যোগেনবাবুর বাড়িতে এলেন। ছাত্র এবং ছাত্রের পিতাকে ডাকালেন। কৃতী ছাত্রকে অভিনন্দন জানিয়ে সস্নেহে বললেন—কি রে, ভয় পেয়েছিলি যে। কাল আমার বাড়ি যাস।
পরের দিন।
বাদুড়বাগান ষ্ট্রীটে বিদ্যাসাগরের বাড়ি।

যোগেন্দ্র বসু আসতেই বিদ্যাসাগর তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ওপরে তাঁর বিরাট লাইব্রেরী ঘরে। সারিবন্দী আলমারিতে অজস্র মূল্যবান বই। দেশী ও বিলিতি। সুদৃশ্য ভাবে বাঁধানো প্রত্যেকটি বই। একটা আলমারি খুলে বিদ্যাসাগর বের করলেন সুন্দর করে বাঁধান স্কটের গ্রন্থাবলী। নিজে হাতে নাম লিখে সেই গ্রন্থাবলী তিনি উপহার দিলেন তাঁর কলেজের প্রথম কৃতী ছাত্রকে। ছাত্রের কৃতিত্বে বিদ্যাসাগরের বুকখানা সে দিন দশ হাত হয়েছিল। ছাত্রের এই সাফল্য দিয়েই সেদিন তিনি জয় করেছিলেন বাধা, চাপা দিয়েছিলেন জনরব। এই যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুই পরবর্তী কালে হিতবাদীর সম্পাদক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

সেই থেকে কলকাতার ছেলেরা আকৃষ্ট হলো মেট্রোপলিটানের দিকে।

"পাশ হই আর ফেল হই আমরা এখানেই থাকব, অন্য কোথাও যাব না"—মেট্রোপলিটনের ছাত্রদের মুখে এই কথা যখন বিদ্যাসাগর শুনতেন তখন গর্বে তাঁর বুকখানা ভরে উঠত। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সর্টক্লিফ সাহেব পর্যন্ত বিস্মিত হলেন মেট্রোপলিটানের এই কৃতকার্যতা দেখে। "কলেজের প্রথম বৎসরের পরীক্ষাতেই এমন সুফল ফলিল যে মেট্রোপলিটন ত্বরিৎ গতিতে উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।"

মেট্রোপলিটন বিদ্যাসাগরের পরিণত প্রতিভার বল।

এর সুনাম ও জনপ্রিয়তার পেছনে ছিল বিদ্যাসাগরের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা এবং আন্তরিকতা। তিনি শিক্ষাব্যবসায়ী ছিলেন না, ছিলেন শিক্ষাব্রতী। এই প্রতিষ্ঠান তাঁর জীবিকানির্বাহের উপায়স্বরূপ ছিল না। স্কুল থেকে একটি পয়সা গ্রহণ করা দূরে থাক, এর শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্যে কত সময়ে কত টাকা নিজে থেকে খরচ করতেন। খরচ করতেন পাবার প্রত্যাশা না রেখেই। এই মহত্ত্ব ছিল বলেই প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই উন্নতির দৃঢ় ভূমিতে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগরের এই দৃষ্টান্ত সম্মুখে রেখেই অশ্বিনীকুমার দত্ত ব্রজমোহন বিদ্যালয় গড়েছিলেন। সকলের উপর বিদ্যাসাগরের অভিজ্ঞতা। কেমন শিক্ষক নিযুক্ত করলে, সে-সব শিক্ষকদের কোন কাজের ভার দিলে কেমন কাজ হবার সম্ভাবনা, তা বিদ্যাসাগর যেমন বুঝতেন এমন কেউ সেদিন বুঝত না। উপযুক্ত

শিক্ষককে উপযুক্ত বেতন দিতে তিনি কোন দিন কার্পণ্য করতেন না। তাঁর বন্ধুপুত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন অন্যায়ভাবে সিভিল সার্ভিসের চাকরি থেকে বরখাস্ত হলেন, তখন কলিকাতার ছাত্রসমাজে তরুণ সুরেন্দ্রনাথের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে বিদ্যাসাগর তাঁকে দুশো টাকা মাইনেতে তাঁর কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকের চাকরি দিলেন। সুরেন্দ্রনাথের জীবনের আরম্ভে তাঁকে যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সেদিন বিদ্যাসাগরই তাঁকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন। দেশ-বরেণ্য সুরেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে এ কথা সকৃতজ্ঞচিত্তেই স্বীকার করেছেন। সুরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটনে পাঁচ বৎসর অধ্যাপনা করেছিলেন। এই রকম দুশো টাকা মাইনে দিয়ে বিদ্যাসাগর স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কেও তাঁর কলেজে চাকরী দিয়েছিলেন।

পাঁচ বছর পরে মেট্রোপলিটন একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হলো এবং আরো দু'বছর বাদে এই কলেজের ছাত্রেরা বি. এ. পরীক্ষা দিতে প্রেরিত হলো। পরীক্ষার ফল ভালই হলো। সে বছর (১৮৮১) মোট ষোল জন ছাত্র মেট্রোপলিটান থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো। বিদ্যাসাগরের আগ্রহ ও উৎসাহ শতগুণে বৃদ্ধি পেল। কলেজের উন্নতির জন্যে বিদ্যাসাগর দু'হাতে খরচ করতে লাগলেন। ইতোপূর্বে তিনি নিজের খরচে একটা ভালো পুস্তকাগার করে দিয়েছিলেন; বি. এ. ক্লাস খুলবার পর থেকে তিনি কলেজের উদ্বৃত্ত টাকায় বহুমূল্য ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সকল কিনতে লাগলেন। কলেজের পুস্তকাগার, কলেজের অন্যান্য দ্রব্যাদি যথাসম্ভব সুন্দর ও বহুমূল্য করতে লাগলেন। সেই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সটক্লিফ সাহেব বলেছিলেন—"পণ্ডিত তাক লাগিয়ে দিয়েছেন—" সে কথা তিনি মিথ্যা বলেন নি। এই প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কল্পে বিদ্যাসাগর যেন তাঁর মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে সুরেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, আশুতোষ, বা অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি শিক্ষাব্রতীদের সম্মুখে যদি শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগরের এই আদর্শ না থাকত, তাহলে তাঁরা শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে কতদূর সাফল্য লাভ করতেন, তা বলা কঠিন।

বিদ্যাসাগর সত্যই দেখালেন যে, বাঙালি স্কুল করতে পারে, বাঙালি কলেজ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক চরিতকারের একটি মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য :

"য়ুরোপীয় শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত কোন কলেজ যে ভাল চলিতে পারে অথবা অধ্যাপনা ভাল হইতে পারে, ইহা লোকের ধারণার অতীত ছিল। বিদ্যাসাগরের নিজের কলেজে ভারতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া দেখাইলেন, কলেজের অধ্যাপনায় বিলাতি অধ্যাপকেরাই সর্বশ্রেষ্ঠ নয়, ভারতীয় শিক্ষকের দ্বারা অনুরূপ, এমন কি, কোন বিষয়ে উৎকৃষ্টতর শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা যাইতে পারে। মেট্রোপলিটনের সাফল্য দেখিয়া অন্যান্য কলেজ হইতে অনেক ছাত্র এই কলেজে ভর্তি হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা বিস্তারের এক নূতন দিক খুলিয়া দিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, বে-সরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠার তিনিই প্রবর্তক। তিনি যখন যে কাজে হাত দিতেন, সে কাজ সার্থক না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। তা ছাড়া, শিক্ষা-বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল বিপুল। সারা বাংলায় শিক্ষা-বিস্তারে যে প্রতিভা নিযুক্ত ছিল, তাহা একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত হওয়াতে সেই প্রতিষ্ঠান অতুলনীয় সফলতা লাভ করিল।"

এই স্কুল ও কলেজ করবার আরো একটি হেতু ছিল। বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন যে, উচ্চশিক্ষা প্রবর্তন ভিন্ন এই জাতির উন্নতি নেই। অথচ বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন যে উচ্চশিক্ষার খাতে ব্যয় করতে বিদেশী শাসকবর্গ একেবারেই মুক্তহস্ত নন। সেদিন শাসকবর্গের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা যে প্রসার লাভ করেছিল, তার প্রধানতম কারণ এই যে ঈশ্বরচন্দ্রের মতন চিন্তাশীল মনীষীরা বুঝেছিলেন যে, শিক্ষা ছাড়া দেশের উন্নতির সম্ভাবনা নেই। বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম উচ্চশিক্ষা প্রচলনের জন্যে বে-সরকারী কলেজ স্থাপন করে এই বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন। তারপর বাংলার অন্যান্য কয়েকজন মনীষী ও শিক্ষাবিদ্ বিদ্যাসাগরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উচ্চশিক্ষা প্রসারে অগ্রসর হন। এই উদ্যোগেরই ফল সিটি কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ও বঙ্গবাসী কলেজ। সেদিন বিদ্যাসাগরের দৃষ্টান্তকে সামনে রেখেই আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র বসু বাংলা ও সমগ্র ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষা প্রসারের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। বে-সরকারী প্রচেষ্টায় যে দেশের মধ্যে স্বল্পব্যয়ে উচ্চশিক্ষার প্রসার সম্ভব, তা বিদ্যাসাগর সেদিন হাতে-কলমে প্রমাণ করে শিক্ষিত বাঙালির সামনে এক বিরাট আদর্শ স্থাপন করেন। তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তী কালে

বহু কৃতী বাঙালি-সন্তান উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। তারই ফল বাংলার একাধিক জেলায় একাধিক বে-সরকারী কলেজ।

মেট্রোপলিটন এমনি বড়ো হয়নি।

এর সাফল্যের মূলে ছিল বিদ্যাসাগরের সংগঠনী-প্রতিভা। সে প্রতিভা প্রকাশ পেত নানা ভাবে। উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন, তাঁদের যথোপযুক্ত বেতন দেওয়া ছাত্রদের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করা, শিক্ষকদের কাজের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা—এ সবই বিদ্যাসাগর একা করতেন। প্রসন্নকুমার লাহিড়ী ও নগেন্দ্রনাথ ঘোষের (এন. এন. ঘোষের) মতো যোগ্য লোককে শিক্ষক ও অধ্যক্ষের পদে বেছে নেওয়া একমাত্র বিদ্যাসাগরের দূরদৃষ্টিতেই সম্ভব ছিল; ইংরেজি শিক্ষা প্রসারণের জন্যে নিজের বিদ্যালয়ে ইংরেজ শিক্ষক বা অধ্যাপক নিযুক্ত না করে এদেশীয় শিক্ষক বা অধ্যাপক নিযুক্ত করে বিদ্যাসাগর তাঁর স্বাজাত্য-প্রীতিরই পরিচয় দিয়েছিলেন। দেশী শিক্ষক নিয়েই বিদ্যাসাগর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দিগ্বিজয়ী—এ কী কম কৃতিত্বের কথা!

নিজের সুযোগ্য এবং কৃতবিদ্য তৃতীয় জামাতাকে তিনি কলেজের সেক্রেটারি নিযুক্ত করেছিলেন; তার ওপর কলেজের ভার দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির ভাবনা সব সময়েই তাঁর মাথায় ঘুরে বেড়াত। বিদ্যাসাগর নিজে বিদ্যালয় পরিদর্শন করতেন। রুগ্নদেহেও তিনি এ কাজ করেছেন। কোন কাজের ভার অন্যের উপর দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতেন না। যখন বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসতেন, বিনা নোটিসেই আসতেন। অধ্যাপক নিবিষ্টচিত্তে পড়াচ্ছেন, এমন সময় বিদ্যাসাগর ধীরে ধীরে এসে তাঁর পেছনে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতেন। দৈবাৎ যদি সেই অধ্যাপক তাঁকে দেখতে পেয়ে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠতেন অমনি বিদ্যাসাগর তাঁকে নিষেধ করে বলতেন—"তুমি পড়াতে পড়াতে উঠো না। তোমার কাজ তুমি করে যাও।" অধ্যাপকদের কর্তব্য ত্রুটি তিনি আদৌ বরদাস্ত করতে পারতেন না। আবার যদি কোন ছাত্রকে ঘুমোতে দেখতেন, তখনি তাকে স্থানান্তরে নিদ্রা যাবার ব্যবস্থা করে দিতেন। মেট্রোপলিটানের ছাত্র এবং অধ্যাপক ও শিক্ষকদের জন্যে তাঁর বাড়ির দরজা সর্বদা অবারিত ছিল। এমন কি বিদ্যালয়ের দ্বারবানদের সুখ-সুবিধা পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি এড়াত না। এইভাবে "দেহের শোণিত-

বিন্দু বিন্দু পাত করিয়া ও জীবনের চিন্তাস্রোতে রেণু রেণু অর্পণ করিয়া" বিদ্যাসাগর নিঃস্বার্থভাবেই এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন। এই মেট্রোপলিটনই তাঁর অক্ষয় স্মৃতি।

বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্যে কখনো বেতের প্রয়োজন হতো না। শিক্ষকদের উপর তাঁর কড়া হুকুম ছিল যে তাঁরা যেন কখনো ছাত্রদের প্রহার না করেন ; মিষ্ট কথায় শান্তভাবে তাঁরা যেন ছাত্রদের নিয়মাধীনে রাখেন। কোনো শিক্ষক যদি এই আদেশের বিপরীত আচরণ করতেন, বিদ্যাসাগরের স্কুলে তাঁর চাকরি করা মুস্কিল হতো। ছাত্রদের তিনি বশ করতেন স্নেহ দিয়ে। স্নেহের শাসন যে বড়ো শাসন, বিদ্যাসাগরের চেয়ে এ কথা বেশী করে কেউ জানতেন না। একবার স্কুলের ছেলেরা তাঁর কাছে গিয়ে পৌষ-পার্বণের ছুটী চাইল। বিদ্যাসাগর ছুটী মঞ্জুর করলেন। সহাস্যে সস্নেহে বললেন, তোমাদের অনেকের তো বিদেশে বাড়ি। কলকাতার বাসায় পিঠে পাবে কোথায় ? ছেলেরা একসঙ্গে বলে উঠলো—কেন, আপনার বাড়িতে। বিদ্যাসাগর হেসে বললেন—বেশ তাই হবে। সেবার তিনি ছাত্রদের জন্যে বাড়িতে প্রচুর পিঠে-পুলির আয়োজন করেছিলেন। এইভাবে শান্ত সদয় ব্যবহার করতেন বলেই ছাত্রেরা বিদ্যাসাগরের অনুগত ছিল। তাদের দোষ-ত্রুটী তিনি সংশোধন করতেন শাসন করে নয়, স্নেহ দিয়ে। আবার যে ছাত্রকে মনে হতো সংশোধনের অতীত, তেমন ছাত্রকে তিনি বিদ্যালয়ে রাখতেন না। কোমলে-কঠোরে এমনি প্রকৃতি ছিল বিদ্যাসাগরের।

বিদ্যাসাগরের ছাত্র-প্রীতি সম্পর্কে আর একটি কাহিনীর উল্লেখ করব। ছাত্রদের তিনি সর্বদাই 'তুই' বলে ডাকতেন। একবার মেট্রোপলিটান স্কুলের শ্যামবাজারস্থ শাখার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের অবাধ্যতা দোষের জন্যে তিনি তাদের তাড়িয়ে দেন। ছেলেরা পরের দিন সকালবেলায় তাঁর বাদুরবাগানের বাড়িতে এসে উপস্থিত। তারা অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা চাইল। বিদ্যাসাগর গলে জল। সস্নেহে বললেন, যা, আর এ কাজ করিস্ না ; এবার মাপ করলাম। ছেলেরা আশ্বস্ত হলো। তখন বেলা বারোটা। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একটি ছাত্র হাসতে হাসতে অনুচ্চশব্দে বলে—কী কঠোর প্রাণ, এতখানি বেলা হলো তা বললেন না, একটু জল খেয়ে যা। কথাটা বিদ্যাসাগরের কানে গেল। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি

দিয়ে নেমে এসে ছেলেদের ডাকলেন; বললেন—ঠিক বলেছিস, আমার কঠোর প্রাণই বটে, তোদের একটু জল খেতে বলিনি। আয়, আয় একটু জল খেয়ে যা। ছাত্ররা অপ্রস্তুত। তারা আবার ক্ষমা চায়। তখন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে স্নেহ-সাগর সাগর-হৃদয়ে। সকলকে ধরে তিনি ওপরে নিয়ে এলেন—সকলকে প্রচুর জলযোগে পরিতুষ্ট করলেন—নিজে হাতে করে খাওয়ালেন তাদের। পাষাণের অন্তরালে যেন প্রবাহিত হলো করুণার মন্দাকিনী ধারা।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর দু'বছর আগে কলেজের জন্যে নতুন জমি কেনা হয়। জমি কিনতে ও নতুন বাড়ি করতে দেড় লক্ষ টাকা খরচ হয়। প্রায় লাখ টাকা দেনা হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের এই প্রতিষ্ঠানটি বিদেশীর কাছেও কি রকম সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পেয়েছিল তার উল্লেখ আছে বাক্ল্যাণ্ডের 'বেঙ্গল আণ্ডার দি লেফটেনাণ্ট গভর্ণরস্' নামক বিখ্যাত বইতে। বাক্ল্যাণ্ড ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি লিখেছেন: ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা শহরে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে এক সুপরিচিত ঘটনা। এই ধরণের পরবর্তী বহু বিদ্যালয়ের ইহা আদর্শস্থানীয়। মেট্রোপলিটন কলেজের সংশ্লিষ্ট স্কুলে আট শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত; এতদ্ব্যতীত কলিকাতাতেই এই বিদ্যালয়ের চার-পাঁচটি শাখা বিদ্যমান ছিল।"

মেট্রোপলিটন সত্যই বিদ্যাসাগরের অতুলনীয় কীর্তি। স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনিই দেখালেন যে বাঙালির নিজের চেষ্টায় উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন সম্ভব।

এই প্রতিষ্ঠান তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি ছিল সত্য—কিন্তু এই সম্পত্তি তিনি চিরদিন পরার্থেই রেখেছিলেন।

বাংলার শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে এই তাঁর গৌরবস্তম্ভ।

ন্যায়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও আন্তরিকতার উপর দাঁড়িয়ে আছে বিদ্যাসাগরের এই গৌরবস্তম্ভ।

দরিদ্র বাঙালি সন্তানের উচ্চশিক্ষা লাভ, তার জ্ঞানোপার্জনের পথ সুগম করে দিয়ে শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর তাঁর দেশবাসীর সম্মুখে যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন—সেই আদর্শ আদর্শ-হিসাবে আজো শ্রেষ্ঠ, আজো অনুসরণযোগ্য।

॥ চব্বিশ ॥

এইবার বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-সাধনার কথা।

একাধারে তিনি বাংলা সাহিত্যের মহর্ষি কণ্ব ও বাল্মীকি।

বাংলা সাহিত্যে তাঁর একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। সে ভূমিকা যে কত বড়ো আর কত গুরুত্বপূর্ণ তা নিপুণভাবে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলায় সাহিত্য ভাষার সিংহদ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন। তার পূর্ব থেকেই এই তীর্থাভিমুখে পথ খননের জন্যে বাঙালির মনে আহ্বান এসেছিল এবং তৎকালীন অনেকেই নানা দিক থেকে সে আহ্বান স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁদের অসম্পূর্ণ চেষ্টা বিদ্যাসাগরের সাধনার পূর্ণতর রূপ ধরেছে। ভাষার একটা প্রকাশ মননের দিকে এবং জ্ঞানের তথ্য সংগ্রহের দিকে, অর্থাৎ বিজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞানে ইতিহাসে; আর একটা প্রকাশ ভাবের বাহনরূপে রসসৃষ্টিতে। এই শেষোক্ত ভাষাকেই বিশেষ করে বলা হয় সাহিত্যের ভাষা। বাংলায় এই ভাষা দ্বিধাহীন মূর্তিতে প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে বিদ্যাসাগরের লেখনীতে; তার সত্তায় শৈশব যৌবনের দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়েছিল।···সংস্কৃত শাস্ত্রে বিদ্যাসাগরের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। এই জন্য বাংলাভাষার নির্মাণ কার্যে সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে তিনি যথোচিত উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু উপকরণের ব্যবহারে তাঁর শিল্পজনোচিত বেদনাবোধ ছিল। তাই তাঁর আহরিত সংস্কৃত শব্দের সবগুলিই বাংলাভাষা গ্রহণ করেছে, আজ পর্যন্ত তার কোনটিই অপ্রচলিত হয়ে যায়নি। বস্তুত পাণ্ডিত্য উদ্ধত হয়ে উঠে তাঁর সৃষ্টিকার্যের ব্যাঘাত করতে পারেনি। এতেই তাঁর ক্ষমতার বিশেষ গৌরব। তিনি বাংলাভাষার মূর্তি নির্মাণের সময় মর্যাদা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। বিদ্যাসাগরের দান বাংলাভাষার প্রাণপদার্থের সঙ্গে চিরকালের মতো মিলে গেছে।

"শুধু তাই নয়। যে গদ্যভাষারীতির তিনি প্রবর্তন করেছেন, তাঁর ছাঁদটি বাংলা ভাষায় সাহিত্য-রচনা-কার্যের ভূমিকা নির্মাণ করে দিয়েছে।... সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজো বাংলাভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়।"

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যে কত বড়ো বিপ্লব এনেছিলেন তা ভাবলে পরে বিস্মিত হতে হয়। তিনি যে খুব উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা নয়; তিনি পঞ্চাশ খানার বেশী বই লিখে গেছেন। এই সব বইয়ের অধিকাংশই স্কুল পাঠ্য বই, নয়ত অনুবাদ কিংবা অনুকরণ। মৌলিক রচনা বিদ্যাসাগরের নেই বললেই চলে। তথাপি তাঁর গৌরব ভাষার সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটনে। এই কথাটির মর্ম উপলব্ধি করতে হলে একটু পেছনের দিকে, ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। রামমোহন থেকেই শুরু করা যাক। বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক তিনি। রামমোহন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "তিনি কী না করিয়াছিলেন? শিক্ষা বলো, রাজনীতি বলো, বঙ্গভাষা বলো, বঙ্গ সাহিত্য বলো, সমাজ বলো, ধর্ম বলো, বঙ্গসমাজের যে-কোনো বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে, সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালের নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র।" তবে এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে রামমোহনের আগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরা মিলে এই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন রাজার পূর্বগামী। বিশেষ করে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কীর্তি এ দিক দিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বাংলা গদ্য তাঁরই চেষ্টায় প্রথম সাহিত্যের গৌরব লাভ করে এবং তিনিই প্রথম বাংলাভাষা নিয়ে সাধু ও কথ্য রীতিতে সাহিত্য রচনার পথ দেখিয়েছিলেন। বিদ্যালঙ্কারই বাংলা-গদ্যসাহিত্যের প্রথম শিল্প-বোধ-সম্পন্ন স্রষ্টা। তবে এই ভাষার বহুল পরিবর্তন সাধন করেন রামমোহন। কি ভাষায়, কি ভাবে, কি রচনায়, কি পদবিন্যাসে—সকল দিক দিয়ে বাংলা-সাহিত্যকে তিনি এক নতুন রূপ দান করেছিলেন।
তারপর এলেন বিদ্যাসাগর।

বাংলা গদ্যরীতির প্রথম প্রবর্তক রামমোহন হলেও বাংলা ভাষাকে স্থায়ী, সুষ্ঠু, স্বীয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে তোলেন বিদ্যাসাগর। অলঙ্কার-বহুল সংস্কৃত শব্দ ও উপমার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে ও প্রয়োজন অনুযায়ী মাত্রা ও যতির প্রবর্তন করে বাংলা ভাষাকে তিনিই আধুনিক যুগোপযোগী করে তোলেন।

বাংলা-গদ্যসাহিত্যে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা বুঝতে হলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কথা স্মরণ করতে হয়। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলাভাষায় তখন যেমন লেখকদের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁরাই যথার্থ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করেছিলেন। এঁদের মধ্যের অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাভাষা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের নাম। এঁরা দুজনেই দুই দিকপালের মতো বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। সাহিত্যের এই দুই সাধক আজীবন মাতৃভাষার উন্নতির জন্যে তপস্যা করেছিলেন। অক্ষয়কুমারের কৃতিত্ব এই যে বিদ্যাসাগরের আগেই তিনি এমন শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা করেছিলেন যে তাতে কোনরূপ জড়তা বা কোন রকম জটিলতা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বাংলাভাষায় তিনিই উৎকৃষ্ট গদ্যের প্রবর্তক।

প্রসঙ্গত একটা কথার উল্লেখ করব। বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালির চিন্তাধারায় জ্ঞানতপস্বী ও মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের দানের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে অনেকেই কুণ্ঠিত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের শৈশবাবস্থায় অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সৃষ্টি করে ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এই যে, অক্ষয়কুমারের মধ্যে ছিল একটি স্বাধীন সংস্কারমুক্ত মন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী—যে মন ও দৃষ্টিভঙ্গী কিছু পরিমাণে দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকেও প্রভাবিত করেছিল। প্রখর যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমারের প্রতি বিদ্যাসাগর তাই যৌবনেই আকৃষ্ট না হয়ে পারেন নি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই সাময়িকপত্রের গতানুগতিক ধারা ভঙ্গ করল। তত্ত্ববোধিনীর আগে পর্যন্ত বাংলা গদ্যের ভঙ্গি ছিল অপূর্ণ এবং সৌষ্ঠব-বর্জিত। সে গদ্য দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয় নি, এমন কি গদ্যে সাহিত্য সৃষ্টির কথা

কারো মনে জাগেনি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নিয়ে এলো বিপ্লব। এর সরল সহজবোধ্য রচনাগুলি বাংলা গদ্যে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করল। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখকের রচনামণ্ডিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাংলা সাময়িক-পত্রের যে আদর্শ স্থাপন করেছিল, পরবর্তী কালে বঙ্গদর্শন-ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় তাই অনুসৃত হয়েছিল। এই লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষায় এবং ভাবে বাঙালির চিত্তে নবজাগরণের চাঞ্চল্য এনেছিল অক্ষয়কুমারের মনীষা। বাংলা গদ্যের জটিলতা ঘুচিয়ে বাক্যে ভারসমতা ও ব্যবহারযোগ্যতা দিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার। বিদ্যাসাগর তাতে প্রাণসঞ্চার করলেন লালিত্য ও শ্রুতিমাধুর্য যোগ করে। বাংলা গদ্যের নাড়ী দেখে তার ঋতুগত স্পন্দনপ্রবাহ বা তাল ঠিকমতো ধরে সেই ভাবে বাক্যগঠন-রীতি দেখিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের এই কৃতিত্বের কথা আলোচনা করে বলেছেন: "বাংলাভাষাকে পূর্ব-প্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর ভার হইতে মুক্ত করিয়া তাহার পদগুলির মধ্যে অংশ যোজনায় সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলাগদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহার যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি-সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া গ্রাম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলাগদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্য-ভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।"

কুশলী গদ্যশিল্পী ছিলেন বিদ্যাসাগর।

কুশলী গদ্যশিল্পী হতে গেলে স্বতন্ত্র বিচারবুদ্ধি ও বাংলা বাক্যের ধ্বনি-সচেতন কান থাকা প্রয়োজন। তা বিদ্যাসাগরের ছিল। এই ক্ষেত্রে বাংলাসাহিত্যে চার প্রধানের নামই আমাদের মনে আসে—বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী। বিদ্যাসাগরকে আমরা জানি সাধু গদ্যের স্রষ্টা বলে। কিন্তু বাংলা গদ্যরাজ্যে তাঁর কৃতিত্ব এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। কথ্যভাষাতেও

তিনি অবলীলাক্রমে লিখতে পারতেন এবং এর প্রমাণ আছে ছদ্মনামে লেখা তাঁর তিনখানি বইতে—'ব্রজবিলাস', 'অতি অল্প হইল' এবং 'আবার অতি অল্প হইল'। শব্দ-প্রয়োগে বিদ্যাসাগর যে কত মুক্ত-সংস্কার ও প্রগতিশীল ছিলেন, তার প্রমাণ এই বই তিনখানি।

বিদ্যাসাগরের আগে বাংলা-গদ্যের যে অবস্থা ছিল তার ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন যে, এই ভাষা-গঠনে তাঁর শিল্পপ্রতিভা ও সৃজন-ক্ষমতা কী অসাধ্য সাধনই না করেছে। এই সম্পর্কে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আর একজন সমর্থ শিল্পীর মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি। বাংলা সাহিত্যের 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্য-সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেছেন: "বাংলার আদি গদ্য-লেখকদের মধ্যে দু'জন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—দুজনেই মেদিনীপুরের মানুষ। মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ—ইংরেজদের জন্যে লেখা এবং ছাপাও লণ্ডন শহরে। সে হিসেবে বলতে গেলে বাংলা গদ্যের বিলেতে জন্ম। এই বই ছিল সেকালের স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ—সে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতার কেল্লায়, আর সে স্কুলের ছাত্ররা ছিল সব ইংরাজ যুবক, বাঙালি বালক নয়। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ছিলেন সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী ব্রাহ্মণপণ্ডিত, সুতরাং ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতির কিঞ্চিৎ জ্ঞানদান করা তিনি অবশ্য কর্তব্য মনে করেছিলেন; উপরন্তু কিঞ্চিৎ নীতি শিক্ষা দেওয়াও তাঁর অভিপ্রেত ছিল। প্রবোধচন্দ্রিকা একাধারে বোধোদয় আর কথামালা। ভাষা ও ভাবের শুচিতার অভাব থাকলেও প্রবোধচন্দ্রিকার আখ্যানভাগের গদ্য খাঁটি বাংলায় লেখা। তিনিই সংস্কৃত ভাষাকে বাংলা আকার দেবার চেষ্টা করেছিলেন এবং পরবর্তী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা এই পদ্ধতি-তেই বাংলা গদ্য লিখেছেন। এই সংস্কৃত ভেঙে বাংলা গড়তে গিয়েই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বাংলা গদ্য বিশৃঙ্খল করে ফেলেছিলেন। এর কারণ এই যে, বাংলা ভাষার গঠন যে সংস্কৃত ভাষার গঠনের অনুরূপ নয়, সে জ্ঞান তাঁদের ছিল না। ফলে তাঁরা সংস্কৃত ভেঙেছিলেন বটে, কিন্তু বাংলা গড়তে পারেন নি।

"তারপর এলেন বিদ্যাসাগর। তিনিই এই ভাষাকে যতদূর সম্ভব সমন্বিত ও শ্রুতিমধুর করে তুললেন। যেখানে ছিল তান মান লয়ে বঞ্চিত

কর্ণপীড়াদায়ক কর্কশতা, বিদ্যাসাগর সেইখানে নিয়ে এলেন শ্রুতিমধুরতা। ডাকিনীর ডমরুধ্বনি আর গণ্ডগোলের ভাষাই বিদ্যাসাগরের হাতে পড়ে কিছুটা শোভন ও শ্রীমণ্ডিত হলো। প্রথমত, তিনি সংস্কৃত শব্দ বে-পরোয়া ভাবে বাঙালির কানে ছুঁড়ে মারেন নি। শেয়াল অবশ্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের শ্মশানেও নেই, বিদ্যাসাগরের দ্রাক্ষাবনেও নেই। তবে শিবা তাঁর হাতে পড়ে শৃগাল হয়ে উঠেছে, তার সে শৃগাল দাঁড়িয়ে থাকে দ্রাক্ষা-বৃক্ষের নিম্নে, বাংলার শিশুদের এই শিক্ষাদান করবার জন্যে যে, দ্রাক্ষাফলের নাগাল পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের গদ্যের ধ্বনি উৎকটও নয়, শ্রুতি কটুও নয়। বিদ্যালঙ্কারের ভাষার তুলনায় বিদ্যাসাগরের ভাষাকে স্থললিত বলা যেতে পারে। এবং তাঁর গদ্যের অন্বয় উচ্ছৃঙ্খলও নয়, বিশৃঙ্খলও নয়।...বিদ্যাসাগরের গদ্য সুগঠিত; এবং স্থানে স্থানে শ্রুতিমধুর হলেও যে কায়েমি হয়নি, তার কারণ এ ভাষা কৃত্রিম, এ ভাষায় বাঙালি তার মনের কথা খুলে বলতে পারে না। এ গদ্য যে বাঙালির মনঃপূত হয় নি, তার প্রমাণ পরবর্তী লেখকেরা বাংলা গদ্যের রূপান্তর ঘটালেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা বিদ্যাসাগরী ভাষার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করল। কিন্তু সে কাহিনী স্বতন্ত্র। তবে এইখানে একটা কথা জেনে রাখা দরকার। কোম্পানীর আমলের বাংলা গদ্য সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের রচিত ভাষা। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানীর প্রভুত্বের অবসান এবং সেই সঙ্গে বাংলা ভাষার ওপর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদেরও প্রভুত্বের অবসান হলো। আমাদের ভাষার ওপর টোলের প্রভাব নষ্ট হলো এবং তার পরিবর্তে নব-প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হলো।"

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বিদ্যাসাগরের যুগে বাংলা গদ্যের বিবর্তনে হিন্দু কলেজ গোষ্ঠীর দান কিছু কম নয়। সংস্কৃত কলেজ গোষ্ঠী বিদ্যা-সাগরকে পুরোভাগে রেখে করেছিলেন সংস্কার, হিন্দু কলেজ গোষ্ঠী আনলেন বিপ্লব। গদ্যে প্যারীচাঁদ ও পদ্যে মধুসূদনের বৈপ্লবিক যুগান্তর স্মরণীয়। হিন্দু কলেজ গোষ্ঠীর গদ্য-লেখকদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর উল্লেখযোগ্য হলেন রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও প্যারীচাঁদ মিত্র।

বিদ্যাসাগরের পূর্বসূরী টেকচাঁদ ঠাকুরই টুলো বাংলার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী। ইনি বিদ্যাসাগরের চেয়ে দু বছরের বড়ো। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন : "প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) আদর্শ বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু বাংলা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।" এই প্যারীচাঁদের দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্তি 'আলালের ঘরের দুলাল'। এই বইতে তিনি প্রথম দেখালেন যে যেমন জীবনে তেমনি তেমনি সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। এই বইতেই টেকচাঁদ প্রথম দেখালেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাংলা দেশকে উন্নত করতে হয়, তবে বাংলা দেশের কথা নিয়েই সাহিত্য গড়তে হবে। বিদ্যাসাগরও বাংলা গদ্য সাহিত্যে টেকচাঁদের মূল্য স্বীকার করেছেন।

এইখানে প্রসঙ্গত একটা কথার উল্লেখ করব।

বিদ্যাসাগরের যুগে বাংলা গদ্য তথা বাংলা ভাষায় এমন যুগান্তর সম্ভব হলো কি করে? পলাশির প্রান্তরে বাঙালির কপাল পুড়ে যাওয়ার পর বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পথ প্রায় শতাব্দী কাল ধরেই রুদ্ধ ছিল। সামাজিক অধঃপতন ও রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ই এর মূল কারণ। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক আদর্শানুসারেই সাহিত্য সৃষ্ট হয়। পারিপার্শ্বিকতা এড়িয়ে মানুষ চিন্তা করতে পারে না। বাস্তব-নিরপেক্ষ কল্পলোকে মানুষের বিহার এক রকম অসম্ভব। এই কারণে শত বৎসর কাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শূন্য যুগ। তারপর এলো পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ঢেউ। আগের যুগের সামাজিক জড়তা, স্থিতিশীলতা এবং আদিম সরলতার মধ্যে বাংলা গদ্যের বিকাশ সম্ভব হয় নি। কারণ ভাষা ও জীবন, ভাষা আর সমাজের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও নিবিড়। তাই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ থেকেই বাংলার সমাজ যখন সচল, সক্রিয় জটিল হয়ে উঠল, বাঙালির জীবনের সামনে দেখা দিল বিবিধ সমস্যা, তখন ভাষাকেও অক্ষরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত কাব্যের মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব হলো না। সমস্ত জটিলতাকে আত্মসাৎ করে ইতিহাসের নেপথ্য এবং নিগূঢ় গতিপথেই সম্ভব হলো বাংলা গদ্যের বিকাশ। সেই বিকাশের সিংহদ্বারই উদ্ঘাটন করলেন বিদ্যাসাগর। নির্মাতা বিদ্যাসাগর একা, এ কথা বললে

ঠিক বলা হবে না, কেননা বাংলার সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে বাংলা দেশে এমন কতকগুলি প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছিল যাঁদের প্রত্যেকেই বিদ্যাসাগরের মতো কালের নির্দেশ মেনে নিতে দ্বিধা করেন নি। এঁদেরই মিলিত প্রয়াস সৃষ্টি করলো নূতন কালের উপযোগী নূতন গদ্যরীতি। সেই প্রয়াসের পুরোভাগে ছিলেন বিদ্যাসাগর।

বাংলা সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের প্রাক্কালে বিদ্যাসাগর যে পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হলেন, সেই পরিবেশের মধ্যে ছিল জড়তা, জটিলতা এবং কিছু পঙ্গুতা। এই ত্রুটী দূর করতে গিয়ে তিনি আলালী ভাষাকে অবশ্য আদর্শ ভাষা বলে গ্রহণ করলেন না, নিজের প্রতিভা বলে নিজেই এক স্বতন্ত্র গদ্য-রীতির সৃষ্টি করলেন। আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের বনিয়াদ বলতে গেলে বিদ্যাসাগরীয় রীতি। 'সীতার বনবাস'-এর প্রথম লাইনেই আছে: "রঘুকুল ধুরন্ধর রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগলেন"—স্পষ্টই দেখা যায় এ বাক্যের অন্বয় সহজ, অর্থ সরল, গতি সচ্ছন্দ। উপরন্তু এ গদ্যের অন্তরে ছন্দ আছে। গদ্যেরও যে ছন্দ আছে, সে-ছন্দ যে ব্যক্ত নয়, প্রচ্ছন্ন, এ সত্য আমরা প্রথম আবিষ্কার করলাম বিদ্যাসাগরীয় গদ্য রীতিতেই। সুতরাং বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম কৃতী শিল্পীর গৌরব বিদ্যাসাগরকেই দিতে হয়। সাহিত্যে তাঁর জন্যে এই ভূমিকাটিই সেদিন অপেক্ষা করছিল। বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত এ স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।" এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, যে বিদ্যাসাগর সাহিত্যিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের যশোবিস্তারের পূর্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, সেই বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথম জীবনে কিন্তু বিরূপ মতই পোষণ করতেন। স্যর গুরুদাস তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রথম শ্রদ্ধার ভাব ছিল না—তিনি বলিতেন 'He is only primer-maker'—তিনি খানকতক ছেলেদের পাঠ্য পুস্তক লিখেছেন বই তো নয়।" এই উক্তি স্যার গুরুদাস শুনেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুরের বৈঠকখানায়। দীনবন্ধু মিত্র, লালবিহারী দে প্রভৃতির সাক্ষাতেই বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্তব্য করেছিলেন। এই বঙ্কিমচন্দ্রই পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ

করেছেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের গোড়ার কথা প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় বলেছেন। "বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত ও গঠিত বাংলা ভাষাই আমাদের মূলধন। তাঁহারই উপার্জিত সম্পত্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি।"

প্রসঙ্গত বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম সম্পর্কে আর একটা কথা বলা দরকার। কোনো কোনো বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও বিদ্যাসাগরের ওপর বঙ্কিমচন্দ্রের যেমন শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, বিদ্যাসাগরও তাঁর দু'একটা লেখায় একটু আধটু ক্ষুণ্ণ হলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন আর তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। এই উদারতাই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। 'বঙ্কিম জীবনী' গ্রন্থে সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন, সেটি বিশেষভাবেই স্মরণীয়। একদা কোনো এক ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে নিজের কাজ উদ্ধারের আশায় মিথ্যা করে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে লাগাতে থাকেন। বিদ্যাসাগর সব শুনে, হাসতে হাসতে বললেন, দেখ হে, তোমার কথা শুনে বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। একটা লোক গুরুতর রাজকার্য করার পর কখন যে আবার বই লেখে, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। দেখ, বঙ্কিমের বইয়ে আমার আলমারীর একটা শেলফ ভর্তি হয়ে গেছে। আমি তার বই রীতিমত পড়ি। মতানৈক্য সত্ত্বেও লোকচক্ষুর অন্তরালে এই দুই বিরাট প্রতিভাশালী পুরুষের মধ্যে পরস্পর শ্রদ্ধাভক্তি ও স্নেহ-ভালোবাসা যে কী গভীর ছিল, তার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হতে হয়।

এ কথা আজ সর্বজন-স্বীকৃত যে, বিদ্যাসাগরের হাতেই বাংলা ভাষার সংস্কার হয়েছিল। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের পিতা তিনিই। যে বাংলা এখন আমরা পড়ি আর লিখি, বিদ্যাসাগরই তার ভিত্তি স্থাপন করেন।

বাংলা ভাষার পিতৃত্বের গৌরব একান্তভাবে তাঁরই প্রাপ্য।

"ভাষার প্রাঙ্গণে তব, আমি কবি, তোমারি অতিথি"—বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি আদৌ অত্যুক্তি নয়।

'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-গ্রন্থের লেখক লিখেছেন:

"বিদ্যাসাগরের বই প্রায় সবই পাঠ্য পুস্তক জাতীয়। প্রথম রচনা 'বাসুদেব-চরিত' বোধ করি পৌরাণিক কাহিনী বলিয়াই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের খ্রীষ্টান কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে নাই, সুতরাং মুদ্রিতও হয় নাই।

'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ব্যবহারের জন্য লেখা। তাহার পর ১৮৪৯ হইতে ১৮৬৯ মধ্যে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (দ্বিতীয় ভাগ') 'জীবন চরিত', 'বোধোদয়' 'শকুন্তলা', 'কথামালা', 'চরিতাবলী', 'সীতার বনবাস' 'আখ্যান মঞ্জরী', এবং 'ভ্রান্তিবিলাস' বাহির হয়। বেতাল-পঞ্চবিংশতির মূল হিন্দী। শকুন্তলা ও সীতার-বনবাস সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে লেখা। বাকি বইগুলির মূল ইংরেজি। বিদ্যাসাগরের স্বাধীন রচনা হইতেছে 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' দুইখণ্ড, 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' এবং দুই খণ্ড 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার'। প্রথম নিবন্ধটিতে বিদ্যাসাগরের অসাধারণ সাহিত্য-রসজ্ঞতার পরিচয় আছে। শেষের বই দুইটিতে তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের প্রগাঢ় বিচার-শক্তির পরিচয় জাজ্জ্বল্যমান। কয়েকটি বেনামী সরস ব্যঙ্গ-রচনা বিদ্যাসাগরের লেখা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।"

সমস্ত দিক থেকে দেখে রামমোহনের পরে এ সময়কার যুগপ্রধান বিদ্যাসাগর —যিনি বাংলা গদ্যের অন্তর-রহস্য উপলব্ধি করেছিলেন, যাঁর মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সঙ্গে সাহিত্যিক অনুভূতি এসে মিশেছিল এবং যাঁর মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছিল সেই জিনিষ যা আধুনিক কালের প্রধান ধর্ম—মানবতাবাদ।

উত্তরকালে বিদ্যাসাগর সাহিত্যক্ষেত্রে যে সম্পূর্ণ সফল-মনোরথ হবেন তার পূর্বাভাষ আমরা পাই 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বইতে। আগেই বলেছি "বৈতাল পঁচ্চিসী" বইয়ের অনুবাদ এটি। হেস্টিংস-এর মুন্সী লল্লুলাল এর লেখক। এর কাছেই হেস্টিংস হিন্দী শিখতেন। পণ্ডিত শিবদাস ভট্টের লেখা "বেতাল-পঞ্চবিংশকা" নামে একখানা সংস্কৃত বইও তখন ছিল। হিন্দী বেতালের অশ্লীল অংশগুলি বর্জন করেই বিদ্যাসাগর তাঁর বেতাল রচনা করলেন। প্রকৃতপক্ষে এ কাজের নেপথ্য প্রেরণা ছিলেন মার্শাল সাহেব। তাঁর প্রকাশিত এই প্রথম গ্রন্থের রচনার পারিপাট্য অনুভব করবার মতো। সাতাশ বছরের যুবক বিদ্যাসাগর সেদিন এই 'বেতাল' লিখেই বাংলা সাহিত্যে নির্মাতার আসন অধিকার করেন—এ কম কৃতিত্বের কথা নয়। বেতালের ভাষার একটু নমুনা তুলে দিলাম:

"উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্বসেন নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি মহিষী। তাঁহাদের গর্ভে রাজার ছয় পুত্র জন্মে। রাজকুমারেরা সকলেই সুপণ্ডিত

ও সর্ববিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন। কালক্রমে নৃপতির লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, সর্বজ্যেষ্ঠ শঙ্কু সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তৎকনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগ, নীতিপরতা ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন; তথাপি, রাজ্যভোগের লোভে অসমর্থ হইয়া, জ্যেষ্ঠের প্রাণ সংহার পূর্বক স্বয়ং রাজেশ্বর হইলেন; এবং ক্রমে ক্রমে নিজ বাহুবলে, লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া আপন নামে অব্দ প্রচলিত করিলেন।"

এখানে মনে রাখা দরকার যে, তখনকার পয়ার-ত্রিপদী-মালঝাঁপের তালে মশগুল বাঙালি পাঠকের কাছে যেমন প্রথমে সমাদৃত হয়নি মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ, তেমনি দলিল-দস্তাবেজের প্রচলিত ভাষার সঙ্গে পরিচিত বাঙালি পাঠকের কাছে প্রথমে সমাদর পায়নি বিদ্যাসাগরের বেতাল। এমন কি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেও প্রথমে পাঠ্যরূপে বেতাল গৃহীত হয় নি। এ ক্ষেত্রে আপত্তি তুলেছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই কৃষ্ণমোহনকে বাঙালি জানে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বলে যিনি মধুসূদনকে খ্রীষ্টান করেছিলেন, জানেনা যে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সংস্কার সাধন করবার জন্যে যে সকল মনীষী আপ্রাণ পরিশ্রম করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এই কৃষ্ণমোহন। বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে বাংলাসাহিত্যের তিনি যে উন্নতি সাধন করেছিলেন, সেজন্যে বাঙালির তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকার কথা। কৃষ্ণমোহন বিদ্যাসাগরের চেয়ে সাত বছরের বড়ো ছিলেন। কৃষ্ণমোহন দশটি ভাষা জানতেন। খ্রীষ্টান হলেও তখনকার দিনে বাংলা ভাষার উন্নতিমূলক এমন কোন প্রচেষ্টা ছিল না যার সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না ছিল। বিদ্যাসাগর আর কৃষ্ণমোহন একই সঙ্গে বিলেতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কৃষ্ণমোহনের বিরূপ মন্তব্যের ফলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বেতাল পাঠ্যরূপে গৃহীত হলো না। তখন "বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরুপায় হইয়া শ্রীরামপুরের পাদরী সাহেব মহোদয়গণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পাদরী মার্শম্যান সাহেব সে সময়ে প্রচলিত সমস্ত গদ্য গ্রন্থের মধ্যে উক্ত নব-প্রকাশিত বেতাল পঞ্চবিংশতিকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়া এক প্রশংসাপত্র দিলেন। বর্তমান বাংলা ভাষার পিতৃস্থানীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম

গ্রন্থ এইরূপ দুই এক ধাক্কা খাইয়া শেষে পাদ্রী সাহেব কতৃক অনুমোদিত হইয়া পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়।”

বেতালের প্রথম সংস্করণের ভাষা তেমন প্রাঞ্জল ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেব তিনশো টাকায় কিনলেন একশো কপি আর বাকী বইগুলি বিদ্যাসাগর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিতরণ করেন। সুনিপুণ শিল্পীর মতো তিনি দ্বিতীয় সংস্করণে বেতালের ভাষা আগের চেয়ে আরো প্রাঞ্জল ও লালিত্যপূর্ণ করেন। তখন থেকেই বাঙালি পাঠক বেতালে মোহিত হলো। এই বেতালের যুগেই বিত্তাসাগর ছশো টাকা ধার করে একটি প্রেস করেন। তাঁর এই উত্তমের অর্ধেক অংশীদার ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার ; পরে তর্কালঙ্কারের সঙ্গে মতান্তর হওয়াতে বিত্তাসাগর তাঁর ওপর বিরক্ত হন। তর্কালঙ্কার প্রেসের অংশীদারত্ব ত্যাগ করেন। প্রেস বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি হয়—এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। নিজস্ব প্রেসে বই প্রকাশের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই বিদ্যাসাগর এই ব্যবস্থা করেছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনের জন্যে তাঁকে যে অনেক বই লিখতে হবে—সম্ভবত বিদ্যাসাগর তাঁর দূরদৃষ্টি বলে এই সব বিবেচনা করেই প্রেসটি করেছিলেন।

বেতালের পর লিখলেন বাংলার ইতিহাস, জীবনচরিত। তারপর এলো বোধোদয়। এর প্রথম নাম ছিল শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ। বেথুন স্কুলের পাঠ্য হিসেবেই এ বই সম্পাদিত হয়েছিল বিলিতি বই থেকে। সে বইয়ের নাম চেম্বার্স রুডিমেণ্টস অব নলেজ। তার আগে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়েছে। তখন বিদ্যাসাগরের পর এই মদনমোহনই ছিলেন শিশুপাঠ্য গ্রন্থের অদ্বিতীয় লেখক। বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া তখন আর কারো পাঠ্যপুস্তক বড় একটা ছিল না এবং এঁরা দুজনে কোম্পানীর সরকারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলে এঁদেরই পাঠ্যপুস্তক বেশী বিক্রী হতো।

যাই হোক, বিত্তাসাগর শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগের নাম বদলিয়ে ‘বোধোদয়’ নাম দিলেন। বোধোদয় দীর্ঘকাল ধরে বাঙালি বালক-বালিকার অতি প্রিয় পাঠ্যপুস্তক ছিল। ‘ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্য স্বরূপ’ বোধোদয়ের এই বাক্যটি

এক সময়ে মহাবাক্য হিসাবে বাংলার ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে ফিরতো। এই কথাটি বিদ্যাসাগরের নিজস্ব নয়—ধার করা। বোধোদয় বেরবার দশ বছর আগে, তত্ত্ববোধিনী সভার তৃতীয় বার্ষিক উৎসব সভায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বক্তৃতায় সর্বপ্রথম এই কথাটির উল্লেখ করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে প্রায় গোড়া থেকেই বিদ্যাসাগরের সংযোগের এও একটা প্রমাণ। কথাটি সম্ভবত বিদ্যাসাগরের মনে লেগে ছিল, তাই দশ বছর বাদে বোধোদয়ে 'ঈশ্বর' বিষয়ক প্রবন্ধে এটি সন্নিবেশিত করেন। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, বোধোদয়ের প্রথম সংস্করণে ঈশ্বরের নাম-গন্ধ ছিল না। বাংলার অন্যতম ধর্মগুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রথমে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, ছেলেদের জন্যে এমন সুন্দর একখানি পাঠ্যপুস্তক লিখলেন অথচ তাতে ঈশ্বরের সম্বন্ধে কিছু লিখলেন না? বিদ্যাসাগর বললেন—সেইজন্যেই লোকে বোধ হয় আমাকে নাস্তিক বলে। তখন বিজয়কৃষ্ণ বললেন—"সত্যি, আপনার বোধোদয়ে ঈশ্বরের নাম-গন্ধ নেই, এ বড়ো দুঃখের কথা। সাধারণ প্রয়োজনীয় সকল বস্তুরই খুব সহজে যাতে একটা বোধ জন্মে, বোধোদয় সেই ভাবেই লিখেছেন। কিন্তু সংসারে মানুষের সবচেয়ে যে বিষয়ের বোধ বেশী দরকার, সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি কথাও বোধোদয়ে নেই।" বোধোদয়ের পরবর্তী সংস্করণে 'ঈশ্বর' বিষয়ক যে প্রবন্ধটি বেরুলো, তার মূলে ছিল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রেরণা। তাই ঈশ্বর সম্বন্ধে লিখতে বসে বিদ্যাসাগরের লেখনীমুখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐ কথাটিই প্রকাশ পেলো।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বিদ্যাসাগর খুব ভালোবাসতেন। ব্রাহ্মসমাজের অনেককেই তিনি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতেন। বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রথম পরিচয়ের কাহিনীটি এখানে উল্লেখযোগ্য। বিজয়কৃষ্ণ তখন মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগের ছাত্র। বাৎসরিক পরীক্ষার আগেই কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেন। অধ্যক্ষটি বাংলা বিভাগের একটি ছাত্রকে বৃথা সন্দেহে চোর অপবাদ দিয়ে পুলিশে দেন এবং সেই সঙ্গে বাঙালি জাতির চরিত্রের উপর কটাক্ষ করে প্রকাশ্য ভাবে সকল ছাত্রকে অপমানিত করেন। ছাত্রসমাজ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং বিজয়কৃষ্ণকে নেতৃস্থানীয় করে তারা একযোগে কলেজ ত্যাগ করলো। চারদিকে এই ব্যাপার নিয়ে তুমুল আন্দোলন চললো। কিন্তু অধ্যক্ষের এই

অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করবার জন্যে সেদিন নেতৃস্থানীয় বাঙালিদের একজনও অগ্রসর হননি। যুবক বিজয়কৃষ্ণ একাকী এর প্রতিকার মানসে বিদ্যাসাগরের কাছে এলেন। তিনিও প্রথমে ছাত্রদের এই অপমানে সহানুভূতি প্রকাশে বিরত ছিলেন এবং ছাত্রদেরই দোষী বিবেচনা করে তাদের ফিরিয়ে দিতে উদ্যত হন। বিজয়কৃষ্ণ তখন বাংলার সেই আদর্শ সমাজ-নেতাকে বললেন—শুধু ছাত্র হিসাবে আমরা অপমানিত হলে আপনার কাছে আসতাম না। প্রিন্সিপাল আমাদের জাতির উপরে কটাক্ষ করেছেন; আমাদের জাতির কি একটা মর্যাদা নেই? জাতির মর্যাদা! স্পষ্টভাষী যুবকের এই কথায় বিদ্যাসাগর চমকে উঠলেন। তারপর সব ঘটনা শুনে বীরসিংহের সুপ্ত সিংহ সজাগ হলেন এবং স্বভাব-সিদ্ধ দৃঢ়তায় এর প্রতিকার মানসে তখনকার ছোটলাট বীডন সাহেবের কাছে সমস্ত বিষয় লিখে জানালেন। সরকারী তদন্তের ফলে অধ্যক্ষই দোষী সাব্যস্ত হলেন এবং তিনি ছাত্রগণের কাছে ত্রুটী স্বীকার করে, তাঁর সেই অশোভন উক্তি পরিহার করতে বাধ্য হন। এই ঘটনার পর থেকেই বিদ্যাসাগর বিজয়কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হবার আগে বিদ্যাসাগর আর একখানা বই লিখতে আরম্ভ করেন—'নীতিবোধ'। এটিও একখানি ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ। সময়ের অভাবের জন্যে বইখানি আর তিনি শেষ করেন নি; রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখতে বলেন। রাজকৃষ্ণ নীতিবোধ সম্পূর্ণ করে বিদ্যাসাগরকে দিয়ে পাণ্ডুলিপিখানা দেখিয়ে নেন এবং তিনি সংশোধনও করে দিয়েছিলেন। নীতিবোধের গ্রন্থকার রাজকৃষ্ণ বাবুই ছিলেন। তারপর 'কথামালা', 'ঋজুপাঠ', প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ বেরুলো কথামালা ঈশপের অনুবাদ। অনুবাদ সুন্দর। কথামালা পড়েনি এমন বাঙালি ছেলেমেয়ে নেই। বিদ্যাসাগরের কথামালা আজো ছেলেদের প্রিয়। তিনখানি ঋজুপাঠ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য পুরাণ ও পঞ্চতন্ত্রের সার-সঙ্কলন। সংগ্রহ গ্রন্থ হিসাবে বাংলা পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে ঋজুপাঠ আজো আদর্শ গ্রন্থ। ব্যাকরণ-কৌমুদী ও উপক্রমণিকা বিদ্যাসাগরের আর এক অক্ষয় কীর্তি—এ বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে।

তারপরে এলো 'শকুন্তলা'—বিদ্যাসাগরের আশ্চর্য সাহিত্য-সৃষ্টি।
বাংলা-সাহিত্যে এক অপূর্ব নূতন শ্রী নিয়ে এলো 'শকুন্তলা'।
বাংলাগদ্যে নবযৌবনের বার্তা নিয়ে এলো 'শকুন্তলা'।
কী লিপিচাতুর্য, কী রচনামাধুর্য আর কী পদলালিত্য—সকল দিক দিয়েই 'শকুন্তলা' অনবদ্য, অভিনব।
যে পড়লো সেই মোহিত হয়ে গেল।
'শকুন্তলা'-রচয়িতার প্রশংসায় বাংলার আকাশ-বাতাস সেদিন ভরে উঠেছিল।
'শকুন্তলার' আবির্ভাব ও সমাদর বাংলা-সাহিত্যে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা।
কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলের' অনুবাদ বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'—কোথাও অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ, কোথাও বা ভাবানুবাদ—কিন্তু সব মিলে এক অনবদ্য সৃষ্টি। বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার এই প্রসঙ্গে যথার্থই লিখেছেন: "এ অনুবাদের তুলনা নাই। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সংস্কৃত যেমন মধুর, এই শকুন্তলার বাংলা তেমনি মধুর। শকুন্তলার দুষ্মন্ত ভবনে গমন কালে, শকুন্তলা, মহর্ষি কণ্ব ও সখিদ্বয়ের শোকভাব এমনই সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যায়।"

লিখলেন 'বর্ণপরিচয়'। বর্ণপরিচয় নয়—যেন আদি কবির প্রথম কবিতা।
সামান্য এই বর্ণপরিচয় বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনা-শক্তির অসামান্য নিদর্শন।
অন্যের কাছে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ শুধু অ আ ক খ-র বই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বই-ই মনে হয়েছিল যেন আদি কবির প্রথম কবিতা। 'জীবনস্মৃতির'-র আরম্ভেই কবি লিখেছেন, "কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে, পাতা নড়ে।' তখন 'কর, খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা। সে দিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন।......এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সে দিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।" সাহিত্য-গুরুর এই সামান্য বইখানি সম্পর্কে কবিগুরুর এই অসামান্য শ্রদ্ধানিবেদন বিশেষভাবেই স্মরণীয়।

যে সময়ে তিনি বর্ণপরিচয় লেখেন তখন তাঁর মুহূর্তের অবসর ছিল না। বিধবাবিবাহ-আন্দোলন, কলেজের অধ্যক্ষতা, স্কুলের ইনসপেক্টরি—এসব কাজের মধ্যে থেকেও বিদ্যাসাগর বাংলার শিশুদের কথা চিন্তা করে লিখলেন এই বই।

বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ।

তারপর বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ।

ছোট্ট বই—অ আ ক খ অজ আম—আর রাখাল বড় সুবোধ ছেলে—এই তো বই। কিন্তু এ কথা আজ কে অস্বীকার করবে যে, এই বই দুখানার শাদা মলাটের উপর যাঁর নাম অঙ্কিত তাঁর কাছে সমগ্র বাঙালি জাতই পুরুষানুক্রমে ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকবে। বর্ণপরিচয়ের প্রথমভাগে বিদ্যাসাগর বাংলা বর্ণবিচারে প্রবৃত্ত হন। এ বিচারে তিনিই প্রথম। বর্ণপরিচয় লেখার একটা নেপথ্য ইতিহাস আছে। বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার লিখেছেন: "প্যারীবাবুর (প্যারচরণ সরকার) সদর বাটীর বৈঠকখানা ঘরে সর্বদাই বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সমাগমে মজলিস হইত। একদিনকার ঐরূপ মজলিসে বঙ্গদেশীয় বালক-বালিকাগণের শিক্ষা লাভের সদুপায় সম্বন্ধে কথাবার্তা উঠে। সেদিনকার বৈঠকের কথাবার্তায় স্থির হয় যে, প্যারীচরণ সরকার মহাশয় ইংরেজী বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া বালকদিগের প্রথম পাঠ্য কতকগুলি ইংরেজী পুস্তক রচনা করিবেন, আর বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া বালকদিগের উপযোগী কতকগুলি বাংলা পুস্তক রচনা করিবেন। এইরূপ স্থির হওয়ার পর উভয় বন্ধু ঐ উভয় ভাষায় শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।" বিদ্যাসাগর লিখলেন বর্ণপরিচয়, প্যারীচরণ ফার্স্ট বুক—শিশুপাঠ্যের দুইখানি অবিস্মরণীয় এবং অননুকরণীয় গ্রন্থ।

কথিত আছে, বিদ্যাসাগর একদিন মফঃস্বলে স্কুল-পরিদর্শনে যাবার সময় পাল্কীতে বসে বর্ণপরিচয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের শেষে ভুবনের একটি কাহিনী আছে। কাহিনীটি নীতিমূলক হলেও বিদ্যাসাগরের অজ্ঞাতসারেই ভুবনের কাহিনী যে ছোট গল্পের কাছ ঘেঁসে গেছে, সেটি লক্ষ্য করবার বিষয়। ছোটগল্পের যা প্রধান লক্ষণ—একটি অখণ্ড ভাবরসে কাহিনীর পরিসমাপ্তি—ভুবন গল্পে তা চমৎকার পরিস্ফুট। সুতরাং

বিদ্যাসাগরের ভুবন বাংলা মৌলিক ছোট গল্পের একটা আদি নিদর্শন। এর থেকেই বোঝা যায়, বিদ্যাসাগর যদি মৌলিক কথাসাহিত্যের রচনায় হাত দিতেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই সফলকাম হতেন। সে প্রতিভা তাঁর ছিল, কিন্তু সে অবসর ছিল না। শিল্পীজনসুলভ সৃষ্টির ক্ষমতা বিদ্যাসাগরের ছিল, কিন্তু তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল স্বতন্ত্র। তাঁর সকল চিন্তা-ভাবনা যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছিল একটি বিষয়ে—জ্ঞানদান ও শিক্ষাবিস্তার। বাংলার ভাবী রাখালদের কথা ভেবে, লেখক বিদ্যাসাগর তাঁর প্রতিভা ও প্রচেষ্টা পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যাবার কথা চিন্তাই করলেন না। কত বড়ো একটা আত্মত্যাগের ইতিহাস লুকিয়ে আছে এর মধ্যে, সে কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এ কথা যদি হৃদয় দিয়ে বুঝতেন তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কখনই 'পাঠ্যপুস্তক-লেখক' বলে অশ্রদ্ধা করতেন না। তাই বিদ্যাসাগর "বাংলা দেশের অসহায় শিশু ও বালকবালিকাদের কথা স্মরণ করিয়া আপন শিল্প-প্রতিভাকে দমন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্য 'বর্ণ-পরিচয়', 'বোধোদয়', 'কথামালা' 'আখ্যানমঞ্জরী'রূপ চিরস্থায়ী খেলনা সৃষ্টি করিয়া নিজের বৃহত্তর শিল্পসৃষ্টিকে খণ্ডিত করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক প্রতিভা বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া আমরা সাক্ষ্য-স্বরূপ খুব উচ্চ ধরণের কোনও সৃষ্টিকে বিচারকের সম্মুখে দাখিল করিতে পারি না বটে, কিন্তু এ কথা নিঃসংশয়ে স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, গোটা বাংলা ভাষাটাই তাঁহার প্রতিভার সাক্ষ্যস্বরূপ দীর্ঘ কালের জন্য রহিয়া গেল।"

সংস্কৃতের পাণ্ডিত্য বিদ্যাসাগরের সমস্ত রচনার ওপর ব্রাহ্মণ্য শুচিতার একটা ছাপ দিয়েছে। তাঁর লেখা সর্বত্র পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহী। মৃত্যুঞ্জয়ী রুচির বর্বরতা বিদ্যাসাগরী বাংলায় কোথাও নেই।

এ গৌরব আর কোন্ বাঙালি লেখক করতে পারেন?

সরকারী কাজ ছেড়ে দেবার আট বছর বাদে আমরা পেলাম 'সীতার বনবাস'।

বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-প্রতিভার পরিণত দান।

'সীতার বনবাস'-এর চার বছর আগে মহাভারতের অসমাপ্ত অনুবাদ বই আকারে প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় তত্ত্ববোধিনী

পত্রিকার পৃষ্ঠায় এবং পরে কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুরোধে বিদ্যাসাগর অনুবাদে বিরত থাকেন—এ কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। অনুবাদ ভালো হলেও, অন্যান্য বইয়ের মতো মহাভারতের অনুবাদ বিশেষ লাভজনক হয় নি, সমাদরও পায় নি। কিন্তু 'সীতার বনবাস' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর আগে আর কোনো লেখকের কোনো বইয়ের ভাগ্যে এমন সমাদর লাভ ঘটেনি। এ বইয়ের প্রতিপত্তি ও পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ভবভূতির 'উত্তর-রামচরিত' অবলম্বনে 'সীতার বনবাস' লেখা। অবশ্য বিদ্যাসাগর শকুন্তলার অনুবাদে যেমন সর্বাংশে কালিদাসকে অনুসরণ করেন নি, সীতার বনবাসেও তেমনি তিনি ভবভূতিকে সর্বাংশে অনুসরণ করেন নি। ভবভূতির উত্তর-রামচরিত মিলনাত্মক, কারণ বিয়োগান্ত নাটক সংস্কৃত অলঙ্কার-বিরুদ্ধ। বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাসে' রাম-সীতার মিলন নেই—সীতার বনবাসেই তিনি বইয়ের বিয়োগান্ত উপসংহার করেছেন। ভবভূতির ছায়াসীতা কবি-কল্পনার এক আশ্চর্য নিদর্শন। সীতার বনবাসে এ জিনিস নেই। কেন নেই, তার একটা কারণ অবশ্য অনুমান করা যায়। বিদ্যাসাগর-মানস যাঁরা গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন, তাঁরাই দেখেছেন তাঁর চিন্তা ও কল্পনায় কখনো অতিমানবত্ব স্বীকৃতি পায়নি। বিদ্যাসাগরের কাছে রাম বা সীতা কেউই অতিমানব বা অতিমানবী নন। আদর্শ মানুষ হিসেবে রামচরিত্র এঁকেছেন বলেই বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস বাঙালি পাঠকসমাজে এতখানি আবেদন জাগিয়েছিল।

সীতার বনবাসের ভাষার শোভা ও সৌন্দর্য উপভোগ করবার মতো। এমন প্রাণময় ও প্রসাদগুণ পরিপূর্ণ ভাষা এর আগে আমরা আর কোনো বইতে পাইনি। নামে মাত্র অনুবাদ, প্রকৃতপক্ষে সীতার বনবাস বিদ্যাসাগরের মৌলিক সৃষ্টি। দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থই বলেছেন: "এই নব-ভবভূতির লেখায় অনুবাদের কষ্টকৃত চেষ্টার আভাব মাত্র নাই—'সীতার বনবাস' যেন একখানি মৌলিক গ্রন্থ। ইহার কোন একটি শব্দ এমন নাই, যাহা রচনার কুশলতার প্রতিবন্ধক। নদী-স্রোতের ন্যায় লেখা অবিরাম গতিতে বহিয়া গিয়াছে, কোথাও একটু বাধে নাই।" কথিত আছে, বিদ্যাসাগর চার দিনে এই বই লিখেছিলেন। দিনের বেলায় নানা কাজে ব্যস্ত থাকায়, তিনি লিখবার অবসর পেতেন না। রাত একটা থেকে পরের দিন বেলা দশটা

বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে এ যুগের আর এক সাহিত্যরথীর অভিমত এখানে উল্লেখ করব। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষাকে যে গড়ন দিলেন, এখন পর্যন্তও সেই গড়ন সর্বাঙ্গসুন্দর এবং বাংলা গদ্যের আদর্শ হইয়া আছে। ভাব-গম্ভীর রচনার জন্য বিদ্যাসাগরের বাংলা হইতে উৎকৃষ্টতর বাংলা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। বাংলা সাহিত্যে তিনি যে দান করিয়াছেন, তাহা অমর। আমার বিশ্বাস, ভাষা হিসাবে বঙ্কিমের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি হইতেও বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে।...বিদ্যাসাগরী বাংলা এখন পর্যন্তও বালক-বালিকাদের নিতান্ত নিরাপদ আদর্শ। তাঁহার ভাষার বিশুদ্ধতা, বাক্যবিন্যাসের নিপুণতা, রুচির পরিচ্ছন্নতা এবং শুভ্র, নির্মল ও দোষ-লেশহীন রসধারা বাঙালি লেখক ও ছাত্রদিগকে যে আদর্শের সঙ্গে পরিচিত করিবে, তাহা সর্বতোভাবে কল্যাণ-কর ও শুভার্থবিধায়ক। অথচ ভাষা ভাব-গম্ভীর হইলেও তাহা ভারাক্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। ...বিদ্যাসাগরের লেখার প্রধান গুণ তাঁহার মহাপ্রাণতা। পরদুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়াছে। এই মর্মানুভূতিগুণে তাঁহার লেখায় যে প্রাণঢালা করুণা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার প্রতি অক্ষরে যেন অশ্রু নিঃসৃত হইতেছে। এই সহজ হৃদয়োচ্ছ্বাসে তাঁহার সমস্ত রচনা প্রাণবন্ত হইয়াছে। ...বিদ্যাসাগরের রচনায় যে গতিশীলতা, যে সহজ কবিত্ব ও আড়ম্বরহীন সহৃদয়তা আছে, সেই সময়ের আর কোন বাংলা পুস্তকে তাহা দৃষ্ট হয় না,—অথচ সংস্কৃতের পাণ্ডিত্যের দরুণ যে ভাষায় বিশুদ্ধতা ও শব্দ মনোনয়নে উপযোগিতার জ্ঞান বিদ্যাসাগরের পক্ষে অনায়াস-সাধ্য হইয়াছে, তাঁহার অনুকরণকারীদের পক্ষে সেই সফলতা লাভ করা অসম্ভব। সেই জন্যই বাংলা-সাহিত্যে তিনি যে স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থিত, তাহা অন্যের পক্ষে অনধিগম্য।"

এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট কাহিনীর উল্লেখ করব। বিদ্যাসাগরের একটি ছাত্রের লেখক হবার ইচ্ছা হয়। তিনি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন--নির্ভুল লেখা শেখা যায় কি করে? উত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন—খুব সহজ একটি উপায় আছে। সেটি অনুসরণ করলে কখনো ভুল হবে না। ছাত্রটি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—বলুন, সে কি উপায়; আমি পরীক্ষা করে দেখব। বিদ্যাসাগর বললেন—কখনো লিখো না। এই উত্তরটি সর্বকালের নবীন লেখকের উদ্দেশ করে তিনি বলেছিলেন কিনা কে জানে? তবে এর

মধ্যে লেখক বিদ্যাসাগরের একটি দিক বেশ উজ্জ্বল ভাবেই প্রতিভাত হয়েছে। বাণীর সাধনায় তিনি একনিষ্ঠ ছিলেন আজীবন এবং এই সম্পর্কে আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন সেট যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের লিপিপটুতাও অসাধারণ ছিল। পত্র-সাহিত্যে এ যুগে রবীন্দ্রনাথের যে খ্যাতি, সে যুগে বিদ্যাসাগরের সেই খ্যাতি ছিল। চিঠিপত্র প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের নিদর্শন হলেও, পত্র সাহিত্য, বাংলা সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিদ্যাসাগর একজন দক্ষ লিপিকার ছিলেন। তাঁর চিঠির ভাব, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি লক্ষ্য করবার মতো। বিদ্যাসাগরের চিঠির আর একটা বিশেষত্ব আছে। প্রথম জীবনে তিনি চিঠির শিরোভাগে 'শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং' বা 'শ্রীশ্রীহরিঃ সহায়' লিখতেন। পরবর্তী কালেও তিনি যে এই অভ্যাস একেবারে বর্জন করেছিলেন তা মনে হয় না। হিন্দুচিত সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানে তিনি বিরত ছিলেন। তবে যে তাঁর শেষ বয়সেরও কোন কোন চিঠি পত্রের শিরোনামায় দুর্গা বা হরির উল্লেখ দেখতে পাই, তা বিদ্যাসাগরের অভ্যাসের ফলও নয়, বিশ্বাসের ফলও নয়। যে কারণে চটি জুতা পায়ে দিতেন, থান-ধুতি মোটা চাদর ব্যবহার করতেন এবং ভট্টাচার্যের মতো মাথা কামাতেন, শিখা রাখতেন, ঠিক সেই কারণেই চিঠির শিরোনামায় দুর্গা বা হরিকে স্থান দিয়েছিলেন। সেই স্বাজাত্যবোধ—হয়তো একেই তিনি বাঙালির জাতীয়ত্বের একটা অঙ্গ মনে করতেন। তাঁর ইংরেজি লেখার লিপি-নৈপুণ্য দেখে সিভিলিয়ান সাহেবরাও প্রশংসা করতেন। বাংলা হস্তাক্ষর তো মুক্তার মতোই ছিল। শুধু গদ্যসাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে নয়, বিদ্যাসাগরের মর্মবেদনা এবং সমসাময়িক সমাজের প্রাণহীনতা উপলব্ধি করার পক্ষেও তাঁর চিঠিগুলি অমূল্য। বিদ্যাসাগরে ব্যথিত ক্ষুব্ধ জীবনের পরিচয় তাঁর পত্রাবলীতেই আছে। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে তিনি কতো চিঠি লিখেছিলেন, তার সীমাসংখ্যা নেই। কথিত আছে, বন্ধুবান্ধবেরা বিদ্যাসাগরের চিঠি আজীবন যত্নের সঙ্গে রক্ষা করতেন। চিঠির ভেতর দিয়ে এই সহজ মানুষটি এমন সহজভাবে কথা বলতেন দেখলে পড়ে বিস্মিত

হতে হয়। কৃষ্ণনগরে তাঁর এক বিশেষ বন্ধু ছিলেন—ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়। সেই প্রিয় সুহৃদের মাতৃবিয়োগে বিদ্যাসাগর (তখন তাঁরও মাতৃবিয়োগ হয়েছে, অতএব তিনি সমব্যথী) যে সান্ত্বনাপত্র লিখেছিলেন, তার কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিলাম:

"সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্—চণ্ডীর মুখে শুনিলাম, গত শুক্রবার জননীদেবী মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার দেহান্ত সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর হইয়াছে। তিনি যাতনামুক্ত হইলেন এবং আপনাকে জীবিত দেখিয়া দেহত্যাগ করিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা। তবে আপনার দশদিক শূন্য হইল।...আপনি তাঁহার শেষদশায় শুশ্রূষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা আপনার পক্ষে অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে।...ইতি ১৬ই মাঘ, ১২৮৪ সাল। ত্বদেকাত্মনঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ।" (পত্রে উল্লিখিত চণ্ডীবাবু বিদ্যাসাগরের বইয়ের দোকান ডিপজিটরীর ম্যানেজার চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়) নামটি পর্যন্ত সই করতেন খাটি বাঙালি প্রথায়। এই রকম সহৃদয়তার নিদর্শন বিদ্যাসাগরের সকল চিঠিতেই। সত্যই বিদ্যাসাগরের চিঠি বাংলাসাহিত্যের এক দুর্লভ সম্পদ। বাঙালি সে সম্পদ আজো সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করে নি।

লেখক বিদ্যাসাগর আজীবন জ্ঞানপিপাসু ছিলেন।

অধ্যয়ন ছিল তাঁর জীবনব্যাপী তপস্যা।

শিক্ষাদান তাঁর ব্রত। বিদ্যাচর্চা ছিল সাধনা। শেষ জীবনেও নিতান্ত অসুস্থ শরীরেও তিনি সবসময়ে বিদ্যাচর্চায় নিযুক্ত থাকতেন। বাড়িতে ছিল নিজের প্রকাণ্ড লাইব্রেরী। জীবনে তাঁর একটিমাত্র বিলাসিতা ছিল—বই কেনা। সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলা এবং হিন্দী বইতে পরিপূর্ণ ছিল তাঁর লাইব্রেরী। তাঁর সময়ে কলকাতার আর কারো এতবড় লাইব্রেরী ছিল কিনা সন্দেহ। নিজের চেষ্টায় তিনি অনেক সংস্কৃত বই ছাপিয়েছিলেন, সে সব বই ছাড়া, হাতে লেখা অজস্র পুঁথি ছিল তাঁর লাইব্রেরীতে। স্কট, সেক্সপীয়র, মিলটন, হাক্সলি, টিণ্ডেল, মিল, স্পেন্সার-এর পাশাপাশি থাকতেন পরাশর, মনু, ভবভূতি, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, ব্যাস ও বাল্মীকি। বাড়ির শোভাবর্ধনের জন্যে তিনি এমন মূল্যবান লাইব্রেরী করেন নি। গ্রন্থকীট ছিলেন বিদ্যাসাগর,

যেসব বই কিনতেন, তার বেশীর ভাগই তিনি পড়তেন। বই-অন্ত প্রাণ ছিল বিদ্যাসাগরের। বহুব্যয়ে তিনি বই বাঁধিয়ে রাখতেন, বইয়ের যত্ন করতেন। আত্মপ্রীতি বা বন্ধুপ্রীতি কিংবা পুত্রপ্রীতির চেয়েও বিদ্যাসাগরের পুস্তক-প্রীতি ছিল অসাধারণ। তাঁর সংগ্রহ যেমন ছিল বিস্ময়কর তেমনি ছিল সংগৃহীত পুস্তকের যত্ন। সহস্র কর্মের মধ্যে তাঁর অবসর যাপনের সঙ্গী ছিল এই বই। পুত্রকলত্র পরিবৃত সংসারের কোলাহলের মধ্যে নিজের লাইব্রেরীর নির্জন কক্ষে বসে বিদ্যাসাগর তাঁর অবসর মুহূর্তগুলি যাপন করতে ভালোবাসতেন।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা উল্লেখযোগ্য। মেয়েদের সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে বিদ্যাসাগর সব সময়ই উৎসাহিত করতেন। কোনো বাঙালি মেয়ে বই লিখেছে জানতে পারলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকত না। বরিশালের লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরীর স্ত্রী কুসুমকুমারী দেবীর লেখা সামাজিক উপন্যাস 'স্নেহলতা' যখন বেরুল, বিদ্যাসাগর তার প্রশংসা করে একটি সমালোচনা লিখেছিলেন। গিরীন্দ্র মোহিনী দাসীর 'জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী' বইখানিও বিদ্যাসাগরের প্রশংসা লাভ করেছিল। স্বর্ণকুমারীর 'দীপনির্বাণ' উপন্যাস পড়ে বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক পত্রে তাঁর এই প্রতিভাময়ী কন্যার কৃতিত্বে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।

'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়ে বিদ্যার পরিসমাপ্তি হয়নি—বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এই উক্তি একেবারেই অত্যুক্তি নয়।

সমাজ-সংস্কারে যেমন, শিক্ষাবিস্তারে যেমন, বাংলা সাহিত্যের পুষ্টি সাধনেও তেমনি বিদ্যাসাগরের নাম চিরস্মরণীয়।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্নতি, পরিপুষ্টি ও সৌন্দর্য সাধন—এর মূলে বিদ্যাসাগরের যত্ন। নিঃসন্দেহে বাংলা গদ্যের তিনি নৈষ্ঠিক শিল্পী। তাঁর কলানৈপুণ্যে বাংলা গদ্য অলংকৃত।

তাই 'বিদ্যাসাগর'—এই নামটি বাংলা সাহিত্য-সংসারে চির দেদীপ্যমান।

॥ পঁচিশ ॥

আগেই বলেছি বিদ্যাসাগরের জীবন সাধারণ জীবন নয়—যেন একখানি অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত।

সে বিরাট জীবনের সমগ্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য। কেননা সে যুগে তাঁর চেয়ে কর্মবহুল ও ঘটনাবহুল জীবন আর কারো ছিল না। বিধাতার আশীর্বাদে তিনি পেয়েছিলেন সুদীর্ঘ পরমায়ু আর জীবনের সেই সুদীর্ঘকাল অসংখ্য ঘটনা আর নিরবছিন্ন কর্মের ইতিহাস। সে ইতিহাসের মধ্যে হয়ত কিছুটা কিম্বদন্তী, কিছুটা জনশ্রুতি ভীড় করে আছে, তবু বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর যে সময়টাকে আমরা বিদ্যাসাগরে যুগ বলে চিহ্নিত করে থাকি—সেই যুগের যাবতীয় সংস্কার-প্রচেষ্টার ইতিহাসের সঙ্গে এই ব্রাহ্মণের জীবনের ইতিহাস এমন ওতপ্রোত ভাবেই মিশে আছে যে, একটাকে আর একটা থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। তাঁর পারিবারিক জীবনের কথা এ পর্যন্ত আমরা বিশেষ কিছু উল্লেখ করি নি। যুগমূর্তি বিদ্যাসাগর তো আমাদের মতো সাধারণ বাঙালির নিরুদ্বেগ পারিবারিক জীবন যাপন করেন নি—পিতামাতা স্ত্রীপুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজন নিয়ে তাঁর ছিল এক বিরাট পরিবার; কিন্তু তাঁর পাবিবারিক জীবনের পরিধি পরিব্যাপ্ত ছিল সারা বাংলাদেশেই। মতো যে তাঁর বন্ধুবান্ধব সতীর্থ ও সহকর্মী—কে তার সংখ্যা করবে? বিদ্যাসাগর তাঁদের প্রত্যেকেরই পরিবারভুক্ত ছিলেন—তাঁরা সবাই তাকে অতি আপন জন মনে করতেন। গোটা বাংলাদেশটাই যেন তাঁর কাছে একটি পরিবার বলে মনে হতো—নিজের পারিবারিক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বিদ্যাসাগর তাই কোনো দিনই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। এই ভাবটুকু বিদ্যাসাগর পেয়েছিলেন ভগবতী দেবীর কাছ থেকে।

এক আশ্চর্য মা পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর এই ভগবতী দেবীর মধ্যে। তাঁর জীবনে ভগবতী দেবীর প্রভাব এত বেশী ছিল যে, তাই নিয়েই একখানা স্বতন্ত্র বই লেখা যেতে পারে।

"তিনি (ভগবতী দেবী) যে কেবল পতি, পুত্রকন্যা, পৌত্র-পৌত্রী প্রভৃতি পরিজনবর্গের সেবাতেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিংবা তিনি যে কেবল গৃহদ্বারে অপেক্ষা করিয়া দুঃখীজনের দুঃখ হরণ করিতে প্রয়াস পাইতেন, তাহা নহে, পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার পাড়ায় পাড়ায় বেড়ান রোগ ছিল। সকল ঘরের সংবাদ লইতে ও সকলের অভাব মোচন করিতে সর্বদাই উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করিতেন।"

পুত্র বিদ্যাসাগরের মধ্যেও আমরা ঠিক এই ভাবটি দেখতে পাই—সেই পরদুঃখকাতরতা ও পরসেবাপরায়ণতার মধ্যেই তিনি যেন জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে পেতেন। এ ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্যের বালাই ছিল না—ব্রাহ্মণ কায়স্থ শূদ্র ভেদজ্ঞান তাঁর ছিল না। দুস্থ ও দুঃখীর অন্নবস্ত্র জুগিয়েছেন সারাজীবন, অসহায় বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করেছেন, বন্ধুবান্ধবের বিপদে-আপদে এসে বুক দিয়ে দাঁড়িয়েছেন সব সময়ে ; কখনো বিরক্ত হন নি, কখনো অবহেলা করেন নি, কখনো ক্লান্তি বোধ করেন নি। স্বোপার্জিত ধনরাশি পরের সেবায় মুক্ত হস্তে ব্যয় করে বিদ্যাসাগর পিতৃপিতামহ-প্রদর্শিত দরিদ্র ব্রাহ্মণের বেশে সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে গেছেন। দরিদ্রের বন্ধুরূপেই তিনি জনসমাজে বিচরণ করতেন। বস্তুতঃ বহুপরিবার-পরিবৃত হলেও বিদ্যাসাগরের জীবন এক অনাসক্ত বৈরাগীর জীবন। পারিবারিক জীবনে তিনি সুখী ছিলেন না, নিতান্ত অসুখী হয়ে মনের ক্লেশে জীবন যাপন করেছেন, তবু অশান্তির মধ্যে কখনো কারো সুখ সাধনে বিমুখ ছিলেন না। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর বিশেষত্ব।

সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছেড়ে দেবার পরও গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সংশ্রব কখনো ছিন্ন হয়নি। যখনই যে বিষয়ে প্রয়োজন হয়েছে, গভর্ণমেণ্ট বিদ্যাসাগরের মত চেয়েছেন। এইভাবে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বলতে গেলে সরকারের বে-সরকারী পরামর্শদাতা ছিলেন। পর পর বহু ছোটলাটই বিদ্যাসাগরের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের সংস্কার-

সংক্রান্ত এক ব্যাপারে ছোটলাট তাঁর পরামর্শ চাইলেন। এই সম্পর্কে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের প্রস্তাব ও অধ্যক্ষের মন্তব্য তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বিদ্যাসাগর খুব যত্নের সঙ্গে সেগুলি পড়ে উত্তরে লিখলেন: "সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কিত তিনটি বিবরণী আমি যত্ন ও মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছি। কাউয়েল সাহেব (ইনি তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ) কলেজে স্মৃতি ও বেদান্তের পাঠ বন্ধ করিতে চাহেন। দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মত মেলে না।...আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, এ সম্বন্ধের অধ্যাপনা বন্ধ করিলে কলেজের পাঠ্য-বিষয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।...... ডাঃ রোয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন, কলেজ উঠাইয়া দেওয়া হোক এবং উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারী ইংরাজি স্কুল ও কলেজসমূহে সংস্কৃত-চর্চা চালাইবার জন্য ব্যয়িত হোক। স্কুল-কলেজে সংস্কৃত-শিক্ষা প্রচলনের আমি যতটা পক্ষপাতী, ততটা আর কেহ নয়। কিন্তু কলেজের বিলোপ করিয়া তৎপরিবর্তে এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের আমি ঘোরতর বিরোধী।"

ক্যাম্পবেল তখন ছোটলাট। তাঁর নীতিই ছিল সকল বিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচ করা। তাঁর সময়ে সংস্কৃত কলেজে স্মৃতির অধ্যাপকের পদ উঠিয়ে দেবার একবার প্রস্তাব হয়। ইংরেজি বিভাগও উঠিয়ে দেবার কথা হয়। স্মৃতির অধ্যাপনা উঠিয়ে দেবার প্রস্তাবে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে অসন্তোষ দেখা দিল। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েস ও সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার পক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি উঠল; আবেদনও গেল সরকারের কাছে। ছোটলাট আবার বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চাইলেন। স্মৃতির জন্যে স্বতন্ত্র অধ্যাপকের পদ থাকা দরকার—বিদ্যাসাগর এই অভিমত প্রকাশ করলেন। প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী তখন কলেজের অধ্যক্ষ। তিনিও বিদ্যাসাগরের এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই পরামর্শ অগ্রাহ্য করে দর্শন ও অলঙ্কারের সঙ্গে স্মৃতির অধ্যাপকের পদ এক করে দেওয়া হয়। লোকে ভাবলো সরকারী এই ব্যবস্থায় বিদ্যাসাগরের সমর্থন আছে এবং বহু অপ্রিয় সমালোচনাও তাঁকে সহ্য করতে হলো। বিদ্যাসাগর ছোটলাটকে আবার এক সুদীর্ঘ পত্র লিখলেন। সেই চিঠিতে তিনি পরিষ্কার ভাবেই জানিয়ে দিলেন: "বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিলে স্মৃতির একজন স্বতন্ত্র অধ্যাপক দরকার; এখনো আমার সেই মত। স্মৃতিশাস্ত্রের বিষয়-বস্তু বিপুল, সারা জীবনের চেষ্টায় ইহা শিখিতে হয়।...অন্য

বিষয়ের অধ্যাপক পদের সহিত স্মৃতির পদ এক করিয়া ফেলিলে এই বিষয়টিকে খাটো করা হইবে এবং ইহার কার্যকারিতাও কমিয়া যাইবে।…ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ হিসাবে কলেজের কাজে যতদূর অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে আমি এই মত সমর্থন করিতে পারি না।"

বিদ্যাসাগরের এই চিঠিতেও কোনো ফল হয় নি। তবে জনসাধারণের মন থেকে ভুল ধারণা দূর করবার জন্যে বিদ্যাসাগর এই চিঠিখানা 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজে প্রকাশিত করেন।

গ্র্যান্ট সাহেব তখন ছোটলাট। অল্প খরচে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে কি ব্যবস্থা করা যায় সেই সম্পর্কে ভারত সরকার বাংলার ছোটলাটের অভিমত চাইলেন। এ ক্ষেত্রেও ছোটলাটকে বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হতে হলো। তিনি অবশ্য অনেকের কাছ থেকেই এ বিষয়ে মত চাইলেন, তবে বিশেষভাবে চাইলেন বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে, কেননা তিনি জানতেন যে বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তার ও উন্নতি সাধনের উপায় সম্বন্ধে তাঁর চেয়ে বেশী চিন্তা কেউ করে নি। গণশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের চিন্তা-ভাবনা সেদিন কতখানি প্রাগ্রসর ছিল তা ছোট-লাটকে লেখা এ বিষয়ে তাঁর সুদীর্ঘ এবং সুচিন্তিত পত্র থেকেই বোঝা যায়। এই চিঠিতে তিনি সারা ভারতবর্ষের গণশিক্ষার বিষয়টি সুন্দরভাবে আলোচনা করেছিলেন। এই চিঠিখানি শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর গভীর অভিজ্ঞতার নিদর্শন এবং বর্তমানেও এর মূল্য কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি।

সেই পত্রে বিদ্যাসাগর লিখলেন: "মাসিক পাঁচ-সাত টাকা মাত্র ব্যয় করিয়া কোনো শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন, আমার মতে দেশের বর্তমান অবস্থায় তাহা কার্যকর হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই।…উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই যখন শিক্ষার সুফলের কথা এখনো প্রকৃতরূপে ধারণা করিতে পারে না, তখন জনসাধারণের অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষা-ব্যবস্থার চেষ্টায় কোনো কাজ হইবে না। যদি এ বিষয়ে পরীক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সরকার যেন অবৈতনিকভাবে শিক্ষা দিতে প্রস্তুত থাকেন। বে-সরকারী পরীক্ষা এপর্যন্ত কোনো সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় নাই।…সমস্ত দেশটাকে শিক্ষিত করিয়া তোলা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়,

কিন্তু কোনো রাজসরকার এরূপ কার্যভার গ্রহণ করিতে অথবা সাধন করিতে পারে কিনা সন্দেহ।"

বিদ্যাসাগরের সরকারী কার্যত্যাগের দু বছর আগে কলকাতায় ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউসন খোলা হয়।
মাসিক তিনশ টাকা মাইনেতে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এর পরিচালক নিযুক্ত হন। সরকারী তত্ত্বাবধানে জমিদারগণের নাবালক ছেলেদের শিক্ষার উন্নততর ব্যবস্থা করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।
কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব এবং রমানাথ ঠাকুর—এই চারজনকে গভর্ণমেণ্ট এই প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করেন। প্রত্যেকেই বছরে তিন মাস করে পরিদর্শন করবেন স্থির হয়। সরকারী কাজ ছেড়ে দেবার আট বছর বাদে, বিদ্যাসাগর তাঁর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা স্বরূপ সর্বপ্রথম একটি রিপোর্ট সরকারের কাছে পাঠালেন। পরের বছরেও তিনি আর একটা রিপোর্ট পাঠান। এ রিপোর্ট তিনি ইংরেজিতেই লিখেছিলেন। এই রিপোর্টেও বিদ্যাসাগরের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় আছে এবং তিনি এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নতির জন্যে যেসব পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন, তার অধিকাংশই গ্রাহ্য হয়েছিল। পরে পরিচালকের সঙ্গে মতান্তর হওয়ার ফলে বিদ্যাসাগর ইনষ্টিটিউসনের কাজ ত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ সার্টক্লিফ সাহেবের সঙ্গে কোনো বিষয়ে মনোবাদের ফলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী পদত্যাগ করেন। তিনিও বিদ্যাসাগরের মতো স্বাধীনচেতা ছিলেন। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এই ব্যাপারে সার্টক্লিফের পক্ষ সমর্থন করেন। বিডন সাহেব তখন ছোটলাট। এই পদত্যাগ উপলক্ষ করে শহরে শিক্ষিত সমাজে ইংরেজের ন্যায় বিচারের প্রতি একটা অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠলো। বিডন সাহেব বিদ্যাসাগরকে ডেকে পাঠিয়ে এ বিষয়ে একটা মিটমাট করিয়ে দেবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। বিদ্যাসাগর ছোটলাটকে বলেছিলেন—"আপনার রাজত্বে এ কী অন্যায়!" ইংরেজের অন্যায়কে অন্যায় বলতে, অবিচার বলতে বিদ্যাসাগর দ্বিধা করতেন না। পরে তাঁর এবং বিডন সাহেবের অনুরোধে প্রসন্নকুমার কলেজের অধ্যক্ষের পদ পুনরায় গ্রহণ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার দু বছর পরের একটি ঘটনা।

বাংলাদেশের উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ে কতদূর পর্যন্ত সংস্কৃত-চর্চা প্রবর্তন করা যেতে পারে, সে বিষয়ে বিবেচনা করবার ও রিপোর্ট দেবার জন্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। বিদ্যাসাগর এই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সুচিন্তিত রিপোর্ট এ ক্ষেত্রেও সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আরো ন বছর বাদে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর এ্যাটকিন্‌সন্ সাহেব যখন ইংরেজি ও বাংলা স্কুলপাঠ্য পুস্তক-নির্বাচন কমিটির সভ্য হবার জন্যে বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেন, তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করেন নি। বলেছিলেন: "দুইটি কারণে আমি এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইতেছি। আমি গ্রন্থকার, অতএব কমিটির ব্যবস্থার সহিত আমার স্বার্থ সাক্ষাৎভাবে জড়িত।...তাছাড়া, আমি মনে করি আমার উপস্থিতি আমার গ্রন্থগুলির দোষ-গুণের অপক্ষপাত স্বাধীন আলোচনার অন্তরায় হইবে।" প্রখর যুক্তিপন্থী বিদ্যাসাগরের এই নীতিটি আজকের দিনেও বহু শিক্ষক এবং অধ্যাপক-গ্রন্থকার অনুসরণ করতে পারেন।

দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তান্তর করা সম্পর্কে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি বিল হয়।

সরকার এ বিষয়েও বিদ্যাসাগরের মত চেয়ে পাঠালেন।

এই রকম একটি জটিল বিষয়ে বিদ্যাসাগর যে সুচিন্তিত মত দিয়েছিলেন তাতে হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বহু শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখিয়ে বললেন: "সুতরাং দেবোত্তর সম্পত্তির হস্তান্তর কোনো মতেই আইনসঙ্গত নয়।" তবে সেই সঙ্গে তিনি এ কথাও বললেন যে, দেবোত্তর সম্পত্তির সুপরিচালনার জন্য ট্রাস্টি নিযুক্ত করার যে প্রথা বিদ্যমান, সে সম্পর্কে আইনের বিধি নিতান্তই আবশ্যক। "এরূপ উদ্দেশ্যে দেবোত্তর সম্পত্তির কোন প্রকার হস্তান্তর আমার সামান্য বিবেচনায় হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রের বিরোধী নয়।...তবে দেখিতে হইবে যে, উক্ত প্রকার হস্তান্তর দ্বারা সম্পত্তির কোন মঙ্গল সাধিত হইয়াছে কি না।...আমি প্রস্তাব করিতেছি, আইনের পাণ্ডুলিপিতে ২য় ধারা এরূপ ভাবে লিখিত হয় যে, ভবিষ্যতে সম্পত্তির কোন প্রকার ক্ষয় বা তদ্রূপ একেবারে অসম্ভব

হয়...তাহা হইলে আইনটি হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রের বিরোধী বা সাধারণ হিন্দু-সমাজের মনঃক্ষোভের কারণ হইবে না।” বলা বাহুল্য, দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তান্তর করণ সম্বন্ধে তখন কোন আইন পাশ হয়নি।

সহবাস-সম্মতি আইন হবে।

গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়েও বিদ্যাসাগরের মত জানতে চাইলেন।

বহু পরিশ্রম সহকারে, নানা শাস্ত্রের আলোচনা করে তিনি আইনের বিরুদ্ধে অভিমত দিলেন। দুঃখের বিষয়, বিদ্যাসাগরের মত গ্রাহ্য হয়নি। তিনি বিধবাবিবাহের আইন চেয়েছিলেন, তা হয়েছিল; অথচ এ ক্ষেত্রে তাঁর মত গৃহীত হলো না দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিধবাবিবাহ আইন হবার সময়ে যে হিন্দু-সমাজ বিদ্যাসাগরের প্রতিকূলাচারণ করেছিল, সেই বিদ্যাসাগর যখন সহবাস-সম্মতি আইনের বিপক্ষে মত দিলেন, তখন তাই দেখে সমগ্র হিন্দু-সমাজ সুখী হয়েছিল। অনেকে বলেন যে তিনি বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে নিজের ভুল বুঝতে পেরে এই কাজ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর এমন কপটাচারী ছিলেন না। তা যদি হতেন তা হলে জীবনের শেষ অবস্থাতেও নিজ দৌহিত্রের বিধবা-বিবাহ দেবার উদ্যোগ তিনি করতেন না।

যাই হোক, বিরুদ্ধ মতই দিন, আর অনুকূল মতই দিন, এ কথা সত্য যে গভর্ণমেণ্ট বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখতেন এবং কি শিক্ষা, কি সমাজ-সংস্কার সকল বিষয়ে তাঁর মতামতের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন। সরকারের বে-সরকারী পরামর্শদাতা হিসাবে, বিদ্যাসাগর কখনো স্বাধীন মত ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হন নি, কখনো সত্য ও ন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেন নি; দেশের মঙ্গলের জন্যে যা ভালো বুঝেছেন, তা নির্ভয়েই ব্যক্ত করেছেন।

ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু উইল আইনের বিল উত্থাপিত হলো।

এর আগে পর্যন্ত ‘ইণ্ডিয়ান সাকসেসন আইনেই’ কাজ চলতো। সে আইন কেবল সাহেবদের জন্যে। তারই কতকগুলি ধারা বদলিয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের জন্যে ‘হিন্দু উইলস এ্যাক্ট’ হয়। এই পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল, কেননা, বড়লোকেরা মৃত্যুসময়ে তাঁদের ইচ্ছামত উইল করতেন এবং সেই

উইলে অনেক সময়ে অনেক রকমের জুয়াচুরি ঘটতো। এই বিল নিয়ে তুমুল আন্দোলন হয়। গভর্ণমেণ্ট এই বিল সম্পর্কে দেশের হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও গণ্যমান্যদের মত গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগরকে বাদ দিয়ে কোন কাজ হবার নয়। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। গভর্ণমেণ্ট বিদ্যাসাগরের মত চাইলেন। তিনি অশেষ যত্ন সহকারে আইনের মর্ম বিশেষরূপে আলোচনা করে দুটো বিষয়ে আপত্তি জানালেন। প্রথমতঃ, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অজাত ব্যক্তিকে দান বৈধ হয় না ; দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু আইনে আবহমানকাল যে স্বত্বাধিকার স্বীকৃত, তার বিরুদ্ধে আইন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। দুঃখের বিষয়, তাঁর যুক্তিপূর্ণ আপত্তি অগ্রাহ্য করেই আইন বিধিবদ্ধ হয়।

সারা বাংলা তথা ভারতে এই মানুষটির অসামান্য প্রভাব ও প্রতিপত্তি দেখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পক্ষে ভারতসরকার বিদ্যাসাগরকে সংস্কারপন্থী হিন্দু-সমাজের অধিনায়ক হিসাবে রাজ-সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। মৃত্যুর এগার বছর আগে, নববর্ষের প্রথম দিনে, ভারত-গভর্ণমেণ্ট বিদ্যাসাগরকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন। কথিত আছে, বিদ্যাসাগর প্রথমে এই সরকারী উপাধি গ্রহণে অসম্মত ছিলেন এবং সনদ নিতে তিনি বড়লাটের দরবারে যান নি। পরে ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল নিজের হাতে তাঁকে এই সম্মান-লিপি প্রদান করেন। এর ষোল বছর আগে তিনি বিলেতের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির একজন সম্মানিত সভ্য নির্বাচিত হন।

লোকসেবার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের স্মরণীয় প্রচেষ্টা—হিন্দু ফ্যামিলি এ্যানুইটি ফাণ্ড। তাঁর কর্মজীবনের এটিও একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। সরকারী চাকরি ছাড়বার চৌদ্দ বছর পরের ঘটনা এটি।

বিদ্যাসাগরের মতো আর কেউই বাংলার মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ভদ্র পরিবারের অভাব-অনটন বা দুঃখের কথা প্রাণ দিয়ে অনুভব করেন নি—বিশেষ করে হিন্দু সমাজের অনাথা বিধবাদের দুঃখের কথা। প্রচলিত সামাজিক প্রথা এবং অর্থহীন দেশাচারের দারুণ উৎপীড়নের মধ্যে বাংলার বিধবারা কী অসহায় ভাবে জীবন অতিবাহিত করে, তা দরিদ্র পিতামাতার সন্তান বিদ্যাসাগর গভীর ভাবেই বুঝতেন। হিন্দু পরিবারে বিধবার অর্থনৈতিক জীবন যে কী অনিশ্চিত তা তাঁর চেয়ে মর্মান্তিক ভাবে আর কেউ সেদিন

উপলব্ধি করেছিলেন কি না সন্দেহ। একজনের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের অর্থনৈতিক বনিয়াদ যে দৃঢ় হতে পারে না, তা তিনি বুঝতেন বলেই সহস্র কর্মের মধ্যে থেকে এর প্রতিকারের কথাও চিন্তা করতেন। এই চিন্তারই ফল হিন্দু ফ্যামিলি এ্যান্যুইটি ফাণ্ড। সামান্য আয়-সম্পন্ন মধ্যবিত্ত একজন বাঙালি, মৃত্যুকালে তার পরিবারবর্গকে এক রকম পথেই বসিয়ে যায়, অথবা তাদের ভরণপোষণের জন্যে সে উপযুক্ত সংস্থান করে যেতে পারে না। হিন্দু সমাজের একান্নবর্তী পরিবারে অবশ্যম্ভাবী এই বিপর্যয় প্রতিরোধ করবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এই ফাণ্ডের সৃষ্টি। বাঙালির এই যৌথ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির একটি নেপথ্য ইতিহাস আছে।

কথিত আছে, ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের (পরবর্তী নাম ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, বর্তমান নাম স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া) জনৈক কর্মচারীর অকাল মৃত্যুতে তার পরিবারবর্গের অসহায় অবস্থা দেখে ঐ ব্যাঙ্কের দেওয়ান, কলুটোলার সুপ্রসিদ্ধ সেন-বংশের নবীনচন্দ্র সেন (কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র) অনাথা বিধবা ও তার নাবালক পুত্র-কন্যার সাহায্যার্থে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার আবেদন জানান বিদ্যাসাগরের কাছে। তাঁর কাল-সচেতন মন সহজেই এই আবেদনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তারপর এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার পর তিনি তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্যামাচরণ দে-র সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করলেন। এই শ্যামাচরণ দে-র পনর নম্বর কলেজ স্কোয়ারের বাড়িতেই প্রকৃতপক্ষে এ্যান্যুইটি ফাণ্ডের জন্ম।

তারপর মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে একদিন একটা সভা করে, শহরের কয়েকজন সম্রান্ত লোকের সামনে বিদ্যাসাগর ফাণ্ড সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনাটি উত্থাপন করলেন এবং মধ্যবিত্ত বাঙালির-পক্ষে এর প্রয়োজনীয়তা সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। বিদ্যাসাগরের সামনে ছিল বাঙালির প্রথম অর্থনৈতিক উদ্যম—ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। দ্বারকানাথ ঠাকুর এর প্রতিষ্ঠাতা। এ্যান্যুইটি ফাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবার তেতাল্লিশ বছর আগের কথা। বাঙালি ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পত্তন করেছে, বাঙালি বীমা ব্যবসায়েরও পত্তন করে গেল অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধানের মধ্যে। বিদ্যাসাগরের সুবিস্তীর্ণ কর্মজীবনের মধ্যে তাঁর এই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার গুরুত্ব পূর্ববর্তী কোন চরিতকারই দেবার চেষ্টা করেন নি। দয়ার সাগর আর বিদ্যার সাগর ছাড়াও ঈশ্বরচন্দ্র যে একজন বাস্তববাদী

কর্মী লোক ছিলেন, তাঁর প্রতিভার এই দিকটি আজো গভীর অনুশীলনের বিষয়, অন্ততঃ উনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগৃতির ইতিহাসে তাঁর প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করতে হলে এ ছাড়া উপায় নেই।

হিন্দু সমাজে এই রকম একটা হিতকর প্রতিষ্ঠান যে দরকার, সে কথা সবাই স্বীকার করলেন। কত বড়ো একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের যে বিদ্যাসাগর সেদিন সূচনা করেছিলেন, আজ, এই সুদূর কালের ব্যবধানে, তার মূল্য আমরা বুঝেছি। বিদ্যাসাগরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেদিন নবজাত এই প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকরূপে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যর মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার, দ্বারকানাথ মিত্র, রায় শ্যামাচরণ দে বাহাদুর (ভারত সরকারের ইনি সহকারী কন্ট্রোলার-জেনারেল ছিলেন), নবীনচন্দ্র সেন, পাইকপাড়ার কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ, কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং পুঁটিয়ার রাণী শরৎকুমারী। প্রথম দিনের এই সভার পর ফাণ্ড সংক্রান্ত নিয়মাবলী রচনা করবার জন্যে যাঁদের নিয়ে একটি সাব-কমিটি গঠিত হয় তাঁদের মধ্যে এঁরা ছিলেন: দ্বারকানাথ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিত্তাসাগর, শ্যামাচরণ দে, কৃষ্ণদাস পাল, নন্দলাল মিত্র, নবীনচন্দ্র সেন, দীনবন্ধু মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র ধর এবং পঞ্চানন রায়-চৌধুরী। সূচনায় এই ব্যবস্থা করা হলো যে, মাসে মাসে ফাণ্ডে দু'টাকা চার আনা করে জমা দিতে হবে; মৃত্যুর পর পিতা-মাতা, বিধবা স্ত্রী বা আত্মীয় যাবজ্জীবন মাসে মাসে পাঁচ টাকা করে পাবে। যদি দশ টাকার সংস্থান করতে কেউ ইচ্ছা করে, তাহলে এই হিসাবের অনুপাতে ফাণ্ডে টাকা জমা দিতে হবে। দশজনের প্রদত্ত টাকা নিয়ে বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে ইতিহাস-বিখ্যাত এই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাজ আরম্ভ হলো। দু'চারজন লোক এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থে এককালীন মোটা টাকা দিলেন। পাইকপাড়ার রাজপরিবারের সঙ্গে বিত্তাসাগরের দীর্ঘকালের আলাপ। এই ফাণ্ড প্রতিষ্ঠার দু বছর আগে রাজা প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন বিত্তাসাগরের পরম বন্ধু। তাঁর সকল কাজে তিনিই ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়ক। প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর পর বিত্তাসাগরই ছোটলাট বিডন সাহেবকে অনুরোধ করে পাইকপাড়া ষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলেন। সেই রাজপরিবারের কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ তাঁর

এই প্রচেষ্টায় আড়াই হাজার টাকা দান করেছিলেন। পরবর্তী কালে পুঁটিয়ার মহারাণী শরৎকুমারী দেবী এই প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের অনুরোধে এক হাজার টাকা দান করেছিলেন। প্রথম দু'বছর ট্রাস্টির মধ্যে ছিলেন বিদ্যাসাগর এবং দ্বারকানাথ মিত্র। তৃতীয় বছরে দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যুর পর ট্রাস্টি হলেন তিনজন—বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং রমেশচন্দ্র মিত্র। কোম্পানীর প্রথম পরিচালকবর্গের মধ্যে ছিলেন: শ্যামাচরণ দে (চেয়ারম্যান), মুরলীধর সেন (ডেপুটি চেয়ারম্যান), নরেন্দ্রনাথ সেন, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নন্দলাল মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র ধর, নবীনচন্দ্র সেন (সেক্রেটারি), প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র, কালীচরণ ঘোষ ও পঞ্চানন রায়-চৌধুরী। সাবসক্রাইবারদের রোগাদি পরীক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হলো ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে।

কোম্পানীর ইতিহাস থেকে আমরা যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি তাতে দেখতে পাই যে, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের সাক্ষাৎ সংস্রব ছিল মাত্র তিন বছর। এই তিন বছর ফাণ্ডের কাজ চলেছিল খুব সুশৃঙ্খলার সঙ্গে, এবং প্রতিষ্ঠানটি জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল; গ্রাহকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিন বছর পরে ডিরেক্টরবর্গকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখে বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্রব ত্যাগের কারণ জানালেন। যুক্তিপূর্ণ এবং তেজস্বিনী ভাষায় লেখা বিদ্যাসাগরের এই চিঠিখানি একটি মূল্যবান দলিল। ফাণ্ডের পরিচালনা ব্যাপারে বহুবিধ বিশৃঙ্খলতার উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর স্পষ্টই বলেছিলেন, বাঙালি পাঁচজনে একসঙ্গে কাজ করতে পারে না, তাই তিনি সম্পর্ক ত্যাগের সিদ্ধান্ত করেছেন। বিদ্যাসাগরের অভিযোগ ছিল আরো গুরুতর। ডিরেক্টরেরা ফাণ্ডের নিয়ম মানেন না, ফাণ্ডের উন্নতিসাধনে তাঁদের একেবারেই মনোযোগ নেই; যাঁরা চাঁদা দিতেন তাঁদের ঔদাসীন্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। সেক্রেটারিই সর্বময় কর্তা। হিসাব-পত্র ঠিক নেই। ফাণ্ডের নিয়মাবলী পরিবর্তন আবশ্যক বলেও তা করা হয় না। সভার রিপোর্টে সভাপতি স্বাক্ষর না করলেও, তাঁর নাম স্বাক্ষর করা হয়েছিল এবং ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে আনা হয়েছিল—ইত্যাদি বহুবিধ অভিযোগপূর্ণ সেই পত্রখানিতে লিমিটেড কোম্পানী পরিচালনা করতে হলে কী পরিমাণ সততা ও নিয়মানুবর্তীতা দরকার, তারই সংকেত আছে। যে প্রতিষ্ঠান তিনি হাতে করে গড়লেন,

সে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ যে কতখানি বেদনাদায়ক তা প্রকাশ পেয়েছে বিদ্যাসাগরের পদত্যাগ-পত্রের উপসংহারে :—"এই ফাণ্ডের সংস্থাপন ও উন্নতি সম্পাদন বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি। উত্তরকালে আপনাদের ফলভোগের প্রত্যাশা আছে; আমি সে প্রত্যাশা রাখি না। যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া, তাহার পরম ধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম, কেবল এই বিবেচনায় আমি তাদৃশী চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি, এতদ্ভিন্ন এ বিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র স্বার্থ সম্বন্ধ ছিল না।…যাঁহাদের হস্তে আপনারা কার্যভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সরল পথে চলেন না। এমন স্থলে, এ বিষয়ে লিপ্ত থাকিলে উত্তরকালে কলঙ্কভাগী হইতে ও ধর্মদ্বারে অপরাধী হইতে হইবে; কেবল এই ভয়ে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক এ সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে।"

লোকসেবার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের চরিত্র বুঝবার পক্ষে বিদ্যাসাগরের এই কয়টি কথাই যথেষ্ট। লিমিটেড কোম্পানী করে লোককে প্রতারণা করা যায়—বাঙালির মাথায় এই দুর্বুদ্ধির অভাব দেখছি সে দিনও হয় নি। অন্য দিকে, জনহিতকর যৌথ প্রতিষ্ঠানে জাল জুয়াচুরি ও প্রতারণার যে আদৌ স্থান নেই, প্রায় শতবর্ষ পূর্বে বিদ্যাসাগর এই কথা বুঝেছিলেন। ফাণ্ডের ডিরেক্টররা বহু চেষ্টা করেও তাঁর সঙ্কল্প বদলাতে পারেন নি। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন ও রমেশচন্দ্রও ফাণ্ডের ট্রাস্টির পদ ত্যাগ করলেন। বাঙালির সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের স্মৃতিপুত এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আজো বজায় আছে। বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের পর ফাণ্ডের পরবর্তী ইতিহাস আমাদের কাহিনীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তবে মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে যে সঞ্চয় দরকার—এই অর্থনৈতিক চেতনা বিদ্যাসাগরই আমাদের দিয়ে গেছেন—এ যুগের বাঙালির এই ইতিহাসটুকু মনে রাখা উচিত।

হিন্দু ফ্যামিলি এ্যানুইটি ফাণ্ড থেকে যে বছর বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করলেন, তার পরের বছর কলকাতা শহরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা : বিজ্ঞান-

সভার প্রতিষ্ঠা। স্বনামখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার (বিদ্যাসাগরের জন্মের তেরো বছর বাদে এঁর জন্ম) তখন শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। দৃঢ়চিত্ততায় তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গেই তুলনীয়। নব্য বাংলার শিক্ষাগুরুদের মধ্যেও মহেন্দ্রলালের নাম তখন শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকৃত হতো। সেই মহেন্দ্রলালের উদ্যোগে ও চেষ্টায় যখন কলকাতায় বিজ্ঞান চর্চার জন্যে 'সায়েন্স এসোসিয়েসন' প্রতিষ্ঠিত হলো তখন "অনেক সম্পন্নলোকের দানের পরিমাণ অতিক্রম করিয়া তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) দানের অঙ্ক উঠিয়াছিল। তিনি জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের সুহৃদরূপে এই অনুষ্ঠানের সূত্রপাতে এক হাজার টাকা দিয়াছিলেন।" ভারতবাসীর পক্ষে যে বিজ্ঞান চর্চা দরকার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনেই যে জাতির উন্নতি—এ কথা সেদিন মহেন্দ্রলালের সঙ্গে বিদ্যাসাগরও বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন বলেই মহেন্দ্রলালের এই প্রচেষ্টায় তাঁর সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিলেন।

নবীনচন্দ্র সেন তাঁর কবি-প্রতিভার প্রথম প্রয়াস 'পলাশির যুদ্ধ' বিদ্যাসাগরের চরণে অর্ঘ্য হিসেবে অর্পণ করেছিলেন, এ কথা আগেই বলেছি। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'সীতার বনবাস' নাটক উৎসর্গ করলেন বিদ্যাসাগরকে। সেই উৎসর্গ পত্রের ভাষা এই রকম: "পূজনীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীচরণেষু—গুরুদেব-দীননাথ! মাতৃভাষা জানি না বলা, ভাল নয়, মন্দ, মহাশয়ের 'বেতাল' পাঠে বুঝিলাম। আচার্য! আমার পরীক্ষা গ্রহণ করুন। আমি চিরদিন মহাশয়কে মনে মনে বন্দনা করি। সেবক, শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।"

মাইকেলও তাঁর 'বীরাঙ্গনা কাব্য' উৎসর্গ করেছিলেন বিদ্যাসাগরকে, এ কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে।

দীনবন্ধু মিত্রও তাঁর 'দ্বাদশ কবিতা' বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করে কৃতার্থ হয়েছিলেন।

বাংলার সমসাময়িক দিকপাল সাহিত্যিক ও কবিদের প্রায় সকলেই এইভাবে বিদ্যাসাগরকে সম্মান দেখিয়েছিলেন। ব্যতিক্রম একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র।

এই রকম পূজার নির্মাল্য সাগর-চরণে অর্পণ করে অনেকেই সেদিন ধন্য হয়েছিলেন। এমন কি, তাঁর মৃত্যুর পরে বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিবেদন করেন নি, এমন উল্লেখযোগ্য মনীষী বাংলাদেশে বিরল। এ কালের সাহিত্যিকরাই বরং সাহিত্য-গুরু বিদ্যাসাগর, সম্পর্কে নির্লজ্জ ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়েছেন।

আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব। কারো শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে 'বিদায়' গ্রহণ করা ব্রাহ্মণ-অধ্যাপকদের একটি বিশেষ রীতি। বিদ্যাসাগর কখনো কোথাও এই রীতি অনুসরণ করতেন না। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মায়ের শ্রাদ্ধে বিদ্যাসাগর নিমন্ত্রিত হন। গুরুদাসবাবু জানতেন যে বিদ্যাসাগর অন্যান্য ব্রাহ্মণদের মত 'বিদায়' গ্রহণ করবেন না। তাই তিনি রূপোর একটা গেলাস তাঁকে সেদিন উপহার দিয়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন। সেই গেলাসের উপর গুরুদাস দু'লাইন সংস্কৃত শ্লোক লিখে বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর সে দান প্রত্যাখ্যান করেন নি। বিদ্যাসাগরের পর স্যর গুরুদাসই দ্বিতীয় বাঙালি যাঁর মাতৃভক্তি ছিল অসাধারণ। বিদ্যাসাগর বলতেন—"গুরুদাসের মাতৃভক্তি দেখিয়া আমি তাহাকে ভক্তি করি।"
বয়সে স্যার গুরুদাস বিদ্যাসাগরের চেয়ে চব্বিশ বছরের ছোট ছিলেন। বয়সে ছোট হলেও গুণীর গুণের মর্যাদা দিতে বিদ্যাসাগর কোনো দিনই কুণ্ঠিত ছিলেন না। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব।

বিদ্যাসাপরের নির্লোভতার আর একটি কাহিনীর উল্লেখ এখানে করব। কৃষ্ণনগরের মিশনারি স্কুলের শিক্ষক ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ অঞ্চলের একজন উৎসাহী ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মপ্রচারক ছিলেন। মিশনারিরা তাঁকে খ্রীষ্টান করতে বহু চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। ব্রজনাথ বিদ্যাসাগরের খুব অনুরাগী ছিলেন। কলকাতায় এলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। ডিপজিটরীর কর্মচারীদের ব্যবহারে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং একদিন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বসে বলেন, কেউ যদি এটা নেয় তা হলে আমি বাঁচি। দৈবক্রমে সেই সময়ে ব্রজনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ আপনার রাগের কথা না মনের কথা? বিদ্যাসাগর বললেন—সত্যই এ আমার মনের কথা। তখন ব্রজনাথ বললেন—তা হলে আমাকে দিন। বিদ্যাসাগর বললেন, নিন। —কত দাম দিতে হবে? জিজ্ঞাসা করেন ব্রজনাথ। বিদ্যাসাগর বললেন,

আপনি এখন ডিপজিটরীর কাজ রীতিমতো চালিয়ে এর উপস্বত্ব ভোগ করুন, পরে যেমন হয় করা যাবে। পরের দিনই একজন লোক দু'হাজার টাকা নিয়ে উপস্থিত—ডিপোজিটরী কিনতে চায়। বিদ্যাসাগর রাজী হলেন না। বললেন—যা একজনকে একবার দিয়েছি, কোটি টাকা পেলেও তা ফিরে নেব না।

এই-ই বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের সুদীর্ঘ জীবনে অনেকগুলি বন্ধু-বিয়োগ ঘটে। তার সবগুলির উল্লেখ অসম্ভব। জীবনে যাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেছেন অথবা যাদের সঙ্গে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, জীবনের মধ্যপথে ও শেষভাগে এমন কয়েকজন সুহৃদকে একে একে হারিয়ে, বিদ্যাসাগর খুবই শোকাভিভূত হয়েছিলেন। পারিবারিক শোকতাপ তো ছিলই। কিন্তু পারিবারিক জীবনের বাইরে বাংলার যে বৃহৎ সমাজ-জীবনের সঙ্গে বিদ্যাসাগর একাত্মীভূত ছিলেন, যেখানে যাদের সঙ্গে তাঁর চিন্তার এবং ভাবের আদান-প্রদান হতো, সেইসব প্রিয়জনদের মৃত্যুতে এই ব্রাহ্মণ পরম বেদনা অনুভব করতেন। বিশেষ করে রমাপ্রসাদ, অক্ষয়কুমার, রামগোপাল ঘোষ, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল, দীনবন্ধু মিত্র এবং দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত শোক পেয়েছিলেন। রমাপ্রসাদ ও অক্ষয়কুমারের কথা আগেই বলেছি। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী, লেখক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম পথ-প্রদর্শকদের মধ্যে অন্যতম রামগোপাল বিদ্যাসাগরের সুহৃদ ও সহায় ছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্যদলের অগ্রণীদের অন্যতম রামগোপাল ঘোষ বিদ্যাসাগরের চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের বড়ো ছিলেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে ইনি বিদ্যাসাগরকে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। দুর্গাচরণ ছিলেন বিদ্যাসাগরের অকৃত্রিম বন্ধু; এঁর কাছেই তিনি ইংরেজি শিখেছিলেন। চিকিৎসক দুর্গাচরণ উদারহৃদয় ছিলেন; তাঁরই সহায়তায় বিদ্যাসাগর কত আর্তপীড়িতের প্রাণদান করেছিলেন। দুর্গাচরণ বিদ্যাসাগরের অনেক কাজেই মনপ্রাণ ঢেলে দিতেন; বিদ্যাসাগরও তার প্রতিদান দিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

অনেক কাজেই বিদ্যাসাগর দ্বারকানাথের পরামর্শ নিতেন। পীড়িত-পরিত্রাণে যেমন ডাক্তার দুর্গাচরণ, জমিদার-পীড়িত প্রজা-উদ্ধারে তেমনই দ্বারকানাথ

বিদ্যাসাগরের অকৃত্রিম সহায় ছিলেন। দ্বারকানাথের জীবনের উন্নতির মূলে ছিলেন বিদ্যাসাগর, এ কথা দ্বারকানাথ নিজেই স্বীকার করেছিলেন। তাঁরই পরামর্শে দ্বারকানাথ আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এইরকম বহু লোকেরই জীবনের গতি সেদিন নির্দেশ করে দিয়েছিলেন এই ব্রাহ্মণ।

দ্বারকানাথের মৃত্যুর এক বছর আগে দীনবন্ধু মিত্র মারা যান।

'নীলদর্পণের' দীনবন্ধু। সেই 'নীলদর্পণ' বাংলার সমাজে যা একদিন তুমুল আন্দোলন তুলেছিল।

বিদ্যাসাগরের জন্মের দশ বছর বাদে দীনবন্ধুর জন্ম। দীনবন্ধু নাম তিনি নিজে গ্রহণ করেন, এবং এই নামেই তিনি কলেজে ভর্তি হন। তাঁর শৈশবের নাম ছিল গন্ধর্ব-নারায়ণ। দীনবন্ধু আশৈশব বিদ্যাসাগরের অনুরাগী এবং অনুগামী ছিলেন। গুপ্তকবির প্রভাকরে দীনবন্ধুর কবি প্রতিভার প্রথম উন্মেষ এবং তখন থেকেই বিদ্যাসাগর তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। তারপর নীলকর-পীড়িত বাংলার প্রজাদের দুঃখে রাজকর্মচারী দীনবন্ধুর হৃদয়ে যখন আগুন জলে উঠ্‌লো এবং হৃদয়ের সেই জ্বালা 'নীলদর্পণ' নাটকে আত্মপ্রকাশ করল, তখন থেকে দীনবন্ধুর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় আরো ঘনিষ্ট হয়। প্রত্যক্ষ কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কোন সংশ্রব ছিল না, কেননা তাঁর কর্মের ক্ষেত্র ছিল স্বতন্ত্র, তবে যেখানে যে কেউ যেভাবে হোক দেশের কল্যাণ সাধন করেছে, বিদ্যাসাগর তাকেই বন্ধুত্বের আলিঙ্গন দিয়েছেন—এ উদারতা সাগর-চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দীনবন্ধুর সংস্কারমুক্ত মন বিদ্যাসাগরকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না করে পারেনি। আকৃষ্ট হবার কারণ আরো ছিল। বিদ্যাসাগর দীনবন্ধুর প্রতিভার একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এই অনুরাগের হেতু দীনবন্ধুর সহানুভূতি। বিদ্যাসাগর বাস্তবে যা ছিলেন, দীনবন্ধু সাহিত্যে তাই ছিলেন। উপেক্ষিত, অবনমিত এবং দরিদ্রের দুঃখের মর্ম তিনি নিবিড়ভাবে বুঝতেন। তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতাও ছিল বিদ্যাসাগরের মতোই বিস্ময়কর। তাঁর রচনায় যে সহানুভূতি ও পরদুঃখকাতরতা তীব্র হয়ে ফুটে উঠেছিল, তা পাঠ করে বিদ্যাসাগর মুগ্ধ হয়েছিলেন। দীনবন্ধুর সুকীয়া স্ট্রীটের বাসায় বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে যেতেন এবং 'নীলদর্পণ'-এর নাট্যকার যখন অসুস্থ, তখনো তাঁর

চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করতে এবং নানাভাবে মিত্র-পরিবারের তত্ত্বাবধান করতে তিনি ত্রুটি করেন নি। দীনবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে বাংলা-সাহিত্যে ক্ষতির কথা স্মরণ করে বিদ্যাসাগর কত সময়ে দুঃখ প্রকাশ করতেন। কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যুতে শুধু মৌখিক শোকপ্রকাশ করে কিংবা সমবেদনা জানিয়েই বিদ্যাসাগর কখনো তাঁর কর্তব্য শেষ করতেন না। তাই আমরা দেখতে পাই যে, দীনবন্ধুর মৃত্যুর পরে, তাঁর অসহায় স্ত্রী-পুত্রদের তিনি তত্ত্বাবধান করেছিলেন।

"কতকগুলি অপোগণ্ড শিশুসন্তান লইয়া মিত্র-গৃহিনী যখন চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া আসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ই পরমাত্মীয়ের ন্যায় সর্বদা সংবাদ লইয়াছেন, নিকটে থাকিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন এবং সংসার-সংগ্রামে ও বালকগণের শিক্ষাবিধানে সহায়তা করিয়া পরলোকগত মিত্রমহাশয়ের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন।" এ ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সত্যই ছিলেন মানব-দেবতা। নবীনচন্দ্র তাঁকে বৃথাই মানব-ঈশ্বর ও নর-নারায়ণ বলে বন্দনা করেন নি। বন্ধুজনের বিপদ-মোচন ও সুখসাধনের জন্যে বিদ্যাসাগরের অসাধ্য কিছুই ছিল না। তাঁর বন্ধুত্ব মুখের কথায় শেষ হতো না। বন্ধুদের সকল অবস্থার সংবাদ রাখতেন, তাদের বিপদে মাথা পেতে দিতেন; বন্ধু-সেবায় কোন ক্লেশকে ক্লেশ বলে মনে করতেন না। বন্ধুত্বের এমন আদর্শ আজো বিরল। বন্ধু-বৎসল বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্বে সেদিন অনেকেই গর্ব বোধ করতেন।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করব। বই বেরুবার বারো বছর পরে 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম অভিনয় হলো শনিবার, ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২। পরের বছর দীনবন্ধুর মৃত্যু হয়। এই নাটককে কেন্দ্র করে জন্ম হলো ন্যাশনাল থিয়েটারের—প্রথম সাধারণ নাট্যশালা। গিরিশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি প্রভৃতি সেকালের সৌখিন অভিনেতারা এই থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অমৃতলাল বসু তাঁর 'স্মৃতিকথায়' লিখেছেন যে, প্রথম অভিনয় রজনীতে দীনবন্ধুর বিশেষ আগ্রহে বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজ কুঠিয়াল রোগ্ সাহেবের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অর্ধেন্দুশেখর। কুঠিয়াল সাহেবের দুর্দান্ত প্রকৃতি তাঁর অভিনয় এমন প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল যে, তাই দেখে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত বিচলিত হন এবং তার পায়ের

দক্ষিণ কলিকাতায় বিদ্যাসাগরের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর দাতব্য হাসপাতাল। ছবিতে হাসপাতালের বর্তমান অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাইতেছে। ইনি বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র ৺অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

বীরসিংহে ভগবতী বিদ্যালয়ের সম্মুখে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিস্তম্ভ
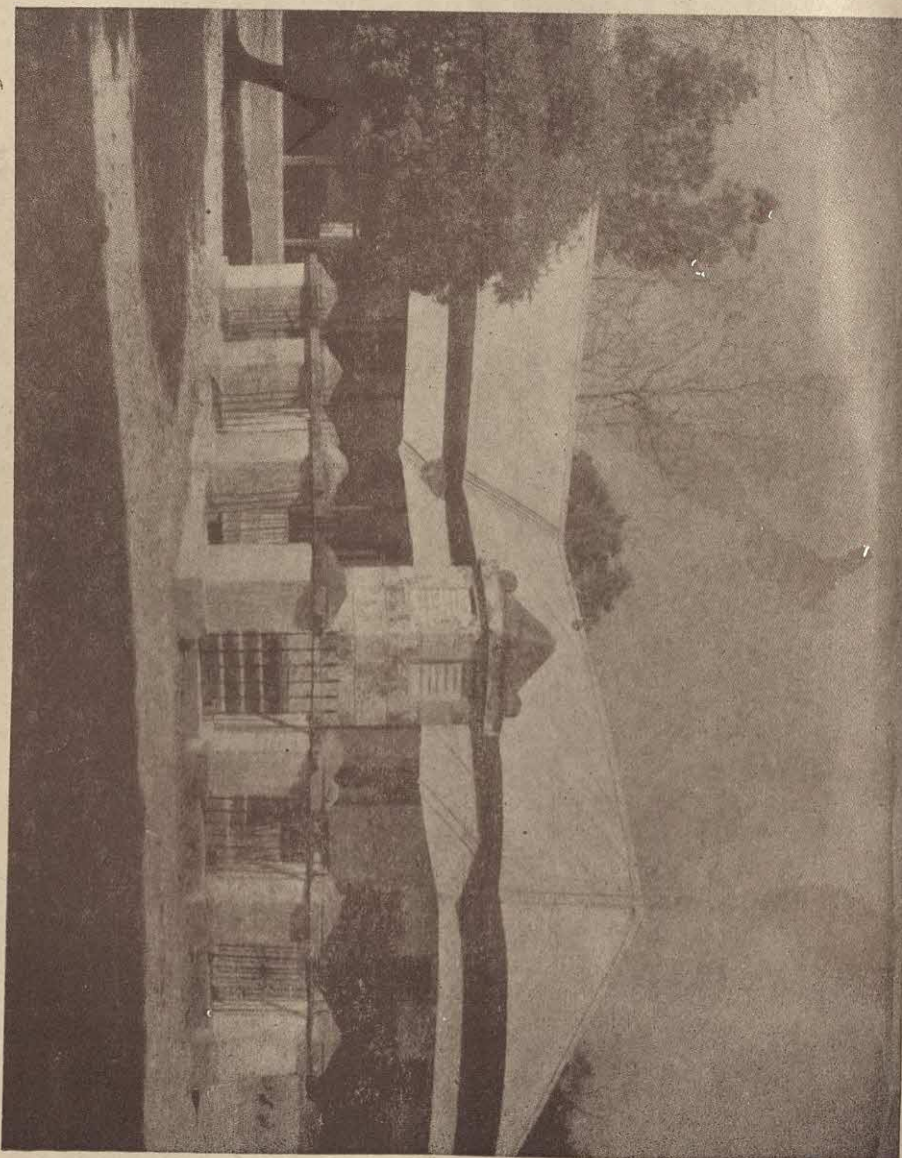
চটি খুলে রোগ সাহেবকে মারেন। অমনি প্রেক্ষাগৃহে তুমুল উত্তেজনা, অভিনয় কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তারপর বিদ্যাসাগরের সেই চটি মাথায় ধারণ করে অর্ধেন্দুবাবু বললেন—এই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সেদিন থেকেই বিদ্যাসাগরের চটির গৌরব সারা বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পরের দিনে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় এর একটা বিবরণও প্রকাশিত হয়েছিল।

বিপন্নের সেবার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর পশ্চাদপদ ছিলেন না।
সরকারী চাকরি ত্যাগ করবার ন বছর পরে একটি দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। দেশব্যাপী এই দুর্ভিক্ষের সময়ে বিদ্যাসাগর স্থির থাকতে পারেন নি। দুর্ভিক্ষের প্রথম খবর বেরুলো হিন্দু পেট্রিয়টে। উড়িষ্যা ও বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলের লোকই বেশী বিপন্ন হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার এই সম্পর্কে লিখেছেন: "এই দুর্দিনে বঙ্গবীর মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়া দীন-দুঃখীর ক্ষুধানল নির্বাণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ নিরন্ন প্রজামণ্ডলীর দারুণ অভাবের প্রকৃত বিবরণ রাজকর্মচারীদের গোচর করিতে এবং তদ্দ্বারা রাজপুরুষদিগের দ্বারা দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুরোধ ক্রমে অনুসন্ধান এবং মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার নানা স্থানে সরকারী খরচে অন্নসত্র খোলা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার মন উঠে নাই। মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে লোক অন্নাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে এবং বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্তী গ্রামের লোক সকল অন্নাভাবে কাতর হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে; এই অন্নাভাব ও আর্তনাদের সংবাদ কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পৌঁছিবামাত্র তিনি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোক-মণ্ডলীর জঠরানল নিবারণের ব্যবস্থা করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ বাটী গমন করিলেন। তাঁহার নিজব্যয়ে যে কত লোক প্রাণধারণ করিয়াছিল এবং সেজন্য তাঁহার যে কত টাকা ব্যয় হইয়াছিল তাহার প্রকৃত বিবরণ সংগৃহীত হওয়া নিতান্ত কঠিন ব্যাপার।"
কথিত আছে, স্বগ্রামে এই দুর্ভিক্ষের প্রথম সংবাদ পেয়েই বিদ্যাসাগর তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্রকে লিখে পাঠালেন, "যত টাকা ব্যয় হয় হউক, কেহ যেন

অভুক্ত না থাকে, সকলেই যেন খাইতে পায়।" হিন্দু পেট্রিয়টের একটি সংবাদ থেকে জানা যায় যে, এই দুর্ভিক্ষের সময়ে, "বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহ এবং নিকটবর্তী দশ-বারোখানি গ্রামের নিরন্ন লোকদিগের জন্য অন্নসত্র স্থাপন করিয়াছিলেন।"

এই দুর্ভিক্ষের পাঁচ বছর পরে বর্ধমানে ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বর সংহার-মূর্তি নিয়ে দেখা দিল। বর্ধমান বিদ্যাসাগরের বড় প্রিয়। এই পথ দিয়ে তিনি বীরসিংহে যাওয়া-আসা করতেন। অবসর পেলেই এখানে আসতেন। বর্ধমানের দুঃস্থ দরিদ্রমাত্রেই বিদ্যাসাগরকে দয়ার সাগর ও দাতা বলে চিনত। সেই বর্ধমানে যখন ম্যালেরিয়া দেখা দিল, তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। সমসাময়িক পত্রিকা থেকে জানতে পারা যায় যে, বর্ধমানের সেই ম্যালেরিয়া-জনিত মহামারী ব্যাপার বর্ণনাতীত। ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা নেই, চিকিৎসা করবার লোক নেই, রোগে সবাই ত্রাহি ত্রাহি করছে। তখনকার হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় এই লোকক্ষয় ঘটনার মর্মস্পর্শী বিবরণ আছে। বিদ্যাসাগর এলেন এগিয়ে। গভর্ণমেণ্ট কি করবেন না করবেন সে চিন্তা না করে, সকলের আগে তিনি রোগীদের চিকিৎসার জন্যে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় খুললেন। ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করলেন। আর নিজে কলকাতায় এসে তখনকার ছোটলাট গ্রে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে সর্বনাশী ম্যালেরিয়ার সংবাদ তাঁর গোচরে আনলেন। তারপরে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। এই সময়ে বিদ্যাসাগর খালি দু'হাজার টাকার কাপড়ই বিলিয়েছিলেন। কুইনিনের পরিবর্তে যখন সিঙ্কোনা ব্যবহারের কথা ওঠে তখন বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, গরীবের অসুখ বলে, প্রকৃত ঔষধ ব্যবহার হবে না, তা কি কখনো হয়? গরীব বড়লোক সকলের প্রাণ তো একই।
বিপন্নের সেবা কেমন করে করতে হয় তা বিদ্যাসাগরই বাঙালিকে প্রথম দেখিয়েছেন। সঙ্কটত্রাণ যে মুখের কথা নয়, অন্তরের জিনিস, তা তিনিই বুঝিয়ে গেছেন। "ইতরজাতীয় দরিদ্রলোকদের প্রতি পাছে কোন প্রকার অযত্ন হয়, এই আশঙ্কায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে দুঃখী ও দুঃখিনীর মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেন।...তিনি নিজে ঐরূপ করিতেন বলিয়াই কেহই আর তাহাদের প্রতি কোন প্রকারে অযত্ন করিতে সাহস করিত না।"

গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হলো এই কথা। লোকে তাঁকে দয়ার অবতার বলে ঘোষণা করলো।

বিদ্যাসাগরের কাছে মানুষের একটিমাত্র পরিচয় ছিল—মানুষ। সে মানুষ হাড়ি হোক, ডোম হোক, বিদ্যাসাগর তাকে মানুষ বলেই জানতেন এবং সেইভাবেই তার সেবা করতেন। মানব-সেবার এই উদার আদর্শ তিনি রেখে গিয়েছিলেন বলেই পরবর্তী কালে বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ হতে পেরেছিলেন। বিবেকানন্দের দরিদ্র-নারায়ণ সেবা বিদ্যাসাগরের আদর্শেরই পরিণতি। তাই বিবেকানন্দ বলতেন—"রামকৃষ্ণের পর আমি বিদ্যাসাগরকেই অনুসরণ করি।" বিদ্যাসাগর না হলে বিবেকানন্দ হতো না—এ সিদ্ধান্ত অনৈতিহাসিক নাও হতে পারে।

বিপুল ঋণভার শেষ জীবনে বিদ্যাসাগরের অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিধবা-বিবাহ আন্দোলন, মাইকেল-উদ্ধার, অসংখ্য আত্মীয়-অনাত্মীয়ের ভরণপোষণ, সঙ্কট-ত্রাণ এবং শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদি বহুবিধ ব্যাপারের জন্যে বিদ্যাসাগরকে ঋণগ্রস্ত হতে হয়েছিল। দুঃসাহসী ছিলেন বলেই লক্ষাধিক টাকার এই ঋণের জন্যে তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল না। অশান্তি বোধ করতেন শুধু ঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারার জন্যে। তাঁর একটা বিশ্বাস ছিল, ঋণের পরিমাণ যতই হোক, পরিশোধের উপায় হবেই। কলেজের চাকরি নেই, আয়েরও নতুন পথ নেই, ভরসা কেবল পুস্তক বিক্রীর চার-পাঁচ হাজার টাকা মাসিক উপার্জন। ব্যয়ের তুলনায় সে আয় যৎসামান্যই। তবু এ অবস্থাতেও দান ও দয়ার বিরাম ছিল না। যখন যে এসে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে, ব্রাহ্মণ তাকে ফিরিয়ে দিতে পারেন নি; নিজের অসুবিধা সত্ত্বেও যথাসাধ্য দানে তিনি কোন দিনই বিরত ছিলেন না। সে মহৎ দান ও দয়ার কাহিনী অজস্র। এই ভাবে ঋণজালে জড়িত হয়ে বিদ্যাসাগর আর একবার সরকারী কর্মের প্রার্থী হয়েছিলেন। স্যার সিসিল বিডন তখন বাংলার ছোটলাট। হ্যালিডের মতো বিডন সাহেবও বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং সর্বদা তাঁর খোঁজখবর নিতেন। বিদ্যাসাগরের সকল অনুষ্ঠানেই বিডন সাহেবের পূর্ণ সহানুভূতি ছিল।

—পণ্ডিত, কোন রকম উপযুক্ত কাজকর্মের সুবিধা হলে, আপনি তা নিতে সম্মত আছেন কি না? একদিন কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন স্যার সিসিল বিডন।

—আপাততঃ নতুন করে চাকরী নেবার কথা আমি ভেবে দেখিনি, পরে এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখব। উত্তর দিলেন বিদ্যাসাগর।

এই ঘটনার ঠিক এক বছর পরে সাংসারিক অসচ্ছলতা এমনই ভীষণ আকার ধারণ করলো যে বিদ্যাসাগর নিরুপায় হয়েই কর্মের প্রার্থী হলেন। ছোটলাটকে এক পত্রে লিখলেন: "আমার অবস্থার পরিবর্তন-নিবন্ধন আমার জন্য কিছু করিতে আপনাকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। আমি খুব বিপদে পড়িয়াছি এবং কোনপ্রকার নূতন আয়ের পথ না হইলে, আমার ঐ সকল অসুবিধা দূর হওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আপনি গত বৎসর এই সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমি রাজসরকারে পুনরায় প্রবেশ করিতে প্রস্তুত আছি কি না? আমার বোধ হয়, আমি সে সময়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম। সে সময়ে যাহা আমার পছন্দ অপছন্দ বিষয় ছিল, আপাততঃ তাহাই আমার পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আশা করি এইরূপে বিরক্ত করার জন্য কিছু মনে করিবেন না।"

বিদ্যাসাগর যে কত সহজ, সরল মানুষ তার পরিচয় আছে পত্রের এই কয়েকটি ছত্রে। এমন স্বচ্ছ চরিত্রের মানুষ সে যুগে যেমন, এ যুগেও তেমনি বিরল। উত্তরে ছোটলাট জানালেন: "আপনার অনুরোধ মনে রাখিব, কিন্তু আপাততঃ আপনাকে নিযুক্ত করিবার উপযোগী কোন কর্মকাজের সুবিধা দেখিতে পাইতেছি না।' এ ঘটনা চাকরী ছাড়ার আট বছর পরের কথা।

আরো তিন বছর কেটে গেল।

ঋণের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেলো।

বিদ্যাসাগর আবার ছোটলাটকে চিঠি লিখলেন। ইতিমধ্যে বিডন সাহেব বিদ্যাসাগরকে একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন যে, প্রেসিডেন্সী কলেজে একজন সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত করবেন। সেই প্রসঙ্গ তুলে বিদ্যাসাগর লিখলেন—"যদি আপনার সে ইচ্ছা এখনো থাকে এবং আমাকে ঐ কর্মে

নিযুক্ত করার যদি কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে আমাকে তাহাই দিবেন।" সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগর এ কথা লিখতেও ভুললেন না—"কিন্তু আমি অতি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি যে, আমার অভাব ও বিপদের মাত্রা গুরুতর আকার ধারণ করিলেও, যদি আমি উক্ত কলেজের ইংরাজ অধ্যাপকগণের সমান বেতন না পাই তাহা হইলে আমার আত্মসম্মান-বোধের অনুরোধে আমি উহা গ্রহণ করিব না।" চিঠির শেষে তিনি তাঁর যুক্তির সমর্থনে হাইকোর্টে দেশীয় জজ ও ইংরেজ জজদের সমান মাইনে পাওয়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছিলেন।

আত্মসম্মান বোধ!—বিদ্যাসাগরের বিদ্যাসাগরত্ব অভিব্যক্ত এই একটিমাত্র কথায়।

চাকরি চাইলেন, কিন্তু আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে নয়।

এই না হলে আর বিদ্যাসাগর?

বাঙালির জন্যে উত্তরাধিকার হিসাবে তিনি রেখে গেছেন এই মহামূল্য সম্পদ।

প্রেসিডেন্সী কলেজের চাকরি হলো না।

ছোটলাট উত্তরে জানালেন যে, "ভারতসরকার প্রেসিডেন্সী কলেজে এত অধিক বেতনে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য অধ্যাপকের পদের সৃষ্টি করিবেন না।" বিদ্যাসাগর বিডন সাহেবের অসুবিধার কথা অনুমান করে সানন্দে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলেন। কেউ তাঁর জন্যে বিব্রত হয়, এ তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি আশা করেছিলেন গভর্ণমেণ্ট তাঁর জন্যে কিছু করতে পারেন। সে আশা নিষ্ফল হলো, ব্রাহ্মণ কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হলেন না।

বাংলার বহু জমিদার ও সম্ভ্রান্ত রাজপরিবারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের আলাপ। নদীয়ার রাজবাড়ি, চকদিঘীর রাজবাড়ি, বর্ধমানের রাজবাড়ি, মুর্শিদাবাদের রাজবাড়ি, পাইকপাড়ার রাজবাড়ি, পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ি, উত্তরপাড়ার জমিদার—সকলেই বিদ্যাসাগরকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন, সকলেই প্রয়োজন হলে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এমন কি, পারিবারিক গোলযোগ মেটাবার জন্যেও তাঁরা বিদ্যাসাগরকে সালিশী মানতেন। তাঁর নির্লোভ মহত্ত্বই এর একমাত্র কারণ। কত সময়ে কত ভাবে পরামর্শ দিয়ে বিদ্যাসাগর এঁদের হিতসাধন করতেন। বাংলা দেশের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের

পারিবারিক মোকদ্দমায় বিদ্যাসাগর সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তিনি যেমন দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন তেমনি বাংলার বহু সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য লোকদেরও সহায় ও সুহৃদ ছিলেন। বিশেষ করে পাইকপাড়ার রাজবংশ বিদ্যাসাগরের কাছে নানা কারণে কৃতজ্ঞ। কারো কাছেই তাঁর কোনো প্রত্যাশা ছিল না। ঋণ-পরিশোধ করা একান্ত দরকার হলো। পাইকপাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র প্রতাপচন্দ্র বেঁচে নেই, কার কাছে ধার চাইবেন? তখন বিদ্যাসাগর নিরুপায় হয়ে মুর্শিদাবাদের মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাছে সাড়ে সাত হাজার টাকা ধার চেয়ে এক চিঠি লিখলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিন বছরে ঐ টাকা পরিশোধ করবেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী এ টাকা দিয়েছিলেন। কথিত আছে, পাইকপাড়ার রাজবাড়ির কোনো স্ত্রীলোক এই বিপদের সময়ে বিদ্যাসাগরকে পঁচিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। এসব টাকা তিনি আবার সময় মতো সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছিলেন।

রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তিনি অনেক বিষয়েই বিদ্যাসাগরের পরামর্শ নিতেন। একবার তাঁর এক মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে রাজনারায়ণ বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চেয়ে পাঠালেন। ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ হিন্দু বিদ্যাসাগরের কাছে পরামর্শ চাইছেন—তাঁর মতামতের ওপর শ্রদ্ধা ছিল বলেই চাইছেন। উত্তরে বিদ্যাসাগর তাঁকে যে কথা লিখেছিলেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর লিখলেন: "আপনার কন্যার বিবাহ-বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়াছি।...আপনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। ব্রাহ্মধর্মে আপনার যেরূপ শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে দেবেন্দ্রবাবু যে প্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, যদি তাহা ব্রাহ্মধর্মের অনুযায়ী বলিয়া আপনার বোধ থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রণালী অনুসারেই আপনার কন্যার বিবাহ দেওয়া সর্বতোভাবে বিধেয়। আর যদি আপনি প্রাচীন প্রণালী অনুসারে কন্যার বিবাহ দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্ম-বিবাহ প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবেক। তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্ম-প্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিলে ঐ বিবাহ সর্বাংশে সিদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক কি না, তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না।...ঈদৃশস্থলে নিজের অন্তঃকরণে অনুধাবন করিয়া যেরূপ বোধ হয়, তদনুসারে কর্ম করাই কর্তব্য।" আজীবন যিনি নিজের অন্তঃকরণে

অনুধাবন করে একটির পর একটি কাজ করে গেছেন, সেই বিদ্যাসাগরের পক্ষে এমন কথা বলাই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।

বিশ্রাম সুখভোগ বিদ্যাসাগরের জীবনে খুব কমই ছিল।
একে তো তিনি আরামপ্রিয় বাঙালির মতো হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবার মানুষ ছিলেন না। তাঁর জীবন ছিল একটি মহাযজ্ঞ। নিবিড় কর্ম-স্রোতের মধ্যে বৃথা অপব্যয় করবার মতো তিলমাত্র সময় তাঁর ছিল না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিশ ঘণ্টা কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতেন। তিনি যথার্থই কর্মযোগী ছিলেন। শেষ জীবনে গুরুতর পরিশ্রমে এবং একের পর এক বন্ধু ও স্বজন-বিয়োগে যখন শরীর ও মন ভেঙে পড়েছিল, তাঁর তখনই প্রয়োজন হলো কোনো নির্জন স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে বাস করবার। প্রথমে দেওঘরে থাকবেন বলে একটা বাড়ি পছন্দ করলেন; কিন্তু দাম বেশী বলে কিনতে পারলেন না। পরে সাঁওতাল পরগণায় কার্মাটারের এক অতি নিভৃত স্থানে একটা মনের মতো বাড়ি তৈরি করালেন। বন-জঙ্গলে পরিবৃত কার্মাটারে সরল সাঁওতালদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবনের অনেকগুলি দিন সুখে অতিবাহিত হয়েছে। এই স্বাস্থ্য-নিবাসে বিদ্যাসাগর শুধু একাই ছিলেন না; তাঁর বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত লোকেরাও স্বাস্থ্যলাভের জন্যে কার্মাটারে যেতেন। বিদ্যাসাগরের স্বভাব-সিদ্ধ আতিথ্যের এখানেও ব্যতিক্রম হতো না, সকলকেই তিনি সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করতেন। সাঁওতালদের সরল জীবনধারা সরল-চিত্ত ব্রাহ্মণকে এমনই মুগ্ধ করেছিল যে, বিদ্যাসাগর বলতেন—"পূর্বে বড়মানুষদের সঙ্গে আলাপ হইলে বড় আনন্দ হইত, কিন্তু এখন তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্তি হয়না। সাঁওতালদের সহিত আলাপে আমার প্রীতি। তাহারা গালি দিলেও আমার তৃপ্তি। তাহারা অসভ্য বটে, কিন্তু সরল ও সত্যবাদী।"
সরল ও সত্যবাদী বিদ্যাসাগরের চরিত্রের এও একটা উজ্জ্বল দিক।
জ্যোতির্ময় সেই জীবনের আলো এমনি করেই সেদিন একটি যুগকে আলোকিত করে গেছে।

বিদ্যাসাগরের কার্মাটারের জীবন সম্পর্কে আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। তারই একটু এখানে উদ্ধৃত

করে দিলাম : "জামতাড়া ও মধুপুর ষ্টেশনের মধ্যে কার্মাটার। ১৮৭৮ সালে ষ্টেশনের পাশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক বাংলো ছিল। বাংলোটিতে ত্নটি হল, চারটি ঘর ও ত্নটি বারান্দা ছিল; বাংলোর চারিদিকে একটি চারচৌরশ জমি চার-পাঁচ বিঘা হইবে,—সেইটি বাগান : বাগানটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় নানা দেশ হইতে আমের কলম আনিয়া পুঁতিয়াছিলেন। তিনি গাছগুলির বিশেষ যত্ন করিতেন। বাগানে আরো নানারকমের গাছ ছিল।···আমরা কার্মাটারে পৌছিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলোয় গেলাম। প্ল্যাটফরমের নীচেই বাংলো, বাগানের গেটে ঢুকিতেই দেখি, তিনি বাংলোর বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন।... সন্ধ্যা পর্যন্ত গল্পগুজবে কাটিয়া গেল।...পরদিন সকালে দেখি বিদ্যাসাগর মহাশয় বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে টেবিলে বসিয়া কথামালা কি বোধোদয়ের প্রুফ দেখিতেছেন।...রৌদ্র উঠিতে-না-উঠিতেই একটা সাঁওতাল গোটা পাঁচ-ছয় ভুট্টা লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল—ও বিদ্যাসাগর, আমার পাঁচগণ্ডা পয়সা নইলে ছেলেটার চিকিৎসা হইবে না; তুই আমার এই ভুট্টা নিয়া আমায় পাঁচগণ্ডা পয়সা দে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ পাঁচ আনা পয়সা দিয়া সেই ভুট্টাকটা লইলেন ও নিজের হাতে তাকে তুলিয়া রাখিলেন। তারপর আর একজন সাঁওতাল, —তার বাজরায় অনেক ভুট্টা; সে বলিল—আমার আট গণ্ডা পয়সার দরকার। বিদ্যাসাগর আটগণ্ডা পয়সা দিয়াই তাহার বাজরাটি কিনিয়া লইলেন।··· তারপর দেখি,—যে যত ভুট্টা আনিতেছে, আর যে যত দাম চাহিতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দামে সেই ভুট্টাগুলি কিনিতেছেন আর তাকে রাখিতেছেন। আটটার মধ্যে চারিদিকের তাক ভরিয়া গেল, অথচ ভুট্টা কেনার কামাই নাই।···ভুট্টা কেনা চলিতে লাগিল। একটু অন্য কাজে গিয়াছি, আসিয়া দেখি বিদ্যাসাগর নেই। সব ঘর খুঁজিলাম, নেই, রান্নাঘরে নেই, বাগান সব খুঁজিলাম, নেই; বাগানের পিছন দিকে একটা আগড় আছে—সেটা খোলা; মনে করিলাম, এইখান দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন, সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, একটা আল্‌পথে বিদ্যাসাগর মহাশয় হন্ হন্ করিয়া আসিতেছেন, দর্ দর্ করিয়া ঘাম পড়িতেছে, হাতে একটা পাথরের বাটি।···জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথায় গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন —ওরে, খানিকক্ষণ আগে একটি সাঁওতালনী আসিয়াছিল; সে বলিল—

বিদ্যাসাগর, আমার ছেলেটার নাক দিয়ে হু হু করে রক্ত পড়ছে, তুই এসে যদি তাকে বাঁচাস্। তাই আমি একটা হোমিওপ্যাথিক ওধুধ এই বাটি করে নিয়ে গিয়েছিলাম। এক ডোজ ওষুধে তার রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া গেল।...আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কত দূর গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন—ওই যে গাঁ-টা দেখা যাচ্ছে, মাইল দেড়েক হবে।

"বাংলোয় আসিয়া চাহিয়া দেখি, বাংলোর সম্মুখের উঠান সাঁওতালে ভরিয়া গিয়াছে—পুরুষ মেয়ে ছেলে বুড়ো—সব রকমের সাঁওতালই আছে।...বিদ্যাসাগরকে দেখিয়াই তারা বলিয়া উঠিল—ও বিদ্যাসাগর, আমাদের খাবার দে। বিদ্যাসাগর ভুট্টা পরিবেশন করিতে বসিলেন। শুক্না কাঠ ও পাতার আগুন দিয়া সাঁওতালের দল ভুট্টা সেঁকে আর খায়; ভারী ফুর্তি ..তাকের রাশীকৃত ভুট্টা প্রায় ফুরাইয়া আসিল। তাহারা উঠিয়া বলিল—খুব খাইয়েছিস্ বিদ্যাসাগর। ক্রমে সাঁওতালের দল চলিয়া যাইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর রকে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন; আমিও আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিলাম; ভাবিলাম এ রকম বোধ হয় আর দেখিতে পাইব না।"

এই মানবপ্রেম। সরল, নিরক্ষর সাঁওতালরা তাঁর আত্মীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সঙ্গ লাভ করে ব্রাহ্মণ যেন স্বর্গীয় শান্তি উপভোগ করতেন। তাদের শিক্ষার জন্যে একটা স্কুল পর্যন্ত করে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

কার্মাটারের সেই নির্জন অরণ্যে, সেই শুষ্ক কঠিন মাটিতে, সাঁওতালদের জীর্ণ পর্ণকুটীরে বিদ্যাসাগরের করুণার স্রোত সেদিন যেভাবে প্রবাহিত হয়েছিল—তা শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার জিনিস। বাংলার মাটিতে মানবপ্রেমের এমন মহিমান্বিত বিগ্রহ আর দুটি দেখিনি। মানবপ্রেম ছিল বিদ্যাসাগরের সকল কাজের মূল—তাঁর জীবনের প্রধান সুর।

মাতৃজাতির প্রতি ছিল বিদ্যাসাগরের আশ্চর্য সমবেদনা-বোধ।

হিন্দু নারীর মর্মবেদনার করুণধ্বনি তাঁর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তাই তাদের বন্ধনমুক্ত করবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেম তিনি। কথিত আছে, পৌষ মাসের দুর্দান্ত শীতের অধিক রাত্রিতেও বিদ্যাসাগর পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। খুঁজে দেখতেন শীতের আক্রমণ উপেক্ষা করে কোথাও কোনো অসহায় মানুষ অভুক্ত অবস্থায় পথে পড়ে আছে কি না।

ঘুরতে ঘুরতে কোনো কোনো রাতে তিনি যেতেন চাঁপাতলা বা বৌবাজার অঞ্চলে। শীতের হিমেল হাওয়ায় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা তখন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। পথঘাট তখন একেবারে নির্জন। রাত একটা বাজে। বিদ্যাসাগর পথ চলছেন ত চলছেনই। এরই মধ্যে গিয়ে তিনি হাজির হলেন বারাঙ্গনা পল্লীতে। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন এই কঠিন শীতকে উপেক্ষা করে রাত্রির ঐ তৃতীয় প্রহরেও দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু কয়েকটি হতভাগিনী উপার্জনের আশায়। কিন্তু রাত্রির এই তৃতীয় প্রহর কি উপার্জনের সময়! বিদ্যাসাগরের হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল তাদের এই অদ্ভুত অসহায় অবস্থা দেখে। ব্রাহ্মণ এগিয়ে চললেন তাদের দিকে। বললেন, আর কেন মা, অনেক রাত হয়েছে, এবার ঘরে যাও। ঠাণ্ডায় অসুখ হতে পারে।—বলেই প্রত্যেকের হাতে কিছু কিছু অর্থ দিলেন। বারাঙ্গনারা বিস্মিত। তাদের জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

মহাপ্রাণতার এমন অদ্ভুত দৃষ্টান্ত কেউ কোথাও শুনেছে, না দেখেছে?

এই মহাপ্রাণতাই বিদ্যাসাগরকে বড় করে তুলেছিল।

॥ ছাব্বিশ ॥

এইবার বিদ্যাসাগরের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে দু'এক কথা বলে আমাদের আলোচনা শেষ করব।

নানা কারণে বিদ্যাসাগরের সংসার-জীবন সুখের হয়নি।

বহু পরিজন পরিবৃত হয়েও সংসারে তিনি যেন একাকী ছিলেন।

তাঁর জীবনের খাতায় এই দিকটি শূন্য বললেই হয়।

হৃদয়ের সেই অপরিসীম শূন্যতা, সেই অপরিমেয় বেদনা এই ব্রাহ্মণকে তিলে তিলে দগ্ধ করেছিল, কিন্তু কখনো কর্তব্যচ্যুত করতে পারেনি। সাংসারিক জীবনের সকল দায়িত্বই তিনি হাসিমুখে বহন করেছেন, কখনো কারো সুখ-সাধনে বিমুখ ছিলেন না। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্নী ও পুত্র—সকলের প্রতি সকল কর্তব্যই আজীবন হৃষ্টচিত্তে পালন করেছেন। প্রতিদানে তিনি না পেয়েছেন পত্নীর ভালবাসা, না পেয়েছেন ভাইদের কাছ থেকে সদ্ব্যবহার, না পেয়েছেন একমাত্র পুত্রের কাছ থেকে সশ্রদ্ধ ও সপ্রীতি আচরণ।

বিদ্যাসাগরের পারিবারিক জীবন তাই আত্মীয়-স্বজনের অভিমান, বঞ্চনা ও দুর্ব্যবহারে ভারাক্রান্ত। আত্মীয় ও বন্ধুবিচ্ছেদের গরল আকণ্ঠ পান করেও তিনি নির্বিকার। তবু তিনি অনুযোগ করেন নি, অসীম ধৈর্যভরে নিজের কর্তব্য পালন করে গিয়েছেন। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। যেটুকু স্নেহমমতা পেয়েছিলেন তা একমাত্র হেমলতার কাছ থেকে। হেমলতা তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা।

বিদ্যাসাগরের পাঁচটি ভাইয়ের মধ্যে দুটি আগেই অল্প বয়সে মারা যায়—হরচন্দ্র আর হরিশচন্দ্র। কর্মজীবনের প্রারম্ভেই বিদ্যাসাগর এই চতুর্থ ও পঞ্চম সহোদর দুটিকে কলকাতায় এনেছিলেন লেখাপড়া শেখাবার জন্যে। এদের মধ্যে হরচন্দ্র তাঁর খুব প্রিয় ছিল। সে মারা যায় বারো বছর বয়সে

আর হরিশচন্দ্র আট বছর বয়সে। দারুণ বিসূচিকা রোগেই দুটি ভইয়ের জীবনান্ত হয়। ভ্রাতৃবৎসল বিদ্যাসাগর স্বভাবতই এই দুটি ভাইয়ের অকাল-মৃত্যুতে অত্যন্ত শোক পেয়েছিলেন। সংসারে তিনি জ্যেষ্ঠ সন্তান, জ্যেষ্ঠের কর্তব্য সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর তাই সর্বদা সচেতন ছিলেন। দীনবন্ধু, শম্ভু ও ঈশান—এই তিনটি সহোদরকে তিনি কলকাতায় রেখে পরম যত্নের সঙ্গেই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু তো তাঁর একরকম সহপাঠী ছিলেন বললেই হয়—দুটিতে এক সঙ্গেই দয়েহাটার সিংহীবাড়ির সেই অপরিসর অন্ধকার ঘরটিতে তাঁদের ছাত্রজীবনের কয়েকটি বছর কাটিয়েছিলেন ঠাকুরদাসের কঠোর শাসনের মধ্যে। বিদ্যাসাগর ও দীনবন্ধুর কর্মজীবনও প্রায় একত্রে আরম্ভ হয়। তাঁদের দুটি বোনও ছিল।

অল্পবয়সেই বিদ্যাসাগরের বিয়ে হয়।

পত্নী দীনময়ীর সঙ্গে যখন তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন তখনো তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয়নি। বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। দীনময়ী তখন আট বছরের বালিকা মাত্র। সুন্দরী ও সুলক্ষণা ভার্যা তিনি লাভ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিবাহের বছর তিন পরে তাঁর মধ্যম ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের বিয়ে হলো। বিদ্যাসাগরের বিবাহিত জীবনের দীর্ঘকালের মধ্যে প্রথম চৌদ্দ বছর খুব অশান্তিতেই কেটেছিল। অশান্তির কারণ বাইশ বছর পর্যন্ত দীনময়ীর কোন সন্তানাদি হয়নি ; এজন্যে পরিবারের সকলেই একটু মনক্ষুণ্ণ ছিলেন। কথিত আছে, বিদ্যাসাগরের মা এবং ঠাকুমা দুজনেই দীনময়ীর জন্যে বহুবিধ দৈব ওষুধের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিয়ের প্রায় ষোল বছর বাদে বিদ্যাসাগরের প্রথম পুত্র নারায়ণচন্দ্রের জন্ম। বিদ্যাসাগর তখন ফোর্টউইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার। নারায়ণচন্দ্রই বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র। তারপরে তাঁর চারটি মেয়ে হয় ; বড় মেয়ে হেমলতা, মেজ কুমুদিনী, সেজ বিনোদিনী এবং ছোট মেয়ে শরৎকুমারী। আগেই বলেছি, বিদ্যাসাগর যখন উপার্জনক্ষম হলেন, তখন থেকেই পুত্রের অনুরোধে ঠাকুরদাস কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং বীরসিংহ গ্রামে নিরুদ্বিগ্ন গৃহস্থের জীবন যাপন করতে আরম্ভ করেন। তখন ঠাকুরদাসের সংসার জমজমাট। আগের মতো সে দারিদ্র্য নেই, অভাব নেই। লক্ষ্মীশ্রীপূর্ণ সংসার, সংসারে বৃদ্ধা মাতা, নিষ্ঠাবতী ও স্নেহশীলা পত্নী, পুত্রবধূ ও পৌত্র। এই সময়টাই ঠাকুরদাসের জীবনে সুখের

সময় হয়েছিল। সাংসারিক সুখের ওপর ছিল পুত্রগর্ব। উপার্জনক্ষম এবং খ্যাতিমান পুত্র—এ সৌভাগ্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোনো দিনই কল্পনা করতে পারেন নি। বিদ্যাসাগরের এই সময়কার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তাঁর এক চরিতকার লিখেছেন :

"বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় অবস্থানপূর্বক কাজকর্ম করিতেন এবং একান্নবর্তী পরিবারবর্গের ভরণপোষণ ও ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের জন্য যখন যত টাকার প্রয়োজন হইত, তাহার সরবরাহ করিতেন। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, কখন কখন জননী, পত্নী ও পুত্রকন্যাসহ কলিকাতায় বাস করিতেন, কিন্তু পিতামাতার জীবদ্দশায় ও তৎপরে, বিবাহিত জীবনের দীর্ঘকাল একাকী কলিকাতায় বাস করিতেন। তদীয় পত্নীও পুত্রকন্যাসহ বীরসিংহের বাড়িতেই অনেক সময়ে বাস করিতেন।"

দাম্পত্য-জীবনের সূচনায় স্বামী-স্ত্রীতে এই দীর্ঘকাল বিচ্ছেদ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরবর্তীকালে অনেক সময়েই অনেক বিষয়ে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করেছিল। তা ছাড়া, আমরা দেখতে পাই বিদ্যাসাগর যখন দেশে আসতেন তখনো "নিজের স্ত্রীর ও পুত্রকন্যার সেবা অপেক্ষা অপর দশজনের সেবাই অধিক করিয়াছেন।" নবোদ্ভিন্নযৌবনা পত্নীর পক্ষে স্বামীর এই আচরণ তাঁর কাছে স্ত্রীর প্রতি অবহেলা বা ঔদাসীন্য বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। বিদ্যাসাগরের প্রকৃতি ছিল বসুধৈব কুটুম্বকম্, তাই বিদ্যাসাগর দেশে যখনই আসতেন তখন পরিবারবর্গ অপেক্ষা প্রতিবেশিদেরই আনন্দ হতো বেশী, কেননা, তাঁর অবসর সময়ের অধিকাংশই তাদেরই সাহচর্যে কাটত। নিজের সুখের দিকে কোনোদিনই যে মানুষ দৃষ্টিপাত করেন নি, চিরকাল যে মানুষ আত্মনিগ্রহ ও আত্মশাসনের অধীন হয়ে জীবন কাটিয়েছেন, তাঁর জীবনে ব্যক্তিগত সুখের চিন্তা কতটুকু? তার ওপর ছিল অপরিসীম পিতৃ-মাতৃভক্তি। বিদ্যাসাগরের জীবনের লক্ষ্যই ছিল বাপ-মাকে সুখী করা, তাঁদের সুখের জন্যে যুবক বিদ্যাসাগর যে নিজের সুখের চিন্তাকে বলি দেবেন—এ সহজেই অনুমান করা যায়। স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ বা ভালোবাসা যে তাঁর ছিল না তা নয়, কেননা বিদ্যাসাগর তো আর হৃদয়হীন মানুষ ছিলেন না। কিন্তু বাপ-মায়ের প্রতি ভক্তির প্রগাঢ়তা এবং প্রতিবেশিগণের প্রতি ভালোবাসার আতিশয্যই তাঁকে পত্নীর প্রতি কিছুটা বিমুখ করে তুলেছিল। আরো একটি কথা।

সংসারের সকল কর্তৃত্বই ন্যস্ত ছিল তাঁদের হাতেই। বধূদের কোনো কর্তৃত্বই ছিল না। সংসারের তহবিল ছিল ঠাকুরদাসের হাতে, ভাঁড়ার ভগবতী দেবীর হাতে। একান্নবর্তী পরিবারের এই অসুবিধা দীনময়ীকে তাঁর স্বামীর প্রতি বিরূপ হতে কতটুকু সহায়তা করেছিল, তা সহজেই অনুমান করতে পারা যায়। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার প্রতি যাঁর এত অনুরাগ, সেই বিদ্যাসাগর তাঁর নিরক্ষর পত্নীকে কি মনের মতো তৈরি করে নিতে পারতেন না? কিন্তু তা সম্ভব হয়নি ঠাকুরদাসের জন্যেই। তিনি বরাবরই মেয়েদের লেখাপড়া শিখবার বিরোধী ছিলেন; এইজন্যে তাঁর কোনো পুত্রবধূই শিক্ষালাভের সুযোগ পান নি। কঠোর পিতৃশাসনে তাঁর জীবন এমনই নিয়ন্ত্রিত ছিল যে, এ ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর পিতার বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পাননি। যদি পারতেন তা হলে তাঁর বিশাল কর্মজীবনে তাঁর স্ত্রীর কোনো না কোনো ভূমিকা থাকতো। এবং তাঁরই অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার ফলে দীনময়ী কোনো দিনই স্বামী সোহাগিনী হতে পারেন নি; একটা দুরন্ত অভিমানই তিনি স্বামীর প্রতি আজীবন পোষণ করে গেছেন। দাম্পত্য-জীবনের শুরুতেই স্বামীর সম্পর্কে দীনময়ীর যে বিরাগ দেখা দিয়েছিল, এইসব কারণেই সেই বিরাগ আর কোনো দিনই আন্তরিক অনুরাগে পরিণত হয়নি। বিদ্যাসাগরের যে উদার প্রকৃতি আপন পরিজনের গণ্ডী ছাড়িয়ে, নিখিল-জগৎকে আলিঙ্গন দিতে উদ্যত, দীনময়ী তাঁর স্বামীর সেই স্বভাবটিকে ধরতে পারেন নি। তাই সকলের অলক্ষ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রচিত হয়ে উঠেছিল একটি বিরাট ব্যবধান, এক নিদারুণ অন্তরাল দুজনকে বাহ্যতঃ একত্রে রাখলেও অন্তরের দিক দিয়ে পৃথক করে রেখেছিল। কঠিন সত্যের সাধক ছিলেন বলেই বিদ্যাসাগরের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল দাম্পত্য-জীবনের সুখভোগে বঞ্চিত হয়েও, সংসারের সকল কর্তব্য হাসিমুখে পালন করা। জীবনের চারদিকে সহস্র কর্মের আবর্ত রচনা করে, তিনি তাই জীবনের এই অপরিসীম শূন্যতা, এই বেদনা ভুলতে চেয়েছিলেন। তবে এ কথাও এখানে বলা যেতে পারে যে, বিদ্যাসাগরের মতো মানুষদের জীবনে বোধ হয় এই নিয়তির পরিহাস। দিবারাত্র দেশের এবং দশের কাজে লিপ্ত থেকে মুহূর্তের জন্যও নিজের সুখ চিন্তা করবার এঁদের অবসর কোথায়? পত্নীর সযত্ন-রচিত সুখের নীড় এঁদের জন্যে নয়, বসন্তের আবেশ-হিল্লোল এঁদের জীবনকে স্পন্দিত

করে না—এঁরা জীবন-পথের উদাস পথিক, পারিবারিক জীবনের সুখশান্তি এঁরা অনায়াসেই উৎসর্জন করতে পারেন। বিদ্যাসাগরও তাই করেছিলেন, অথবা তাঁর প্রকৃতি তাঁকে দিয়ে তাই করিয়েছিল। স্বামীর এই বসুধৈব কুটুম্বকম্ স্বভাবটি পত্নী দীনময়ী যদি ঠিকমতো বুঝতেন, তাহলে বিদ্যাসাগরের দাম্পত্য-জীবন সুখেরই হতো। দীনময়ী তাই বিদ্যাসাগরের জীবন-সঙ্গিনী হতে পারেন নি, কর্মসঙ্গিনী তো নয়ই।

তারপর বিদ্যাসাগরের মায়ের কথা।

ভগবতী দেবী সত্যিই সুগৃহিণী ছিলেন। এক বিচিত্র উপাদানে গঠিত এই নারীর প্রধান গৌরব এবং গর্ব ছিল যে, তিনি বিদ্যাসাগরের মা। তাঁর পরদুঃখকাতরতা ও পরসেবাপরায়ণতা সুপ্রসিদ্ধ। মায়ের চরিত্রের এই গুণ দুটি সাগর-চরিত্রকে বিশেষভাবেই প্রভাবান্বিত করেছিল। বিদ্যাসাগর তাই বলতেন: "আমি যদি আমার মায়ের গুণরাশির শতাংশের একাংশমাত্র পাইতাম, তাহা হইলে কৃতার্থ হইতাম। আমি এমন মায়ের সন্তান, ইহা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি।" পরসেবা ছিল ভগবতী দেবীর স্বভাবের ধর্ম। বিদ্যাসাগর মায়ের কাছ থেকে কুলপ্রথানুসারী মন্ত্র গ্রহণ করেন নি সত্য, কিন্তু এইটুকু ষোল আনাই নিয়েছিলেন। এই পরসেবায় হাড়ি ডোম মুচি-মেথর, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদ ছিল না। যদি কোন রকমে শুনতে পেলেন কোথাও কোন স্ত্রীলোক কষ্টে আছে, অমনি ভগবতী দেবীর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠতো। এই ব্যাকুলতার একটি কাহিনী এখানে উল্লেখ করব।

"একবার বাড়ির জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ছয়খানি লেপ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী লেপ কয়খানি দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। জননীর নিজের ব্যবহারের জন্য এবং বাটীর অন্য কাহারও কাহারও জন্য সেগুলি আসিয়াছিল। প্রতিবেশিগণের বাড়িতে বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন, তাহারা শীতে বড় ক্লেশ পাইতেছে—এমন শক্তি নাই যে, শীত নিবারণের উপযোগী বস্ত্রাদি ক্রয় করে। সেই জননীসদৃশী গৃহিণী সেই দরিদ্র গৃহস্থকে একখানি লেপ দিয়া, অবশিষ্ট কয়েকখানিও শেষে ঐরূপ নিতান্ত অসচ্ছল ও শীতক্লিষ্ট লোকদিগকে দান করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিলেন: ঈশ্বর! তোমার প্রেরিত লেপ কয়খানি শীতে বিপন্ন

লোকদিগকে দিয়া ফেলিয়াছি, আমাদের ব্যবহারের জন্য লেপ পাঠাইয়া দিবে।"

বিদ্যাসাগরের চরিতকারেরা ভগবতী দেবীর দয়া-দাক্ষিণ্য সম্পর্কে এইরকম অনেক কাহিনীরই উল্লেখ করেছেন।

প্রত্যেক ভাইকে বিদ্যাসাগর মাসহরা দিতেন। মাঝে মাঝে দীনবন্ধু, শম্ভু ও ঈশান জ্যেষ্ঠের ওপর অভিমান করে মাসহরা নিতেন না। ফলে তাঁদেরই কষ্ট হতো। বিদ্যাসাগর যখনই সেই কষ্টের কথা জানতে পারতেন, তখনই বাড়ি গিয়ে গোপনে ভ্রাতৃবধূদের আঁচলে টাকা বেঁধে দিতেন। ঠাকুরদাসের পরিবার এখন আগের মতো তিন-চারিটি প্রাণীর সংসার নয়—একটি বৃহৎ পরিবার বললেই চলে। কালক্রমে বিদ্যাসাগর বুঝলেন, বহুপরিবারের একসঙ্গে বাস নিতান্ত অপ্রীতিকর ও অশান্তিজনক। বীরসিংহে তিনি ভাইদের আলাদা আলাদা খাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এমন কি, নিজের ছেলের জন্যেও পৃথক ব্যবস্থা হলো। এক সংসারে থাকতে গেলে হাঁড়ি ও হেঁসেল নিয়ে অশান্তি নিত্যই হবার সম্ভাবনা, সেই অশান্তি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই বিদ্যাসাগর এই ব্যবস্থা করেছিলেন। ইতিপূর্বে ভগিনী দুটির পৃথক হাড়ি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। যে-সব দরিদ্র ও অসহায় বালক তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল, তাদের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেছিলেন। কিন্তু এত করেও তিনি পারিবারিক শান্তি স্থাপনে সফল-মনোরথ হতে পারেন নি। এই ব্যর্থতার বেদনা আজীবন নীরবে সহ্য করে গেছেন।

এর থেকেই বোঝা যায়, বিদ্যাসাগর একান্নবর্তী পরিবার প্রথার বিরুদ্ধেই ছিলেন। হিন্দুসমাজ গঠনের এই মূলতত্ত্ব সম্পর্কে তার এই বিরোধী মনোভাবকে অনেকেই কটাক্ষ করেছেন। একান্নবর্তী প্রথার একজন বড়ো সমর্থক ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। "একান্নভূত পরিবার প্রথা হিন্দু-সমাজ গঠনে একটি প্রধান অঙ্গ, বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা মানেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়"—এই কথা ভূদেব বলেছিলেন একবার। সম্ভবত এই কারণে এবং বিধবা-বিবাহ ব্যাপারের জন্য ভূদেব ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে চিরকাল একটা প্রবল ব্যবধান ছিল। এই দুই মনীষী তাই কখনো এক কর্মক্ষেত্রে মিলতে পারেন নি।

সরকারী চাকরী ত্যাগ করবার ন বছর বাদে বিদ্যাসাগর তাঁর বড় মেয়ে হেমলতার বিয়ে দিলেন।
মনের মতো জামাই পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। কুলে শীলে ও পাণ্ডিত্যে আদর্শ জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজপতি।
হেমলতাও ছিল খুব বুদ্ধিমতী ও কাজের মেয়ে।
অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন বিদ্যাসাগর।
ভাইদের উন্নতির জন্যে তিনি সব সময়েই অবহিত থাকতেন। তাদের পারিবারিক ভালো-মন্দও দেখতেন।
তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন কোনো ভাইকেই কষ্ট পেতে হয় নি। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, এই ভাইদের কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন সবচেয়ে বড় আঘাত।
মেজভাই দীনবন্ধু তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পর্যন্ত করতে উদ্যত হয়েছিলেন।
এই মামলার উপলক্ষ ছিল তাঁর প্রেস।
একদিন ছেলে এসে বললো, বাবা! মেজখুড়ো ছাপাখানার বখরা চাইছেন। বিদ্যাসাগর শুনে অবাক। ভাইকে ডাকালেন। বললেন—শুনলাম তুমি ছাপাখানার ভাগ চেয়েছ—ভালো তাই হবে। দেনা-পাওনা দেখ, মধ্যস্থ মান। দীনবন্ধু প্রথমে মধ্যস্থ মানতে চাইলেন না। তিনি আদালতের আশ্রয় নিতে উদ্যত হলেন। প্রেস বিদ্যাসাগরের একার সম্পত্তি, সেই সম্পত্তিতে কেউ জোর করে অন্যায় করে ভাগ বসাবে, এ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তবু দীনবন্ধুকে তিনি স্বেচ্ছায় অংশ দিতে রাজী হলেন—এমনই ভ্রাতৃবৎসল মানুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর। পরে অবশ্য ব্যাপারটি সালিশীর দ্বারা নিষ্পত্তি হয়েছিল। সালিশী ছিলেন দুজন—দ্বারকানাথ মিত্র আর দুর্গামোহন দাস। সালিশীদের বিচারে প্রেসের ওপর দীনবন্ধুর সত্ব ও অংশ থাকার দাবী টেকে নি। বাদীর দাবী ডিসমিস হয়। এই অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে কিছুকাল দুই ভাইয়ের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর কর্তব্য করে গেছেন। ভ্রাতৃবধূর আঁচলে সংসার খরচের টাকা বেঁধে দিয়ে বলতেন—মা, এই নাও, দীনোকে বলো না। আমি জানি তোমাদের কষ্ট হচ্ছে, এই টাকায় সংসার খরচ চালাবে। এই ভাইকেই (দীনবন্ধুকে) তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী পর্যন্ত করে দিয়েছিলেন। দীনবন্ধুকে তিনি এতই ভালোবাসতেন।

নিজেকে বহু বিষয়ে বঞ্চিত করেও বিদ্যাসাগর সব সময়েই ভাইদের এবং আত্মীয়-স্বজনের শুভ কামনা করতেন। এর জন্যে তাঁর খরচের অন্ত ছিল না। সকলকেই সাধ্যানুসারে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারে তাঁর সে চেষ্টা নিষ্ফল হতো। তিনি তাই প্রায়ই দীর্ঘশ্বাসে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলতেন—"সন্তুষ্ট কাহাকেও করিতে পারিলাম না। আমার কথামালায় যে বৃদ্ধ ও ঘোটকের গল্প আছে আমি সেই বৃদ্ধ।"

সাংসারিক জীবনে হৃদয়ের মর্মবেদনা প্রকাশের কী সরল ভঙ্গি!

সংসারের বাইরেও অন্য লোকের—নিতান্ত অনাত্মীয়েরও—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবার জন্যে বিদ্যাসাগর সব সময়েই ব্যগ্র থাকতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক চরিতকার লিখেছেন,"সখের জিনিস ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি কখনো তাঁহার মনে স্থান পাইত না। লোককে দিবার সময় ভাল কাপড়, ভাল খাবার, বাজারের বাছা বাছা জিনিস আনিতেন, কিন্তু নিজের বেলায় থান ধুতি, মোটা চাদর, চটি জুতা, সামান্য আহার—এই সকলেই সদা সন্তুষ্ট। তিনি সমগ্র জীবনে যে অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, অন্যের হইলে সে ব্যক্তি বাংলা দেশে ধনবান লোকসমাজে গণনীয় ব্যক্তি হইত, কিন্তু তিনি স্বোপার্জিত ধনরাশি দরিদ্রের সেবায় ব্যয় করিয়া নিজে দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন করিয়াছেন, এবং আমরণ দরিদ্র ব্রাহ্মণের বেশে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন।"

এই বিদ্যসাগর।

এই অনাসক্ত বৈরাগ্যই তাঁর জীবনের বিশেষত্ব।

বীরসিংহের বসত বাড়ি পুড়ে গেল। চিহ্ন পর্যন্ত রইল না; একেবারে ভস্মাবশেষ। বিগ্রহটি পর্যন্ত দগ্ধ-বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। গৃহদাহের খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর কলকাতা থেকে দেশে এলেন। "সেই সময়ে গ্রামের কেহ তাঁহাকে ইষ্টক-নির্মিত্র বাড়ি প্রস্তুত করাইতে অনুরোধ করেন। তিনি স্বাভাবিক হাসিভরা মুখে বলিলেন, 'গরীব বামুনের ছেলের পাকা বাড়ি লোকে শুনলে হাসবে যে। কোন রকমে মাথা রাখিবার একটু স্থান হইলেই হইল'।"

এইবার নতুন করে যে বাড়ি তৈরি হলো তার সমস্ত খরচ বিদ্যাসাগরই বহন করলেন। কলকাতার বাড়ি তখনো করেন নি। তখনো পর্যন্ত তিনি রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেই থাকতেন।

দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্র ও ঈশান—এই তিন সহোদরের কাছ থেকে বিদ্যাসাগর সবচেয়ে যে বড়ো আঘাত পেয়েছিলেন, এইবার সেই কাহিনী সংক্ষেপে উল্লেখ করব। ভাইদের আচরণেই তাঁকে চিরজীবনের মতো দেশত্যাগী হতে হয়েছিল—এর চেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা বিদ্যাসাগরের জীবনের আর একটিও ঘটেনি। এটি তাঁর সরকারী চাকরি ত্যাগের এগার বছর পরের ঘটনা। ক্ষীরপাইয়ের মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ব্রাহ্মণ বিধবাকে বিয়ে করতে চান। তিনি ছিলেন একটি স্কুলের হেডপণ্ডিত এবং ক্ষীরপাইয়ের বিখ্যাত হালদার পরিবারের ভিক্ষাপুত্র। এই বিয়েতে হালদারদের মত ছিল না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি এই বিয়েতে তাঁর সম্মতি দিলেন এবং বীরসিংহেই এই বিয়ের অনুষ্ঠান করতে চাইলেন। পাত্র-পাত্রী বীরসিংহে এলে পরে বিদ্যাসাগরও বিয়ের একদিন আগে কলকাতা থেকে দেশে এলেন। তিনি বীরসিংহে আসামাত্র হালদাররা এবং আরো সব সম্ভ্রান্ত লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে এই বিয়েতে নিরপেক্ষ থাকতে অনুরোধ করলেন। বিদ্যাসাগর সহজে এইভাবে একজনকে সহায়তা থেকে বঞ্চিত করবার মতো লোক ছিলেন না—বিশেষ করে তাঁর জীবনের যা সবচেয়ে পুণ্য ব্রত সেই বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে। কিন্তু যখন দেখলেন, যাঁরা এর আগে একাধিক বিধবাবিবাহের ব্যাপারে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরাই এখন নানা যুক্তি দেখিয়ে মুচিরামের বিয়েতে ঘোরতর আপত্তি তুলছেন। সব শুনে বিদ্যাসাগর বললেন—"এ বিয়ে হবে না ; আপনারা বর-কনে নিয়ে যান। আমি এ বিয়েতে কোনো সংস্রব রাখব না।"

বিদ্যাসাগরের কথা—অচল অটল, এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না জেনেই বিরোধী দল নিশ্চিন্ত মনে চলে গেলেন।

কিন্তু সেই রাত্রেই বিদ্যাসাগরের তিন সহোদর গ্রামের অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে মিলে মুচিরামের বিয়ে দিয়ে দিলেন। কাজটা এমনই গোপনে সমাধা হলো যে, বিদ্যাসাগর এর বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলেন না। সকাল হয়েছে। বারান্দায় বসে বিদ্যাসাগর তামাক খাচ্ছেন। এমন সময়ে কোথায় যেন শাঁখ বেজে উঠল। বিদ্যাসাগর কিছুই বুঝতে পারলেন না। প্রতিবেশী গোপীনাথ সিংহ আসতেই তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—গোপি, শাঁখ বাজে কেন?

—আপনি জানেন না? মুচিরাম পণ্ডিতের যে বিয়ে হয়ে গেল।

—কারা বিয়ে দিলে? গম্ভীর কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করেন বিদ্যাসাগর।

—আজ্ঞে মেজঠাকুর, সেজঠাকুর আর ছোটঠাকুর—এঁরাই তো দাঁড়িয়ে বিয়ে দিলেন।

—কোথায় বিয়ে হলো?

—আজ্ঞে, আপনাদের বাড়ির সামনে ঐ বাড়িটায়।

—হুঁ। রাগে বিদ্যাসাগরের মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। চুপ করে তামাক টানতে লাগলেন। ভেতরে ভেতরে দাবানল জলে উঠলো। এমন সময় ছোট ভাই ঈশান বাড়ি ঢুকছিলেন। বিদ্যাসাগর ডাকলেন—ঈশান।

সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে ঈশানচন্দ্রের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাবার উপক্রম। কাছে এলেন। জ্যেষ্ঠের এমন রুদ্রমূর্তি তিনি এর আগে কখনো দেখেন নি। বিদ্যাসাগর বললেন—আর বাবুরা কোথায়?

ঈশান নিরুত্তর। নতমস্তকে দাঁড়িয়ে।

—সব জানতে পেরেছি আমি। তোরা আমাকে লোকসমাজে মিথ্যাবাদী করে দিলি। এই গ্রামে, আমারই বাড়ির সামনে এই কাণ্ড করলি? আমার সত্যভঙ্গ হলো। এ দেশে আর নয়।

পরের দিন সকালবেলায় অতৃপ্ত ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধচিত্তে চিরদিনের মতো বীরসিংহ গ্রাম ত্যাগ করলেন। যাবার সময়ে ভাইদের ডেকে শুধু বললেন—তোরা আমাকে দেশত্যাগী করালি।

বিদ্যাসাগর আর বীরসিংহে ফেরেন নি। জীবনের শেষ বাইশ বছর তিনি দেশত্যাগী ছিলেন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের প্রবর্তক বিদ্যাসাগরের এই চরম পুরস্কার।

ভগবান বিদ্যাসাগরকে সবই দিয়েছিলেন—খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও সম্পদ; দেননি শুধু সুখময় সংসার-জীবন।

এই ঘটনার পর সংসার-সুখে তিনি কতদূর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন তার কিছু উল্লেখ আছে এই সময়ের কয়েকখানি পত্রে। এই চিঠিগুলি তিনি লিখেছিলেন তাঁর মা, বাবা, স্ত্রী এবং ভাইদের। একই সঙ্গে কর্তব্যজ্ঞান এবং বৈরাগ্যের উদাস ও করুণ রাগিণী এই চিঠিগুলির ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত,

নির্জনতাকাংখী একটি মানুষের হৃদয়ের আকৃতি অভিব্যক্ত হয়েছে ঐগুলিতে। আমার মনে হয় পৃথিবীর পত্র-সাহিত্যেও এমন চিঠি বিরল।

মাকে লিখছেন:

"পূজ্যপাদ শ্রীমন্মাতৃদেবী শ্রীচরণারবিন্দেষু—প্রণতিপূর্বক নিবেদনমিদম্—নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যেও কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই।...এজন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নির্লিপ্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল নিভৃতভাবে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি।...আপনার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত মাস মাস যে ত্রিশ টাকা পাঠাইয়া থাকি, যতদিন শরীর ধারণ করিবেন, কোন কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবেক না।...যদি আমার নিকট থাকা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব।"

বাবাকে লিখলেন:

"পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পিতৃদেব শ্রীচরণারবিন্দেষু—প্রণতিপূর্বক নিবেদনম্—নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যেও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই।...সাংসারিক বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না।...পিতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং আপনার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধ করিয়াছি তাহা বলা যায় না—কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিবেন।...আপনার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহার্থে যাহা প্রেরিত হইয়া থাকে, যতদিন আপনি শরীর ধারণ করিবেন, কোন কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবেক না।"

স্ত্রীকে লিখলেন:

"শুভাশয়ত শ্রীমতী দীনময়ী দেবী কল্যাণনিলয়েষু, শুভাশীর্বাদপূর্বকমাবেদনমিদম্—আমার সাংসারিক সুখভোগের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আর আমার সে বিষয়ে অনুমাত্র স্পৃহা নাই।...এক্ষণে তোমার নিকটে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি এবং বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, যদি কখন কোন দোষ বা অসন্তোষের কার্য করিয়া থাকি, দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবে।"

মধ্যম সহোদর দীনবন্ধুকে লিখলেন :

"এক্ষণে তোমাদের নিকট জন্মের মত বিদায় লইতেছি, যদি কখন কোন দোষ বা অসন্তোষের কার্য করিয়া থাকি, আমাকে ক্ষমা করিবে।...সাংসারিক ব্যয় নির্বাহার্থে আনুকূল্য গ্রহণ অভিমত হইলে তদর্থে মাসে মাসে ১০৲ টাকা পাঠাইতে পারি।"

শম্ভুচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্রকে ঐ একই কথা। প্রত্যেককেই মাসহারা দেবার প্রতিশ্রুতি। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, নিজের পরিবারবর্গ ভিন্ন বীরসিংহ গ্রামের প্রধান ব্যক্তি গদাধর পালকে পর্যন্ত একখানা চিঠি তিনি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে বিদ্যাসাগর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গ্রামের সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও আশীর্বাদ জানিয়ে বিনয়বাক্যে তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে দ্বিধা করেন নি। আর লিখলেন : "সাধারণের হিতার্থে গ্রামে যে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে এবং গ্রামস্থ নিরুপায় লোকদিগের মাস মাস যে কিছু কিছু আনুকূল্য করিয়া থাকি, আমার শক্তি থাকিতে ঐ সকল বিষয় রহিত হইবে না।"

এই চিঠি কয়খানি বিদ্যাসাগর প্রত্যেকের নামে রেজিষ্টারী ডাকযোগে পাঠিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের এই দুঃখের আগুন তাঁর চিতাভস্মে নির্বাপিত হয়।

বিদ্যাসাগর ছেলের বিয়ে দিলেন।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের নায়কের পক্ষে যে ভাবে ছেলের বিয়ে দেওয়া উচিত ঠিক সেই ভাবেই দিলেন। পাত্রী—খানাকুল কৃষ্ণনগরের শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ভবসুন্দরী। বাল-বিধবা, বয়স তেরো বছর। কন্যার মাতা বিধবা মেয়েটিকে নিয়ে প্রথমে বীরসিংহ গ্রামে যান এবং বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্রের কাছে পুনর্বিবাহ দেবার প্রস্তাব করেন। শম্ভুচন্দ্র কলকাতায় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে চিঠি লিখলেন। বিদ্যাসাগর একটি পাত্র ঠিক করে কন্যাকে কলকাতায় আনবার জন্যে ভাইকে চিঠি লিখে দিলেন। ইতিমধ্যে নারায়ণচন্দ্র মেয়েটিকে বিয়ে করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বিদ্যাসাগরের কাছে সে সংবাদ গেল। বড় জামাই গোপালচন্দ্র যখন এই সংবাদ নিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে এসে তাঁর মতের কথা জিজ্ঞাসা করেন,

তখন তিনি জামাতাকে বলেছিলেন—"ইহা অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের বিষয় আমার আর কিছুই হইতে পারে না। তখন আমার মতের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?" বাড়ির সকলেরই অমত, কিন্তু বিদ্যাসাগর পুত্রের এই বিয়েতে সম্পূর্ণ সম্মতি জানালেন এবং পাত্র-পাত্রীকে কলকাতায় পাঠাতে লিখলেন। মির্জাপুরের কালীচরণ ঘোষের বাড়িতে এই বিয়ে হয়েছিল।

বিয়ের চার দিন পরে বিদ্যাসাগর তাঁর সেজ ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে এক চিঠিতে লিখলেন: "২৭শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।...এই বিবাহে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোন মতেই উচিত কার্য হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক। আমি উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া, কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না; ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জল করিয়াছে। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য ব্যাপার।...আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সংকুচিত হইব না।"

বিদ্যাসাগরের দৃঢ়চিত্ততার অন্য পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। "তিনি বিধবা-বিবাহ কিরূপ চক্ষে দেখিতেন এবং তাহার সিদ্ধিকল্পে কতদূর ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, এবং আরো কতটা করিতে পারিতেন তাহার নিখুঁত ছবি এই পত্রের বর্ণে বর্ণে অঙ্কিত রহিয়াছে।"

এখানে উল্লেখযোগ্য যে একমাত্র পুত্রের বিবাহবাসরে দীনময়ী উপস্থিত ছিলেন না। এ বিয়েতে পত্নীর মত নেই অনুমান করেই বিদ্যাসাগর তাঁকে

সংবাদ দিতে দেন নি। স্ত্রী যখন কলকাতায় এলেন, তখন পাছে বধূ ও বনিতার মধ্যে অসদ্ভাব হয় এই আশঙ্কা করে বিদ্যাসাগর ছেলেকে আলাদা বাসা করে দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর সে বাসায় প্রায়ই যেতেন এবং আহারাদি করতেন। এর পর অবশ্য দীনময়ী, পুত্র ও পুত্রবধূ সকলেই অনেকদিন একসঙ্গে বাস করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের এক চরিতকার লিখেছেন: "নারায়ণবাবুর বিবাহের পর সংবাদ পাইয়া তদীয় জননী কলিকাতায় পুত্রবধূকে ক্রোড়ে লইয়া বহু অশ্রুপাত করিয়া বলিয়াছিলে, 'এত সুখে আমাকে বঞ্চিত করিয়া তোদের কি লাভ হইল? বউ নিয়ে আমাকেই ঘর করিতে হইবে।' বলা বাহুল্য তিনি দীর্ঘ জীবনে বধূর প্রতি কখনও স্নেহের অভাব প্রদর্শন করেন নাই।"

পৌত্রের বিয়ের এক মাস পরেই ভগবতী দেবী মারা গেলেন।

ঠাকুরদাস বহুকাল আগে থেকেই কাশীবাস করছিলেন।

আত্মীয়স্বজন সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিদ্যাসাগর যখন একটু শান্ত চিত্তে নির্জনে বাস করছিলেন, সেই সময়ে ভগবতী দেবী কাশীবাসের জন্যে স্বামীর কাছে গেলেন। এক চৈত্র-সংক্রান্তিতে সাধ্বী ও পুণ্যবতী ভগবতীদেবীর সেইখানেই মৃত্যু হয়। "তিনি স্বামী, পুত্র, কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, আত্মীয়স্বজন চারিদিক পরিপূর্ণ ও সুপ্রসন্ন দেখিয়া, কর্তার নিকট পদধূলি চাহিতে চাহিতে ও সকলকে আশীর্বাদ করিতে করিতে লোকলীলা সংবরণ করেন।" কাশীপুরের গঙ্গাতীরের নির্জন বাসভবনে বসে বিদ্যাসাগর মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পেলেন। মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগরের সে মর্মান্তিক বেদনা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মৃত্যুসময়ে মায়ের কাছে থাকতে ও সেবা করতে পান নি বলে তাঁর ক্ষোভের সীমা ছিল না। কাশীপুরের গঙ্গাতীরেই মায়ের শ্রাদ্ধ করলেন।

তারপর? তারপর নিভৃত নিলয়ে কেবল অশ্রু বিসর্জন। কথিত আছে, "ভগবতীদেবীর মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর এক বৎসরকাল সর্বপ্রকার সুখ পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে স্বহস্তে পাক করিয়া একাহার, নিরামিষ ভোজনে দিন যাপন করিতেন। এক বৎসরের জন্য বিনামা, ছত্র ও কোমল শয্যা ত্যাগ করিয়া দীনদুঃখীর ন্যায় কায়ক্লেশে জীবন যাপন করিয়াছেন।"

ঠাকুরদাস কাশীবাসী হবার পর বিদ্যাসাগর প্রায়ই কাশী আসতেন। মৃত্যুর পূর্বে ভগবতীদেবী একবার এই পুণ্যতীর্থ দর্শন করে দেশে ফিরে যান। কথিত আছে, এই কাশীতেই বিদ্যাসাগর একদা কাশীর ব্রাহ্মণদের— "আপনি কি তবে কাশীর বিশ্বেশ্বর মানেন না?"—এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের কাশী বা তোমাদের বিশ্বেশ্বর মানি না।" "তবে কী মানেন?"—ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণদের এই প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর শুধু বলেছিলেন—"আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।"

বিদ্যাসাগরের এই একটি উক্তির মধ্যেই আছে তাঁর অসাধারণ পিতৃ-মাতৃভক্তির পরিচয়। পরবর্তী কালে এই আদর্শকেই বাঙালির সামনে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছিলেন বাংলার আর দুজন মাতৃভক্ত সন্তান—স্যর গুরুদাস ও স্যর আশুতোষ। পিতামাতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি প্রদর্শনের ভেতর দিয়ে বিদ্যাসাগর যে সুমহৎ শিক্ষা রেখে গেছেন, আজকের দিনের প্রত্যেক বাঙালি-সন্তানকে একবার তা স্মরণ করতে বলি।

॥ সাতাশ ॥

মায়ের মৃত্যুর দু'বছর পর বিদ্যাসাগর তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা কুমুদিনীর বিয়ে দিলেন। পাত্র চব্বিশ পরগণার রুদ্রপুর-নিবাসী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইনি পুরুলিয়ার সাব-রেজিস্ট্রার ছিলেন।

কুমুদিনীর বিয়ের সাত মাস পরেই এক নিদারুণ শোক পেলেন বিদ্যাসাগর। দুটি নাবালক পুত্র রেখে বড় জামাই মারা গেলেন। গোপালচন্দ্র সমাজপতি ছিলেন তাঁর শ্বশুরের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। বিদ্যাসাগর তাঁকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। এমন স্নেহাস্পদ জামাতার অকাল মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর বড়ই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। গোপালচন্দ্র যেমন সুপুরুষ, সুশ্রী ও বিদ্বান ছিলেন, তেমনি অমায়িক ও বিনয়ী ছিলেন। কন্যার জীবনে এমন ভাগ্যবিপর্যয় বিদ্যাসাগরকে স্বভাবতই অত্যন্ত কাতর করে তুললো। বিধবার বেশে হেমলতা যখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়াত, বিদ্যাসাগর আর স্থির থাকতে পারতেন না—পিতৃ-হৃদয়ের সে বেদনা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। বিধবা কন্যার মুখের দিকে তাকালে বিদ্যাসাগরের বুক ফেটে যেত। হেমলতা একাদশী করে, বিদ্যাসাগরও একাদশীর দিন অন্নজল গ্রহণ করতেন না। দু'বেলা খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন। মাছ খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন। মেয়ে রাত্রে উপোস করে থাকে, এই চিন্তাতেই তাঁর ক্ষুধাতৃষ্ণা আপনা আপনি লোপ পেয়ে যেত। কিছুদিন পরে মেয়ের বহু সাধ্যসাধনায় বিদ্যাসাগর আহার সম্পর্কে এই কঠোরতা ত্যাগ করেন। "কন্যাকে তিনি গৃহের সর্বময়ী করিয়াছিলেন। কন্যাও কায়মনোবাক্যে পিতৃ-সংসারের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবতী ছিলেন।...বিধবা-কন্যা বিদ্যাসাগরের গৃহে অন্নপূর্ণারূপে বিরাজমান। তাঁহার পুত্র দুইটি বিদ্যাসাগরের স্নেহ-বাৎসল্যে এবং করুণাশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।...

বিদ্যাসাগর মহাশয় দৌহিত্রদ্বয়ের বিদ্যার্জনের পক্ষে কোন ত্রুটি রাখেন নাই... তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে সংস্কৃত শিখাইবার ভার লইয়াছিলেন।"
বিদ্যাসাগরের এই জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র স্বনামধন্য সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। মাতামহের চরিত্রের বহুগুণই তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেছিলেন। পরবর্তী কালে 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সুরেশচন্দ্র বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

এইবার পিতাপুত্রে বিচ্ছেদের কথা বলব।
নানা কারণে বিদ্যাসাগর পুত্রের প্রতি বিরক্ত হন। ক্রমে পিতা-পুত্রের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান রচিত হয়। অবশেষে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ করলেন। স্বামীর প্রতি পত্নী দীনময়ীর বিরূপতার এই ছিল একটি কারণ। কর্তব্যের ত্রুটি বিদ্যাসাগর কখনো সহ্য করতেন না। পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে তিনি এই কারণেই ত্যাগ করেছিলেন। পিতা-পুত্রের দীর্ঘকালব্যাপী বিচ্ছেদের সময়ে, নারায়ণচন্দ্র পিতার মনস্তুষ্টি সাধনের বহু চেষ্টা করেও কৃতকার্য হন নি। জীবনের শেষ বয়সে একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ করা একমাত্র বিদ্যাসাগরের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। পুত্র বারবার ক্ষমা চেয়ে চিঠি লেখেন, বিদ্যাসাগর অচল, অটল। পত্নীর সকাতর নিবেদনও তাঁকে টলাতে পারেনি। কিন্তু কঠিন-প্রকৃতি বিদ্যাসাগর পুত্রের প্রতি বিরূপ থাকলেও পুত্রবধূ, পৌত্র ও পৌত্রীগণের প্রতি চিরদিনই স্নেহসম্পন্ন ছিলেন। মতিমালা, কুন্দমালা, মৃণালিনী, প্যারীমোহন প্রভৃতি নারায়ণচন্দ্রের ছেলে-মেয়েদের সব সময়েই তিনি সংবাদ নিতেন এবং পুত্রবধূ ভবসুন্দরীকে লেখা প্রত্যেকখানি চিঠিতে পৌত্র-পৌত্রীদের উল্লেখ থাকতো। পুত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ হলেও বিদ্যাসাগর পুত্রবধূকে নিয়মিত মাসহারা পাঠাতেন। পৌত্রকেও চিঠি লিখতেন। এক চিঠিতে লিখছেন:
"প্রাণাধিক ভাই প্যারীমোহন, তুমি পত্র লিখতে পারিয়াছ; ইহাতে আমি কত আহ্লাদিত হইয়াছি বলিতে পারিনা। তুমি মন দিয়া লেখাপড়া করিবে তাহা হইলে আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইব।" এইভাবে তাঁর হৃদয়ের গভীর স্নেহের ফল্গুধারা পৌত্র ও পৌত্রীদের উদ্দেশে নিয়ত নীরবে প্রবাহিত হতো। কথিত আছে, স্ত্রী-র অন্তিম সময়ে বিদ্যাসাগর তাঁর পুত্রকে ক্ষমা করেছিলেন, তবে সেবার কোন অধিকার দেন নি।

তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনীর বিয়ে দিলেন।

পাত্র সূর্যকুমার অধিকারী বি. এ.। হেয়ার স্কুলের শিক্ষক।

ছেলের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর বিদ্যাসাগর এই তৃতীয় জামাইকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। জামাইকে তিনি মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত করেছিলেন। জীবনের একটি শেষ কাজ বাকী ছিল—উইল করা। মৃত্যুর ত্ব'বছর আগে বিদ্যাসাগর উইল করলেন।

এই উইলে তিনি পুত্রকে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি থেকে একেবারেই বঞ্চিত করেন, এবং তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করেন নি। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর এই উইল নিয়ে হাইকোর্টে মোকদ্দমা হয়। বিচারে সিদ্ধান্ত হয়, নারায়ণচন্দ্র বঞ্চিত হতে পারেন না। উত্তরকালে তিনি পিতার বিষয়ের অধিকারী হয়েছিলেন। এই উইল বিদ্যাসাগর বাংলায় লিখেছিলেন—অতি সুন্দর মার্জিত বাংলা। উইলের ভাষা দেখে রেজিস্ট্রার পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। উইল লেখার ধরণেও নূতনত্ব ছিল। এ উইল বিদ্যাসাগরের দানশীলতা ও মহৎ-প্রাণতার একখানি স্বচ্ছ দর্পণ। বাংলাদেশে উইলের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের উইল আজো বিখ্যাত।

উইল করার এক বছর পরেই ঠাকুরদাসের মৃত্যু হয়।

মায়ের মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর আর কাশী যাননি। ঠাকুরদাস তাই বিদ্যা-সাগরকে একটিবার একদিনের জন্যে কাশী আসতে অনুরোধ করে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তখন তাঁর বয়স বিরাশী বছর। বৃদ্ধ পিতার অনুরোধ বিদ্যাসাগর উপেক্ষা করতে পারলেন না। কাশী এলেন। কয়েকদিন তাঁর কাছে থেকে সেবা-শুশ্রূষা করে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। তিন মাস বাদে ঠাকুরদাস আবার পীড়িত হলেন। তাঁর অন্তিম সময় বুঝতে পেরে সকল পুত্রই একে একে পিতার শয্যাপার্শ্বে এসে উপস্থিত হলেন। বিদ্যাসাগরও এলেন। তারপর এক বৈশাখের প্রথম দিনে, "সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুরদাস দুঃখ-কষ্টময় সংসারভার উপযুক্ত পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের হস্তে রাখিয়া পরিজন ও পুত্রগণের ক্রোড়ে দেহ ত্যাগ করিলেন।" কথিত আছে, পিতৃবিয়োগে বিদ্যাসাগর পাঁচ বছরের ছেলের মতো কেঁদেছিলেন। তারপর চারভাই মিলে মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে পিতার মৃতদেহ বহন করে নিয়ে গেলেন। পিতার আদেশ ছিল, তাই কাশীতেই তিনি তাঁর শ্রাদ্ধাদি করেন।

পিতার মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর যে অপরিসীম শূন্যতা বোধ করেছিলেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। কেননা, কলকাতার ছাত্রজীবনে তিনি এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, ধর্মনিষ্ঠ মানুষটির মধ্যেই একাধারে পিতা ও মাতাকে পেয়েছিলেন। অতীতের সেইসব কথা স্মরণ করে তিনি নির্জনে অশ্রুমোচন করতেন। যে বছরে বৈশাখে পিতার মৃত্যু হয় সেই বছরের শেষভাগে তাঁর কলকাতার বাদুড়বাগানের বাড়ি সম্পূর্ণ হয়। বহুব্যয়ে বিদ্যাসাগর এই বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। বাগানের সখ বিদ্যাসাগরের চিরকাল। এই নতুন বাড়িতেই একটি সুন্দর ফুলের বাগান ছিল। লাইব্রেরির সখ আরো বেশী। তাই "স্বকৃত নূতন বাড়িতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের পরম প্রিয় পুস্তকালয়-টিকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া মনের দীর্ঘকালস্থায়ী দুঃখ দূর করিলেন।" জীবনের শেষ পনর বছর বিদ্যাসাগরের এই খানেই অতিবাহিত হয়। জ্ঞানচর্চা আর শাস্ত্রপাঠ—এই ভাবেই তাঁর অবসর সময় যাপিত হতো। মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন।

বাদুরবাগানের বাড়িতেই কনিষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারীর বিয়ে হয়। পাত্র—কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মেয়ে-জামাইকে তিনি বাড়িতেই রেখেছিলেন।

জামাই ও মেয়েদের বিদ্যাসাগর বড় ভালবাসতেন। এই ছিল তাঁর শেষ জীবনের সুখ। কথিত আছে, "এক এক দিন সন্ধ্যার সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বসিবার ঘরে পরিবারস্থ সকলে মিলিত হইতেন। কন্যারা এক এক কোণে এক একজন দাঁড়াইতেন, দৌহিত্রগুলি কেহ দক্ষিণে, কেহ বা বামে, কেহ বা সম্মুখে কেহ বা পশ্চাতে দাঁড়াইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় সকলকে লইয়া গল্প করিতেন। ...বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাকে উহাকে উপহার দিবার জন্য নূতন সিকি, দুয়ানি, আধুলি ও টাকা সর্বদাই নিকটে রাখিতেন।" আজ, সুদূর কালের ব্যবধানে, বাদুড় বাগানের সেই শান্ত নির্জন বাড়িতে সন্ধ্যাকালে দৌহিত্র ও দৌহিত্রীদের সঙ্গে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই নিঃসঙ্কোচ মেলামেশার ছবিখানি আমাদের মানসপটে যখন উদিত হয়, তখন বুঝতে পারি এই মানুষটি কত সহজ, সরল এবং সুন্দর।

তবু বিদ্যাসাগর কলকাতায় বেশী দিন থাকতে পারতেন না। শোকতাপের দুরন্ত আঘাতে মন অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। শরীর রোগে জীর্ণ। দুর্জয় বীর বিদ্যাসাগর ক্রমেই যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। যখনই সংসার-কোলাহল ভীষণ বোধ হতো, তিনি কখনো কার্মাটারে, কখনো বা চন্দননগরে গিয়ে বাস করতেন।

আরো বারো বছর অতিক্রান্ত হলো।

পত্নী দীনময়ী দুরারোগ্য রক্ত-অতিসার রোগে শয্যাশায়ী হলেন।

তারপর একদিন ভাদ্রের প্রথম সন্ধ্যায় তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করলেন।

স্ত্রীর জন্যে জীবনে তিনি অনেক অশান্তি ভোগ করেছেন—আজ কিন্তু বিদ্যাসাগরের অন্য মূর্তি। হৃদয়ের সমস্ত প্রেম তিনি যেন উজার করে ঢেলে দিলেন মৃত্যুপথ-যাত্রী পত্নীর উদ্দেশে। মৃত্যুর কিছুপূর্বে দীনময়ী পুত্রের জন্য করুণা ভিক্ষা করলেন স্বামীর কাছে। কন্যা হেমলতা পিতাকে খবর দিলে পরে বিদ্যাসাগর শান্তভাবে বললেন—তাই হবে। ত্যাজ্য পুত্রের জন্য স্বামীর সঙ্গে জীবনে তিনি অনেক বাদ-বিসংবাদ করেছিলেন, অনেক সময়ে গোপনে পুত্রকে অর্থসাহায্য করেছেন, নিজের গহনা পর্যন্ত বাঁধা দিয়ে তিনি এ কাজ করেছেন। এজন্যে বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে স্ত্রীর মাসহরা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দুর্জয় অভিমানে তিনি স্বামীর কাছে হাত পাতেন নি। অতীতের সেই সব স্মৃতি বঞ্চিত ব্যথিত সাগর-হৃদয়ে আজ যেন উদ্বেল হয়ে উঠলো—জেগে উঠলো মনের মধ্যে দাম্পত্য সুখাভাবের নিদারুণ স্মৃতি। তেজস্বী বিদ্যাসাগরের হৃদয়ও আজ যেন অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তপ্ত অশ্রুতে তিনি পত্নীর তর্পণ করলেন।

পত্নী-বিয়োগে বিদ্যাসাগর ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়লেন।

শোক-জর্জরিত অবস্থায় আরো দুটি বছর অতিক্রান্ত হলো।

দীর্ঘকাল ধরেই পেটের অসুখে তিনি ভুগছিলেন। সেই অসুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলো। গুরুপাক খাদ্য আর সহ্য হয় না—আহার বলতে এখন শুধু বালি আর পালো। ডাক্তার এসে কিছুদিন নির্জনে থাকবার পরামর্শ দিলেন। বিদ্যাসাগর এলেন চন্দননগরে। সঙ্গে ভাই শম্ভুচন্দ্র, পুত্র নারায়ণচন্দ্র, দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র, আর কন্যা হেমলতা। গঙ্গার তীরে একটি সুন্দর স্বাস্থ্যপ্রদ

দোতলা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হলো। এখন চন্দননগর কলেজ যে বাড়িতে আছে, বিদ্যাসাগর ঐ বাড়িতেই ছিলেন। এই স্থানান্তরের ফলে বিদ্যাসাগর একটু সুস্থ বোধ করলেন, কিন্তু রোগ সারল না। যখন বুঝলেন আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নেই, তখন চার মাস বাদে, বিদ্যাসাগর কলকাতায় ফিরলেন। কন্যা হেমলতা পিতার আরোগ্যের জন্যে প্রায় হাজার টাকা খরচ করে স্বস্ত্যয়ন করালেন।

নতুন বছর এলো। বিদ্যাসাগরের জীবনে শেষ নতুন বছর।

একে একে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় অতিক্রান্ত।

এলো শ্রাবণ মাস। বিদ্যাসাগর বুঝলেন অন্তিম সময় আসন্ন।

চিকিৎসার ত্রুটি নেই। পাঁচজন বিখ্যাত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আছেন—তিনজন বাঙালি, দুজন সাহেব ডাক্তার। তাঁদের মধ্যে মহেন্দ্রলাল সরকার একজন। চিকিৎসকেরা, আসেন, দেখেন, চলে যান। এঁদের মধ্যে একজন—ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু—শুধু দিবারাত্র বিদ্যাসাগরের রোগ শয্যাপার্শ্বে বসে থাকতেন, শুশ্রূষা করতেন, প্রতি মুহূর্তে রোগের গতি নিরীক্ষণ করতেন। ভাই, ছেলে, মেয়ে—সবাই বিষাদপূর্ণ মুখে রোগীর কাছে বসে।

পেটের মধ্যে ক্যানসার—দুরারোগ্য ব্যাধি।

মৃত্যুপথযাত্রী বিদ্যাসাগর, তবু কী তীব্র ছিল তাঁর মর্মানুভূতি। তারই একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করব। মৃত্যুর কিছুদিন আগে হাইকোর্টের উকীল শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত পীড়িত দেখে তিনি তাঁকে বললেন, শুনেছি কারমাটারে আপনার শরীর ভাল থাকে। সেখানে তো আপনার বাড়ি আছে, আপনি সেখানে কিছুদিন থাকলে আপনার শরীর শোধরাতে পারে।

—সেখানে থাকবার মত আমার অর্থ নাই, বিদ্যাসাগর বললেন।

—সে কি কথা? আশ্চর্য হয়ে বলেন শিববাবু।—সেখানে আপনার ব্যয়বাহুল্য হবার তো কোনো কারণ দেখি না।

এই কথায় বিদ্যাসাগর কেঁদে ফেললেন। অশ্রু-নিরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "সে জায়গায় অসংখ্য সাঁওতালের বাস,—তাহাদের এক একজন প্রতিবেলায় একসের চালের ভাত খাইতে পারে,—এমন দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে যে, তাহারা এক ছটাক ভাতও সারা দিনে পায় না। শিব বাবু, আমি শত শত সাঁওতালের

অনশনক্লিষ্ট মুখ ও তাহাদিগকে আর্ত ও অভুক্ত দেখিয়া এই ক্ষুৎপিপাসুদের সম্মুখে নিজে কিরূপে ভাত খাইব? এত অর্থ কোথায় পাইব, যাহাতে তাহাদের দুঃখ নিরসন করিব? আমি কোন প্রাণে সেখানে যাইব?"
এই বলে মুমূর্ষু বিদ্যাসাগর কাঁদতে লাগলেন।
এই তপ্ত অশ্রু-প্রবাহের মধ্যেই খুঁজে পাই প্রাণবন্ত সেই মানুষটিকে। এই মর্মানুভূতি, এই সহৃদয়তা, এই পরদুঃখকাতরতা সেদিনও যেমন বিরল ছিল, আজো তেমনি বিরল।

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে একদিন স্যর গুরুদাস এলেন বিদ্যাসাগরকে দেখতে। অসুস্থ বিদ্যাসাগরকে দেখতে তিনি প্রায়ই আসতেন। কিন্তু আজ তিনি এসেছেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। এসেছেন বিদ্যাসাগরের বড় মেয়ে হেমলতার বিশেষ অনুরোধে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুরোধ। আগেই বলেছি, বিদ্যাসাগর তাঁর একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে ত্যাগ করেছিলেন এবং ছেলেকে বিষয়-সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করেছিলেন। উইলও সেই মর্মে সম্পাদিত হয়েছিল। হেমলতা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। বোনেদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করলেন এবং তাদের বোঝালেন যে, বাবার বিষয়-সম্পত্তি সবই দাদার প্রাপ্য। বাবা ছেলেকে বঞ্চিত করে মেয়েদের সব দেবেন, এ ঠিক নয়। বাবা বেঁচে থাকতেই এই মর্মন্তুদ বিষয়টির যাতে নিষ্পত্তি হয় সেই জন্যে হেমলতা একদিন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি জানতেন যে একমাত্র গুরুদাস বাবুর অনুরোধ বিদ্যাসাগর ফেলতে পারবেন না। কারণ গুরুদাসের সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়বোধ তাঁকে বিদ্যাসাগরের প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল। মেয়েদের সেই অনুরোধ নিয়েই গুরুদাস আজ এসেছেন।
—এসো গুরুদাস, এই বলে বিদ্যাসাগর তাঁকে রোগশয্যা থেকেই অভ্যর্থনা করলেন। গুরুদাস বাবু অন্যান্য কথার পর নারায়ণচন্দ্রের প্রসঙ্গটা তুললেন। বিদ্যাসাগর একটু অবাক হলেন। গুরুদাস বাবুর সব কথা শুনলেন তিনি। বিচক্ষণ বিচারপতি গুরুদাস অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রসঙ্গটির অবতারণা করলেন এবং শেষে বললেন, এক্ষেত্রে নারায়ণকে আপনার ক্ষমা করাই উচিত। তাঁর সাংসারিক ব্যাপারে বাইরের কেউ মধ্যস্থতা করে, বিদ্যাসাগরের কাছে তা অসহ্য। কিন্তু গুরুদাস বাবুর কথা স্বতন্ত্র। বয়সে চব্বিশ

বছরের ছোট হলেও—গুরুদাস বাবুকে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং স্নেহের মধ্যে একটু শ্রদ্ধার ভাবও ছিল। এই শ্রদ্ধার হেতু গুরুদাসের অসামান্য মাতৃভক্তি আর তাঁর চারিত্রিক নিষ্ঠা। যেমন আইনজ্ঞ, তেমনি ধর্মনিষ্ঠ তিনি। গুরুদাসের সততা নিরপেক্ষতা ও ধর্মনিষ্ঠ আচরণের জন্যে বিদ্যাসাগর তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। তাই তাঁর কথা তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। বললেন, গুরুদাস, তুমি যখন বলছ, তখন আমি নারায়ণকে ক্ষমা করলাম। তবে একটি শর্ত আছে। সে আমার মুখাগ্নি করতে পারবে না।

বিদ্যাসাগরের প্রকৃতি তাঁর জানা ছিল, তাই গুরুদাস বাবু আর বেশী পীড়াপীড়ি করলেন না।

দ্বারান্তরালে দাঁড়িয়ে হেমলতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

আর একদিন। গুরুদাস বাবু আসতেই বিদ্যাসাগর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, —আচ্ছা গুরুদাস, তুমি তো গীতা পড়েছ। গীতার শিক্ষা কি?

—যা দিয়ে মানুষের শরীর, মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয় সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা। গীতা আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছে। বললেন গুরুদাস।

—ঠিক বলেছ। এই শিক্ষা সর্বকালের। বোধ করি সকল ধর্মেরও।

মৃত্যুপথযাত্রী বিদ্যাসাগরের মুখে আজ এই প্রসঙ্গ শুনে গুরুদাস খুবই বিস্মিত হলেন। কারণ, ধর্ম ও ভগবানের বিষয় বিদ্যাসাগর খুব কমই আলোচনা করতেন। সে অবসরও তাঁর ছিল না, জীবনের শেষ বয়সেও না। এই ঘটনার উল্লেখ করে পরবর্তী কালে স্যর গুরুদাস তাঁর 'স্মৃতি-কথায়' লিখেছিলেন—"সেদিন আমার সত্যই মনে হইয়াছিল যে, সকল কর্মের ফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে লোকসেবা করা—গীতার এই আদর্শেরই মূর্ত বিগ্রহ বিদ্যাসাগর মহাশয়।"

সাগর-চরিত্র বিশ্লেষণ করলে পরে স্যর গুরুদাসের এই উক্তি যথার্থ বলেই মনে হয়। মনে হয়, কঠিন সত্যের সাধনায় বিদ্যাসাগরের জীবন চিরকালের মতো জয়যুক্ত। সে-জীবনের মৃত্যু নেই।

রোগের উপশম হয় না।

কোন দিন একটু ভালো, কোনো দিন একটু মন্দ। এ্যালোপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথ দু'রকম চিকিৎসাই চলে। আহার একেবারেই বন্ধ—কেবল মাত্র গাধার দুধ। দিন দিন রোগে ম্লান ও ক্ষীণ হতে লাগলেন। শ্রাবণের প্রথমেই বিদ্যাসাগর একেবারে শয্যাশায়ী হলেন। বিখ্যাত কবিরাজ ব্রজেন্দ্র-কুমার সেন এলেন, বিজয়রত্ন সেন এলেন। গায়ে প্রবল উত্তাপ—১০৬ ডিগ্রি টেম্পারেচার। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের স্থিরতা নেই। জ্বর ও যন্ত্রণার জ্বালায় শরীর একেবারে অবসন্ন। শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহ যায়। ডাক্তার সাল্‌জার রোগীর অবস্থা দেখে আশঙ্কিত হলেন। ক্রমে রোগ বৃদ্ধি পেলো। বিরাট পুরুষ বিদ্যাসাগর নীরবে রোগের যন্ত্রণা সহ্য করেন। মুখে মৃত্যুর ছায়া অথচ সে মুখের ভাব এতটুকু বিকৃত নয়। দৃষ্টি নিবদ্ধ শুধু বাপ-মায়ের ছবি দুখানির দিকে। মায়ের কাশী যাবার প্রাক্কালে বহু অর্থব্যয়ে তিনি এই তৈল চিত্র-খানি তৈরী করিয়েছিলেন। অনেক টাকা খরচ করে বিদ্যাসাগর তাঁর পিতামাতার উৎকৃষ্ট চিত্র প্রস্তুত করিয়েছিলেন। তাঁরা লোকান্তরিত হবার পর অনেক সময় সেই প্রতিকৃতির সামনে বসে তিনি অশ্রুপাত করতেন। পরমভক্ত পুরুষসিংহ এইভাবে পিতামাতার স্নেহ ও প্রীতির ধ্যানে নিবিষ্ট থাকতেন এবং এইভাবেই পবিত্র শোকাশ্রুতে তাঁদের পরলোকগত আত্মার সন্তর্পণ করতেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত বিদ্যাসাগর পরলোকের চিন্তায় কিছুমাত্র ব্যাকুল না হয়ে শুধু নিস্পন্দ নয়নে বাকশূন্য অবস্থায় তাকিয়ে আছেন তাঁর চিরআরাধ্য জনক-জননীর ছবির দিকে।

সমগ্র জীবন সুকঠোর সংগ্রাম করে, সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে, দীন দরিদ্র আতুর অনাথার দুঃখমোচন করে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলকে অপরিমেয় স্নেহে অভিষিক্ত করে, "আপন পুষ্পকোমল এবং বজ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন" করে, "আপন আত্মনির্ভর উন্নত-বলিষ্ঠ চরিত্রের মহান আদর্শ বাঙালি জাতির মনে" চিরদিনের মতো এঁকে দিয়ে, ১৩ই শ্রাবণের গভীর রাত্রে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বিদ্যাসাগর।

শ্রাবণের সেই দ্বিপ্রহরা রজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল একটি বিরাট জীবনের স্পন্দন।

অন্তিমে বিদ্যাসাগর
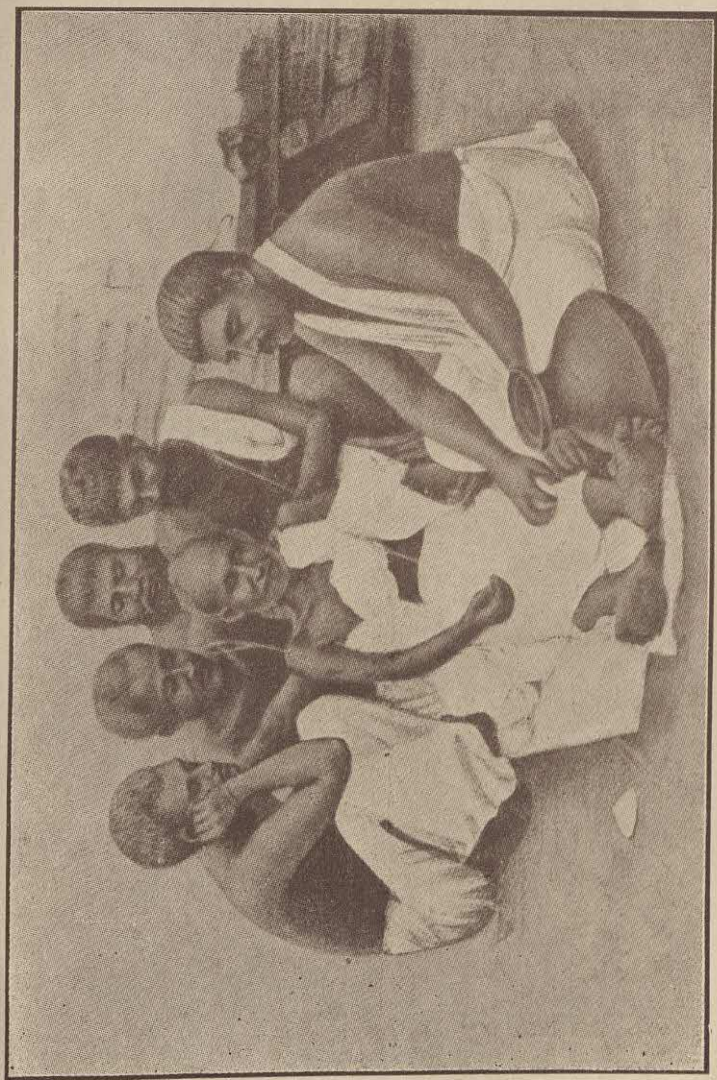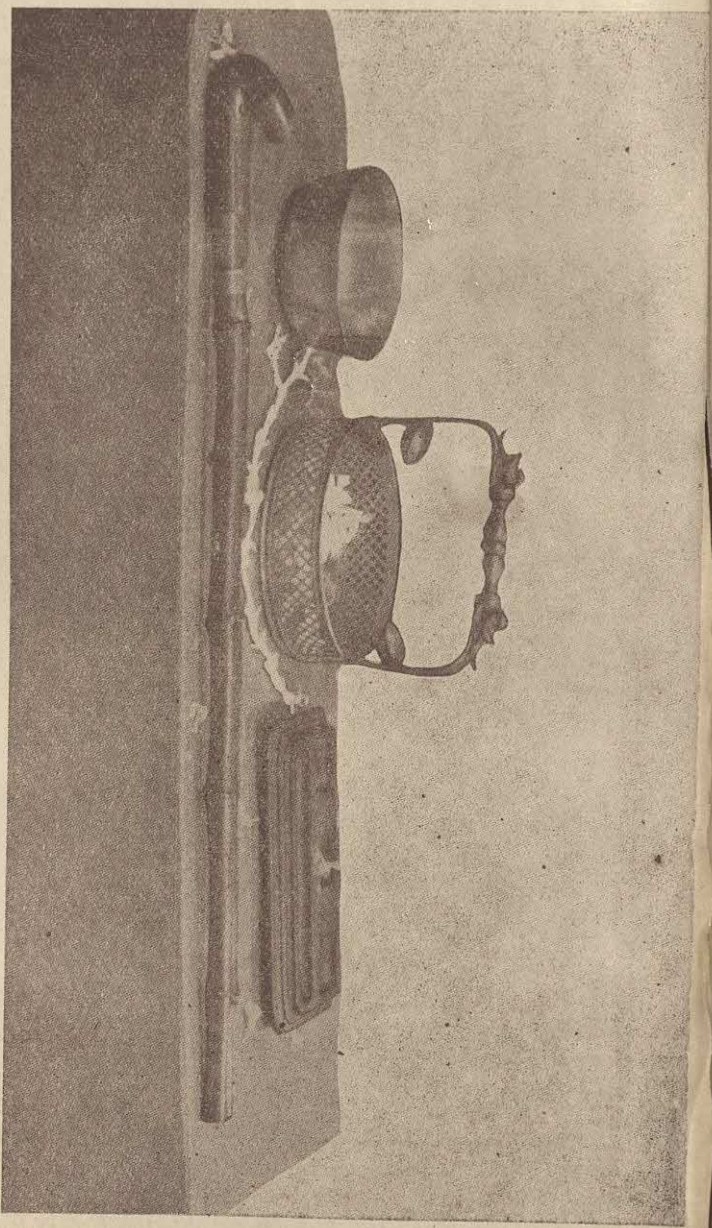
বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত লাঠি, দোয়াতদান, মুড়ি খাবার বাটি ও
দীনময়ী দেবীর ফুলের সাজি

॥ আটাশ ॥

কোনো কোনো দেশে কোনো কোনো কালে কদাচিৎ এমন একজন অ-সাধারণ সাধারণ মানুষের আবির্ভাব হয় যার ভেতর দিয়ে সমাজের মঙ্গলচেতনা নানা দিকে উৎসারিত হবার পথ খুঁজে বেড়ায়। এঁদের বলা চলে যুগমূর্তি। বিশেষ যুগের সমগ্র রূপটি যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে এঁদের ব্যক্তিত্বে, এঁদের চিন্তায়, এঁদের কর্মে। এই বিরল মানবের একজন এবং অনেক বিষয়ে প্রধান একজন ছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর আবির্ভাবকে অনেকেই একটা বিস্ময়কর ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় না। ইতিহাসের গতি রৈখিক নয়, চক্রাকার। তাই এর পুনরাবৃত্তি ঘটে উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের পেছনে ইতিহাসের এই নিয়মই অলক্ষ্যে কাজ করেছে। তাই প্রায় অর্ধ শতাব্দীকালের ব্যবধানে রামমোহনের পরেই বিদ্যাসাগরের জন্ম সম্ভব হয়েছিল। তাঁর মধ্যে অজেয় দৃপ্ত পৌরুষ ও অপরিমেয় করুণার যে সমন্বয় দেখি, সাধারণতঃ তাই আমাদের হৃদয়কে শ্রদ্ধায় অভিভূত করে। তাঁর যে বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টা সাহিত্য, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা তো বাংলার সমাজ-জীবনের ইতিহাসেরই ঊর্ধ্বমুখী গতি। বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল এই গতিরই একটা প্রচণ্ড প্রকাশ।

বিদ্যাসাগরের চরিত্র বিশ্লেষণ করবার আগে প্রসঙ্গত রামমোহন-বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একটু তুলনামূলক আলোচনা করব। বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বুঝবার পক্ষে এই আলোচনা অপরিহার্য। জড়তা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে রামমোহন বিদ্রোহ করেছিলেন। বিদ্রোহ করেছিলেন তাঁর মনন ও বিচারশক্তি নিয়ে, সংগ্রাম করেছিলেন মানবহিতবাদের দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়িয়ে।

তিনি আহ্বান করেছিলেন নবজাগরণকে। রামমোহনই আধুনিক ভারতে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন জ্ঞানের পথ, স্বাধীনচিত্ততার পথ, আত্মপ্রসারণের পথ। সকল দিক দিয়েই রামমোহন নবযুগের সার্থবাহ, তাঁরই সাধনায় ভারতবর্ষের জীবন এক নতুন গরিমা লাভ করেছিল। এদেশের সমাজে বিপ্লবের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস তিনিই মুক্ত করে দিয়েছিলেন, অথচ ভারতবর্ষের যা সত্যকার ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনা তাকে ধূলিসাৎ করে বিদেশের নববিধানকে ও নবসংহিতাকে তিনি স্বীকার ও গ্রহণ করেন নি। রামমোহনের চিত্ত ইতিহাস-চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল বলেই ভারতবর্ষের অতীত সমস্ত জ্ঞান ও সাধনাকে পরিহার করা তাঁর ঐতিহ্যবাদী মনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কালের অনেক জড়ভার হিন্দুসমাজ ও শাস্ত্রের মধ্যে জমেছে, একথা যেমন তাঁর মত আর কেউ উপলব্ধি করে নি, ভারতবর্ষের চিরপ্রবহমান মননধারা ও তার চিরসাধনার বস্তুর প্রতি এত গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের প্রমাণও তাঁর মত আর কে দিতে পেরেছে? নিরর্থক অনুষ্ঠান, নিশ্চল আচার আর মননহীন লোকব্যবহার—প্রধানতঃ এরই বিরুদ্ধে রামমোহন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তির স্বাধীনতা ও বিচারশীলতা রামমোহনের কাম্য ছিল।

বিদ্যাসাগরও তাই। রামমোহন যার সূচনা ঘটিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর তাকে পরিণতির পথে অনেকখানি নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই প্রখর যুক্তিপন্থী মন—সেই আপোষহীন বিদ্রোহী মনোভাব। যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর বহু বিষয়েই যুক্তিবাদী রামমোহনকেই অনুসরণ করেছিলেন। রামমোহনের মত বিদ্যাসাগরও অলৌকিক ও অভ্রান্ত শাস্ত্রকে দৈবলোক হতে বিচ্যুত করে তাকে যুক্তি ও বিচারের বিষয়ীভূত করেছিলেন, অথচ রামমোহনের মত বিদ্যাসাগরও কখনো তাঁর ঐতিহাসিকবোধকে বিসর্জন দেন নি। রামমোহনের মতই বিদ্যাসাগরের মন সত্যসন্ধিৎসু, তাঁর অনুভূতি সুতীক্ষ্ণ। রামমোহনের মত বিদ্যাসাগরও জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা। জাতীয়তা, বিশ্বমানবতা, অক্ষুণ্ণ মানবপ্রীতি রামমোহনে যেমন, বিদ্যাসাগরেও তেমনি। তবে রামমোহনের চিত্ত যেমন একটা বিশাল বিশ্বব্যাপক ক্ষেত্রে বিচরণ করত, বিশ্বের সকল মানুষকেই রামমোহন যেমন একসূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর ততখানি অগ্রসর হতে

পারেন নি। দুজনেরই জীবনদর্শনের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য এবং দেশবাসীর উপর দুজনেরই সমান প্রভাব। আধ্যাত্মিকতা ছিল রামমোহনের জীবনের মূল ভিত্তি, বিদ্যাসাগরের জীবন দাঁড়িয়ে আছে একান্তভাবে মানবপ্রীতির উপর। ধর্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে রামমোহন যা চেয়েছিলেন, বিদ্যাসাগরও তাই চেয়েছেন—মনের মুক্তি, প্রাণহীন আচারপরায়ণতার পরিবর্তে স্বাধীন চিন্তা, মনন ও উপলব্ধি; সমাজে ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযান ও রাষ্ট্রে সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতা লাভের সাধনা। সাম্যবাদ ও লোকশ্রেয়বাদ উভয় যুগমানবেরই জীবনের মূল সুর। দুজনেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বদেশের মহা কল্যাণ সাধন করে গেছেন। রামমোহনের কর্মের পরিধি ছিল বিস্তীর্ণ—ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতি; বিদ্যাসাগরের কর্মের পরিধিও কম বিস্তীর্ণ নয়—সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্য। দুজনেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে উচ্চতম আদর্শ নিয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। দুজনেই এদেশের চিত্তকে আত্মসঙ্কোচন হতে মুক্ত করে আত্মপ্রসারণের ক্ষেত্রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। মোট কথা, বাঙালির মানস-চেতনার উদ্বোধনে রামমোহনের পাশেই বিদ্যাসাগরের স্থান।

জীবনের প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল নানাভাবে মাতৃভূমির সেবা করে, লোকহিতকর বহু কর্তব্য সমাধান করে, বীরসিংহের দরিদ্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বিদ্যাসাগর ইহলোক ত্যাগ করলেন। স্বল্পজীবি বাঙালির পরমায়ুর হিসাবে পরিণত বয়সেই তাঁর মৃত্যু হলো। তারপরেও অর্ধ শতাব্দীকালের অধিক অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

আজকের নতুন কালের পরিপ্রেক্ষিতেও যাচাই করে দেখি বিদ্যাসাগর খাঁটি সোনা। আজো দেখি সমস্ত বাংলাদেশের বিপুলতম অন্তঃকরণ যা ছিল, তাঁরই ছিল। সে হৃদয় ছিল অপরাজিত মহাবলী, প্রকৃত মানুষের হৃদয়। পাণ্ডিত্য এবং মানবিকতাবোধ—এই দুই দিকেই ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন সাগরের মতো সীমাহীন এবং অতলস্পর্শী। এই দুটি গুণই ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের এমন যোগাযোগ অতি বিরল। সত্যের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ তাঁর কঠিন কঠোর চরিত্রকে যে মাহাত্ম্য দান করেছে, সেই মাহাত্ম্য আজো অম্লান। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলার ইতিহাসে একটি বড়

নাম—শ্রদ্ধার এবং শ্লাঘার নাম। তাঁর সমকালবর্তী মনীষী বাঙালির মণ্ডলে এই বিশেষত্বে তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

আমাদের যদি মানুষ হতে হয়, তবে মনুষ্যত্বের সাধক বিদ্যাসাগরের আদর্শই গ্রহণ করতে হবে।

বিদ্যাসাগরের পবিত্র চরিত্র বাঙালির—শুধু বাঙালির নয়—ভারতবাসীর আদর্শস্থল। সে-চরিত্র যেন আলোকস্তম্ভ স্বরূপ। তাকে তাই একদিক দিয়ে দেখলে চলবে না, তাকে দেখতে হবে, বুঝতে হবে নানাদিক থেকে।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে শুচিতাই তাঁর আদর্শ ছিল, অথচ তিনি শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন না কোনো দিন।

ধর্ম ও নীতির অনুশাসনের গণ্ডী অতিক্রম করেও বিদ্যাসাগর চিরদিন জীবনের শুচিতা রক্ষা করে গিয়েছেন। ভাঙনের যুগে অবতীর্ণ হয়েও বাঙালিত্বের অজেয় দুর্গে বাঙালির ধর্ম, বাঙালির সংস্কার, বাঙালির ভাব অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করেছিলেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে, আচারে ব্যবহারে, সত্যই ছিল তাঁর নিয়ামক। বিদ্যাসাগরের মতো এমন সত্যনিষ্ঠ মানবপ্রেমিক উনবিংশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না। সত্যের প্রতি অসীম অনুরাগই তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ কথা। কে বলেছিল তাঁকে বিধবা-বিবাহ প্রচারের চেষ্টা করতে? জলের মতো অর্থব্যয় হলো, ব্রাহ্মণসমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা নষ্ট হলো, তবু এই সংস্কার-উদ্যমে কে তাঁকে সর্বস্বান্ত হতে উপদেশ ও প্রেরণা দিয়েছিল? এর একমাত্র উত্তর—সত্যের তাড়না। মহাপুরুষদের হৃদয়ে যখন সত্যের উপলব্ধি বদ্ধমূল হয়, তখন তা শুধু প্রেরণা দেয় না—রীতিমতো তাড়না করে। সত্যের চেয়ে বড় কিছু নেই—বিদ্যাসাগর এই কথা সিংহ-বিক্রমে ঘোষণা করলেন। কে তাঁকে বলেছিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সামান্য মতভেদ-উপলক্ষে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের একটা উচ্চপদে ইস্তফা দিতে? তখনকার দিনে একজন টুলো ব্রাহ্মণের পক্ষে তা কি কম গৌরবের সামগ্রী? কিন্তু ভ্রূক্ষেপে মনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, বিদ্যাসাগর কাজটা ছেড়ে দিয়ে নিঃস্ব হলেন। সত্যের মর্যাদা-রক্ষার জন্য তাঁর কোনো বিপদই ছিল না, যা অসহনীয়—কোনো কাজই ছিল না, যা অসাধ্য। সত্যাশ্রয়ী বিদ্যাসাগরের তুলনা বিদ্যাসাগর। সত্যানুরক্তিতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মেলা ভার।

বিনয়, মিষ্টভাষিতা, অকপটতা, স্নেহ, প্রেম, তেজ, বীর্য তাঁর চরিত্রের ভূষণ ছিল। মূর্তিমান সহিষ্ণুতা বিদ্যাসাগর, আবার অন্যদিকে প্রতিজ্ঞায় অটল, স্বীয় সংস্কারে অচল, সত্যের প্রতিষ্ঠায় অজেয়। বিদ্যাসাগরের চিত্ত, ভবভূতির ভাষায়, কুসুমের মতো মৃদু ছিল ; কিন্তু প্রয়োজনে তিনি বজ্রের মত কঠোর হতেন। শত প্রলোভন, সহস্র অনুরোধ, সাধ্য সাধনায় তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হতেন না। একদিকে তাঁর প্রকৃতি যেমন বলিষ্ঠ ছিল, অন্যদিকে তাঁর স্বভাবও ছিল তেমনি সরল ও কোমল। এই গুণেই বিদ্যাসাগর শত্রু-মিত্র সকলেরই প্রশংসা-ভাজন ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বাক্যনিষ্ঠা যেন সাধনার বস্তু ছিল।

ওজন করে তিনি কথা বলতেন। নিজের মহত্ত্বে উদাসীন, নিজের মহিমায় অন্ধ, বিদ্যাসাগর আন্তরিকতার সঙ্গে মহত্তের পূজা করতেন—সে ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ কোনো বর্ণ-বৈষম্য বা জাতি-বৈষম্য মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। গুণগ্রাহী বিদ্যাসাগর যার মধ্যে গুণের লেশমাত্র দেখতেন, তাকেই অকপটে সমাদর করতেন। লোকে দেখতো মাইকেল খ্রীষ্টান, কিন্তু বিদ্যাসাগর দেখতেন মাইকেলের প্রতিভা। তাই তাঁকে তিনি বুকে টেনে নিয়েছিলেন। কারো কাছে তাঁর কোনো প্রত্যাশা ছিল না, তাই তাঁর কাছে স্তাবকের দল কখনো ঘেঁষতে সাহস পায়নি। উচ্চনীচ, ধনী দরিদ্র সকল বর্ণের সকল জাতির মানুষকে শ্রদ্ধা করেই বিদ্যাসাগর বাঙালির অনাবিল শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। এই শ্রদ্ধাবুদ্ধি সাগর-চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব। তাই না সেই ব্রাহ্মণ বলেছিলেন—"গরীব বড়মানুষ আমার সবই সমান।"

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ও কর্মসাধনা ছিল বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন : "বিদ্যাসাগর অধ্যবসায়ের সঙ্গে জয়ী করেছিলেন আপন শুভ সংকল্পকে, সেই তাঁর উত্তুঙ্গ মহত্ত্বের ইতিহাসকে সাধারণত তাঁর দেশের বহুলোক সসংকোচে নিঃশব্দে অতিক্রম করে থাকেন। এ কথা ভুলে যান যে, আচারগত অভ্যস্ত মতের পার্থক্য বড় কথা নয়, কিন্তু যে দেশে অপরাজেয় নির্ভীক চারিত্রশক্তি সচরাচর দুর্লভ, সে দেশে নিষ্ঠুর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের নির্বিচল হিতব্রতপালন সমাজের কাছে মহৎ প্রেরণা। ক্ষতির আশঙ্কা উপেক্ষা করে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বারংবার আত্মসম্মান রক্ষা করেছেন, তেমনই যে শ্রেয়োবুদ্ধির প্রেরণায় দণ্ডপাণি

সমাজ-শাসনের কাছে তিনি মাথা নত করেন নি, সেও কঠিন সংকটের বিপক্ষে তাঁর আত্মসম্মান রক্ষার মূল্যবান দৃষ্টান্ত। দীন দুঃখীকে তিনি অর্থদানের দ্বারা জয় করেছেন, সে কথা তাঁর দেশের সকল লোক স্বীকার করে; কিন্তু অনাথা নারীদের প্রতি যে করুণায় তিনি সমাজের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে প্রবল শক্তিতে আঘাত করেছিলেন, তার শ্রেষ্ঠতা আরো অনেক বেশী, কেননা তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কেবলমাত্র তাঁর ত্যাগশক্তি নয়, তাঁর বীরত্ব। সর্বসমক্ষে সমুজ্জ্বল হয়ে থাক বিদ্যাসাগরের অক্ষয় মনুষ্যত্ব আর মহাপুরুষোচিত কারুণ্যের স্মৃতি।"

বিদ্যাসাগর ক্ষণজন্মা পুরুষ। বাঙালির তিনি চিরন্তন বিস্ময়।

তাঁর বিশাল হৃদয়বত্তা, কাণ্ডজ্ঞান, তাঁর চিন্তাধারার স্বচ্ছতা ও বলিষ্ঠতা, তাঁর মনের সংস্কারমুক্তি, বাঙালির গতানুগতিক জীবনযাত্রার প্রতি তাঁর বিরাগ, মানবতার প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ ও ব্যবহারিক জীবনের নূতন মূল্যবোধ—বাঙালির চিরদিনের বিস্ময়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তিনিই—তিনি যেন আমাদের কাছে দুর্নিরীক্ষ্য ও দুরাধর্ষ, তাঁর হৃদয় সাগরের মত—বিশাল, অতলস্পর্শ, রহস্যময়। তাঁর চরিত্র জ্যোৎস্নার মত নির্মল।

সব দেশে সকল সময়ে এমন মানুষ জন্মগ্রহণ করে না। বিদ্যাসাগরের মতো পুরুষ-সিংহ যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ ধন্য হয়, যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সে জাতি কৃতার্থ হয়। বিদ্যাসাগর মানব-সমাজের গর্ব। ভারতবাসীর তিনি গর্ব। বাঙালির তিনি গর্ব।

বীরসিংহ তাই বাঙালির পুণ্যতীর্থ। সমগ্র বাংলা দেশই বিদ্যাসাগরের জন্মের জন্য একটি পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছে। বাংলার মাটিতেই তিনি মনুষ্যত্বের অক্ষয় বট প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। মেঘলোকের উর্ধ্বে সমুন্নত-শির হিমালয়ের গম্ভীর মহিমা মানুষকে যেমন স্তব্ধ করে; সেই রকম বিদ্যাসাগরের চরিত্রমহিমা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়, অভিভূত হতে হয়। পরাধীনতার যুগেও আমাদের মধ্যে আমরা এমন মানুষকে একদিন পেয়েছিলাম, এ কথা চিন্তা করে এই আত্মপ্রত্যয়হীনতার যুগেও আমরা বল, শক্তি ও সাহসের প্রেরণা লাভ করতে পারি। মানবধর্মের মহত্বকে বুঝতে

হলে বিদ্যাসাগরর পুণ্যচরিত মনন করতে হয়, স্মরণ করতে হয় তাঁর বীর্যবত্তা, অকুতোভয়তা আর স্বাতন্ত্র্য-মর্যাদা ও স্বদেশ-প্রীতি।

অক্লান্তকর্মা পুরুষ বিদ্যাসাগর। নিবিড় কর্ম-স্রোতের মধ্যে তাঁর বৃথা অপব্যয় করবার মত তিলমাত্র সময় ছিল না। সাহিত্য, সমাজ আর শিক্ষার জন্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর কেউ তাঁর মতো এককভাবে এত চিন্তা করেন নি, এত পরিশ্রমও করেন নি। এই তিন দিক দিয়েই তিনি স্বদেশকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁরই চেষ্টায় বাংলার চারদিকে সেদিন স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন মাথা তুলেছিল। মেয়েদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের জন্যে বিদ্যাসাগর বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন এবং তাঁরই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে তখনকার একাধিক প্রগতিশীল দল এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন। বাংলার মেয়েরা দেশাচারের বাতাবরণ ছিন্ন করে তাদের অন্তরের ব্যথা ও বেদনা প্রকাশ করেছিল সেদিন। হৃদয়ের মূকবেদনা নিয়ে যারা দিনাতিপাত করত অন্তঃপুরে, বাংলার সেইসব নির্বাককুণ্ঠিতা অন্তঃপুরচারিণীদের মুখে ভাষা দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তাই আমরা দেখতে পাই যে, দেশে স্ত্রী-শিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগল অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে। তাঁদেরই লেখনী থেকে বেরুলো তাঁদেরই অভাব-অভিযোগ সম্পর্কিত কত পুস্তক-পুস্তিকা। এমন কি, বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলেই সেদিন স্বল্পশিক্ষিতা যেসব পুরনারী পর্দা ও প্রথার অন্তরাল ভেদ করে সাহিত্য-ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই লাভ করেছিলেন অবলা-বান্ধব বিদ্যাসাগরের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ আর অভিনন্দন।

বিদ্যাসাগরের দানের কথা আর কি বলব? তাঁর বাড়িতে দানের যেন নিত্য মহোৎসব চলত, তার মধ্যে ব্রাহ্মণ-শূদ্র ছিল না, শত্রু-মিত্র ছিল না। চাঁদের আলোর মত, সূর্যের কিরণের মত সে দানের পরিবেশন সর্বত্র। সে দানের তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তার মোট পরিমাণ দিতে গেলে হয়ত কোন কোন বড় রাজার তুলনায় তা অল্প বলেও মনে হতে পারে। রাজেন্দ্র মল্লিক বা তারক প্রামাণিকের মত ধনশালী ছিলেন না বিদ্যাসাগর, তাঁর দানের পরিমাণ হয়ত এঁদের চেয়ে কমই ছিল। কিন্তু পরিমাণ দিয়ে

বিদ্যাসাগরের দান মোটেই বিচার্য নয়—এ বিচারের তুলাদণ্ড মর্মানুভূতি, সহৃদয়তা ও পরদুঃখ-কাতরতা। লক্ষ টাকা কেউ দান করতে পারে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত প্রাণ কোথায়? এই প্রাণবন্ত, মূর্ত দয়ার অবতার মোট কত টাকা দিয়েছেন, সেই হিসাব দেখে তাঁর দাক্ষিণ্যের বিচার চলবে না। তিনি যা দিয়েছিলেন তা তাঁর সর্বস্ব। পথের ভিখারী থেকে কবি-শার্দূল মাইকেল মধুসূদন পর্যন্ত সকলেই বিদ্যাসাগরের দয়া উপলব্ধি করেছেন। শীতার্ত, অনাহারে ও উৎকণ্ঠায় জীর্ণ পথের পতিতারাও বিদ্যাসাগরের দয়া থেকে বঞ্চিত হয় নি। দয়ার উৎস বিদ্যাসাগর বরাভয়যুক্ত হস্ত প্রসারণ করে সাধ্যমত সকলের কামনা পূর্ণ করেছেন—প্রার্থী ও অ-প্রার্থীর মধ্যে কোন বিভেদ রাখেন নি।

দানের সঙ্গেই মনে পড়ে বিদ্যাসাগরের ব্রাহ্মণ্যতেজের কথা।

আগেই বলেছি সাগর-চরিত্রের যা কিছু মহত্ত্ব এবং বৈশিষ্ট্য তা এই ব্রাহ্মণ্য-তেজকে কেন্দ্র করেই বিচ্ছুরিত হতো। এ যেন তাঁর জীবনের পাত্রে পবিত্র হোমাগ্নির মত নিত্য প্রজ্জ্বলিত ছিল। বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনে যে অপূর্ব ত্যাগ ও তেজ, জ্বলন্ত অভিমান ও আত্মসম্মান-জ্ঞান, সর্বজনীন দয়া বৃত্তি ও সমাজ-সংস্কারের প্রবল ইচ্ছা দেখিয়েছেন, তার কোনোটাই বিদেশী প্রভাবের ফল নয়। কবি হেমচন্দ্র তাঁর চরিত্র বোঝাতে গিয়ে একটা অদ্ভুত বিশেষণ ব্যবহার করেছেন—"ইংরাজী ঘিয়েতে ভাজা সংস্কৃত-ডিস্"—বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই বিশেষণ আরোপের কোনো অর্থ হয় না। ইংরেজ আসবার পর থেকে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যের আদর্শ আমাদের দৃষ্টি থেকে ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছিল। অর্থ ও সামান্য পদ-লিপ্সার বিনিময়ে আমরা আত্মসম্মান জ্ঞান, চরিত্র-বল ও তেজ সবই বিসর্জন দিয়েছিলাম। বিদ্যাসাগর ধুতি-চাদর ও চটি জুতোর ভেতর দিয়ে ঘোষণা করলেন আমাদের অপরাজিত জাতীয়তা। তিনিই সর্বপ্রথম সগৌরবে এই স্বজাতীর আদর্শ শিক্ষিত সমাজের সামনে তুলে ধরলেন। ইংরেজ সমাজে অবাধ গতিবিধি সত্ত্বেও, বিলাতি আদর্শকে অস্বীকার না করেও, বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের সমাজের আচার-ব্যবহার ছাড়লেন না। বললেন—"আমার পূর্বপুরুষাচরিত পন্থা শুধু আমার প্রিয় নহে, তাহার মধ্যে আমার পক্ষে অগৌরবের কিছু নাই।" এ জিনিস এ দেশের মাটিতেই ছিল। তাঁর পিতামহ রামজয়ের মধ্যে তিনি

দেখেছিলেন সেই ব্রাহ্মণ্যতেজ, সামাজিক প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখবার সেই একনিষ্ঠ প্রয়াস। তারপর চাণক্য, দর্ভপাণি, কেদার মিশ্র, বুনো রামনাথ প্রভৃতির ব্রাহ্মণ্য নিষ্ঠা ও তেজের কথা বিদ্যাসাগরের অজানা ছিল না। এই তেজ ও নিষ্ঠাকে আদর্শ হিসাবে স্বীকার করে, বিদ্যাসাগর সেই সময়ে এই দেশ ও সমাজকে নতুন করে গৌরব প্রদান করেছিলেন। টুলো ব্রাহ্মণের পায়ে উপানহ এবং অঙ্গে ধুতি-চাদর বহু যুগ থেকেই এ দেশে ছিল। এ তাঁর উদ্ভাবনা নয় বা এর মধ্যে বিদ্যাসাগরের কোনো মৌলিকত্ব নেই। যা আমরা বিস্মৃত হয়েছিলাম, যুগ-যুগ-সঞ্চিত সংস্কারের আবর্জনার তলায় যা অবলুপ্ত হয়েছিল, বিদ্যাসাগর তাকেই আবার সজীব ও উজ্জ্বল করে দেখালেন। তাকেই শ্রদ্ধেয় করে তুললেন সকলের চক্ষে।

পরবর্তীকালে এই জিনিসই—এই আত্মসম্মানজ্ঞান, নিজের দেশের আচার-ব্যবহারের প্রতি অনুরাগ দেখিয়েছিলেন স্যর গুরুদাস ও স্যর আশুতোষ এবং এঁরা দুজনেই বিদ্যাসাগরের মতো ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের জীবন ছিল জ্যোতির্ময়। গতানুগতিক জীবন তিনি যাপন করেন নি।

তিনি যাপন করেছেন জীবন্ত জীবন। সহস্র সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বিপুল বলিষ্ঠতায় বাংলার এই বরেণ্য ব্রাহ্মণ মনুষ্যত্বের জয়ধ্বজা বহন করে গেছেন। প্রতিকূল শক্তির সংঘাতে তিনি দমেন নি, টলেন নি বরং অধিকতর দৃঢ়তা এবং নির্ভীকতার সঙ্গে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে অগ্রসর হয়েছেন। প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে আদর্শে স্থির থাকবার এই যে বীর্যবত্তা বা তেজস্বিতা, এর মূলে ছিল বিদ্যাসাগরের বিপ্লবী মনীষা, ঔদার্য এবং মানবতা। তাঁর কর্মবেগ সমুৎসারিত হতো যেখানে মানুষের ঐকান্তিকতার উৎস সেই প্রাণকেন্দ্র থেকে, অহংকারের স্তর থেকে নয়। সেবা ও প্রেম ছিল সেই জীবনের শক্তি ; ইতিহাস, দর্শন আর অর্থনীতি ছিল সেই জীবনের ভিত্তি। বিদ্যাসাগর দেশ ও জাতির প্রেমের এই পরম বেদনাতে উত্তপ্ত হয়েই অগ্নিময় জীবন যাপন করে গিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ, কিন্তু পণ্ডিতের গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা ছিল না তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র।

তাঁর বিরাট এবং বিশাল চরিত্র অসংখ্য গুণের একত্র সমাবেশে ছিল সমুজ্জল। কিন্তু সে-জীবনের প্রধান বিশেষত্ব তাঁর দেশ ও জাতির প্রতি প্রেমের এই প্রচণ্ড উত্তাপ।

অনুদার অন্ধ সমাজকে প্রবল ভাবে আঘাত করে জাতির মধ্যে নূতন গতিবেগ বইয়ে দিতে পেরেছিলেন বিদ্যাসাগর।

জাতিকে মাথা উচু করে দাঁড়াতে শেখালেন তিনি।

বহ্নিবর্চিময় বাংলার সেই নীলকণ্ঠ ব্রাহ্মণকে প্রণাম।

বিদ্যাসাগর বিপ্লবী। ইতিহাসের কার্যকারণ সম্বন্ধ থেকে বিপ্লবের সূত্র সন্ধান করলেই আমরা অনায়াসেই তাঁকে এই আখ্যা দিতে পারি। সমাজ-বিন্যাসে তিনি একটা বড় রকম পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন তাঁর বিধবাবিবাহ আন্দোলনের মাধ্যমে। এ পরিবর্তন যুগান্তকারী। এর প্রতিক্রিয়াও ছিল সুদূরপ্রসারী। সমাজের অন্তর্বিরোধ থেকেই সামাজিক ভাবনার আলোড়ন সৃষ্টি হয়, শুরু হয় রূপান্তরের পথ সন্ধান, বিপ্লব ঘটে চিন্তার রাজ্যে। প্রবল হৃদয়াবেগ আর ক্ষুরধার যুক্তি মিলিয়ে তিনি বিধবাবিবাহ সম্পর্কে যে বই রচনা করেছিলেন, তাই তো সেদিন বিপ্লব ঘটালো বাঙালির চিন্তার রাজ্যে।

কালজয়ী মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর। তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে এক নবযুগের সূচনা হয়েছে। তাঁকে আমরা পেয়েছি একাধারে মহাজ্ঞানী, মহাকর্মী ও সমাজের এক মহান ব্যক্তিরূপে। বাঙালির চক্ষে তিনি দিয়েছেন দৃষ্টি আর মুখে ভাষা। বিদ্যাসাগরের জীবন আমাদের পরম সম্পদ। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বিদ্যাসাগর যে জীবনাদর্শকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, আজ সেই বিষয়ে আমাদের অবহিত হতে হবে। বিদ্যাসাগর বলতেন—"দশজনে আমাকে স্নেহ করিয়া থাকে ইহাই আমার জীবনের লাভ। আমি অবতার হইতে চাহি না।" তাঁর সমকালীন অনেককেই তিনি দেখেছেন অবতারের মত সম্পূজিত হতে এবং সেই পূজা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করতে। বাংলার মাটিতে যত সহজে অবতারবাদের চাষ হয়ে থাকে, এমন আর কোথাও হয় না। সম্ভবতঃ তাই দেখেই বিদ্যাসাগর এই উক্তি করে থাকবেন।

বস্তুতঃ, কোমলতা ও দৃঢ়তা, ভাবুকতা ও গাম্ভীর্য, দয়া ও বিচক্ষণতা, প্রেম ও ন্যায়পরায়ণতা ও স্বাধীনতা, অমায়িকতা ও তীক্ষ্ণ আত্মসম্মানবোধ, সহিষ্ণুতা ও উদ্যম—একত্র হয়ে যেন রচনা করেছিল বিদ্যাসাগর-চরিত্র। সকল গুণই যেন সামঞ্জস্য লাভ করেছিল তাঁর চরিত্রে।

তাঁর মন ছিল পর্বত চূড়ার মতই উন্নত। চরিত্র পর্বত চূড়ার মতই অচল অটল। পর্বত চূড়ারই মত আর্য গৌরব সেই বলিষ্ঠ শরীরের ভেতর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর জীবনের আলোক যখন যার দিকে ফিরিয়ে ধরতেন সে ধন্য হয়ে যেত, সে পুণ্যস্পর্শে সকল দৈন্য যে কেবল মাথা নত করে তাঁর চরণধূলির নীচে পড়ত, তা নয়; মনে হতো, বাপ-মা যেমন নিজের ছেলের ধূলি মলিনতা সযত্নে মুছিয়ে তাকে নিজের কোলে তুলে নেন, তেমনি বিদ্যাসাগর সমস্ত দৈন্য ঘুচিয়ে সকলকে নিজের পাশে বসাতেন। কেউ বুঝতে পারত না তিনি কত বড়। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে আছে এর অজস্র দৃষ্টান্ত। এই যে অভিমানলেশবর্জিত মহানুভবতা—এই-ই বিদ্যাসাগরের অন্তরের ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্য তিনি বিলিয়ে গেছেন অকৃপণ হাতে বাংলার মাটিতে। বাংলার মৃৎপাত্রে বিদ্যাসাগর যেন ঘনাবর্ত দুগ্ধ —বিশুদ্ধ, স্বাদিষ্ট, সুপেয় ও সারবান্।

বিদ্যাসাগরের প্রকৃতির বাইরের একটা খোলস ছিল তা অনেক সময় কর্কশ ও কঠোর বলে মনে হওয়া আশ্চর্য ছিল না। কিন্তু তাঁর বাইরের কঠোরতার ভেতরেও একটা করুণা নিয়ত প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত থাকত। শ্রুতিমধুর মিষ্ট কথায় বিদ্যাসাগর কখনো প্রার্থীর মন মুগ্ধ করতেন না, কিন্তু প্রাণবন্ত ছিলেন। পরদুঃখের কথায় তাঁর হৃদয় দয়ার্দ্র হতো এবং সাহায্য করবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠত। পালিশ করা ভাষায় কথা বলে যেমন কাউকে বৃথা আশা দিতেন না, আবার যেখানে প্রার্থীর মনস্কামনা পূর্ণ করবেন জানতেন, সেখানেও বিদ্যাসাগর বাক্য-পল্লবের বাহুল্য সৃষ্টি করতেন না। কখনো কখনো তিনি হয়ত বিরক্ত হতেন, কিন্তু তাতে দয়ার প্রস্রবণ শুকিয়ে যেত না। ফল্গু-নদীর মত দয়ার প্রবাহ বাইরের ব্যবহারের শুষ্ক বালুকা-স্তূপের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হতো; তাঁর ব্যবহার মাঝে মাঝে উগ্র, এমন কি কঠোর বলে মনে হতে পারত, কিন্তু সেই উগ্রতার সামনে যে স্থির হয়ে থাকত, সেই-ই

তাঁর করুণার স্নিগ্ধ নির্ঝরে আপ্লুত হতো। এই সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন একটি চমৎকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। কাহিনীটি এই।
"প্রথম দিন আমি যখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া মেট্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষকতার প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম, তখন বিদ্যাসাগর বলিলেন,—তুই কি পাশ?
আমি বলিলাম,—ইংরেজিতে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করিয়াছি এবং মফঃস্বলের এক হাইস্কুলে হেড্ মাষ্টারী করিতেছি।
—তোর বাড়ী কোথায়?
—ঢাকা জেলায়।
—ও তোর চাকরী হবে না, ছেলেরা বড় দুর্দান্ত, বাঙাল নিয়ে বড্ড টানা-হেঁচড়া করবে। তোর কথায় তো স্পষ্ট ঢাকার টান রয়েছে, এই উচ্চারণ নিয়ে তুই একদিনও ক্লাশে পড়াতে পারবি নে।
অবশ্য ইহার পরে ছাত্রগণকে পড়াইতে দিয়া তিনি আমার কাজে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং আমাকে একটি চাকুরি দিতে চাহিয়াছিলেন; নানাকারণে আমি তখন মফঃস্বল হইতে আসিয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারি নাই। প্রথম পরিচয়ের দিনেই এরূপ মুখের উপর বাঙাল বলিয়া গালি দেওয়া কি ভদ্রতা? অথচ তাঁহার এই রুচি-বিগর্হিত, 'অভদ্র' কথায় আমার মনে কিছুমাত্র জ্বালা উপস্থিত করে নাই, কারণ, সেই পুরুষবরের চক্ষে বাঙাল ও পশ্চিমবঙ্গের লোকের কোন বৈষম্য ছিল না। তিনি বাঙাল সারদারঞ্জন রায়কে তাঁহার কলেজের অধ্যক্ষ করিয়াছিলেন।"

বিদ্যাসাগরের প্রতিভা এত তীক্ষ্ণ যে, মানুষের অন্তর ভেদ করে তা প্রদীপ্ত হতো। তিনি ছিলেন প্রতিভার জীবন্ত চিত্র। কি গল্পে, কি উপহাসে, কি তর্কে, কি উপদেশে, কি সাহিত্যকর্মে—এই প্রতিভা শতমুখী হয়ে প্রকাশ পেতো। সে চোখ দুটি যেন প্রতিভার খনি, আবার সময়ান্তরে প্রেমের অস্ফুট ভাষা। প্রতিভা ও প্রেম বিদ্যাসাগরের দুই-ই ছিল। একই সময়ে তাঁর চোখ উজ্জ্বল, একই সময়ে জলে অভিষিক্ত। বিদ্যাসাগরের বুদ্ধি বা জ্ঞান হয় তো অতলস্পর্শী ছিল না, জীবনে তিনি যা করে গেছেন তা যৎসামান্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এক জায়গায় তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্।

হৃদয়ের শক্তিতে বিদ্যাসাগর একেশ্বর সূর্য।
চক্ষের জলে তিনি চিরপুণ্য।
বিধবার অশ্রুতে, সাঁওতালের মর্মবেদনায় এবং দরিদ্রের ব্যথায় তাঁর গৌরব চিরকাল সুরক্ষিত থাকবে। পৃথিবী থেকে হয়ত একদিন যাবতীয় শক্তির স্মৃতি মুছে যাবে, কিন্তু হৃদয়ের শক্তি? তার তো বিলুপ্তি নেই। এই হৃদয়ের শক্তিতেই বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর। দরিদ্রের সেবার জন্যেই যেন তাঁর জন্ম। দান ছিল তাঁর স্বাভাবিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। অকাতরে দান করতেন তিনি। কোনো প্রত্যাশা নেই, প্রতিদানের আশায় ছাই, তবু দানস্পৃহা! কী অপরাজিত প্রেমের টান, ভাবলে মুগ্ধ হতে হয়। যশলোলুপ দাতা নন, প্রকৃত দয়ার সাগরই বিদ্যাসাগর। আবার এ কথাও সত্য যে, তাঁর কাছে উপকার পেয়ে তাঁর অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা বা নিন্দা ঘোষণা করে নি, এমন লোক সেদিন খুব কমই ছিল। অথচ বিদ্যাসাগর বারবার তাদেরই অকাতরে দান করেছেন, নানা রকম সাহায্যে নানা রকম বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার করেছেন। তাই বলছিলাম, হৃদয়ের শক্তিতে বিদ্যাসাগর অপরাজেয়।
শিক্ষাদান যদি শ্রেষ্ঠ দান বলে গণ্য হয়, তাহলে বলব দরিদ্র বিদ্যাসাগরের চেয়ে বড়ো দাতা সে সময়ে আর কেউ ছিল না। মেয়েদের দুঃখমোচন ও শিক্ষাবিধান—এক্ষেত্রেও তাঁর দানের পরিমাণ কী কম? শৈশবে যে স্নেহ, দয়া-সৌজন্য তিনি অনাত্মীয়া রাইমণির হাতে পেয়েছিলেন, সকৃতজ্ঞচিত্তে বিদ্যাসাগর তা আজীবন স্মরণ রেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে বাংলার রাইমণিদের জন্য তিনি যা করে গেছেন তা অতুলনীয়।

বিদ্যাসাগরকে অনেকে নাস্তিক বলেন।
বলেন তিনি ধার্মিক ছিলেন না, তাঁর কোনো ধর্মমত ছিল না।
পরের দুঃখমোচনই যাঁর ধর্ম ছিল, মানুষের দুঃখের কথা শুনবার জন্যে যাঁর কান সর্বদা সজাগ থাকত, সেই মানুষ কেমন করে নাস্তিক হয়? কেমন করে বলব তিনি ধার্মিক ছিলেন না বা তাঁর কোনো ধর্মবুদ্ধি ছিল না? যাঁর হৃদয় থেকে বাল-বিধবার দুঃখে সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা আরব্ধ হয়েছিল, যাঁর চক্ষু মৃত্যুর প্রাক্কালে সাঁওতালদের দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ করে সজল হয়ে উঠেছিল, সেই

মানুষ কি কখনো নাস্তিক হতে পারেন? ছেলেবেলা থেকে তিনি প্রতিমা-পূজার পক্ষপাতী ছিলেন না, একথা ঠিক, কিন্তু তাই বলে বিদ্যাসাগর নাস্তিক, কিংবা তাঁর কোন ধর্ম-জীবন ছিল না, এমন কথা বলা ঠিক নয়। নিজের বাপ-মাকে যিনি আজীবন সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে ভক্তিসহকারে সেবা করলেন, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে মানুষকে যিনি মানুষ জ্ঞানে সেবা করলেন, সেই মানুষের ধর্মজীবন কতখানি উন্নত ছিল, তা যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম, তাহলে বিদ্যাসাগরের ধর্মমত নিয়ে কোন প্রশ্নই তুলতাম না। লোকবিরল পরোপকার সাধন—এই ছিল তাঁর ধর্ম। আসল কথা, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংস্কারমূলক আন্দোলন শুরু করে বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজকে যুগ-বিপ্লবের আগমনী সঙ্গীত শুনিয়েছিলেন বলেই হয়ত পরিবর্তন-বিরোধীর দল তাঁকে নাস্তিক অপবাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'—এই যদি হয় আদর্শ, তাহলে ঈশ্বরচন্দ্রকে ধার্মিক বলতে বাধা কোথায়?

আড়ম্বরহীনতা ধর্মের প্রধান লক্ষণ। বিদ্যাসাগরের জীবনে সে পরিচয় যথেষ্ট আছে। অহঙ্কারশূন্যতা ধর্মের দ্বিতীয় লক্ষণ। বিদ্যাসাগরের মত নিরহঙ্কারী লোক এদেশে বিরল। কর্তব্যনিষ্ঠা ধর্মের জীবন। বিদ্যাসাগরের মতো কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ এদেশে আর দেখা যায় না। পবিত্রতা ধর্মের উপাদান। বিদ্যাসাগরের মতো পবিত্রচেতা লোক এদেশে বিরল। জীবনে কখনো কোনো নীতিবিরুদ্ধ অন্যায় কাজ করেছেন বলে আজ পর্যন্ত কেউ শোনে নি। ন্যায়পরতা ধর্মের লক্ষণ। এক্ষেত্রেও দেখি তিনি রামচন্দ্রের মতো ন্যায়পরায়ণ। ন্যায়পরায়ণতার খাতিরে নিজের জামাইকে পর্যন্ত মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে অপসৃত করেছিলেন আর ত্যাজ্য করেছিলেন একমাত্র পুত্রকে। মিথ্যার প্রতি, অন্যায়ের প্রতি বিদ্যাসাগর চিরকাল খড়্গহস্ত ছিলেন। এমন যে মানুষ, তিনি ধার্মিক ছাড়া আর কী?

স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগর যেমন সম্মান দেখাতেন, এমন আর কেউ পারে নি। পতিতা নারী পর্যন্ত তাঁর দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হয় নি। কোন সময়ে কয়েকটি যুবক মেট্রোপলিটানের নতুন বাড়ির ছাদে উঠে ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েদের দেখছিল। এই কথা শুনে বিদ্যাসাগর ক্রোধে অধীর হয়ে ছাত্রদের কলেজ থেকে চিরদিনের জন্যে অপসৃত করেছিলেন। বাল্যবিবাহ মেয়েদের

পক্ষে অকল্যাণকর হচ্ছে দেখে, বিদ্যাসাগর ধর্মবীরের মতো দেশীয় প্রথা উল্লঙ্ঘন করে, নিজের মেয়েদের যৌবনে বিয়ে দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের বেতের গল্পটির উল্লেখ করব। বিদ্যাসাগর বলতেন: "আমি ধর্ম সম্বন্ধে কাউকে কোনো কথা বলি না কেবল বেতের ভয়ে। নিজের বেতের ভয়েই অস্থির, অন্যকে ধর্মের কথা বলিয়া বেত্রাঘাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে ভয় পাই।"

"সে কী রকম?" একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

"মনে কর সকলেই বিচারের দিন বিচারপতির নিকট আনীত হইয়াছে। আমিও সেখানে আনীত। বিচারপতি খাতা খুলিয়া নাম ডাকিয়া আমাকে বলিলেন—'তুমি অমুক দিন অমুক অন্যায় কাজ করিয়াছ?' আমি উত্তরে বলিলাম—'হাঁ করিয়াছি।' অমনি দশ বেতের হুকুম হইল। আমাকে বটতলা লইয়া গিয়া বেত্রাঘাত করিতে লাগিল, আমি বেদনায় ছটফট করিতে লাগিলাম। একটু পরেই আবার আমার ডাক হইল। হাজির হইলে বিচারপতি বলিলেন—'তুমি অমুক লোককে অমুক দিনে এই কথা বলিয়াছ?' আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ বলিয়াছি।' অমনি আর দশ বেতের হুকুম হইল। সে লোক এজাহারে বলিয়াছিল যে বিদ্যাসাগর বলিয়াছিল বলিয়া এই কাজ করিয়াছি। এইরূপ বহুলোককে বহুকথা বলিলে, সে পাপের ভাগী আমাকেই হইতে হইবে ও আমিই দণ্ড পাইব; এই ভয়ে আমি কাহাকেও কোন ধর্মের কথা বলি না।"

বিদ্যাসাগর কত বড় উচ্চশ্রেণীর ধার্মিক ও দার্শনিক ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর এই কথা। বিদ্যাসাগর ধার্মিক ছিলেন, তবে তিনি প্রচলিত অর্থে ধার্মিক ছিলেন না। ধর্মের কোনো অনুষ্ঠানই তিনি পালন করতেন না। সে অবসরই তাঁর ছিল না। কোন সম্প্রদায়ের সকল মত তিনি মেনে চলতেন না, এ কথাও ঠিক। সকল সম্প্রদায়ের লোককেই তিনি আদর করতেন, শ্রদ্ধা করতেন। বিশেষ করে ব্রাহ্ম সমাজের অনেককেই তিনি ভালবাসতেন, অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতেন। ধর্মবিশ্বাস বিদ্যাসাগরের যদি না থাকত, তাহলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তিনি মিশতেন না কিংবা জীবনের প্রথম উদ্যম ও আগ্রহ নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করতেন না। বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্পর্কে তাঁর একটি

মূল্যবান কথা এখানে উদ্ধৃত করছি : "এ দুনিয়ায় একজন মালিক আছেন তা বেশ বুঝি, তবে ঐ পথে না চলিয়া এ পথে চলিলে, নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এসকল বুঝিও না. আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না। ...নিজে যেমন বুঝি সেই পথে চলিতে চেষ্টা করি, পীড়াপীড়ি করিলে বলি, 'এর বেশী বুঝিতে পারি নাই'।"

বিদ্যাসাগরের ধর্মজীবন সম্পর্কে তাঁরই সমসাময়িক বাংলার দুজন বিশিষ্ট মহাপুরুষের দুটি উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি প্রবল ধর্মবিশ্বাস-বিশিষ্ট লোক ছিলেন, কিন্তু কাহাকেও নিজের ধর্মমত কিংবা বিশ্বাস দেখাইতে কিংবা জানিতে দিতে চাহিতেন না। ধর্মমত ও বিশ্বাস উভয়ই গোপন করিয়া চলিতেন।" রামকৃষ্ণ পরমহংস একবার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। কথিত আছে যে, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ করবেন শুনে তাঁর ভক্তরা কারণ জানতে চেয়েছিল। রামকৃষ্ণ শুধু বলেছিলেন : "বিধাতার কৃপা ও বিধাতায় ভক্তি ভিন্ন তাঁর মতো মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয় না।" এ ছাড়া, রামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর সাক্ষাৎকার ও সেই সময় দুজনার মধ্যে কথোপকথন একটি সুপরিচিত কাহিনী। ধর্মবিশ্বাস যদি নাই থাকবে, তাহলে অন্ধ ও খোঁড়া মুসলমান ফকিরের মুখে বাউলের গান শুনে বিদ্যাসাগর অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জন করবেন কেন? জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের প্রতিই তাঁর প্রীতি ছিল। বিদ্যাসাগরের ধর্মজ্ঞান কত সহজ, স্বাভাবিক ও নির্মল ছিল, তা বোঝা যায় তাঁর আর একটি কথা থেকে। বিদ্যাসাগরের এক অনুরাগী যখন তাঁকে তাঁর ধর্মমত বিষয়ে জিজ্ঞাসু হয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন তখন বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "গীতার উপদেশ অনুসারে চলিলেই ভাল হয়।" তবে একথা সত্য যে, ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর কোনো গোঁড়ামি ছিল না। সব জিনিস তিনি যাচাই করতেন যুক্তি দিয়ে। অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ মন ছিল তাঁর। শাস্ত্রে আছে বা শাস্ত্র অভ্রান্ত—বিদ্যাসাগরের কাছে এই-ই শেষ কথা ছিল না। বেদান্তকে ভ্রান্তদর্শন তিনিই বলতে পেরেছিলেন। বিদ্যাসাগর গৃহী ছিলেন, সংসারী ছিলেন, কিন্তু অন্তরে তাঁর এক পরম বৈরাগী বাস করতো। তাই গৃহত্যাগী সাধুদেরও চরিত্রবলে তিনি আকৃষ্ট করতে পারতেন। অর্থ সম্পর্কে

তাঁর মতো নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহ মানুষ সেদিন বাংলা দেশে আর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ।

আরো একটি কথা। পরের জন্য না কাঁদলে মানুষই হওয়া হলো না—এই যাঁর জীবনের শিক্ষা, সেই বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বা অধার্মিক কোনোটাই বলা যায় না। একবার কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রীর শিষ্য পণ্ডিত বহুবল্লভ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে ধর্মপ্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি এমন মহাপ্রাণ, অথচ আপনি স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ কামনা করেন না? উত্তরে বিদ্যাসাগর তাঁকে বলেছিলেন, "এমন স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ চাহি না, যেখানে মানুষের সেবা বা উপকার করিবার কোন সুযোগ নাই।" কথিত আছে, এই রকম উত্তর শুনে শাস্ত্রীমশাই বিস্মিত হয়েছিলেন। এই বহুবল্লভ শাস্ত্রী মহাভাষ্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর মুখে একদিন মহাভাষ্যের ব্যাখ্যা শুনে তাঁর পাণ্ডিত্যে বিদ্যাসাগর মুগ্ধ হন। সমগ্র মহাভাষ্যের ব্যাখ্যা শুনবার ইচ্ছা তাঁর হয়েছিল, কিন্তু নানা কারণে তা আর ঘটে ওঠেনি। বিদ্যাসাগরের ধর্মজীবন নিয়ে বা ধর্মমত নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুধু ধৃষ্টতা নয়, নিরর্থকও বটে।

কতখানি সংস্কারমুক্ত, উদার-হৃদয় পুরুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর তার পরিচয় আমরা পাই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁর একটি উক্তিতে। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ১১ই মে, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলো। শহরের শিক্ষিত সমাজে চকিতে তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্যাসাগরও শুনলেন এই খবর। তখন রোগে-শোকে তাঁর নিজের শরীরও জীর্ণ। সেই অবস্থায় মৃতের প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তিনি গেলেন রেভারেণ্ডের বাড়িতে। শহরের অনেকেই এসেছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের আগমন সেখানে ছিল নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি? শোককাতর কণ্ঠে বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন, "কেন, আমার আসাতে বাধা কি? মধু যে খ্রীষ্টান হইয়াছিল, তাই বলিয়া তাহাকে কি আমি ভালবাসিতাম না? আমি শুধু দেখিতাম মধুর প্রতিভা আর এই পক্ককেশ পাদরী বাঙালির যে কত বড় গৌরবের পাত্র, তাহা কি আমি জানি না?"

সকলেই অবাক হলো বিদ্যাসাগরের মুখে এই কথা শুনে, সকলেরই অন্তর শ্রদ্ধায় ভরে উঠল বিদ্যাসাগরের এই উদারতা দেখে। 'বিদ্যাকল্পদ্রুমের' লেখক কৃষ্ণমোহনের প্রতি বিদ্যাসাগর আজীবন শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

প্রসঙ্গতঃ বাঙালির চরিত্র সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের একটি ধিক্কারবাণীর উল্লেখ করব। সে যুগে সকল স্তরের বাঙালির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠতা ছিল প্রসিদ্ধ। তাঁর মতো এমন করে নেড়েচেড়ে এই জাতটাকে আর কেউ দেখে নি। বাঙালির চরিত্র সম্পর্কে তাঁর মতো দীর্ঘদর্শী লোক সেদিন সত্যই বিরল ছিল। "বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনের শেষ দশায় অতি আর্তভাবে নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া বলিতেন, 'এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নূতন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এদেশের ভাল হয়'।"

একথা সেদিনের চেয়ে বোধ করি বর্তমান কালেই বেশী সত্য।

মানুষ চিনতে সুদক্ষ ছিলেন বিদ্যাসাগর। মানুষের চরিত্র সম্পর্কে তাঁর ছিল প্রখর অন্তর্দৃষ্টি।

মানুষের চরিত্র অধ্যয়নে তাঁর দৃষ্টি ছিল অন্তর্ভেদী।

দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন যে আশুতোষের বয়স যখন দশ বছর, সেই সময় তিনি একদিন তাঁর কনিষ্ঠ পিতৃব্য রাধিকাপ্রসাদ, মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরকে দেখতে গিয়েছিলেন। সেই প্রথম দর্শন। দশ বছরের বালককে দেখে তিনি নাকি বলেছিলেন, "রাধিকাপ্রসাদ এ ছেলে ক্ষণজন্মা, এর প্রতিভায় বাংলাদেশ একদিন উজ্জ্বল হবে দেখো।" তারপরে তিনি আশুতোষকে একখানি 'রবিনসন্ ক্রুশো' উপহার দেন।

এই বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে আরো একটি সুন্দর দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন।

তখনো বাংলা দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্যে কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি। আনন্দমোহন বসু বিলেত থেকে আসার পরই এই সম্পর্কে একটা বিশেষ চেষ্টা দেখা দেয়। আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ ও শিবনাথ শাস্ত্রী এঁদের মধ্যে এ বিষয়ে একটা পরামর্শ হলো। তাঁদের মতে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান

এসোসিয়েশন ধনীদের সভা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেখানে প্রবেশের উপায় নেই, অথচ তাদের উপযুক্ত একটা রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক। তারপর এঁরা তিনজনে আরো কয়েকজন দেশহিতৈষী লোকের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। পরামর্শ হলো ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের বাড়িতে, অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ সে পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তারপর "যখন একটি সভাস্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহন বাবু ও আমি (শিবনাথ শাস্ত্রী) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বলিলেন, 'এতদ্বারা দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে।' আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রথম সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। কে কে এই উদ্যোগের মধ্যে আছে জিজ্ঞাসা করাতে আমরা যখন অপরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে অমৃতবাজারের দলের নাম করিলাম, তখন বিদ্যাসাগর বলিয়া উঠিল, 'যাঃ তবে তোমাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। ওদের এর ভেতর নিলে কেন'?" শিশিরকুমার ঘোষেদের প্রতি বিদ্যাসাগরের বিরক্তির কারণ জানা যায় না। কাজেই তাঁর এই উক্তিতে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রথমে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন; কিন্তু পরে তাঁর ভুল ভাঙল। শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন: "কি আশ্চর্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানব-প্রকৃতির অভিজ্ঞতা! কি আশ্চার্য ভবিষ্যদ্দর্শনের শক্তি! তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। একটি সভা স্থাপন করা স্থির হইলেই. আনন্দমোহন বাবুর মুখে শুনিলাম, শিশিরবাবুর দল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'এই সভায় সম্পাদক হবেন কে?' তাঁরা বলেন, সে পরে স্থির হবে, যাঁকে সকলে মনোনীত করিবেন, তিনিই হবেন। 'ভারত সভা' স্থাপনের বিজ্ঞাপন বাহির হইল। সে বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ার দুই-এক দিন পরে সংবাদপত্রে হঠাৎ বিজ্ঞাপন দেখা গেল যে 'ইণ্ডিয়া লীগ' নামে মধ্যবিত্তদিগের জন্য একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপন করিবার এক সভা হইবে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টীয় আচার্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতি ও শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া ঐ সভা স্থাপিত হইতেছে।

আমরা একেবারে গাছ হইতে পড়িয়া গেলাম। কারণ শিশিরকুমার আদি হইতে আমাদের পরামর্শের মধ্যেই ছিলেন।”

এই ঘটনার মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বিদ্যাসাগরের প্রভাব শহরের সীমা ছাড়িয়ে সারা বাংলাদেশে, এমন কি সারা ভারতবর্ষে সেদিন পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। বাংলার জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর ছিল নাড়ীর যোগ। “দূর মফঃস্বলে পল্লীগ্রামের মধ্যেও তাঁহার প্রভাব কতদূর বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহা চিন্তার অগোচর। সেই উদার স্নেহপূর্ণ হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর বঙ্গের যেসকল পুত্রকন্যার শ্রবণপথে প্রবেশ লাভ করিয়া হৃদয়ের ভিত্তিমূলে আঘাত দিয়াছে, তাঁহারা চিরদিন সেই কণ্ঠস্বরের স্মৃতিকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সংসারের কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন। সেই প্রাচ্য আর্য মনুষ্যত্বের মহাদর্শ তাঁহাদের জীবনকে যুগপৎ প্রণোদিত ও সংযমিত রাখিবে।” একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এমন অসাধারণ প্রভাব বিস্তারের নিদর্শন বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরেই প্রথম ও শেষ।

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িকদের মধ্যে আচার্য কৃষ্ণকমল ‘পুরাতন প্রসঙ্গে’ দুইটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু এরই ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে সাগর-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। রামতনু লাহিড়ী একদিন বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ও হে, একটা ভালো রাঁধুনী বামুন দিতে পার। বিদ্যাসাগর বললেন, সে কি কথা তনু? (রামতনু লাহিড়ীকে বিদ্যাসাগর ‘তনু’ বলে ডাকতেন)—তোমার বাড়িতে রাঁধুনী বামুন কেন? বয়-বাবুর্চিই দরকার। রামতনু বললেন, না হে, রান্নাঘরে অন্ততঃ একটা পৈতেওয়ালা বামুন চাই—নইলে স্ত্রী মঞ্জুর করবেন না। বিদ্যাসাগর বললেন, কেন, তখন বাবার ওপর রাগ করে পৈতে ত্যাগ করলে, আর এখন স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে পৈতেওলা রাঁধুনী বামুন চাই, এ বড় মজার কথা। এমনি স্পষ্টবক্তা মানুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এই। বিদ্যাসাগর একবার তাঁর বাবাকে কাশী রাখতে গিয়েছিলেন। উঠেছিলেন লোকনাথ মৈত্রের বাড়িতে। উমেশচন্দ্র দত্তের ওপর ভার পড়ল বিদ্যাসাগরকে ষ্টেশনে তুলে দিয়ে আসার জন্যে। তখনো গঙ্গার ওপর পুল হয়নি। রাজঘাট থেকে নৌকো করে গঙ্গা পার হতে হয়।

সারা রাত গল্প বলে কাটালেন। আশ্চর্য গল্পকার ছিলেন তিনি। হঠাৎ মাঝ রাতে বললেন, চুড়ি কিনতে হবে। উমেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কার জন্যে? বিদ্যাসাগর বললেন, নাতনি কাশীর চুড়ি চেয়েছে। তখনি উমেশ-চন্দ্রকে সঙ্গে করে চুড়ি কিনতে বেরোলেন। এমনি স্নেহপ্রবণ চিত্তের মানুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর।

শেষ জীবনে সমাজের হাতে উৎপীড়িত, অনাথা বাল-বিধবাদের চোখের জল মুছাতে গিয়ে কঠোর সমাজের তীব্র বিষাক্ত শরে বিদ্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর যেন যাবার সময়ে হতাশ হয়েই বলে গেলেন: "দেশের কিছু হইল না; পাপ দেশ পুণ্য কি, কর্তব্য কি, তাহা বুঝিল না। যদি উৎপীড়ন নিবারণ না হয়, যদি অত্যাচারী দণ্ডিত না হয়, তাহা হইলে আমার এ পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে আমার জীবন-ব্রতের উদ্যাপন হইবে কিসে? এ ব্রত সাধনেই তো আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি। এই ব্রত যদি সিদ্ধ না হইল, তাহা হইলে জীবন বৃথা।" তাই বুঝি তিনি দেশের ও জাতির জন্যে তাঁর সর্বস্ব পণ করেছিলেন। যা সত্য বলে বুঝেছিলেন, তা পালন করবার জন্যে জীবনে যে কত কষ্ট সহ্য করেছেন, তা বলে শেষ করা যায় না। বিদ্যাসাগর নিজে একবার বলেছিলেন, "সৎ কাজ করিবার সময় লোকের নিন্দাকে, লোকের কথাকে ভুলিতে না পারিলে এ পথে যাওয়া ঘোরতর অন্যায়। আমাকে লোকেরা এতদূর নীচ কথা পর্যন্ত বলিয়া সময়ে সময়ে গালি দিয়াছে যে, আমি চরিত্রহীন বলিয়া অল্পবয়স্কা বিধবাদিগকে বাড়িতে আশ্রয় দিই।" বিদ্যাসাগরকে কত নিন্দা, কত নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল, এতেই তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অবিচলিত চিত্তে একদিনের জন্যেও কর্তব্য-ভ্রষ্ট হননি। স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি। বিদ্যাসাগর তাই বীর। বীরত্বের এমন মূর্তি বাঙালি বহুকাল দেখেনি। তাঁর মহান ও কর্মবিপুল জীবন বাঙালির কাছে শাশ্বত প্রেরণা। হিমগিরির তুষারকিরীটী শেখরের মতো সমগ্র সম্পূর্ণ সেই মহাজীবনের স্রষ্টাকে প্রণাম।

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব ও উদারতা সত্যই আমাদের অভিভূত করে। এ কথা সেদিনও যেমন সত্য ছিল, আজো তেমনি সত্য। "আসলে বিদ্যাসাগর দেবত্ব

ও ব্রাহ্মণ্যের সকল গৌরবই-বর্জিতভাবে মানুষকে মানুষরূপেই মহৎ ও মহনীয় দেখিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহা চাহিয়াছিলেন বলিয়াই এই গুরু ও শালগ্রাম শিলার দেশে তাঁহাকে অপরিসীম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। অকারণ আঘাতে আঘাতে তাঁহার কুসুম-কোমল মন পাষাণ কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল··· কিন্তু এই অসহায় নিপীড়িত সমাজের জন্য তাঁহার কল্যাণ হস্তকে নিরস্ত করেন নাই ; বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই মানব-প্রীতিই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বস্তু।"

অথচ এই ভাব তাঁর মধ্যে প্রবল থাকা সত্ত্বেও সত্যের অনুরোধে তিনিই মানুষকে পদে পদে আঘাত করেছেন; এমন কি, আত্মীয়-পরিজন ও সমাজকেও আঘাত করতে বিদ্যাসাগর কুণ্ঠিত হন নি। মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা, সত্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠাকে কিছুতেই কিছুমাত্র দুর্বল করতে পারেনি।

"যেখানেই দেখেছেন তিনি অনাচার—তা বুদ্ধিরই হোক, ধর্মেরই হোক, জ্ঞানেরই হোক, সেখানেই তাঁর চাবুক পড়েছে অকুণ্ঠিত চিত্তে।" সেখানে তিনি নির্মম, কঠোর। তাঁর জীবনের মূল প্রেরণা ছিল মানবিকতা। মানবিক সমস্যা হিসাবেই তিনি সমাজের সব প্রশ্ন, সব সমস্যাকে দেখেছিলেন। তাঁর সাহস ছিল অতুলনীয়, দাক্ষিণ্য ছিল অপূর্ব। এই দাক্ষিণ্য আর দুঃসাহসের মধ্যেই সার্থক বিদ্যাসাগরের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা। বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন মানেই বিশালতর বহুর বিরুদ্ধে একের অভিযান। বিদ্যাসাগরকে মনে পড়লে মনে হয়, যেন জগতের ভিড় ঠেলে কেউ উচ্চ লক্ষ্যে ধ্রুবতারার দিকে বদ্ধদৃষ্টি হয়ে অগ্রসর হচ্ছেন।

যে হাত দিয়ে বালক বিদ্যাসাগর একদিন হলুদ বেঁটেছেন, কাঠ চিরেছেন, বাসন মেজেছেন, সেই হাত দিয়েই পরবর্তীকালে যুগ-সারথি বিদ্যাসাগর বাংলার শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রেখে গেছেন। মহাকালের হস্তাবলেপেও সে স্বাক্ষর মুছে যাবার নয়, সে কর্মকীর্তি বিলুপ্ত হবার নয়। কালের অন্তর প্রেরণা বিদ্যাসাগরের কর্মে গতি দিয়েছে বরাবর। ভাব-বিপ্লবের ভগীরথ তিনি। হারিয়ে যাওয়া জীবনবোধকে তিনিই পরম আগ্রহে তুলে ধরেছিলেন বাঙালির সম্মুখে। সমাজের শীর্ষদেশে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়েরই শক্তিতে আর অলৌকিক বেদনাবোধ নিয়ে।

দাতা, পরোপকারী, শিক্ষাব্রতী, সমাজ-সংস্কারক বা সাহিত্য-স্রষ্টা—এই কি বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ পরিচয়?—না, তা নয়। যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর এক নতুন যুগের স্রষ্টা। রামমোহনের পর বাংলার দ্বিতীয় যুগপুরুষ তিনি। তিনিই বাঙালির জীবনে জীবন-প্রভাতের শুভ প্রেরণা। এই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। তিনি অতীতকে সর্বপ্রযত্নে অতিক্রম করে চলার জন্য এক নতুন পথ সৃষ্টি করেছিলেন। এই নতুন পথ তৈরি করতে গিয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন—"আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের জন্য যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক তাহা করিব, লোকের বা কুটম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"

বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবনের সর্বোত্তম বাণী এই।

এরই অনুশীলনে সার্থক তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি চিন্তা ও কর্ম।

দেশহিত-ব্রতে সম্যক্ আত্মসমর্পিত সেই যুগপুরুষকে প্রণাম।

মহত্ত্ব এবং পৌরুষের সেই জ্যোতির্ময় বিগ্রহকে প্রণাম।

প্রণাম মানব-ঈশ্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে।

কলেজ স্কোয়ারে (কলিকাতা) বিদ্যাসাগরের মর্মর মূর্তি।

অমর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যার সাগর,
শতধারা দয়ার প্রভব ধরাধর।
অনাথার চিরবন্ধু দেশহিতে রত,
শিক্ষা সমুন্নতি ব্রতে দীক্ষিত সতত।
সরল স্বাধীনচেতা কোমল অন্তর,
বঙ্গভাষা নলিনীর নব বিভাকর।
ভক্তিভরে স্মরি তারে স্বদেশনিবাসী,
স্থাপিল এ মূর্তি অতরল অশ্রুরাশি।

বি দ্যা সা গ র

দ্বিতীয় খণ্ড

সাগর-তর্পণ

বাংলার বহু মনীষী তাঁদের অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বিদ্যাসাগরকে। তাঁদের এক একজন বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন এক এক দিক থেকে। এই সব রচনার ভেতর দিয়ে বিদ্যাসাগরের বহুমুখি চরিত্রের এবং লোকোত্তর তাঁর জীবনের একটা সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার একাধিক কবি তাঁদের অন্তরের ভক্তির অর্ঘ্য দান করেছেন বিদ্যাসাগরের চরণে। এই রকম কয়েকটি গদ্য ও পদ্য রচনা সংকলন করে আমরা সাগর-তর্পণ করলাম।

১

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ—যে গুণে তিনি পল্লী আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালি জীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগ প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া—হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে—করুণার অশ্রুপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যদি তাঁহার সেই গুণকীর্তন করিতে বিরত হই, তবে আমার কর্তব্য একেবারেই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। কারণ বিদ্যাসাগরের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারংবার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালি বড়লোক ছিলেন, তাহা নহে, তিনি যে রীতিমতো হিন্দু ছিলেন, তাহাও নহে—তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড় ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র তাঁহার প্রতিভার উপর নির্ভর করিতেছে না। প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশ মাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো, আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্বব্যাপী ও স্থির। প্রতিভা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ—আর, মনুষ্যত্ব জীবনের সকল মুহূর্তেই সকল কার্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে। প্রতিভা অনেক সময় বিদ্যুতের ন্যায় আপনার আংশিকতা বশতই লোকচক্ষে তীব্রতররূপে আঘাত করে এবং চরিত্রমহত্ত্ব আপনার ব্যাপকতা গুণেই প্রতিভা অপেক্ষা ম্লানতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা, ভাবিয়া দেখিলে, সে বিষয়ে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না।

ভাষা প্রস্তর অথবা চিত্রপটের দ্বারা সত্য এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করা ক্ষমতার কাজ, সন্দেহ নাই, তাহাতে বিবিধ বাধা অতিক্রম এবং অসামান্য নৈপুণ্য

প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা সেই সত্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা অপেক্ষাকৃত আরো বেশি দুরূহ, তাহাতে পদে পদে কঠিনতার বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং তাহাতে, স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও নৈপুণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক হয়।

এই চরিত্ররচনার প্রতিভা কোনো সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র মানিয়া চলে না। প্রকৃত কবির কবিত্ব যেমন অলঙ্কার শাস্ত্রের অতীত, অথচ বিশ্বহৃদয়ের মধ্যে বিধি-রচিত নিগূঢ়নিহিত এক অলিখিত অলঙ্কার শাস্ত্রের কোনো নিয়মের সহিত তাহার স্বভাবত কোনো বিরোধ হয় না, তেমনি যাঁহারা যথার্থ মনুষ্য তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরের মধ্যে, অথচ বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের সমস্ত নিত্যবিধান-গুলির সঙ্গে সে শাস্ত্র আপনি মিলিয়া যায়। অতএব অন্যান্য প্রতিভায় যেমন "অরিজিন্যালিটি" অর্থাৎ অনন্যতন্ত্রতা প্রকাশ পায়, মহচ্চরিত্র বিকাশেও সেই অনন্যতন্ত্রতার প্রয়োজন হয়। অনেকে বিদ্যাসাগরের অনন্যতন্ত্র প্রতিভা ছিল না বলিয়া আভাস দিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন, অনন্যতন্ত্রত্ব কেবল সাহিত্যে এবং শিল্পে, বিজ্ঞানে এবং দর্শনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল। এত বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুই-এক জনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এইরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চারকোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন, সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন। কি নিয়মে বড়োলোকের অভ্যুত্থান হয়, তাহা সকল দেশেই রহস্যময়—আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্মা ভীরু-হৃদয়ের দেশে সে রহস্য দ্বিগুণতর দুর্ভেদ্য। বিদ্যাসাগরের চরিত্রসৃষ্টিও রহস্যা-বৃত—কিন্তু ইহা দেখা যায়, যে চরিত্রের ছাঁচ ছিল ভালো। ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে প্রথমেই তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লোকটি অনন্যসাধারণ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোনো সম্পত্তি

দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয় সম্পদের উত্তরাধিকারবণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্রমাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে গোপাল নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপমায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন, তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক্, পিতা যাহা বলিতেন, তিনি ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসিতেন। পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের সময় যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন, তখন প্রতিবেশী মথুর মণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে প্রকার সভ্যবিগর্হিত উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্বজননিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনও করে নাই।

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনী লেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালি জাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে।

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ, দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবণ বাঙালি হৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালি-জন সুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায়, তাহা নহে, তাহাতে বাঙালিদুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রকৃতির ক্ষণিক উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচলকর্তৃত্ব সর্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্ট লাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না। কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেক সময় সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়; তাহা কেবল আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির

উচ্ছ্বাসনিবৃত্ত এবং হৃদয়ের ভারলাঘব করা নহে ; তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ,—পুরুষোচিত ; এই জন্য তাহা সরল এবং নির্বিকার ; তাহা কোথাও সূক্ষ্ম তর্ক তুলিত না, নাসিকা কুঞ্চন করিত না ; বসন তুলিয়া ধরিত না ; একেবারে দ্রুতপদে, ঋজুরেখায়, নিঃশঙ্কে, নিঃসঙ্কোচে আপন কার্য নিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাঁহাকে কখনো রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে নাই। এমন কি, কার্মাটাড়ে এক মেথরজাতীয় স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটীরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাঁহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্ধমান বাসকালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয় নির্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল, তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমরা যাঁহাদিগকে ভালো মানুষ অমায়িক প্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণত তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা বেশি। অর্থাৎ কর্তব্যস্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না।

বিদ্যাসাগর যদিচ ব্রাহ্মণ, এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান, সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই কাণ্ডজ্ঞানটি যদি না থাকিত, তবে যিনি এক সময় ছোলা ও বাতাসা জলপান করিয়া পাঠশিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি অকুতোভয়ে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনজীবিকা অবলম্বন করিয়া জীবনের মধ্যপথে সচ্ছল স্বচ্ছন্দাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দয়ার অনুরোধে যিনি ভূরি ভূরি স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, যিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ আত্মসম্মানকে মুহূর্তের জন্য তিলমাত্র অবনত হইতে দেন নাই, যিনি আপনার ন্যায়সঙ্কল্পের ঋজু রেখা হইতে কোনো যন্ত্রণায়, কোনো প্রলোভনে দক্ষিণে বামে কেশাগ্র-পরিমাণ হেলিতে চাহেন নাই, তিনি কিরূপ প্রশস্ত বুদ্ধি এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বলে সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া সাহসের আশ্রয় দাতা হইয়াছিলেন। গিরিশৃঙ্গের দেবদারুদ্রুম যেমন শুষ্ক শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, প্রাণঘাতক হিমানী বৃষ্টি শিরোধার্য করিয়া, নিজের আভ্যন্তরীণ কঠিন শক্তির দ্বারা আপনাকে প্রচুর সরসশাখপল্লবসম্পন্ন সরল মহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে

—তেমনি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্মদারিদ্র্য এবং সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্য্যাপ্ত বলবুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন সর্বসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে বিদ্যাসাগর হীনতম শ্রেণীর লোকেরও দুঃখমোচনে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি কৃত্রিম কপটভক্তি দেখাইয়া কাশীর ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ইহাই বলিষ্ঠ সরলতা, ইহাই যথার্থ নিজের অশনবসনেও বিদ্যাসাগরের একটি অটল সরলতা ছিল। এবং সেই সরলতার মধ্যেও দৃঢ় বলের পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের তিলমাত্র সম্মান রক্ষার প্রতিও তাঁহার লেশমাত্র শৈথিল্য ছিল না। আমরা সাধারণত প্রবল সাহেবী অথবা প্রচুর নবাবী দেখাইয়া সম্মান লাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আড়ম্বরের চাপল্য বিদ্যাসাগরের উন্নত-কঠোর আত্মসম্মানকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূষণহীন সারল্যই তাঁহার রাজভূষণ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার দরিদ্রা জননীদেবী চরকাসূতা কাটিয়া পুত্রদ্বয়ের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন। সেই মোটা কাপড়, সেই মাতৃস্নেহ-মণ্ডিত দারিদ্র্য তিনি চিরকাল সগৌরবে সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতিচাদর পরিয়া সর্বত্র সম্মান লাভ করেন, বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। আমাদের এই দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না।

সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন, চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন।

বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে—বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধি সহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন; কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লীঝঙ্কার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

বিদ্যাসাগরের কথা বাংলায় সুবিদিত—কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকলেই তাঁহাকে জানেন। তাঁহার জীবনের তথ্যমূলক ঘটনাবলী আমাদের সকলেরই সুপরিচিত। কিন্তু এ কথাটা হয়ত অনেকে জানেন না যে, ঐতিহাসিক তথ্যই জীবনের তত্ত্ব নয়, সেগুলি সংবাদমাত্র। সংবাদের নেপথ্যে যে সংঘাত-প্রতিঘাত থাকে, যে আবেগ, যে প্রতিভা, যে প্রেরণা থাকে তাহার রহস্যই জীবন-রহস্য। সামান্য মানুষের জীবন-রহস্য উদ্ঘাটন করাও সহজ নয়, বিদ্যাসাগরের মত বিরাট জীবনের রহস্য উপলব্ধি করা আরো দুরূহ। তাঁহাকে আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার কথা শুনিয়াছি, লেখা পড়িয়াছি, তাঁহার কার্য-কলাপের ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি—তা সত্ত্বেও তাঁহাকে যে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছি এমন কথা আমি অন্ততঃ বলিতে পারি না। বিদ্যাসাগরের পূর্ণরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে যে মানসিকতার প্রয়োজন, তাহা আমার নাই। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়া তাঁহাকে যতটুকু যে ভাবে বুঝিয়াছি, তাহাই কেবল আজ আপনাদের নিকট নিবেদন করিব।

বিদ্যাসাগর মানুষ ছিলেন। মনুষ্যত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণগুলি তাঁহার জীবনে, আচরণে ও কথায় বিবৃত হইয়া আছে বলিয়াই আমরা তাঁহাকে মানবশ্রেষ্ঠ

বলিতে দ্বিধা করি না। এমনি একজন মানবশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। রাজার মনন, কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার সঙ্গে এই ব্রাহ্মণের মনন, কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার বহু সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাই। এই দুইটি বিরাট চরিত্র পাশাপাশি রাখিয়া আমি অনেক সময় গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছি, দেখিয়াছি একটি অখণ্ড মানবিকতার এপিঠ রামমোহন, ওপিঠ বিদ্যাসাগর। দুইজনেই অপরাজিত চিত্তে বিরোধিগণের সকল কটুক্তি সহ্য করিয়াছেন; দুইজনেরই প্রবর্তিত আন্দোলন-তরঙ্গ সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এইখানে আমি একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করিব, যাহা বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের গুরুত্ব বুঝিতে সহায়তা করিবে। আমি সমসাময়িক কালের বহু কাগজপত্রে দেখিয়াছি যে, বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলন কেবলমাত্র কলিকাতা বা বাংলা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বিদ্যাসাগরের জীবিতকালেই ভারতবর্ষের বহু প্রদেশেই ইহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং বহু প্রদেশেই বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই আন্দোলনের প্রবর্তক হিসাবে বিদ্যাসাগরের নাম, তাঁহার জীবিতকালেই পাঞ্জাব, বোম্বাই, মহারাষ্ট্র এমন কি মাদ্রাজ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাংলা দেশের বিধবাবিবাহ আন্দোলন আরম্ভ হইবার ছয় বৎসর পরেই মহারাষ্ট্র প্রদেশে বিধবাবিবাহ আরম্ভ হয়। বালগঙ্গাধর তিলক বিদ্যাসাগরের নামে শ্রদ্ধায় শির অবনত করিতেন—ইহা আমার স্বচক্ষে দেখা। দুইজনেই কর্মজীবনে কলিকাতার অগ্রসর, উদার, চিন্তাশীল ও সংস্কার-প্রয়াসী লোকেদের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছিলেন; দুইজনেই বড় বড় পণ্ডিতদের সভায় শাস্ত্রীয় বিচার করিয়াছেন—রামমোহন বেদান্তধর্মের ব্যাখ্যায়, আর বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের সমর্থনে। এই রকম বহু আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাই এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে। ইঁহারা প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানব সমাজেরই বরেণ্য, কেবলমাত্র বাঙালি বা ভারতবাসীর নয়।

মনুষ্যত্বের লক্ষণ কি? প্রাণী-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে মানুষও এক প্রকার পশু। পশু হইলেও তাহার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কি সেই বৈশিষ্ট্য? কেহ বলেন মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব, কেহ বলেন সে বিবেকী, কাহারও মতে মানুষ সামাজিক। বার্ক, এ্যাডাম স্মিথ, কবি বায়রণ ও সেক্সপীয়র

প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক ও প্রাচীনকালের অনেক মনীষীই মানুষের সংজ্ঞা নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু গীতায় বিশ্বরূপ-দর্শন অধ্যায়ে মানুষের যে সংজ্ঞা আছে, তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মানুষ স্রষ্টা। অন্যান্য প্রাণীরাও সৃষ্টি করে, কিন্তু তাহাদের সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য নাই। উইপোকা উই ঢিপি ছাড়া কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না, যুগযুগান্ত ধরিয়া সে উহাই করিতেছে। এক এক রকমের পাখী এক এক রকমের বাসা তৈরি করিতে দক্ষ। কিন্তু মানুষের সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়। মানবসভ্যতা স্রষ্টা মানবের কীর্তি, তাহারই নব নব সৃষ্টিতে ইহা সমৃদ্ধ। সৃষ্টিই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, নিত্য নূতন দৃষ্টিতে সে নিজেকে আবিষ্কার করিতেছে, তাহাতেই তাহার আনন্দ, পুরাতনের শৃঙ্খলে সে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। তাহার মনীষা নিত্য নূতন লোকে উত্তীর্ণ হইবার জন্য উন্মুখ, এজন্য যুগে যুগে বহু বিপদকে সে বরণ করিয়াছে। সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছে, পর্বত লঙ্ঘন করিয়াছে, ব্যাধ-জীবনের অবসান করিয়া কৃষি সভ্যতার পত্তন করিয়াছে, কৃষি সভ্যতাকে পিছনে রাখিয়া শিল্পসভ্যতা গড়িয়াছে, অরণ্য কাটিয়া পল্লী বসাইয়াছে, পল্লীকে নগরে রূপান্তরিত করিয়াছে। সৃষ্টি করিয়াছে, নিজের সৃষ্টিকে ধ্বংসও করিয়াছে নবতর সৃষ্টির প্রেরণায়। বিশ্বপ্রকৃতির মতন মানব-প্রকৃতিও সতত সংগ্রামশীল।

মানুষ পশু বটে, কিন্তু সে বিদ্রোহী পশু। প্রকৃতির প্রতিভাবান দুরন্ত অশান্ত সন্তান সে। প্রকৃতির কোন শাসনকেই সে মানিয়া লয় নাই। সে রাত্রির অন্ধকারে আলো জ্বালিয়াছে, দিবসের প্রখর আলোকে রুদ্ধঘরে বসিয়া কৃত্রিম অন্ধকার উপভোগ করিয়াছে। আহারে নিদ্রায় প্রজননে প্রকৃতির কোন বিধান, কোন সীমা, কোন গণ্ডীকে সে মানে নাই। ইহার জন্য শাস্তিভোগ করিয়াছে, তবু মানে নাই। নানাবিধ আবিষ্কারের সাহায্যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতাকে দূর করার প্রচেষ্টাই যেন তাহার সভ্যতার পরিচয়। নব নব সৃষ্টিতে সে নিজেকেই যেন অতিক্রম করিতে চাহিতেছে। পথ দুর্গম, কিন্তু তবু সে আনন্দিত। এই আনন্দের প্রেরণাই তাহার পাথেয়।

বিদ্যাসাগরের বিচিত্র জীবনের দিকে তাকাইলে আমরা একজন স্রষ্টা মানুষকেই দেখিতে পাই। সেই বিরাট পুরুষের মহিমা সহজে অনুভবগম্য

হয় না। সমাজ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহাকে চরিত্র-হীন বলিতেও ইতস্তত: করে নাই। ইহাই তো প্রত্যাশিত। তাঁহার চরিত্রের গভীরতা উপলব্ধি করিতে হইলে গভীর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। তিনি তাঁহার প্রত্যেকটি কর্মে শ্রেষ্ঠ মানুষের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর-মানসের সম্পূর্ণ রূপ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা বাঙালির নাই। বিদ্যাসাগরের অপূর্ব জ্ঞানস্পৃহা, সর্বতোমুখী প্রতিভা, অতন্দ্র অধ্যয়ন-তপস্যা, সমদৃষ্টি আর অতুলনীয় সৃজনীশক্তি—কোন্ বাঙালি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে? তিনি তো আমাদের মতন অন্তঃপুরের অন্ধকারে নিষ্ফল নির্জীব জীবন যাপন করেন নাই। জীবনের মূলমন্ত্ররূপে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন উপনিষদের সেই পূতবাণী 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম'—একমাত্র সত্যই জয়যুক্ত হয়, মিথ্যা নয়। ইহাই ভারতের শাশ্বত পন্থা। বিদ্যাসাগর আজীবন চলিয়াছেন সেই কঠিন পথেই দৃঢ় পদবিক্ষেপে এবং অকুতোভয়ে। সমাজের অর্থহীন অযৌক্তিক, নির্দয় বিধিবিধান, যাহা দেশের বায়ু বিষাক্ত করিয়া তোলে, জাতির প্রাণশক্তিকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলে, তাহারই বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছিলেন একজন সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ক্রূরবুদ্ধি ও স্বার্থান্বেষী সমাজশাসকগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন বিদ্যাসাগর। শাণিত ক্ষুরের ধারের ন্যায়ই দুর্গম পথে তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন একাকী—সেদিনের পরিবেশে ইহা অপেক্ষা বিস্ময়জনক ব্যাপার আমরা আর কি কল্পনা করিতে পারি? বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দুসমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দু সমাজেরই নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই বিশেষ একটি মর্মান্তিক প্রয়োজন বোধের ভিতর দিয়াই বিদ্যাসাগর আসিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর আকস্মিক নন, খাপছাড়াও নন। যে দেশে, যে কালে এবং যে সমাজে তাঁহার উদ্ভব, সেখানকার সমগ্রের সহিত তাঁহার গভীরতম জীবনের যোগ আছে। ইতিহাসে তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট যে ভূমিকা ছিল, সেখানে একমাত্র বিদ্যাসাগর ভিন্ন আর কাহাকেও মানাইত না।*

—ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

* ১৯০১ সালে ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভায় প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ। মূল ভাষণ ইংরেজিতে; অনুবাদ গ্রন্থকারের।

৩

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের মধ্যে আর নাই, কিন্তু পুরুষানুক্রমে তিনি বঙ্গবাসীদিগের প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তিনি ইদানীন্তন বঙ্গসাহিত্যের প্রণেতা, তিনি বঙ্গ সমাজের সংস্কার-কর্তা, তিনি হৃদয়ের ওজস্বিতা ও দাক্ষিণ্য গুণে জগতের একজন শিক্ষাগুরু। গুরু আজি পাঠশালা বন্ধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার কীর্তিমণ্ডিত চিত্রখানি ধ্যান করিয়া দুইটি এক বিষয় আজি শিক্ষা লাভ করিব।

যাঁহাদিগের বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে, আজি তাঁহারা নিজ শৈশবাবস্থার কথা স্মরণ করিতেছেন। সে সময়ের বঙ্গসমাজ অদ্যকার সমাজের মত নহে, তখনকার সাহিত্য অদ্যকার সাহিত্যের ন্যায় নহে। প্রাচীনা গৃহিণীগণ অথবা দোকানী পসারী লোকে রামায়ণ মহাভারত পড়িতেন, যুবকগণ ভারতচন্দ্র আওড়াইতেন, শাক্তগণ রামপ্রসাদের গান গাহিতেন, নব্য সম্প্রদায় নিধুবাবুর টপ্পা গাহিতেন, অথবা দাশুরায়ের ভক্ত ছিলেন। বৈষ্ণব পাঠক কেহ কেহ চৈতন্যচরিতামৃতের পাতা উল্টাইতেন, শাক্ত পাঠক কেহ কেহ মুকুন্দরামের চণ্ডীখানি খুলিয়া দেখিতেন। এই ছিল বাঙ্গালা পদ্যের অবস্থা, সুমার্জিত বাঙ্গালা গদ্য তখনও সৃষ্টি হয় নাই।

এইরূপ কালে ক্ষণজন্মা ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার সহস্র সদ্‌গুণের মধ্যে তাঁহার ওজস্বিতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাই সর্বপ্রধান গুণ। যেটি কর্তব্য সেটি অনুষ্ঠান করিব,—যেটি অনুষ্ঠান করিব সেটি সাধন করিব,—এই ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ের সংকল্প। সমস্ত সমাজ যদি বাধা দিবার চেষ্টা করে, সিংহবীর্য ঈশ্বরচন্দ্র সে সমাজব্যূহ ভেদ করিয়া তাঁহার অলঙ্ঘনীয় সংকল্প সাধন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র আজি আমাদের এই পরম শিক্ষাদান করিতেছেন,—এই শিক্ষা যদি আমরা লাভ করিতে পারি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের হস্তে,—পরের হস্তে নহে।

ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, বঙ্গভাষায় সুমার্জিত নির্মল হৃদয়গ্রাহী গদ্যগ্রন্থ নাই। ক্ষণজন্মা ঈশ্বরচন্দ্র স্বহস্তে তাহার সৃষ্টি করিলেন। সংস্কৃত ভাষার অমূল্য ভাণ্ডার হইতে সুন্দর সুন্দর পবিত্র গল্প ও পবিত্র ভাব নির্বাচন করিলেন, সংস্কৃতরূপ মাতৃভাষার সাহায্যে—নূতন ভাষায় সেই গল্প সেই ভাব প্রকাশ করিলেন, নিজের হৃদয় গুণে, নিজের প্রতিভা বলে সেই গল্পগুলি মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়া বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের উচ্চতম স্থানে স্থাপন করিলেন। বেতাল-পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা ও সীতার বনবাস, কোন্ বাঙালি ভদ্রমহিলা এই পুস্তক-গুলি পড়িয়া চক্ষুজল না বর্ষণ করিয়াছেন? কোন্ সহৃদয় বাঙালী অদ্যাবধি যত্নসহকারে পাঠ না করে? ঈশ্বরচন্দ্রের একটি সংকল্প সাধিত হইল,—নির্মল সুমার্জিত বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হইল। ইহাতেই বিদ্যাসাগর নিরস্ত রহিলেন না। আপনি যে পথে গিয়াছেন, প্রতিভাসম্পন্ন স্বদেশবাসীগণকে সেই পথে লইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সংস্কৃত না শিখিলে বাংলা ভাষার ও বাঙ্গলা গদ্যের উন্নতি নাই। কিন্তু সংস্কৃত কে শেখায়, কে শিখে? টোলে পড়িতে যাইলে অর্ধেক জীবন তথায় যাপন করিতে হয়,—তখনকার পণ্ডিতগণ বলিতেন, এইরূপ না করিলে সংস্কৃত শিক্ষা হয় না। তবে কি শিক্ষিত হিন্দুগণ চিরকাল ঐ পবিত্র ভাষায় বঞ্চিত থাকিবে? তবে কি হিন্দুদিগের পৈতৃক রত্নরাজি ও অনন্ত ভাণ্ডার হিন্দুদিগের চিরকাল অবিদিত থাকিবে? তবে কি হিন্দুজাতির গৌরব স্বরূপ সংস্কৃত সাহিত্য কেবল অল্প সংখ্যক লোকের একচেটিয়া ধন হইয়া থাকিবে?

বিদ্যাসাগর চিন্তা করিলেন, বিদ্যাসাগর উপায় উদ্ভাবন করিলেন, বিদ্যাসাগর কার্য অনুষ্ঠান করিলেন, বিদ্যাসাগর কার্য সম্পন্ন করিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার একচেটিয়াত্ব উঠিয়া গেল, সহস্র সহস্র দেশানুরাগী যুবক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ভাবিত সরল প্রণালীর দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যের মধুরতা আস্বাদন করিল, প্রাচীন গ্রন্থের, প্রাচীন রীতির, প্রাচীন ধর্মের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা অনুভব করিল—ক্রমে আজি হিন্দুসমাজ সেই প্রাচীন পবিত্রতার দিকে ধাবিত হইতে চলিল। স্বার্থপর লোকের কি এ সমস্ত গায়ে সহে? হিন্দু-ধর্মের ভণ্ডামি করিয়া যাহারা পয়সা আদায় করে, তাহারা সনাতন হিন্দু-ধর্মের দ্বার উদ্ঘাটিত দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। আবার দ্বার রুদ্ধ কর,—আবার শিক্ষিত দেশহিতৈষীদিগকে প্রাচীন শাস্ত্র-ভাণ্ডার হইতে বঞ্চিত কর,—আবার

স্বার্থপরদিগকে সেই ভাণ্ডারের প্রহরী স্বরূপ স্থাপন কর, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য নষ্ট হয়, ভাণ্ডারীদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম লোপ হইয়া উপধর্মের অন্ধকারে দেশ পুনরায় আবৃত হয়, তাহাতে হানি কি? ভাণ্ডারীদিগের পয়সা আদায়ের উপায় হয়। বৃথা আশা! জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে—হিন্দুজাতি আপনদিগের প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন বিজ্ঞান, প্রাচীন ধর্ম পুনরায় চিনিতে পারিয়াছে, তাহারা সে ধনে আর বঞ্চিত হইবে না।

তাহার পর? তাহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় সামাজিক উন্নতি-সাধনে কৃত-সংকল্প হইলেন। নির্জীব জাতির সামাজিক উন্নতি-সাধন করা কত কষ্টসাধ্য, তাহা আমরা অদ্যাবধি পদে পদে দেখিতে পাইতেছি। হিন্দুনারীদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করাতে স্বার্থপর পুরুষে কত বাধা দেয়, তাহা আমরা আধুনিক ঘটনা হইতে দেখিতে পাইতেছি। যাঁহারা নিজে আর্য সন্তান বলিয়া দর্প করেন, তাঁহারাই বাল্যবিবাহ, বিধবার চিরবৈধব্য প্রভৃতি অনার্য প্রথাগুলি সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। যাঁহারা নিজে হিন্দুয়ানীর গর্ব করেন, তাঁহারাই রমণীগণকে অশিক্ষিত রাখা ও দাসীর ন্যায় ব্যাবহার করা প্রভৃতি অহিন্দু আচারগুলি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এ সমস্ত কু-প্রথা ও কুতর্কের একমাত্র ঔষধি আছে; এ সমস্ত অহিন্দু আচার প্রতিবিধান করিবার একমাত্র উপায় আছে,—সে ঔষধি ও সে উপায়—প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের আলোচনা।

অদ্যাবধি কুসংস্কারের এরূপ বল থাকে, তাহা হইলে ত্রিংশৎ বৎসর পূর্বে ইহার কিরূপ বল ছিল ইহা সহজেই অনুভব করা যায়। সামান্য লোকে এইরূপ অবস্থায় হতাশ হইত;—কৃতসংকল্প ঈশ্বরচন্দ্র হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। একদিকে স্বার্থপরতা, জড়তা, মূর্খতা ও ভণ্ডামি,—অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার পুরুষদিগের হৃদয়-শূন্যতা, নির্জীবজাতির নিশ্চলতা,—অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুরীতির চল, উপধর্মের উৎপীড়ন, অপ্রকৃত হিন্দুধর্মের অত্যাচার, গণ্ড মূর্খ, স্বার্থপর ভট্টাচার্যদিগের মত, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে নির্জীব, নিশ্চল, তেজোহীন বঙ্গসমাজ—অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আমাদিগের নির্জীব বঙ্গসমাজে এরূপ

ব্যাপার বড় অধিক দেখা যায় নাই,—পবিত্রনামা রামমোহনের পর এরূপ তীব্র যুদ্ধ, এরূপ সামাজিক দ্বন্দ্ব, এরূপ সংকল্প, এরূপ অনুষ্ঠান, এরূপ সিংহবীর্য বড় দেখা যায় নাই। পুরুষ-সিংহের সম্মুখে সমাজের মূর্খতা ও স্বার্থপরতা হটিয়া গেল, সামাজিক যোদ্ধা অসি হস্তে পথ পরিষ্কার করিয়া বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আইন জারি করাইলেন, বিদ্যাসাগরের গৌরবে দেশ পূর্ণ হইল, বিদ্যাসাগরের বিজয় লাভে প্রকৃত হিন্দুসমাজ উপকৃত হইল।

আর একটি মহৎ কার্যে ঈশ্বরচন্দ্র হস্তক্ষেপ করেন। আমাদের প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সন্তানাদি না হইলে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের বিধান আছে, নচেৎ ইচ্ছানুসারে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্য দেহের সৌন্দর্য, বল, তেজ ও গৌরব সমস্তই যেরূপ মৃত্যুর পর লোপ প্রাপ্ত হয়, এবং অবয়ব খানি বিকৃত ও পুতিগন্ধপূর্ণ হয়,—জাতীয় জীবন লোপ হইলে জাতীয় ধর্ম সেইরূপ সৌন্দর্য, পবিত্রতা ও উপকারিতা হারাইয়া নানারূপ জঘন্য আচার-ব্যবহারে পরিবৃত হয়। দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের কারণ ও আবশ্যকতা বিস্মৃত হইয়া এক্ষণকার স্বার্থপর বিলাস লালসা-পরায়ণ পুরুষগণ ইচ্ছানুসারে বহুবিবাহ করাই হিন্দু আচার বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং ভণ্ড ব্যবসায়ীগণ এই কুপ্রথাই ধর্ম বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এইরূপেই আমাদের দেশের, আমাদের জাতির, আমাদের ধর্মের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। যাহা কিছু সরল, পবিত্র ও সমাজের উপকারী ছিল, তাহা বিকৃত বা বিলুপ্ত বা জঘন্য আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং মনুষ্য জীবন বহির্গত হইলে পুতিগন্ধপূর্ণ শব লইয়া আহারপ্রিয় কীটের যেরূপ উল্লাস হয়, জাতীয় জীবন-শূণ্য হিন্দুদিগের বিকৃত আধুনিক অহিন্দু আচরণ ও রীতিগুলি পয়সা-প্রিয় ভণ্ডগণের সেইরূপ উল্লাসের কারণ হইয়াছে। কোন সংস্কার আরম্ভ হইলেই তাহাদিগের একচেটিয়া রোজকারের উপায় হ্রাস হয়,—সুতরাং ধর্ম গেল, ধর্ম গেল বলিয়া চিৎকার আরম্ভ হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় আইন দ্বারা বহু-বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইলেন কিন্তু তাহাতে বিফল প্রযত্ন হইলেন। আমাদিগের বিদেশীয় রাজা সত্যই বলিলেন, "যদি তোমাদের সামাজিক কোনও কুপ্রথা উঠাইবার ইচ্ছা থাকে, সমাজ সে বিষয় যত্ন করুক—আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না। কেবল দণ্ডনীয় অপরাধ মাত্র আমরা নিষেধ করিতে পারি।"

রাজা এ বাক্য প্রতিপালন করিয়াছেন,—পাশব অপরাধ দুই একটি আইন দ্বারা নিষেধ করিয়াছেন, নচেৎ সামাজিক আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরীর ক্রমশঃ হীনবল হইতে লাগিল। আমি ইতিপূর্বে মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষ্যৎ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতাম। পরে আজি ছয় বৎসর হইল যখন রাজকীয় কার্য হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় কিছুদিন বাস করিয়া ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করি, তখন সর্বদাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপদেশ লইতে যাইতাম এবং তাঁহার সহিত বিশেষ পরিচয় হইল। বলা বাহুল্য যে তাঁহার উদারতা, তাহার সহৃদয়তা, তাঁহার প্রকৃত দেশ-হিতৈষিতা, ও তাঁহার প্রকৃত হিন্দুযোগ্য সমদর্শিতা যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই বিস্মিত ও আনন্দিত হইতে লাগিলাম। তাঁহার সুন্দর পুস্তকালয় তিনি আমাকে দেখাইলেন, তাঁহার সংস্কৃত পুঁথিগুলি বসিয়া বসিয়া ঘাঁটিতাম, অনেক বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাঁহার নিকট উপদেশ চাহিতাম। বাঙালি মাত্র ঋগ্বেদের অনুবাদ পড়িবে, এ কথা শুনিয়া যাহারা হিন্দুধর্মের দোহাই দিয়া পয়সা আদায় করে, তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল! ধর্মব্যাপারিগণ ঋগ্বেদের অচিন্তিত অবমাননা ও সর্বনাশ বলিয়া গলাবাজী করিতে লাগিল,—গলাবাজীতে পয়সা আসে! ধর্মের দোকানদারগণ অনুবাদ ও অনুবাদককে যথেষ্ট গালিবর্ষণ করিতে লাগিল,—গালিবর্ষণে পয়সা আসে! এ সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহা আমি কদাচ বিস্মৃত হইব না। তিনি বলিলেন, "ভাই, উত্তম কাজে হাত দিয়াছ, কাজটি সম্পন্ন কর। যদি আমার শরীর একটু ভাল থাকে, যদি আমি কোনরূপে পারি, তোমার সাহায্য করিব।" পাঠকগণ প্রকৃত হিন্দুয়ানী ও হিন্দুধর্ম লইয়া ভণ্ডামির বিভিন্নতা দেখিতে পাইলেন? নিঃস্বার্থ দেশোপকার ও দেশের নাম লইয়া পয়সা উপায়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে পারিলেন? সর্বসাধারণকে প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রে দীক্ষিত করা এবং হিন্দুশাস্ত্র সিন্দুকে বন্ধ রাখিয়া, তাহার নাম লইয়া রোজকারের উপায় উদ্ভাবন করার মধ্যে কি বিভিন্নতা, অবগত হইলেন?

আজি সে মহাপ্রাণ হিন্দু অবতার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর নাই, সমস্ত দেশের লোক তাঁহার জন্য রোদন করিতেছে, তাঁহার জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলা

হইতে আমিও এক বিন্দু অশ্রুবারি সেচন করিলাম। কিন্তু আমাদের রোদন যদি অশ্রুবিন্দুতেই শেষ হয়, তাহা হইলে আমরা বিদ্যাসাগরের নাম উচ্চারণ করিতেও অযোগ্য। তাঁহার জীবন হইতে কি কোনও শিক্ষা লাভ করিতে পারি না? তাঁহার কার্য পরম্পরা আলোচনা করিয়া কি কোনপ্রকার উপকার লাভ করিতে পারি না?

ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধি সকলের ঘটে না। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় ওজস্বিতা, মানসিক বল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা সকলের সম্ভবে না। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় জগৎগ্রাহী সহৃদয়তা, বদান্যতা ও উপচিকীর্ষাও সকলের হইয়া উঠে না। কিন্তু তথাপি ঈশ্বরচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া আমরা বোধ হয় একটু সোজাপথে চলিতে শিখিতে পারি,—একটু কর্তব্য অনুষ্ঠানে উদ্যম করিতে পারি,—একটু ভণ্ডামি ত্যাগ করিতে পারি। যেটি সমাজের উপকারী, যেটি প্রাচীন হিন্দুধর্মের অভিমত, সে প্রথাটি যেন ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করিতে শিখি। যেটি সমাজের অপকারক, যেটি প্রাচীন হিন্দুধর্মের অনভিমত, সে প্রথা যেন ক্রমে ক্রমে বর্জন করিতে শিখি। প্রাচীনশাস্ত্রে ও সনাতন হিন্দুধর্মে যেন আস্থা হয়। উপনিষদাদি প্রাতঃস্মরণীয় গ্রন্থপাঠে যে অনাদি অনন্ত ব্রহ্মের পূজা দেশে প্রচারিত হয়,—প্রস্তর ও মৃত্তিকার পূজা যেন বিলুপ্ত হয়। আর্য সন্তানগণ যেন প্রাচীন আর্যের ন্যায় নিজের দেবকে স্মরণ করিয়া নিজে আহুতি দিতে শিখেন;—ধর্মানুষ্ঠানে কালীঘাটের পাণ্ডাকে মোক্তারনামা দিবার আবশ্যক নাই। এবং মনুর সন্তানগণ যেন মনুর আদেশ অনুসারে নারীকে সম্মান করিতে শিখেন, যোগ্য বয়সে কন্যার বিবাহ দেন, অল্প বয়স্কা বিধবার পুনরুদ্বাহ প্রথা প্রচলিত করেন, বহুবিবাহ বর্জন করেন, এবং পাশব আচরণ বিস্মৃত হইয়া মনু-সন্তানের যোগ্য হয়েন। আমরা সকলে যদি আমাদের ক্ষুদ্র বল ও ক্ষুদ্র বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া হিন্দু-সমাজকে সনাতন প্রশস্ত পথে চালিত করি, সমাজ সেই দিকেই চলিবে। যদি আমরা সেটুকুও না করিতে জানি, তবে আমাদিগের শিক্ষা বৃথা, আমাদিগের হিন্দু নামের অভিমান বৃথা,—এবং প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বৃথাই আমাদিগের মধ্যে জন্মধারণ করিয়া আজীবন আমাদিগের জন্য শ্রম করিয়া গিয়াছেন।

—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪

বিদ্যাসাগর ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ মহৎ কার্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর তাঁহাদের অপেক্ষাও মহত্তর। তিনি প্রতিভাশালী পণ্ডিত অপেক্ষা মহত্তর, যেহেতু তিনি প্রতিভার সহিত অসামান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তেজস্বী মহাপুরুষ অপেক্ষা মহত্তর, যেহেতু তিনি তেজস্বিতার সহিত স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি দানশীল ব্যক্তি অপেক্ষা মহত্তর, যেহেতু তিনি দানশীলতা প্রকাশের সহিত বিষয়-বাসনা ও আত্মগৌরব ঘোষণার ইচ্ছা সংযত রাখিয়াছেন। তাঁহাকে অনেক ভার সহিয়া, অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া, অনেক কষ্টভোগ করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হইয়াছিল, ইহাতে তিনি একদিনের জন্যও অবসন্ন হয়েন নাই। দরিদ্র ঠাকুরদাস যখন অষ্টম বর্ষীয় পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় তাঁহার প্রতিপালকের গৃহে পদার্পণ করেন, তখন তিনি বোধ হয় ভাবেন নাই যে, কালে এই বালক সমগ্র মহৎ ব্যক্তির গৌরবপন্থী হইয়া উঠিবে। অসামান্য অধ্যবসায়ে, অনন্যসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতায় বিদ্যাসাগর উন্নতির চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলনে তৎসম-কালে তাঁহার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সাহিত্য, অলঙ্কার, পুরাণ, স্মৃতি সকল বিষয়েই তিনি অসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষাগুরু তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও পাঠানুরাগ দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন; সতীর্থগণ তাঁহার উদারতার ও সারল্যময় সদাচারে সন্তুষ্ট থাকিতেন; বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষ তাঁহার পারদর্শিতার জন্য তাঁহাকে শতগুণে মহীয়ান করিয়া তুলিতেন। অধ্যয়ন সময়ে তিনি স্বহস্তে পাক করিতেন, বাজার করিতে যাইতেন; কনিষ্ঠ সহোদরদিগকে আহার করাইয়া স্বয়ং বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতেন, এবং বিদ্যালয় হইতে বাসগৃহে প্রত্যাগত হইয়া, আহারের পর প্রায় সমস্ত রাত্রি

প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিতেন। এইরূপ আত্মসংযম, এইরূপ নিষ্ঠা, এইরূপ স্বাবলম্বন, এবং এইরূপ সহিষ্ণুতার সহিত তিনি অমৃতময়ী সারস্বতী শক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন। এই শক্তির প্রসাদে তিনি সর্বস্থলে সর্বগুণে অনমনীয় ও অপরাজেয় থাকিতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দীনদুঃখী ও অনাথদিগের চির আশ্রয়স্থল ছিলেন। তিনি দয়ার সাগর, দান তাঁহার চিরন্তন ধর্ম ও চিরপবিত্র কর্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলী কৃতীপুত্রের ন্যায় তাঁহাকে প্রচুর অর্থ আনিয়া দিত, তিনি উহার অধিকাংশ পরপোষণে ও পরদুঃখ মোচনে ব্যয় করিতেন। গরীব-দুঃখীরা কেবল প্রত্যহ তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া দান গ্রহণ করিত না। অনেকে তাঁহার নিকট মাসে মাসে আপনাদের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থ পাইত। তিনি প্রাত্যহিক মাসিক নৈমিত্তিক দানে হৃদয়-নিহিত দয়ার তৃপ্তি সাধন করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার নিকট জাতিভেদ ছিল না। তিনি সকলেরই স্নেহময়ী ধাত্রী, প্রীতিভাজন পরিজন ও বিশ্ব প্রেমময়ী জননীস্বরূপ ছিলেন। যেখানে উপায়হীন রোগার্ত ব্যক্তি দুরন্ত রোগের দুঃসহ যাতনায় কাতরতা প্রকাশ করিত, সেইখানেই তিনি তাহার রোগশান্তির জন্য অগ্রসর হইতেন। যেখানে নিঃস্ব ও নিঃসম্বল লোকে গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে কষ্টের একশেষ ভোগ করিত এবং এই রোগ-শোক দুঃখময় সংসারে শোচনীয় দারিদ্র্যভারে আপনাদের অনন্ত যাতনার পরিচয় দিত, সেইখানেই তিনি তাহাদের দুঃখমোচনে উদ্যত হইতেন। যেখানে অভাগিনী অনাথা লোকের প্রতিমূর্তিস্বরূপ নির্জন পর্ণকুটীরে নীরবে বসিয়া থাকিত এবং হৃদয়ের প্রচণ্ড হুতাশন নিবাইবার জন্যই নিরন্তর নয়ন সলিলে আপনার বক্ষদেশ ভাসাইয়া দিত, সেখানেই তিনি তাঁহার কষ্ট দূর করিবার জন্য যত্নের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ হইতে অরণ্যবিহারী অসভ্য সাঁওতাল পর্যন্ত সকলেই এইরূপে তাঁহার অসীম করুণায় শান্তিলাভ করিত। কথিত আছে, একদা তিনি প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিতে করিতে এই নগরের প্রান্তভাগ অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দুর গিয়াছেন, সহসা দেখিলেন, একটি বৃদ্ধা অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া, পথের পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে; দেখিয়াই তিনি ঐ মললিপ্ত বৃদ্ধাকে পরমযত্নে ক্রোড়ে করিয়া আনিলেন, এবং তাহার যথোচিত চিকিৎসা করাইলেন। দরিদ্রা বৃদ্ধা তাঁহার যত্নে আরোগ্য লাভ

করিল। যতদিন সে জীবিত ছিল, ততদিন তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতি মাসে অর্থ দিয়া তাহার সাহায্য করিতেন।

বিদ্যাসাগর এইরূপ দয়ার সাগর ছিলেন। তাঁহার অপার করুণা একসময়ে এইরূপেই দীনহীনদিগের দুঃখ-সন্তপ্ত হৃদয় শান্তি সলিলে শীতল করিয়াছেন। যাহাদের কাতরতায় কেহই কাতরতা প্রকাশ করে নাই, যাহাদের কষ্টে কাহারো হৃদয়ে সমবেদনার আবির্ভাব দেখা যায় নাই, যাহাদের উদ্ধারে কাহারো হস্ত প্রসারিত হয় নাই, তিনি এইরূপেই তাহাদিগকে অনন্ত যাতনা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই কার্যে তাঁহার আড়ম্বর ছিল না— সংবাদপত্রের দিগন্তব্যাপী প্রশংসাপত্রের প্রত্যাশায় বা রাজকীয় গেজেটে ধন্যবাদ প্রাপ্তির কামনায় তিনি এই কার্যের অনুষ্ঠান করিতেন না। তাঁহার কার্য নীরবে সম্পন্ন হইত। ফলতঃ নিঃস্বার্থভাবে পর প্রয়োজনের জন্য উপার্জিত অর্থরাশির দানে মহাত্মা বিদ্যাসাগরের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ দয়াশীল, সেইরূপ তেজস্বী ও মহানুভব ছিলেন। দয়ায় তাঁহার হৃদয় যেরূপ কোমল ছিল, তেজস্বিতায় ও মহানুভাবতায় তাঁহার হৃদয় সেইরূপ অটল হইয়া উঠিয়াছিল। চিরদরিদ্র অনাথের নিকট তিনি যেরূপ স্নিগ্ধ সুধাকরের ন্যায় প্রশান্তভাব ধারণ করিতেন, ধনগর্বিত বা ক্ষমতা-গর্বিত ব্যক্তির নিকট তিনি সেইরূপ প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন তপনের ন্যায় অপূর্ব তেজ-মহিমার পরিচয় দিতেন। অভিমানসহকৃত তেজস্বিতা তাঁহাকে সর্বদা উচ্চতম স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিত। এইরূপ তেজস্বী, এইরূপ অভিমানসম্পন্ন বিদ্যাসাগর, জনসাধারণের সমক্ষে কখনো অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া হীনতা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার তেজস্বিতা যেরূপ অতুল্য, তাঁহার মহত্ত্ব সেইরূপ অপরিমেয় ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কি কারণে এইরূপ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছেন, কি কারণে এরূপ অতুলনীয় কীর্তির অধিকারী হইয়া, সকলের নিকট হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইতেছেন? মণ্ডলাধিপতি সম্রাট অসামান্য ক্ষমতা ও অপরিমিত অর্থের বলে যে সম্মান লাভ করিতে পারেন না, একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান কি গুণে সেই সম্মানের পাত্র হইয়াছেন? ইহার একমাত্র কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মস্তিষ্কের অসাধারণ ক্ষমতার সহিত হৃদয়ের অতুল্য

শক্তির সামঞ্জস্য। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার সহিত হৃদয়ের অপূর্ব শক্তি ছিল। তিনি একদিকে জ্ঞানগৌরবে ও বুদ্ধিবৈভবে যেরূপ মহিমান্বিত, অপর দিকে হৃদয়ের মহৎগুণে সেইরূপ গৌরবান্বিত। তাঁহার অভিমান ও তেজস্বিতা যেরূপ অতুল্য, তাঁহার কোমলতা ও দয়াশীলতাও সেইরূপ অসামান্য। বিভিন্ন শক্তির সমবায়ে, বিদ্যাসাগর প্রকৃত মনুষ্যত্বের পূর্ণাবতার-স্বরূপ মহাপুরুষ ছিলেন।

—রজনীকান্ত গুপ্ত

৫

কলিকাতায় আসিয়া যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল তিনি হইলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আমি আমার পিতার সঙ্গে ১৮৫৬ সালের জুন মাসে কলিকাতায় আসিলাম। তখন আমার বয়স নয় বৎসর মাত্র। আমার মাতুল, 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাসায় আমার থাকিবার ব্যবস্থা হইল। পিতার ইচ্ছা ছিল যে আমাকে ডেভিড হেয়ারের স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়া ইংরাজি শিখাইবেন। তিনি তখন কলিকাতার বাংলা পাঠশালাতে ২৫ টাকা মাসিক বেতনে কর্ম করিতেন অতএব পুত্রকে উৎকৃষ্টরূপে ইংরাজি শিখাইবার যে বাসনা ছিল, তাহা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। কেবল তাহাই নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ; তিনি আমার মাতুলের সহাধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন; তিনি সপ্তাহের মধ্যে তিন-চারিদিন আমাদের বাসাতে আসিতেন, এবং আমাকে নিকটে পাইলেই দুইটা আঙুল চিম্‌টার মত করিয়া আমার পেট টিপিতেন; সুতরাং বিদ্যাসাগর আসিয়াছেন শুনিলেই আমি সেখান হইতে পলাইতাম। যাহা হউক, তখন সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগ চলিয়াছে; তিনি সংস্কৃত কলেজে ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি আমার বাবাকে আমাকে হেয়ার স্কুলে না দিয়া সংস্কৃত কলেজেই দিতে বলিলেন; তদনুসারে আমাকে

সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করা হইল। ঐ কলেজে আমার মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অধ্যাপকতা করিতেন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছেন; ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের ছেলেরা সেখানে আগে পড়িত, তখন সকল বর্ণের ছেলেরাই সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সুযোগ পাইয়াছে, সকলের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন পদ্ধতির অধ্যাপনাও উঠিয়া গিয়াছিল, মুগ্ধবোধ দিয়া পড়া আরম্ভ হইত না—তাঁহারই রচিত বোধোদয়, কথামালা ও উপক্রমণিকা মুগ্ধবোধের স্থান অধিকার করিয়াছিল। তৃতীয়তঃ তাঁহার সময়ে বিনা বেতনে পড়িবার নিয়ম উঠিয়া গিয়া, বেতন দিয়া পড়িবার নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, তিনি কলেজের উচ্চশ্রেণীতে ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। এই সব বিরাট পরিবর্তনের মুখেই আমি সংস্কৃত কলেজে আসিয়া ভর্তি হইলাম।

ঠিক সেই সময়েই বিধবাবিবাহের প্রবল আন্দোলন চলিয়াছে। সে-আন্দোলনে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃত কলেজ পর্যন্ত বিক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর বিধবাবিবাহ আইন পাশ হইয়া গেল, তখনকার শিক্ষিত বাঙালি দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল এবং সংস্কৃতের পণ্ডিতেরাও বিদ্যাসাগরকে সে সময়ে যুদ্ধে আহ্বান করেন। সংস্কৃত কলেজ ছিল সেই যুদ্ধের রঙ্গভূমি এবং তরুণ ছাত্রদের মধ্যে কতক গোঁড়া পণ্ডিতদের দলে, কতক বিদ্যাসাগরের দলে যোগদান করিয়াছিল। আমি শেষোক্ত দলে ছিলাম। তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার প্রথম দিন হইতেই আমি বিদ্যাসাগরের একজন বিশেষ অনুরাগী ও ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ইহার একটি কারণ, তিনি আমার মাতুলের সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং আমার পিতা হরানন্দ বিদ্যাসাগর তাঁহার সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আমি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমাদের বাসাতেও আসিয়া তিনি বিধবাবিবাহের বৈধতা সম্পর্কে তুমুল আলোচনা করিতেন। বাড়িতে যাহা শুনিতাম, কলেজে আসিয়া সহপাঠীদের কাছে তাহা বলিতাম এবং এই ভাবেই আমার সহপাঠীদের মধ্যে এই বিষয়টি লইয়া প্রচণ্ড আলোচনা চলিত। সুতরাং আমি জ্ঞানোদয় হইতেই এই সংস্কারের পক্ষপাতী বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আমার ভর্তি হইবার দুই বছর পরে কর্তৃপক্ষের সহিত বিবাদ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি আমার অকপট শ্রদ্ধা ভক্তি চিরকালই রহিয়া গিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন চলিয়া গেলেন, আমরা বালকেরা পর্যন্ত মহা দুঃখিত হইলাম। কিন্তু ছাত্রজীবনে আমার হৃদয়ে সাধুতা ও তেজস্বিতার সেই যে মূর্তি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা আর কোন দিনই মুছিয়া যায় নাই। সে মূর্তি মুছিবার নহে। কলেজের চাকরী ছাড়িয়া দিবার পর বছর দুই তিনি আমাদের বাড়িতে খুব কমই আসিয়াছেন। কিন্তু 'সোমপ্রকাশ' বাহির হইবার পর হইতে আবার তিনি পূর্বের ন্যায় নিয়মিত ভাবে আসিতে লাগিলেন, কারণ এই পত্রিকার তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা। তাহার পর মাতুল যখন সোমপ্রকাশের একমাত্র স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক, তখন হইতে দীর্ঘকাল বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে আসি নাই। তাহার পর ১৮৬৮ সালে আমার সহপাঠী পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ যখন দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিয়া বিধবাবিবাহ করিতে সম্মত হন, তখন আবার বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে আমি আসিলাম। এই বিবাহের সমস্ত খরচ তিনি দিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নানাভাবে দেখিয়াছি—দুঃখীর দুঃখ মোচনে, পীড়িতের সেবায়, আর্তের শুশ্রূষায়, দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষাবিধানে, অত্যাচারীর অত্যাচার দমনে, বন্ধুর বিপদে, বিধবার অশ্রুমোচনে—কতভাবে যে তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাহা বলিতে গেলে একখানি মহাভারত হইয়া দাঁড়ায়। এমন চরিত্রের মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে দুইটি নাই। আমি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলে পরে, বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে ত্যাগ করেন নাই, আমার পিতা আমাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, যদিও তিনি মনে মনে ইহার জন্য দুঃখ পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম হইয়াও সেই ব্রাহ্মণের স্নেহ ও সাহায্য হইতে আমি কোন দিনই বঞ্চিত হই নাই। সেই মহামানবের সংস্পর্শে আসিয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিয়াছি। তাঁহার স্মৃতি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমার পরবর্তী বংশধরদের জন্য সেই সম্পদের কিয়দংশ মাত্র আমি রাখিয়া গেলাম।*

—শিবনাথ শাস্ত্রী

---

* *Men I have seen* পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

৬

তখন আমার বয়স আন্দাজ ৬।৭ বৎসর; বোধ হয় ইংরাজি ১৮৪৭ সাল হইবে। আমি আমার দাদার সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে যাইতাম। তিনি আমাকে একটা বেঞ্চে বসাইয়া রাখিতেন। এই রকম ২।৫ দিন যাইতে যাইতে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে বলিলেন, আয়, তোকে ইস্কুলে ভর্তি করে দি। তখন কোন ছাত্রের বেতন দিবার পদ্ধতি ছিল না; কাজেই ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রতিবন্ধক হইল না। রসময় দত্ত তখন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী। রসময় বাবু Small Cause Court-এর জজ ছিলেন; তিনি প্রত্যহ বেলা ৩টার সময় কলেজে আসিতেন ও ঘণ্টাখানিক সব কাগজপত্র ও ক্লাসগুলি দেখিতেন। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়; তিনি সমস্ত দিনই কলেজে থাকিতেন। রসময় বাবুর বেতন ছিল একশত টাকা; বিদ্যাসাগর মহাশয় পাইতেন পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় চাকরি ত্যাগ করিলেন। রসময় বাবুর সঙ্গে তাঁহার কি একটা বিষয় লইয়া ঝগড়ার মত একটা কিছু হইয়াছিল। অনেকদিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে এই ব্যাপার সম্বন্ধে একটা কথা শুনিয়াছিলাম। রসময় বাবু যখন শুনিলেন যে, তিনি চাকরি ত্যাগ করিয়াছেন, তখন নাকি বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর ত চাকরি ছেড়ে দিলে; এখন খাবে কি করে? কথাটা যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাণে পৌঁছিল, তখন তিনি বলিলেন—বোলো, মুদির দোকান করে খাবে। অনুরূপ কথা রামগোপাল ঘোষও লাটসাহেবকে বলিয়াছিলেন। স্বয়ং লাটসাহেব তাঁহাকে একবার গভর্ণমেণ্টের চাকরি করিবার জন্য অনুরোধ করেন। রামগোপাল বলিয়াছিলেন—চাকরি করিব না; গভর্ণমেণ্টের চাকরি করিব না। লাটসাহেব যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে তুমি কি করিবে?—

তাহার উত্তরে রামগোপাল বলিয়াছিলেন, কলিকাতার রাস্তায় পাথর ভাঙিয়া জীবিকা অর্জন করিব। তেজস্বিতায় বিদ্যাসাগর ও রামগোপাল দুইজনেই সমান ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব ছিল বলিয়াই এই দম্ভ বৃথা আস্ফালন বলিয়া মনে হইত না।

কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইলেন; মাসিক বেতন তিনশত টাকা হইল। তাঁহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পরেও ৫।৬ বৎসর আমি সংস্কৃত কলেজে পড়িয়াছিলাম। তিনি সংস্কৃত কলেজের একরকম আমূল সংস্কার করিলেন। এই সকল পরিবর্তন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং করিলেন, ইহাতে তাঁহার উপরওয়ালাদের কোনও হাত ছিল না, এমন কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি না থাকিলে তখনকার হিন্দুসমাজের গোঁড়ামির দিনে সংস্কৃত কলেজে এত পরিবর্তন হইতে পারিত না।

কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। মহাভারত তাঁহার কীর্তিস্তম্ভ। রাধাকান্তের শব্দকল্পদ্রুমের পার্শ্বে কালীপ্রসন্নের মহাভারতের স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে। তিনি প্রায় আমার সমবয়সী ছিলেন। দুষ্টলোকে তাঁহার 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভার নামকরণ করিয়াছিল 'মদ্যোৎসাহিনী সভা'। মহাভারতের অনুবাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্ররোচনায় হইয়াছিল। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে বিদ্যাসাগর এই কার্যে ব্রতী করিয়াছিলেন। যে পণ্ডিত মণ্ডলীর দ্বারা মহাভারত অনূদিত হইয়াছিল, তাঁহারাও বিদ্যাসাগরের লোক। সেকালে সমস্ত বড়লোক বিদ্যাসাগরের অনুগত ছিল; পাইকপাড়ার রাজারা তাঁহার কথায় উঠিতেন বসিতেন; তাঁহারই কথায় কোনও security না লইয়া তাঁহারা এক ব্যক্তিকে তিন লক্ষ টাকা কর্জ দিয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগরের যখন টাকার দরকার হইল, তিনি টাকার অভাব রাজাদের নিকট জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা বলিলেন— আপনার টাকার দরকার হইতে পারে, এ কথা পূর্বে বলেন নাই কেন? আবার এই পাইকপাড়ার রাজারাই মাইকেল মধুসূদনের প্রথম ও প্রধান patron ছিলেন। তাঁহাদের রাজবাটীতেই 'শর্মিষ্ঠা'র প্রথম অভিনয় হয়।

বিদ্যাসাগরের প্রতি এই যে ভক্তি, ইহার একমাত্র কারণ যে তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ, তাহা নহে। সাহেবদের কাছে বিদ্যাসাগরের খুব প্রতিপত্তি ছিল

বলিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট তিনি অত খাতির পাইয়াছিলেন। তখন হইতেই বাঙালির চরিত্রগত এই দোষ প্রকটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল যে, সাহেবদের নিকট প্রতিষ্ঠাপন্ন না হইলে বাঙালি মানুষের মূল্য বুঝিতে পারিত না, বুঝিতে চাহিতও না। কিন্তু এ কথা কে না জানে যে বিদ্যাসাগর কখনও কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিতেন না—সে সাহেবই হউক কিম্বা দেশী রাজাই হউক। তাঁহার চরিত্রের এই সরলতা ছিল বলিয়াই সাহেব সমাজে তাঁহার প্রতিপত্তি হইয়াছিল এবং তিনি তাহা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। আমাদের জন্য তিনি এই কঠিন চরিত্রের উত্তরাধিকারই রাখিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখনই যে তাঁহার সাহিত্যিক হিসাবে খাতির হইয়াছিল, তাহা নহে। তিনি বালকদিগের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে ব্যস্ত ছিলেন; সমাজের কুরুচিব্যাধি দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইবার অবসর তাঁহার ছিল না। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই যে সমাজের ও সাহিত্যের রুচি মার্জিত হইবে, ইহা তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। স্বভাব কবি ধীরাজ বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগরের নামে যে গান রচনা করিয়াছিলেন, সে গানটি এত রুচিবিগর্হিত ও অশ্লীল যে তাহা পত্রিকায় মুদ্রিত করা অসম্ভব। কিন্তু বিদ্যাসাগর ধীরাজকে নিজের বাড়িতে ডাকাইয়া বলিলেন, ধীরাজ, একবার সেই গানটা গাও ত। সেই যে 'বিদ্যেসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে।' ধীরাজ অমনি সভার মধ্যে গান ধরিত।

বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর দুইজনেই বোধ হয় কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু চরিত্র অংশে আসমান জমিন প্রভেদ। যাহাকে backbone কহে, বিদ্যাসাগরের তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে তর্কালঙ্কার হয়ত vertebrate শ্রেণীর অন্তর্গত হয়েন কিনা সন্দেহ। তবে বিদ্যাসাগরের bigotry এবং jealousy বড় কম ছিল না; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষদের চরিত্রেও এই দোষগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধারণ কথাবার্তায় সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয় যে, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। কিন্তু লোকের সঙ্গে কি মজলিসে কথা কহিবার সময় বাংলা slang শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। 'সীতার

বনবাস' প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা সম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ ধারণা হয় যে, তিনি নিশ্চয়ই শক্ত শক্ত সংস্কৃত কথা ভালবাসিতেন এবং তাঁহার রচনাও সেই প্রকার শব্দে গঠিত। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাষার উপরে আপনার style গঠিত করিয়াছিলেন তাহা সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষা নহে; সে সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সাধারণ কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, সেই ভাষাই বিদ্যাসাগরের রচনার বনিয়াদ। বিদ্যা-সাগরের সর্বতোমুখী প্রতিভা বাংলা সাহিত্য গঠনে কি প্রকারে বিকাশ পাইয়াছিল তাহা আমাদের সুবিদিত। তবে তখন যে নূতন বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল সেই সাহিত্যের দিকপালরূপে তাঁহার সমসাময়িক অনেকেই গণ্য হইবার উপযুক্ত ছিলেন—তাঁহারা কেন পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন—একা বিদ্যাসাগরের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিল।

পদব্রজে পথ পর্যটনে বিদ্যাসাগর কখনও ক্লান্তি বোধ করিতেন না। শেষ অবস্থায় যখন তিনি অত্যন্ত কাহিল হইয়াছিলেন, কিছুই পরিপাক হইত না, তখন ডাক্তারদিগকে ইহার উপায় জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা কহিলেন, খুব হাঁটিতে আরম্ভ করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কতক্ষণ করিয়া হাঁটিব? ডাক্তার বলিলেন—যতক্ষণ না ক্লান্তি বোধ করেন। বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন—তাহলে তো রাত্রি দিন হাঁটিতে হয়, কারণ হেঁটে আমি কখনও ক্লান্তি বোধ করি না।

বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন; একথা বোধ হয় তোমরা জান না। যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। কেবল রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুয্যের সহিত বিদ্যাসাগর পরলোকতত্ত্ব লইয়া মধ্যে মধ্যে হাস্যপরিহাস করিতেন। ললিত সে সময়ে যেন কতকটা যোগসাধন পথে অগ্রসর হইয়াছেন এইরূপ লোকে বলাবলি করিত। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—হ্যাঁ রে ললিত, আমারও পরকাল আছে নাকি? ললিত উত্তর দিতেন—আছে বৈ কি? আপনার এত দান, এত দয়া, আপনার পরকাল থাকিবে না ত থাকিবে কার? বিদ্যাসাগর হাসিতেন।

উজ্জ্বলে মধুরে ওরূপ সংমিশ্রণ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখ মহারথিগণের সহিত যখন তিনি একাকী শাস্ত্র সমুদ্র

মন্থন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই যোদ্ধবেশ আমার মনে পড়ে; আবার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ি থিয়েটারের ষ্টেজ বাঁধা হইল, সেখানে তিনি মাইকেল মধুকে লইয়া রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাঁহার সে অবস্থাও আমার বেশ স্মরণ হয়।

একদিন সন্ধ্যাকালে অথবা প্রভাতে মেছোবাজার ষ্ট্রীটে যে একতলা বাড়িতে বিদ্যাসাগর প্রথমে বাস করিতেন, সেই বাড়িটি খুঁজিয়া বাহির করিবে কি? সেখান হইতে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ির যে ঘরটিতে বিদ্যাসাগর থাকিতেন, সেই ঘরটি দেখিতে যাইতে ইচ্ছা হয় কি? সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল অবস্থায় কলেজের যে ঘরটিতে বাস করিয়াছিলেন, সেই ঘরটি কি বিদ্যাসাগরের স্মৃতি বক্ষে করিয়া এখনও দণ্ডায়মান নাই? তাঁহারই ঘরের সম্মুখে যে মাটি তিনি কোদাল দিয়া কাটিয়া তথায় কুস্তির আখড়া করিয়াছিলেন, যে মাটি তিনি নিজে গায়ে মাখিয়া কুস্তি করিতেন, সেই ভূমির সেই পবিত্র মাটি মস্তকে করিয়া একটু লইয়া আসিবে কি? সেই মাটি মাখো, মাটি মাখো। গ্রীক পুরাণের অসুরের মত সে মাটি স্পর্শ করিলেই নবীন বলে বলীয়ান হইবে; মাটি মাখো, মাটি মাখো। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারি নাই, কিন্তু এখন যেন তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, কোথাও অসম্পূর্ণতা অনুভব করিতেছি না। তাঁহাকে হারাইয়াই কি ভাল করিয়া পাইলাম? কলিকাতা পর্যটন করিয়া তাঁহার পুরাতন বাসস্থানগুলি দেখিয়া আসিবার সামর্থ্য আমার নাই। বিশ বৎসর পূর্বে সমস্ত কলিকাতাবাসী ছোট বড় লোক শ্মশান ঘাটে, যে স্থানে তাঁহার চিতা সাজাইয়াছিল, আমি এক-একদিন প্রত্যূষে সেই তীর্থস্থানে উপনীত হইয়া সেই পবিত্র চিতাভস্মের অন্বেষণ করি। হায়, তখন যদি কমণ্ডলু ভরিয়া সেই ভস্ম আনিতে পারিতাম।

—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

৭

আমি যখন বহরমপুর কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতাম, তখন স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে ওকালতি করিতেন। আমি প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁহার বাসায় যাইতাম। একদিন কথা-প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা উঠিল, তখন সারা বাংলা দেশে শুধু তাঁহারই নাম। স্যর গুরুদাস বলিলেন, বাংলা দেশে মানুষ বলিতে এই একজনই আছেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান রাজীবলোচন রায় সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আরো অনেকেই ছিলেন। রাজীবলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, আপনারা কি সব অমানুষ? স্যর গুরুদাস বলিলেন, না আমরাও মানুষ, তবে নেহাৎ মানুষ, তার বেশী নয়। আর বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বগুণে গুণান্বিত মানুষ। তিনি মনুষ্যত্ব ও মানবতার অবতার।

সেদিন এই কথাটি আমার মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। আজ সেই পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিসভায় দাঁড়াইয়া আমার স্যর গুরুদাসের কথাটি সর্বাগ্রে মনে হইতেছে। কি ছিল তাঁহার, যাহার জন্য আজ তিনি দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বলিয়া পূজিত? ইহার উত্তরে আমি এক কথায় বলিব, তাঁহার ছিল দেব-দুর্লভ চরিত্র, ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য আর ছিল পরদুঃখকাতর ও সংবেদনশীল একটি বিরাট হৃদয়। তাঁহার অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী কল্যাণময় কর্মজীবনের বিবরণ আপনারা সকলেই অবগত আছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। সে সময় আমার নাই; সে যোগ্যতার দাবীও আমি রাখি না। আমি শুধু একটি বিষয় সম্বন্ধে বলিব।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের সর্বপ্রধান অভিব্যক্তি হইয়াছিল তাঁহার আত্মনিবৃত্তিতে। আমরা সকলেই জানি তাঁহার পিতৃ-মাতৃভক্তি কিরূপ প্রগাঢ়

ছিল, তাঁহার কর্তব্য-নিষ্ঠা কি অপূর্ব ছিল। কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না যে নিবৃত্তিই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়াছিল। সংসারের সকল কর্তব্যই তিনি করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভোগ-বিলাস স্পৃহা তাঁহার জীবনে কখনো দেখা দেয় নাই। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়াও তিনি বিচলিত হন নাই। সময় উপস্থিত হইলে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। পদমর্যাদা, সম্মান, প্রতিষ্ঠা, যশ, তাঁহাকেই অন্বেষণ করিয়া বরণ করিত, তিনি কখনো তাহাদের জন্য লোলুপ হন নাই। অভিমান কখনো তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইতে পারে নাই। বাহ্য আড়ম্বরের অন্তরালে তিনি তাঁহার আত্মাকে মুক্ত, স্বাধীন রাখিতে চেষ্টা করিতেন। চটিজুতা পায়ে দিয়া, চাদর গায়ে দিয়া যখন তিনি পথ দিয়া চলিতেন, তখন তাঁহার পবিত্র আত্মার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া যে আলোক বিতরণ করিত তাহার তুলনায় রাজপদ, সম্পদ, গৌরব সকলই বৃথা। পরের দুঃখনিবারণই ছিল সেই ব্রাহ্মণের জীবনের মূলমন্ত্র; দেশের কল্যাণচিন্তা ছিল তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস। বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বের পরিমাপ হয় না। তাঁহার মন ছিল পর্বত চূড়ার মত উন্নত; তাঁহার চরিত্র পর্বত চূড়ার মতই অচল অটল ছিল; পর্বত চূড়ার মতই আর্যগৌরব তাঁহার সেই ক্ষীণ কৃশ শরীরের ভিতর মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান ছিল। সেই অশেষ গুণান্বিত কর্মী পুরুষের গুণের উল্লেখ করিয়া শেষ করা যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণগরিমা তাঁহার আদর্শের সজীব স্মারক। পরিশেষে আমি আপনাদের নিকট শুধু এই কথাই বলিব—বাংলাদেশে মানবতার পূর্ণ আদর্শ যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে ছিল। তাঁহার মত মানুষ যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সে জাতির পুনরুত্থান অনিবার্য। *

—রাসবিহারী ঘোষ

---

* ১৯০১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর সংস্কৃত কলেজে অনুষ্ঠিত বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভায় প্রদত্ত ভাষণ; সভাপতি ছিলেন কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

প্রকৃতির বিধানই হইল প্রগতি। ইহার একটি সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমরা পাই ভালবাসা ও সম্মানের মধ্যে যাহার দ্বারা আমরা সৎ ও মহৎ ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকি। যদি আমরা সৎ ও মহৎ ব্যক্তিকে ভালবাসিতে পারি, সম্মান করিতে পারি, তাহা হইলে স্বভাবতই ঐ দুইটি গুণের প্রতি আমরা আকর্ষণ বোধ না করিয়া পারিব না; মহতের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলার একটা বড় লাভ এই যে তাঁহারা যেসব গুণের অনুশীলনে তাঁহাদের চরিত্রকে গঠন করিয়াছেন, আমরাও একেবারে না পারিলেও, প্রাণপণ অনুশীলনের ফলে আমাদের চরিত্রে সেইসব গুণ ফুটাইয়া তুলিতে পারি। যাহার দ্বারাই সৎ ও মহৎ লোকের প্রতি আমাদের অন্তরে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়, তাহাই প্রগতির সহায়ক, এবং তাহারই অনুশীলন কর্তব্য।

আজ দুই বৎসর হইল বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে গভীর ও দেশব্যাপী শোক প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু এই দুই বৎসরে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। বিদ্যাসাগরের প্রতি আমাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার অভাব ইহার কারণ নহে, ইহার কারণ আমাদের মধ্যবিত্তশ্রেণীর দারিদ্র্য—ইহারাই সমাজের সর্বাধিক লোক। আরো একটি কারণ পাশ্চাত্ত্য জাতির মত ঘটা করিয়া শোক প্রকাশ করিবার রীতি আমাদের মধ্যে নাই; আমরা প্রস্তরমূর্তি বা পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতির খুব বেশী মূল্য দিই না—মূল্য দিই না এই কারণে যে এই দুইটি জিনিসই অত্যন্ত মূল্যবান এবং ঐগুলি বহু টাকা খরচ করিয়া বিদেশ হইতে করাইয়া আনিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার প্রতি আমরা উদাসীন থাকিব কেন? দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বিনা পয়সায় থাকিবার একটি বোর্ডিং হাউস কিম্বা বিনা পয়সায় পড়িবার জন্য একটি ভ্রাম্যমান পুস্তকাগার স্থাপন করিতে পারি, অথবা বঙ্গের

সেই অদ্বিতীয় শিক্ষাগুরু এবং পরোপকারী মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষার জন্য উত্তর কি মধ্য কলিকাতায় একটি সুন্দর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করিতে পারি। বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সমিতি এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম কিন্তু এই সমিতির চেষ্টা কতখানি সফল হইবে তাহা বলা কঠিন। তবে ছাত্র-সম্প্রদায় যে বিদ্যাসাগরকে বিস্মৃত হয় নাই, ইহাই আশার কথা, আনন্দের কথা। বিদ্যাসাগর এই কলিকাতা শহরের ছাত্রদের জন্য কি করিয়া গিয়াছেন তাহার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ছাত্রগণ যে তাঁহাকে সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিয়া থাকে, ইহা জানিয়া স্বর্গে থাকিয়াও বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই আনন্দ বোধ করিবেন। আজিকার এই স্মরণসভা তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম।

শুনিয়াছি বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত এক স্মৃতিসভায় কোন কোন বক্তা নাকি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার স্মৃতিরক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি নিজেই তাঁহার স্থায়ী স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। দুরূহ সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়া অত্যন্ত সহজ প্রণালীতে তিনি যে দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন—উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ কৌমুদী—উহাই বিদ্যাসাগরের অক্ষয় স্মৃতিসৌধ; তিনি যে সহজ ও প্রাঞ্জল গদ্যরীতির প্রবর্তন করিয়াছেন, যাহার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই উন্নতি; স্বল্প-খরচে উচ্চ বিদ্যালাভের জন্য তিনি যে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, যাহার ফলে দেশে শিক্ষার এত দ্রুত ও ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে—এইগুলিই তো বিদ্যাসাগরের স্মৃতিকে অম্লান করিয়া রাখিবে। যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের লোক তাহাদের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা, তাহাদের নিজস্ব বাংলা ভাষা এবং ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিতে থাকিবে, ততদিন বাঙালি সকৃতজ্ঞ চিত্তে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম স্মরণ করিবে।

দুই বৎসর পূর্বেও বিদ্যাসাগর আমাদের মধ্যে ছিলেন; আজ আছে শুধু তাঁহার কর্মকীর্তি—ইহাই তাঁহার স্বদেশবাসী সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে। বিদ্যাসাগরের বিরাট জীবন হইতে আমরা অনেক কিছুই শিক্ষা করিতে পারি। এইখানে আমি শুধু একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। কি অবস্থায় তিনি ইংরেজি শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই কথাই বলিব। ইংরেজি ভাষায়

স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতৃশ্রাদ্ধে
বিদ্যাসাগরকে প্রদত্ত রূপার গেলাস।
গেলাসের উপর উৎকীর্ণ শ্লোক :—
পানপাত্রমিদং দত্তং বিদ্যাসাগরশর্ম্মণে।
স্বর্গকামনয়া মাতুর্গুরুদাসেন শ্রদ্ধয়া॥
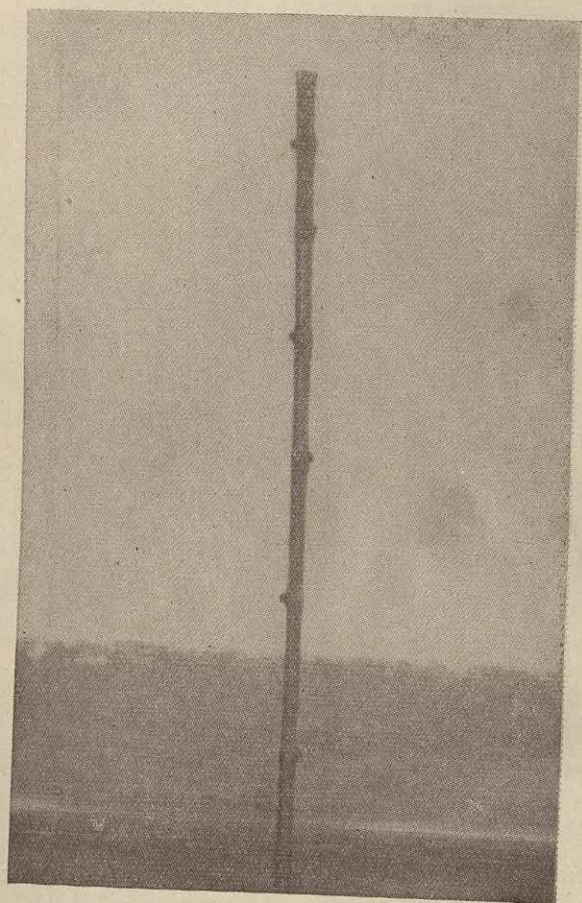
দিল্লীর শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ কর্তৃক বিদ্যাসাগরকে প্রদত্ত উপহার।
লাঠির উপরে আরবি ভাষায় উৎকীর্ণ আছে :—
আল্লাহ্ ত্রামি দীন রুহাম্মদ শাহ-শাহ
ফজল শাহ আলম্ বাদশাহ রদ্ বর্য়াফৎ কী ঈশ্বর

বিদ্যাসাগরের অসামান্য দক্ষতা ছিল এবং তিনি বহু যত্নেই ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্কুলে ইহা শিক্ষা করেন নাই, কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় ইহা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং তখন সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই চলে। একদা তিনি এক ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আসিলেন। ইংরেজিতে তিনি একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি এই সহরের একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই বলিতেন যে দুর্গাচরণ বাবুর মুখে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের উন্নত ও গভীর চিন্তার কথা শুনিয়া ঐ ভাষার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং উহা আয়ত্ত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তখন দরিদ্র যুবক মাত্র এবং তখনকার দিনে ইংরেজি শিক্ষা করা খুব সহজ ছিল না। দুর্গাচরণবাবুকে তিনি অনুরোধ করিলেন তাঁহাকে ইংরেজি শিখাইবার জন্য। প্রতিদিন দীর্ঘপথ হাঁটিয়া বিদ্যাসাগর দুর্গাচরণ বাবুর বাসায় যাইতেন এবং অশেষ অধ্যবসায়ের ফলে ঐ ভাষা এমনভাবেই শিক্ষা করিলেন যে ঐ ভাষা হইতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আহরণ করিয়া নিজের মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিলেন। বিদ্যাসাগরের সেই ইংরেজি শিক্ষক, আমার বন্ধু দুর্গাচরণবাবু আজিকার এই স্মৃতিসভার সভাপতিরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত—ইহা আমাদের পক্ষে কম গৌরব ও আনন্দের বিষয় নহে। আমার তরুণ ছাত্রবন্ধুদের নিকট আমি শুধু এই কথাই বলিব—বিদ্যাসাগরের জীবন হইতে তোমরা আর কিছু শিক্ষা করিতে না পার, অন্ততঃ এই জ্ঞানার্জন-স্পৃহাটুকু শিক্ষা করিও। তাহা হইলেই বাংলার সেই বরেণ্য শিক্ষাগুরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখান হইবে। আর একটি কথা বলিবার আছে। বর্তমানকালের সমগ্র অবস্থার পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে বিদ্যাসাগর মহাত্মা রামমোহন রায় ভিন্ন তুলনায় অপর কাহারও অপেক্ষা কম ছিলেন না।

—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩০১ সালে মেট্রোপলিটান কলেজে বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা। মূল ইংরেজিতে, অনুবাদ লেখকের।

৯

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিসভায় বক্তৃতা দিবার জন্য আমাকে আহ্বান করা হইয়াছে, কিন্তু এই সভার আজ যিনি সভাপতি, বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পর্কে আমার চেয়ে তিনি বেশী অবগত আছেন। তিনি তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিবার সুযোগও পাইয়াছিলেন। আমার বয়স যখন দশ বৎসর, তখন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রথম দর্শন করি। সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতি আমার মনে চির জাগ্রত। সেই সময়ে তিনি আমাকে একখানি 'রবিনসন ক্রুসো' উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের হাতে দেওয়া সেই উপহারটি আমি সযত্নে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা করিয়াছি। তাহার পর আমার কর্মজীবনের আরম্ভে আমি আর একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। তখন তিনি আমাকে তাঁহার মেট্রোপলিটন কলেজে একটি অধ্যাপকের চাকরী দিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর—এই বাক্যটি আমার নিকট একজন মানুষের নাম মাত্র নয়, ইহা আমার নিকট একটি মন্ত্রস্বরূপ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন আমার নিকট একটি জ্যোতির্ময় আলোক স্তম্ভ-স্বরূপ। মনুষ্যত্বের সাধনায় ইহজীবনে যদি কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে এই একটি মাত্র অমোঘ মন্ত্র আছে। বিদ্যাসাগর—এই কথাটির উচ্চারণেই পুণ্য। ইহা আমার উচ্ছ্বাসের কথা নয়, উপলব্ধির কথা। তাঁহারই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া আমার জীবন অনেকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে, চরিত্র বিকশিত হইয়াছে। তিনিই দেশীয় পোষাকের গৌরব শিক্ষিত-সমাজে প্রথম বাড়াইয়াছিলেন; তিনি যদি ধুতি চাদর ও চটিজুতা পরিহিত হইয়া সর্বসমক্ষে যাতায়াত না করিতেন তাহা হইলে আমরা, অন্তত আমি, আজ দেশী পোষাকের প্রতি অনুরক্ত হইতাম কি না সন্দেহ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু অসাধারণত্বের মধ্যে এই একটি।

সেই মহামানবের কর্মকীর্তির কথা আমি আর নূতন করিয়া কি বলিব, আর কতটুকুই বা বলিতে পারি? শুধু ইহাই বলিতে পারি—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্গজননীর শ্রেষ্ঠতম সন্তান। পৃথিবীর ইতিহাসেও ঠিক এমন একটি চরিত্রের মানুষ আমি খুঁজিয়া পাই নাই। সভাপতি মহাশয় ইহার সাক্ষ্য দিবেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি সরল ও সাধারণ মানুষ ছিলেন, অথচ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অসাধারণ। বস্তুত তিনি অসাধারণত্ব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, জ্ঞান, বিদ্যা, শক্তি, সাহস ও গঠনশক্তি ছিল অসাধারণ। সর্ববিষয়েই তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা; তাঁহার জীবনের অতি ক্ষুদ্র কার্যটির মধ্য দিয়াও তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কর্মী ছিলেন—কল্পনাবিলাসী ছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি শুধু সম্মুখেই ছিল না, উহা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তাঁহার চারিত্র্য মহিমায় বাঙালির বহুদূরের ভবিষ্যৎ পর্যন্ত আলোকিত হইয়াছে। তাঁহার সময়ে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে আর কেহই তাঁহার ন্যায় অগ্রসর হইতে পারেন নাই। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি আমার ক্ষুদ্রশক্তিতে যেটুকু করিয়াছি, তাহা তাঁহারই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া। শিক্ষাই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। কেমন করিয়া আমাদের দেশের সর্বত্র জ্ঞানবিস্তার হয়, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধনা। সেই সাধনার উত্তরাধিকার আমরা লাভ করিয়াছি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়ার কথা, পিতামাতার প্রতি ভক্তির কথা আপনারা সকলেই জানেন। উহা এক্ষণে প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। পিতামাতা যে আমাদের সাক্ষাৎ দেবতা—ইহা তিনি যেমন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, এমন আর কেহ পারে নাই, পারিবেও না। আমার পিতৃদেব প্রায়ই বলিতেন—এই বঙ্গদেশে বিদ্যাসাগরই একমাত্র মানুষ যিনি মানুষের দুঃখ বুঝিতেন, মানুষের দুঃখে কাঁদিতে জানিতেন এবং সেই দুঃখমোচনের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেন। দয়া জিনিসটি যে কি তাহা তিনি যেমন করিয়া শিখাইয়াছেন, এমন আর কেহ পারিল না। এইজন্যই বাঙালির হৃদয়ে বিদ্যাসাগরের আসন চিরকাল। পৃথিবীর অমর মহামানবদের সমগোত্রীয় তিনি। আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। —আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৯১৫ সালে নারিকেলডাঙায় অনুষ্ঠিত বিদ্যাসাগরের ২৪তম মৃত্যুবার্ষিকী সভায় প্রদত্ত ভাষণ। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় সভাপতি ছিলেন।

১০

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড়. ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাঙালি জাতির প্রাচীন ইতিহাস কেমন ছিল, ঠিক স্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। লক্ষ্মণ সেন ঘটিত প্রাচীন কিংবদন্তী অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পলাশীর লড়াইয়ের কিছুদিন পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত বাঙালির চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষা এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাঁহাকে বাঙালি বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময়ে কুণ্ঠিত হইতে হয়! বাগ্‌যত, কর্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্‌সর্বস্ব সাধারণ বাঙালি, উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে, স্বজাতীয় পরিচয়ে তাঁহার গুণ কীর্তন করিয়া প্রকারান্তরে আত্ম-গৌরব খ্যাপন করিতে গেলে, বোধ হয়, আমাদের পাপের মাত্রা আরো বাড়িয়া যাইতে পারে।

অণুবীক্ষণ নামে একপ্রকার যন্ত্র আছে, তাহাতে ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখায়; বড় জিনিসকে ছোট করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও, ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্রায় ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙালিত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুস্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের বিরাট মূর্তি ধবল-

পর্বতের ন্যায় অভ্রংলিহ শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই গগনভেদী চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙালির চরিত্রে তাহার একান্তই অসদ্ভাব। বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ বাঙালির চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না। এই হতভাগা দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কাল বিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যার কথা। সেই দুর্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙিতে পারিত, কেহ কখন নোয়াইতে পারে নাই, সেই উগ্র পুরুষাকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া আপনাকে অব্যাহত রাখিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে বাঙালির মধ্যে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দমতা ও অনম্যতা, এই দুর্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ যাহারা কঠোর জীবন দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া পরকে দুই ঘা দিতে জানে ও পরের নিকট দুই ঘা খাইতে জানে, তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যায়; আমাদের মত দুর্বল লোকদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

যে পুরুষাকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ বাঙালির চরিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনকেই নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্রগঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু পিতাপিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ভিন্ন করিয়া তিনি বীরের মত সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে, জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টক সমাবেশে আরো দুর্গম ও দুরতিক্রম। কিন্তু এইরূপে

সেই কাঁটাগুলিকে ছাঁটিয়া, দলিয়া, চলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙালির মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ আশ্চর্য এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙালি ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙালির ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার বাল্যজীবনে য়ুরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। ··· পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্ত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্য চরিত্রে অনুকরণের যোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার চরিত্রকে কোনরূপ পরিবর্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তাঁহার পুর্বেই সম্যক ভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল, আর নূতন মসলা সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙালিটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্যন্ত তেমন বাঙালিটিই ছিলেন। তাঁহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণ দ্বারা পরত্ব গ্রহণের তাঁহার কখন প্রয়োজন হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে-সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি। ইহার জন্য তাঁহাকে কখন ঋণস্বীকার করিতে হয় নাই।

চটিজুতার প্রতি তাঁহার একটা আত্যন্তিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি, ঠিক তাহা দেখিয়াই যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই এই চটিজুতাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত। যে অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও তিনি মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া চলিতেন, এ দর্প ঠিক সেই দর্প।

বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষণা বা মানবপ্রীতি অন্য ধরণের; উহা পাশ্চাত্ত্যের 'ফিলানথ্রপি' নহে। তাঁহার লোকহিতৈষণা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। কোন স্থানে দুঃখ দেখিলেই, যেমন করিয়াই হউক, তাহার প্রতিকার করিতে হইবে--ইহাই ছিল তাঁহার প্রকৃতি। দুঃখের অস্তিত্ব

দেখিলে বিদ্যাসাগর তাহার কারণ অনুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। পরের দুঃখমোচনই ছিল তাঁহার ধর্ম। দুঃখের সম্মুখে আসিবামাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব একেবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। পরের মধ্যে তাঁহার নিজত্ব একেবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার মানবপ্রীতি অন্য দেশের মানব-প্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল। তাঁহার এই মানবপ্রীতি, প্রচলিত অর্থনীতির উপরে উচ্চতর মানবনীতিরই অঙ্গীভূত।

কঠোরতার সহিত কোমলতার সমাবেশ ব্যতীত মনুষ্য-চরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না। ভারতবর্ষীয় মহাকবির কল্পনায় পূর্ণ মনুষ্যত্ব বজ্রের ন্যায় কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল; যুগপৎ ভীম ও কান্ত, অধৃষ্য এবং অভিগম্য। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মত কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। পরের দুঃখে তাঁহার রোদনপ্রবণতাই বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অসাধারণত্ব, এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। তিনি পরের জন্য না কাঁদিয়া থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখ দর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণশোক তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার নিকট এ সময় ঘেঁষিতে পারিত না। বায়ুপ্রবাহে ক্রমসানুমানের মধ্যে ক্রমেরই চাঞ্চল্য জন্মে, সানুমান চঞ্চল হয় না। এ ক্ষেত্রে বোধ করি ক্রমের সহিতই তাঁহার সাদৃশ্য। কিন্তু আবার সানুমানেই শিলাময় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে বারিপ্রবাহ নিঃসৃত হয়, তাহাই বসুন্ধরাকে উর্বরা করে ও জীবকুলকে রক্ষা করে। সুতরাং সানুমানই বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃতপক্ষে তুলনীয়। ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্যধারায় যে ভূমি যুগ যুগ ব্যাপিয়া সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হইয়া রহিয়াছে, রামায়ণী গঙ্গার পুণ্যতর অমৃত প্রবাহ সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে সংসার তাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে; সেই ভূমির মধ্যে ও সেই জাতির মধ্যেই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

বিদ্যাসাগর একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবাবিবাহে পথ প্রদর্শন তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। বস্তুতই এই বিধবাবিবাহ ব্যাপারে আমরা বিদ্যাসাগরের সমগ্র মূর্তিটা দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা, উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোক সমক্ষে

প্রতীয়মান হয়েন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানবনির্যাতন তাঁহার কোমল প্রাণকে দিবানিশি ব্যথিত রাখিত; দুর্বল মনুষ্যের প্রতি নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার হৃদয়ের মর্মস্থলে ব্যথা দিত; তাহার উপর মনুষ্যবিহিত, সমাজ-বিহিত অত্যাচারও তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বালবিধবার দুঃখ দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল, এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে করুণামন্দাকিনীর ধারা বহিল। সুরনদী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করে, তখন কার সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে! বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রূকুটি-ভঙ্গিতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষপর্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই মেরুদণ্ড নমিত করে।

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১১

বাংলার লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সমাজ-সংস্কারক বলিয়াই জানে। তিনি বিধবা-বিবাহ চালাইয়াছেন। বহু বিবাহ বন্ধ করিয়াছেন। তাঁহার দেশের লোক আরও জানেন তিনি পড়ার বই নূতন করিয়া লিখিয়াছেন ও সর্বপ্রথম দেখাইয়া দিয়াছেন যে বাঙালিও ইংরেজের মত স্কুল-কলেজ করিয়া চালাইতে পারে, সর্বপ্রথম দেখাইয়া দিয়াছেন যে সংস্কৃত ব্যাকরণ বাংলাতেও পড়ানো যায়, সর্বপ্রথম সুরুচিপূর্ণ বাংলা বই তিনিই লিখিয়াছেন। দানেও তিনি বীর ছিলেন—১৮৬৬ সালে দুর্ভিক্ষের সময় অনেক লোককে নিজে নিজে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছেন। তিনি কেমন করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, কেমন করিয়া গবর্ণমেণ্টের চাকুরি পান, কেমন করিয়া সে চাকুরিতে উন্নতি হয় এবং ক্রমে তিনি কলেজের

প্রিন্সিপাল ও স্কুলের ইন্‌স্পেক্টার হন, এসব কথা বাঙালীরা বড় একটা জানে না, বড় একটা খোঁজও লয় না।

সংস্কৃত কলেজ হইতে বাহির হইয়া তিনি প্রথম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার; সেখান হইতে তাঁহাকে আনিয়া তাঁহার মুরুব্বী মার্শাল সাহেব সংস্কৃত পাঠশালায় এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী করেন, কিন্তু সেক্রেটারী রসময় দত্তের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ছয় মাসের মধ্যে পদত্যাগ করেন ও আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ভাল চাকরি পান। দত্ত মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগর পুরা সেক্রেটারী হন এবং এক বৎসরের মধ্যে একখানি রিপোর্ট লিখিয়া গবর্ণমেণ্টকে পাঠান; যে রিপোর্টের ফলে সংস্কৃত পাঠশালা কলেজ হইয়া যায়। তাহাতে কথা থাকে—তিন ভাগের দুই ভাগ সংস্কৃত ও এক ভাগ ইংরেজী পড়িবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য ছিল যে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরাই বাংলা শিখিবে; সংস্কৃত ভাল না জানিলে সে লেখকদ্বারা বাংলার উন্নতি হইতে পারে না। সেই রিপোর্টের ফলে তিনিই সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন। ৺প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ইংরেজী সাহিত্যের ও ৺ শ্রীনাথ দাস ইংরেজী অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক হন। পূর্বে যে পাঠশালাটি ছিল, তাহার এক এক ঘরে এক এক জন সংস্কৃত অধ্যাপক বসিতেন; ছেলেরা তাঁহার কাছে পড়িতে যাইত। প্রথম ব্যাকরণের ঘরে পড়িত, তারপর সাহিত্যের ঘরে, তারপর অলঙ্কারের ঘরে, তারপর স্মৃতির ঘরে, তারপর ন্যায়ের ঘরে; কেহ কেহ জ্যোতিষের ঘরেও পড়িত। প্রথম বার বছর ধরিয়া (সংস্কৃত পাঠশালায়) একটি বৈদ্যকেরও ঘর ছিল। সেখানকার অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্ত ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইলে পদত্যাগ করিয়া যেখানে পড়িতে যান এবং প্রথম ছুরি দিয়া মড়া কাটেন। প্রথম যেদিন তিনি ছুরি ধরেন, সেদিন নাকি তোপ হইয়াছিল। মধুসূদন পদত্যাগ করিলে বৈদ্যকের ঘর উঠিয়া যায়। বলিতে গেলে সংস্কৃত পাঠশালায় বৈদ্যকের ঘর হইতেই মেডিকেল কলেজের সৃষ্টি, যাহারা বৈদ্যকের ঘরে পড়িত, তাহাদের একজনকে সাহেবের কাছে কেমিষ্ট্রি পড়িতে হইত, আর মরা পশুর দেহ কাটিয়া এনাটমি শিখতে হইতে; কিন্তু সাহেবের ঘর কলেজের বাড়িতে ছিল না; তাহার জন্য স্বতন্ত্র বাড়িভাড়া করিতে হইত। বৈদ্যকের ঘরের সঙ্গে সঙ্গে কমিষ্ট্রি এনাটমি উঠিয়া গেল।

১৮৫২ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রিন্সিপাল হইলেন। তাহার কিছুদিন পরেই গবর্ণমেণ্টের মতলব হইল দেশে বাংলা-শিক্ষা চালানো। দক্ষিণ বাংলার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত হইলেন। তিনি যখন ইন্‌স্পেক্টারের কাজ করিতে যাইতেন, তখন একজন ডেপুটী প্রিন্সিপাল সংস্কৃত কলেজের কাজ দেখিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাজ করিবার ক্ষমতা অসীম ছিল। ইন্‌স্পেক্টারের কাজেও তাঁহার খুব যশ ও সুখ্যাতি হইল। তিনি গবর্ণমেণ্টের একজন প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মাথা বেশ পরিষ্কার ছিল। তিনি হাতে-কলমে-নিজে কাজ করিতেন বলিয়া অনেক জিনিস তাঁহার উপরওয়ালার চেয়ে ভাল বুঝিতে পারিতেন। এখন তাহাই লইয়া খুটিনাটি আরম্ভ হইল; আর গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইন্‌স্পেক্‌শনের কার্য সঙ্কোচ করিয়া দিলেন। ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাল লাগিল না। তিনি পদত্যাগ করিলেন। গবর্ণমেণ্টর বড় বড় কর্মচারীরা তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন—তুমি থাক; কিন্তু তিনি থাকিলেন না। বাংলার প্রথম লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে ডাকিয়া তাঁহার পদত্যাগ পত্র ফিরাইয়া লইতে বলিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—যে-কার্য তিনি মন দিয়া করিতে পারিবেন না, শুধু টাকার জন্য সে কার্য করিতে রাজী নন। হ্যালিডে সাহেব বলিলেন—আমি জানি তুমি সব দানধ্যান কর, কিছুই রাখ না। সাতশত টাকার মাহিনার চাকুড়ি ছাড়িয়া খাইবে কি? বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—ডালভাত। সাহেব বলিলেন—তাই বা পাইবে কোথা থেকে? তিনি বলিলেন—এখন দুবেলা খাই, তখন না-হয় এক বেলা খাব; তাও না জোটে, একদিন অন্তর খাব। তাই বলিয়া যে কাজে মন বসিতেছে না, সে কাজ করিয়া টাকা লইতে আমি চাই না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পদত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন যে-বিষয় তাঁহার পরামর্শ চাহিতেন, তিনি বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া পরামর্শ দিতেন। সেজন্য গবর্ণমেণ্টে তাঁহার খুব খাতির ছিল। ১৮৮০ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি. আই. ই. করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব পরিশ্রম করিতে পারিতেন, তাঁহার অনেকগুলি বই ছিল। তিনি সব বইয়ের প্রুফ নিজে দেখিতেন এবং সর্বদাই উহার বাংলা পরিবর্তন করিতেন। দেখিতাম প্রত্যেক পরিবর্তনেই মানে খুলিয়াছে।

তিনি প্রেসের কাজ বেশ জানিতেন—বুঝিতেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি সংস্কৃত প্রেসের মালিক ছিলেন। তখন সংস্কৃত প্রেসই বাংলার ভাল প্রেস ছিল। তিনি সংসারের কাজ খুব বুঝিতেন; প্রেস হইল, বই ছাপা হইল, বিক্রয় করিবে কে? তাহার জন্য সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী নাম দিয়া এক বইয়ের দোকান খুলিলেন। উহা এক রকম বইয়ের আড়ত। বই লিখিয়া ছাপাইয়া লোকে ওখানে রাখিয়া দিবে। বিক্রয় হইলে কিছু আড়তদারী বা কমিশন লইয়া গ্রন্থকারকে সমস্ত টাকা দিয়া দিবেন। এই সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী তাঁহার হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে, ইহা এখনও বর্তমান আছে, কিন্তু উহার হিসাব রাখার নিয়ম খুব সুন্দর; যখনই যাও, আগের মাস পর্যন্ত যত বই বিক্রয় হইয়াছে. তাহার হিসাব পাইবে এবং চাহিলেই তোমার যা পাওনা তাই দিয়া দিবে।

সাংসারিক কাজে বিদ্যাসাগরের দূরদৃষ্টির আর একটি উদাহরণ দিব। বিদ্যাসাগর দেখিতেন—বাড়ির রোজগারী পুরুষ মরিয়া গেলে বিধবার এবং বিধবার ছেলেপুলের বড়ই কষ্ট হয়; তাই তিনি নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে মিলিয়া হিন্দু ফ্যামিলী এ্যান্নুইটি ফাণ্ডের সৃষ্টি করেন! স্বামী যতদিন জীবিত থাকিবেন—মরিলে স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য কিছু কিছু টাকা ফাণ্ডে দিবেন; তিনি মরিয়া গেলে ফাণ্ড মাসে মাসে স্ত্রী যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন, ততদিন তাঁহাকে একটা মাসহারা দিবেন। এইরূপে ভদ্রঘরের কত বিধবা যে এই ফাণ্ডের মাসহারা লইয়া জীবনধারণ করিতেছেন, তাহা বলা যায় না। তিনি ফাণ্ডের এমন বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন এবং এই ষাট বৎসরে এত টাকা জমিয়া গিয়াছে যে তাহার সুদ হইতে ফাণ্ডের সমস্ত খরচা চলিয়া যায়; এবং মাসিক চাঁদা সমস্ত জমিয়া যায়। এইরূপে অনেক টাকা জমিয়া গিয়াছে। মূল টাকা গভর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়ার হাতে থাকে। এ ফাণ্ড ফেল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর এক কীর্তি সোমপ্রকাশ। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিতেন—যে সকল বাংলা কাগজ ছিল, তাহাতে নানা রকম খবর দিত; ভাল খবর থাকিত মন্দ খবরও থাকিত। লোকের কুৎসা করিলে কাগজের পসার বাড়িত; অনেক সময় কুৎসা করিয়া তাহারা পয়সাও রোজগার করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিলেন যদি কোন কাগজে ইংরেজির মত

রাজনীতি চর্চা করা যায়, তাহা হইলে বাংলা খবরের কাগজের চেহারা ফেরে। তাই তাঁহারা কয়েকজন মিলিয়া সোমপ্রকাশ বাহির করিলেন; সোমবার কাগজ বাহির হইত বলিয়া নাম হইল সোমপ্রকাশ।

যাঁহারা কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহারা শেষে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে কাগজের ভার দিয়া সরিয়া পড়িলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাগজের সম্পাদকতা করিয়া অনেক অর্থ ও সম্মান উপার্জন করিয়া গিয়াছেন। যখন ভার্ণাকিউলার প্রেস এ্যাক্ট হয়, বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া সরকার কাগজ বন্ধ করিয়া দেন, তারপর অনেক ধরিয়া-করিয়া কাগজখানিকে আবার খুলিয়া লন।

১৮৭৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আমি লক্ষ্ণৌ যাই। লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের সংস্কৃত প্রফেসারের একটিনি করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু যাইবার আট-দশদিন পূর্বে আমার ভয়ানক জ্বর হয়, তখন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখি—আমি একটানা লক্ষ্ণৌ যাইতে পারিব না, আপনার ওখানে (কার্মাটারে) একদিন থাকিয়া যাইব। কার্মাটারে পৌছিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলোয় গেলাম। ···আমি লক্ষ্ণৌতে সংস্কৃত পড়াইতে যাইতেছি—এম, এ, ক্লাশেও পড়াইতে হইবে—বিশেষ হর্ষ-চরিত খানা পুরা পড়াইতে হইবে—শুনিয়া তিনি একটু ভাবিত হইলেন, বলিলেন—বইটা বড় কঠিন। তিনি নিজে আট ফর্মা মাত্র ছাপাইয়াছিলেন এবং তাহা পূর্বে কলিকাতায় আমাকে দিয়াছিলেন। বলিলেন—বাকীটা বড় গোল। আমি বলিলাম—রাজকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় বলেন—ইহার সংস্কৃত বড় কাঁচা। বিদ্যাসাগর বলিলেন—তাই ত, রাজকুমার এত বড় পণ্ডিত হইয়াছে, যে কাঁচাপাকা সংস্কৃত চিনিতে পারে?

যাহা হউক তিনি আমাকে হর্ষ-চরিত এবং অন্যান্য বই পড়াইবার কিছু কিছু কৌশল বলিয়া দিলেন, তাহাতে আমার বেশ উপকার হইয়াছিল। আহারাদির পর রাত্রে শুইবার সময় আমার ঘরে আসিলেন এবং স্বহস্তে যে-কটি জানালা ছিল বন্ধ করিয়া তাহাতে চাবি-কুলুপ লাগাইয়া দিলেন এবং একটি চাবি-কুলুপ আমার হাতে দিয়া বলিলেন—তুমি দরজাটিও চাবি বন্ধ করিয়া শুইবে, এখানে বড় চোরের ভয়।...পরদিন বারটার পর তাঁহার টেবিলে বসিয়া কথামালা কি বোধোদয়ের প্রুফ দেখিতেছেন। প্রুফে বিস্তর কাটকূট

করিতেছেন। আমি বলিলাম—কথামালার প্রুফ আপনি দেখেন কেন? তিনি বলিলেন—ভাষাটা এমনি জিনিস, কিছুতেই মন স্পষ্ট হয় না; যেন আর একটা শব্দ পাইলে ভাল হইত; তাই সর্বদা কাটকূট করি। ভাবিলাম বাপরে, এই বুড়া বয়সেও ইঁহার বাংলার ইডিয়মের ওপর এত নজর।

কিছুক্ষণ পরে বিদ্যাসাগর বলিলেন—তোর জন্যে আমার একটু ভয় হয়েছে। তুই লক্ষ্ণৌতে পড়াইতে যাইতেছিস, পারবি কি? আমি বলিলাম—কেন, কিছু ভয়ের কারণ আছে নাকি? তিনি বলিলেন—আছে বই কি। সেখানে পুণো জ্যাঠা বলিয়া এক বাঙালি ছেলে আছে; আমি যখন লক্ষ্ণৌয়ে গিয়াছিলাম, তখন সে ফোর্থ ইয়ারে পরে। আমি যে-কদিন ছিলাম, রাজকুমার সর্বাধিকারীর বাড়িতে ছিলাম, রাজকুমারও আমাকে খুব যত্নে রাখিয়াছিল। অনেকে আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, অনেকে শুধু দেখিতে আসিতেন। একদিন পুর্ণচন্দ্র আসিয়া হাজির। আসিয়াই বলিল—রাজকুমার বাবু, এখানে অনেক লোক বসে আছেন, এর মধ্যে বিদ্যাসাগর কোন্‌টি? রাজকুমার আমায় দেখাইয়া দিলে, সে বলিল—ও মা, এই বিদ্যাসাগর। উড়ে-কামানো-কামানো, পাল্কীর নীচে গেলেই হয়। তাহার বক্তৃতায় রাজকুমার ত অধোবদন, আমিও কতকটা তাই। তারপর কিছু আলাপচারী করিয়া আমায় বলিল—বিদ্যাসাগর মহাশয়, আপনি ত কলিকাতা ইউনিভার্সিটির সিনিয়র ফেলো, কিন্তু এটা হয় কেন বলুন দেখি? যে ছেলেটা সেকেণ্ড ক্লাস থেকে বা'র হয়ে যায়, সেও লেখে I has; যে এণ্ট্রান্স পাশ করে, সেও লেখে I has; যে এল. এ. পাশ করে, সেও লেখে—I has; যে বি. এ. পাশ করে সেও লেখে—I has, যে এম. এ. পাশ করে, সেও লেখে I has; এ জিনিসটা কেন হয়? এর কি কিছু প্রতিকার নেই? আপনারাই ত ইউনিভার্সিটির মা-বাপ। এইখানে বলিয়া রাখি যে সে সময় লাহোর ছাড়া উত্তর ভারতে আর ইউনিভার্সিটি ছিল না। আগ্রা হইতে রেঙ্গুন পর্যন্ত কলিকাতা ইউনিভার্সিটির অধীনে ছিল, নাগপুরও ছিল, সিংহলও ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—আমি দেখিলাম পুণোর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করা ত আমার কাজ নয়; আমি তাহাকে বলিলাম—পুর্ণবাবু, এটি বুঝাইবার জন্য আপনাকে দুটি গল্প বলিব। মনোযোগ দিয়া শুনুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, কেন এরূপ হয়।

তার আটগুণ রাখিতে হইবে। বেচারা কি করে তাই রাখিল। তখন ঘাটমাঝি বলিল—ওই দেখিতেছেন নৌকা আছে, নৌকার বোটে আছে, দাঁড় আছে, হাল আছে, লগি নাই; বন্যার সময় লগি দিয়া থই পাওয়া যায় না। আপনি বোটে বাইতে বাইতে ওপারে চলিয়া যান। ওপারে যে টঙ দেখিতেছেন, উহার কাছে নৌকা রাখিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যান।

আমরা সেই ঘাটমাঝির মত টঙ বাঁধিয়া বসিয়া আছি। ছেলেরা পড়িতে আসিলে তাদের কাছ থেকে নানা রকম ফি আদায় করিয়া বলি—ঐ স্কুল আছে, বেঞ্চি আছে, চেয়ার আছে, মাষ্টার আছে, পণ্ডিত আছে, কাগজ কলম বই কিনিয়া পড় গে। মাসে মাসে আমার এখানে ফি-টি দিয়া যাইও।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গল্প শেষ হইতে হইতেই ষ্টেশনে টিকিটের ঘণ্টা পড়িল, বুঝা গেল আমাদের গাড়ি আসিতেছে। আমরা আসিয়া ষ্টেশনের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাহির হইলাম, মনে করিলাম এদিনের ব্যাপারটা চিরদিনই আমাদের মনে গাঁথা থাকিবে। আমরা যেন কোনো মহর্ষির আশ্রম হইতে বাহির হইলাম।

১৮৯১ সালের শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবারে আমি শুনিলাম—বিদ্যাসাগর মহাশয় হাওয়া-বদলির জন্য ফরাসডাঙার গঙ্গাতীরে একটি বাড়িতে আছেন। ফরাসডাঙায় গবর্ণমেণ্ট হাউসের দক্ষিণে কতকগুলি বাড়ি আছে, একেবারে গঙ্গার ওপরেই। অনেক কলিকাতার লোক সেখানে হাওয়া বদল করিতে যায়। এবার বিদ্যাসাগর মহাশয় উহারই একটি বাড়িতে ছিলেন। আমার তখন সাধ হইয়াছিল যে বিদ্যাসাগর মহাশয় এত কাছে আছেন, তখন একদিন তাঁহাকে বাড়িতে আনিয়া তাঁহার পদধূলি লইব। তাই আমি একখানা নৌকা করিয়া ফরাসডাঙার দিকে গেলাম। নৌকা হইতে নামিয়া দেখিলাম—সামনের বাড়িতে বারান্দায় বিদ্যাসাগর মহাশয় দাঁড়াইয়া আছেন। উপরে উঠিয়া দেখি বিদ্যাসাগর মহাশয় দাঁড়াইয়াই আছেন; টেবিলের কাছে চেয়ারে একটি লোক বসিয়া আছে। তিনি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার—তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে চাকরী চান। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সহিত যেরূপ ভাবে কথা

কহিতেছেন, তাহাতে বোধ হইল, তাঁহাকে স্নেহও করেন সম্ভ্রমও করেন। তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত হইল, তিনি মেট্রোপলিটান কলেজে ইংরেজি পড়াইবেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে ২০০৲ শত টাকা মাহিনা দিবেন। কথাবার্তা স্থির হইয়া গেল, তিনি উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন; বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—তা হবে না, কিছু খেয়ে যেতে হবে। বলিয়াই পেছনের হলঘরে ঢুকিলেন। দেখিলাম সেখানে পাঁচ-সাতটি কাঁচের আলমারি আছে, প্রত্যেক তাকে ভিন্ন ভিন্ন রকমের আঁব। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে একখানি আসনে বসাইয়া সামনে একখানি রেকাবি দিয়া নিজে ছুরি দিয়া আঁব কাটিতে বসিলেন। একবার এ-আঁবের এক চাক্‌লা দেন, একবার ও-আঁবের এক চাক্‌লা দেন,—পাঁচ-সাত রকমের আঁব তাঁহাকে খাওয়াইলেন। কার্মাটারে ভুট্টা দেখিয়াছিলাম, এখানে দেখিলাম আঁব।

আশুবাবু উঠিয়া গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই এখানে কোথা এসেছিলি? আমি বলিলাম—আপনি এত কাছে আছেন, তাই মনে করিয়াছি, যদি আপনার পায়ের ধূলা আমার বাড়িতে পড়ে। আপনি যেতে পারবেন কি? গেলে আমরা কৃতার্থ হব। তিনি বলিলেন—কেন? তুই আমাকে ঘটা করিয়া খাওয়াইবি নাকি? আমি বলিলাম—সে ভাগ্য কি আমার হবে? তিনি বলিলেন—তাইত আমি বলিতেছিলাম; আমি কি খাই তা জানিস্? বেল শুঁটোর সঙ্গে বালি সেদ্ধ করে তাই একটু একটু খাই। তবে এই যে আঁব দেখছিস্, ও আমার জন্যে নয়। যে নিজে কিছু খেতে পারে না, অন্যকে খাইয়েই তার তৃপ্তি। তাই ত আশুকে অত করে নিজে হাতে আঁব খাওয়াচ্ছিলাম। যা হোক, তুই এসেছিস্, ভালই হয়েছে। কিন্তু আমি তোকে জিজ্ঞাসা করব না, তোর বাড়ির কে কেমন আছে, হয়ত তুই বলবি—অমুক মারা গিয়েছে, অমুক ব্যামোয় ভুগছে, এসব কথা শুনতে আমার আর ইচ্ছে হয় না। আমার বড় কষ্ট হয়। একটু চুপ করিয়া তিনি বলিলেন—আমি গেলে আমায় কি খাওয়াইতিস? আমি বলিলাম—নৈহাটির গজা আর রসমুণ্ডি। তিনি বলিলেন—আচ্ছা, তা তবে আনিস। আমি বলিলাম—আসছে রবিবারেই লইয়া আসিব। ... পরের রবিবারে ঐ দুটি জিনিস লইয়া আমি আবার নৌকা করিয়া তাঁহার বাড়ি গেলাম। শুনিলাম—জরুরী কাজ পড়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায়

চলিয়া গিয়াছেন। মনটা বড় খারাপ হইল। সোমবারে কলিকাতায় আসিলাম। বৃহস্পতিবারে সকালে শুনিলাম—বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বহুতর লোক খালি পায়ে তাঁহার বাড়িতে যাইতেছে। আমিও তাহাই করিলাম।

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১২

টুলো ব্রাহ্মণের সতেজ মূর্তি বিদ্যাসাগর। তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা অসামান্য। কারণ, দেশ হইতে এই জলন্ত ব্রাহ্মণ্য-তেজ-শিখা বিলীন হইতেছিল। বিদেশী সভ্যতার প্রভাবে পূর্বকালের উপানহ, শিখা ও ধুতি-চাদর এ দেশের নব-আভিজাত্য-দৃপ্ত সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইতেছিল। কপালে পবিত্র চন্দন-লেখা মুছিয়া ফেলিয়া নবশিক্ষিত ব্রাহ্মণ মুখে পাউডার মাখিতে লাগিয়া গেলেন; উপবীত এবং তুলসীদাম বা রুদ্রাক্ষমালার স্থানে গলদেশে নেকটাই, উপানহের স্থলে ডসনের বুট ও গরদের ধুতির স্থানে হ্যারিসের বাড়ীর ট্রাউজার পরিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ সমাজেরই একজন ইংরাজী শিখিয়া, একটা কলেজের অধ্যক্ষের উচ্চপদ পাইয়া এবং লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ ও উচ্চ ইংরাজ কর্মচারীর সংস্পর্শ লাভ করিয়া, এমন কি ইংরাজী সাহিত্যের স্বর্ণভাণ্ডারে গভীরভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াও যে টুলো ব্রাহ্মণ সেই টুলো ব্রাহ্মণই রহিয়া গেলেন, সেই প্রাচীনকালের সামান্য বেশ পরিয়া তিনি কুণ্ঠার সহিত এক কোণে সরিয়া রহিলেন না, ধূলি-ধূসর উপানহ-সহ পদ-যুগল তাহার উর্ধ্বতন রাজপুরুষের তদীয় টেবিলের উপর স্থাপন-পূর্বক তৎকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইলেন,—সেই উপানহ ও ধুতি-চাদর রাজ-দ্বারে অসম্মানিত হওয়াতে তিনি রাজ-প্রাসাদের হইতে অভিমানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সুতরাং তাঁহার এই যে প্রাচীন আচার-ব্যবহার পালন, তাহা ঠিক গতানুগতিক বলা যাইতে পারে না। ইহা ব্রাহ্মণ্য-গৌরবতার উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা নিজের দৈন্য-কুণ্ঠিত,

চিরাগত একটা অভ্যাস নহে,—ইহা পাশ্চাত্ত্যপ্রভাবের নিকট নতি-স্বীকারে অসম্মত, অপরাজিত জাতীয়তার ঘোষণা। বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম সগৌরবে এই স্বজাতীয় আদর্শ শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; তৎপূর্বে, তৎসময়ে এবং এখনও শত শত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সামাজিক বিশুদ্ধতা ও আচার-ব্যবহার রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁহাদের এই প্রভেদ যে, তাঁহারা গতানুগতিক, পূর্বসংস্কারবদ্ধ এবং বিলাতী আদর্শ স্বীকার না করিয়াও কতকটা কুণ্ঠা ও লজ্জার সঙ্গে কোনরূপে বিদেশীয় প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের স্বীয় চিরাচরিত পথ অনুসরণের অর্থ—এদেশের আচার ব্যবহারের বিজয়-ঘোষণা, উহাতে এতটুকু কুণ্ঠা বা নতি-স্বীকারের ভাব তো নাই-ই, বরং উহা পাণ্ডিত্যের চিহ্ন ও জাতীয় সম্মান-জ্ঞানের অভিব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তাহা যেন নব্য-তন্ত্রী সমাজকে ডাকিয়া বলিতেছে—"তোমরা একটা সামান্য চাকুরি পাইয়াই বিদেশী প্রভাবে নিজস্ব গৌরব বিসর্জন দিতেছ এবং পরানুকরণ করিয়া স্পর্ধিত হইতেছ, কিন্তু দেখ, আমি তোমাদের মত ইংরাজী শিখিয়াছি, তোমাদের অনেকের যেখানে প্রবেশাধিকার নাই, অল্প সময়ের জন্য যে সকল ইংরাজের সাক্ষাৎ লাভ করিলে তোমরা কৃতার্থ হও, সেই ইংরাজ-সমাজে আমার অবাধ গতি, তাঁহারা আমাকে বন্ধুবৎ গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ আমি আমার নিজ সমাজের আচার-ব্যবহার ছাড়ি নাই, আমার পূর্বপুরুষাচরিত পন্থা শুধু আমার প্রিয় নহে, তাহার মধ্যে আমার পক্ষে অগৌরবের কিছু নাই।" বিদ্যাসাগর এই যে সামাজিক প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, তাহা বীর্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাহা সনাতন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিলেও তিনি তদ্দ্বারা তৎকালে এই দেশে ও সমাজকে নূতন করিয়া গৌরব প্রদান করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর যাঁহাদের মধ্যে লালিত-পালিত তাঁহারা সকলেই খাঁটি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক। তিনি শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবনে যে আবেষ্টনীর মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহাতে উপানহ ধুতি-চাদর এবং টিকির সংস্কার সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। পরিণত বয়সে ইংরাজী শিখিয়া উচ্চপদ লাভ করিয়া ইংরাজ রাজপুরুষদের সংস্পর্শে আসিবার পরেও তিনি তাঁহার জীবনের অভ্যস্ত রীতি ছাড়েন নাই, ইহাই আমাদের চক্ষে তাঁহাকে গৌরব

দিতেছে। এ কথাটাও খুব সহজ নহে। এইরূপ শিক্ষা ও পদ পাওয়া মাত্র তখনই বাঙালী উন্নত সম্প্রদায়ের লোকের মাথা বিগড়াইয়া যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। বাহ্যে পাশ্চাত্ত্য রীতির পক্ষপাতী হইয়াও সে আমলে এই শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজ চরিত্রের দাঢ্য, আত্মসম্মান-জ্ঞান, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ এ সকল কিছুই দেখাইতে পারিতেন না। বিদেশীয়দের সমাজের অতি উপেক্ষিত এক কোণে একটু স্থান করিয়া লইবার জন্য তাঁহারা ব্যবহারে ও চরিত্রে অতিশয় মানসিক দৈন্য ও হীনতা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর শুধু দেশীয় রীতি রক্ষা করেন নাই, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য তেজও বর্তমান যুগের পাশ্চাত্ত্য জাতিসুলভ প্রখর ব্যক্তিত্ব অভাবনীয় রূপে বিকাশ পাইয়াছিল। তথাপি বলিতে হয়, টুলো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজে এখনও এই বিষয়ের উপাদান বিদ্যমান ছিল এবং বিদ্যাসাগর-চরিত্র তাঁহার আবেষ্টনীর প্রতিকূল বা স্বীয় সামাজিক সংস্কারের বিরোধী ছিল না।

বাংলা ভাষা বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণী; তিনি হাতে-কলমে কাজ করিয়া জাতীয় শিক্ষার মূলধন বৃদ্ধি করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর লিখিত রচনা পড়িয়া আমরা লাভবান হইয়াছি, আমাদের বংশধরেরাও হইবে। তিনি বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তি গড়িয়া গিয়াছেন। বাংলাসাহিত্যে তিনি যে দান করিয়াছেন, তাহা অমর। শুধু বাংলা নহে, সংস্কৃত শিক্ষাকেও তিনি কালোপযোগী করিয়া নবভাবে স্থাপিত করিলেন। এই তীক্ষ্ণধী, সহৃদয় ব্রাহ্মণ সর্বত্রই হিন্দুর পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করিয়াছেন, এবং সর্বত্রই গোঁড়ামির আবর্জনা দূর করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

—দীনেশচন্দ্র সেন

১৩

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হিতৈষণা ও স্বদেশপ্রীতি লইয়া অনেক কথা শুনা গিয়াছে। আমি তাঁহার চরিত্রের শেষোক্ত গুণটি সম্পর্কে বলিব। পেট্রিয়টিজম্ জিনিসটা আমাদের বহুদিনের, কিন্তু নামটি বিদেশের। যে সমাজে মানুষ সমাজেরই ছিল—সে সমাজে স্বদেশপ্রীতি স্বাভাবিক ছিল। লোকহিতৈষণাও আমাদের দেশে একদা ধর্মের অঙ্গ ছিল। দেশের হিতসাধনকারী ফিলানথ্রপিষ্ট

(philanthropist) স্বতন্ত্র ; আর কায়মনোবাক্যে দেশের স্বীয় মাহাত্ম্যের সমর্থনকারী পেট্রিয়ট (patriot) স্বতন্ত্র। যিনি স্বদেশের স্বাধীনতা, গৌরব, তেজোবীর্য এবং মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করেন, তিনিই পেট্রিয়ট। তিনি যদি নেপোলিয়নের ন্যায় রুধিরস্রোতে দেশকে ভাসাইয়া দিয়া দেশের অহিত সাধন করেন, আর বলেন যে দেশের মহত্ত্ব যদি না রহিল, তবে তাহার হিতে কাজ নাই, তথাপি তিনি পেট্রিয়ট। পক্ষান্তরে যাঁহারা কাটা ছাঁটা আঁটা সাঁটা পোষাক এবং দোকান-সাজানিয়া এবং গৃহ সজ্জাতেই সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখেন ; স্বদেশের কিছুই দুচক্ষে দেখিতে পারেন না ; এমন কি স্বদেশের সর্ববাদি-সম্মত বিশিষ্ট উৎকর্ষ-স্থানটিকেও যাঁহারা কেবল অন্যের দেখাদেখি নাক মুখ সিট্‌কাইয়া ভালবাসেন, বলেন—তা বটে, তাহার ভালত্ব আপন চক্ষে দেখেনও না—দেখিতে জানেনও না ; যাঁহারা স্বদেশের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন না, তাহা দূরে থাকুক, উল্টা আরো যাঁহারা স্বদেশকে নীচু করিয়া আপনারা উঁচু হইবার চেষ্টায় 'যাচিয়া মান' এবং 'কাঁদিয়া সোহাগের' কর্দমাক্ত পথে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান হন, তাঁহারা যদি দেশের 'মাথা হেঁট-করা' দেহের যাঁতা চালাইবার উপযোগী মহামহা বহ্বাড়ম্বরে ব্যাপৃত হইয়া দেশহিতৈষতার ধ্বজা উড়াইতে এক মুহূর্তও ক্ষান্ত না হন, তাহা হইলেও আমি তাঁহাদিগকে গ্যারিবল্ডি বলিব না। বিদ্যাসাগর মহাশয় ওরূপ গ্যারিবল্ডি ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে আমরা পেট্রিয়ট বলিতেছি। তিনি যদি একশত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেন, শত সহস্র লোককে আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, দশকোটি বিধবার মৃত সাধব্য পুনর্জীবিত করিতেন, তাহা হইলে বলিতাম তিনি মস্ত একজন হিতৈষী স্বদেশ-প্রেমিক। তাঁহাকে বলিতেছি আরেক কারণে, যখন তিনি উড্রো সাহেবের অধীনতাশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নিঃসম্বল হস্তে গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক লেখনীযন্ত্র দ্বারা জীবিকা সংস্থানের পথ কাটিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বুঝিলাম যে, হাঁ ইনি পেট্রিয়ট, যেহেতু ইনি খাওয়া পরা অপেক্ষা স্বাধীনতাকে প্রিয় বলিয়া জানেন। যখন দেখিলাম যে, তিনি উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সমস্তই ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ সে সভ্যতার কৃত্রিম কুহকাংশে পদাঘাত করিয়া স্বদেশীয় উচ্চ অঙ্গের সভ্যতা বিদ্যা-বিনয়-দয়া-দাক্ষিণ্য-মহত্ত্ব এবং সদাশয়তা—সমস্ত আপনাতে মূর্তিমান করিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে, এ ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণ

সত্য সত্যই পেট্রিয়ট ছাঁচে গঠিত। যখন দেখিলাম যে, 'এদেশের কিছু হইবে না' বলিয়া তিনি অকেজো মৌখিক সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সংসর্গে বিমুখ হইয়া বাষ্পগদ্‌গদলোচনে গৃহকোটরে ঢুকিয়া আপনাতে আপনি ভর করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন—দীপ্ত দিবাকর অল্পে অল্পে তেজোরশ্মি গুটাইয়া অস্তাচলশিখরে অবনত হইতেছেন, তখন বুঝিলাম যে, পূর্বজন্মে ইনি প্রাচীন রোম নগরের কোন একজন খ্যাতনামা পেট্রিয়ট ছিলেন—পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ হইতে আমাদের এই হতভাগ্য দেশে নিপতিত হইয়া মনের খেদে ধুলিতে অবলুণ্ঠিত হইতেছেন; অথচ কেহ তাঁহাকে পুঁছিতেছে না।*

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

* ১৩০৬ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

১৪

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে;
দীন যে, দীনের বন্ধু! উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্যবলে! পেয়ে সে মহাপর্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ! কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী,
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘশির তরুদল, দাসরূপ ধরি'।
পরিমল ফুল-কুল দশ দিশ ভরে'
দিবসে শীতলশ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৫

আপনার বেশভূষা সামান্য আকার,
দেখিলে পরের দুঃখ নেত্র জলভার!
সমাজ-পীড়িত দুঃখ করিতে মোচন
জীবন উৎসর্গ নিজ করিল যে জন,
আপনি সহিলা নিন্দা কত তিরস্কার;
ঋণে বদ্ধ অবশেষ—তবু দৃঢ় পণ,
সংকল্প সাধন কিম্বা শরীর পতন!
এ হেন পুরুষ-সিংহ জন্মে মা, ক'জন?
অদ্বিতীয় বাংলা ভাষার শিক্ষা-গুরু
বর্ণমালা হতে বঙ্গ-সাহিত্যের শুরু
স্বহস্তে অর্জিত যাঁর—যাঁর প্রতিভায়
উজ্জ্বল বাংলা আজ প্রখর প্রভায়!
স্বাধীন স্বতন্ত্র চিত্ত কাহার তেমন?
দর্প নির্ভীকতা বীর্য যে কিছু লক্ষণ
তেজীয়ান পুরুষের সবই ছিল তাঁয়।
তৃণজ্ঞান পদমান অবজ্ঞা যেথায়,
শ্বেতাঙ্গ-প্রসাদও গর্বে ঠেলিতে হেলায়।
হেন পুত্র, হায় মাতঃ, হারালে কোথায়?

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬

ফুরাল বঙ্গের লীলা মাহাত্ম্য সকলি,—
হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী।
হারালে মা বঙ্গভূমি পুত্ররত্নে আজ,
বিশীর্ণ বিমর্ষ দুঃখে বঙ্গের সমাজ!
কি মহা পরাণ লয়ে জন্মেছিল ধীর,
কিবা বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভা, করুণা গভীর;
বিদ্যার সাগর খ্যাতি—আরো মনোহর;
বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর;—
তেমন সন্তান মাগো, কে আর তোমার!
কাঁদিছে হের গো, তাঁরে করিয়া স্মরণ,
দরিদ্র কাঙাল দুঃখী কত শত জন,
কেবা অন্ন দিবে আর, কে ঘুচাবে দুঃখ
দরিদ্র কাঙালে দেখে কে চাহিবে মুখ;
কত রাজা রাণী আছে এ রাজ্য ভিতর—
কাঙালে হেরিয়া কেবা করে সে আদর।
মানব দেহেতে সেই দয়া মূর্তিমান,—
প্রাতে স্মরণীয় নিত্য যাঁর গুণগান!

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭

বিদ্যার সাগর তুমি
বিপ্লবের বেলাভূমি
সংসার মরুতে তুমি দয়ার সাগর—
দক্ষিণ করের দান
কভু নাহি জানে বাম,
নিজে দীন হীন, পরদুঃখেতে কাতর।
গলদশ্রু দু'নয়নে
ভিক্ষা চাহি শ্রীচরণে
আশীর্বাদ করো শিরে স্থাপিয়া চরণ।
তোমার সাহিত্য প্রাণ
তোমার আদর্শ ধ্যান
সমর্পিয়া, পূজি বঙ্গ-সাহিত্য ঈশ্বর—
বিশ্বের সাহিত্য বুঝি, পুজি বিশ্বেশ্বর।

—নবীনচন্দ্র সেন

১৮

বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যূষের বিভা,
বঙ্গভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টীকা!
রুদ্ধ ভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধন গাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্য গঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি ;
ভারতীর পূজা তরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট (ক)

স্বরচিত আত্মচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা

[বিদ্যাসাগরের আত্মচরিত তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত হয়। বইখানি অসম্পূর্ণ। শৈশব থেকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হওয়ার ঘটনা পর্যন্ত ইহাতে আছে। কি কারণে বিদ্যাসাগর বইখানি অসমাপ্ত রাখেন এবং কি কারণেই বা তিনি তাঁর জীবদ্দশায় এটি প্রকাশ করেন নি, তা অনুমান করা কঠিন। তবে এই কথা বলা যায় যে, বিদ্যাসাগর যদি তাঁর সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করে যেতেন, যদি তিনি তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে সমসাময়িক ইতিহাস লিখতেন, তাহলে বাংলা সাহিত্যে আমরা নিঃসন্দেহে একখানি প্রথম শ্রেণীর আত্মচরিত পেতাম আর পেতাম সর্বঅবয়বসম্পন্ন একখানি জীবনচরিতের উত্তম দৃষ্টান্ত। যিনি ছাত্রজীবনে ছিটে খাওয়ার কথা নিঃসঙ্কোচে উল্লেখ করতে পারেন, সত্যপ্রকাশে যিনি চির অকুণ্ঠ, তাঁর মতন লোকই জীবনকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করতে, হৃদয়ের গূঢ় কথা ব্যক্ত করতে এবং সমসাময়িক ঘটনা ও যেসব লোকের সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হয়েছিল, তাদের চিন্তা ও চরিত্রকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যাচাই করতে পারতেন। মন ও মুখ যাঁর এক, জীবন যাঁর স্বচ্ছ, চরিত্র যাঁর নির্মল, চিন্তা যাঁর সংস্কারমুক্ত—সেই বিদ্যাসাগরের পক্ষেই যথার্থ আত্মজীবনী রচনা করা সম্ভব ছিল। তাছাড়া, যদি তিনি তাঁর জীবনের ইতিহাস নিজে লিখে যেতে পারতেন, তাহলে তাঁর জীবন-চরিত রচনা করার জন্যে অনেক কিছু উপাদান ও উপকরণ পাওয়া যেত এবং সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকত না। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একাধিক জীবনী বিরচিত হয়েছে (তাঁর জীবনচরিতকারের মধ্যে তাঁর ভাইও একজন)। সেইসব জীবনীতে পরস্পর-বিরোধী ঘটনার যেমন সমাবেশ দেখা যায়, তেমনি

জনশ্রুতি ও কিম্বদন্তীসূত্রে প্রাপ্ত বহু উপকরণও সেগুলির মধ্যে নির্বিচারে স্থান পেয়েছে। ফলে, জীবনীর বিষয়ীভূত মানুষটির ভাষা, মনোবৃত্তি, ধর্মপ্রবৃত্তি, রীতিনীতি প্রভৃতি যথাযথভাবে বিশ্লেষিত ও আলোচিত হয়নি। এই প্রসঙ্গে জনসনের জীবনী-লেখক বসওয়েলের উক্তি স্মরণীয়। যে-বিদ্যাসাগরকে আজ আমরা এইসব জীবনচরিতের ভেতর দিয়ে পাই, সে-বিদ্যাসাগর তাই অনেকটা কিম্বদন্তীর বিদ্যাসাগর, জনশ্রুতির বিদ্যাসাগর।

সমসাময়িক কালের বাংলার সমাজ-জীবনের যে পঙ্কিল-চিত্র তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সংকীর্ণচেতা, স্বার্থপর ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি যেসব মানুষের সংস্পর্শে তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে আসতে হয়েছিল এবং বাংলার বহু অভিজাত পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা করে তিনি তাদের পারিবারিক জীবনের যেসব তথ্য জানতে পেরেছিলেন, হয়ত সেগুলি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে গেলে, অনেকের মনে ব্যথা দিতে হয়। বিদ্যাসাগরের স্পর্শকাতর কোমল হৃদয় স্বভাবতই এ-ক্ষেত্রে সঙ্কোচ বোধ না করে পারেনি। আমাদের অনুমান, আত্মজীবনী লিখতে তিনি বিরত হয়েছিলেন এই কারণেই। তবু যেটুকু লিখেছেন, তার সাহিত্য-মূল্য বড় কম নয়। পিতা ও পিতামহের চরিত্র-বর্ণনায় বিদ্যাসাগর যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তা যে কোনো প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের ঈর্ষার বিষয়। বিশেষ করে পিতামহ রামজয়ের অপরাজেয় প্রকৃতি, তাঁর স্বভাবের মহত্ত্ব পৌত্রের লেখনীতে এমন নিপুণভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে যে, পাঠকের চোখের সামনে সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণের মূর্তি আপনা থেকেই ফুটে ওঠে। এই জাতীয় রচনায় তিনি যে রীতির প্রবর্তন করে গেছেন, আজকের দিনেও সে রীতি অচল নয়। আমরা তাঁর এই স্বরচিত আত্মচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা পাঠকদের সামনে তুলে ধরলাম। ইতি—লেখক।]

শকাব্দ: ১৭৪২, ১২ আশ্বিন, মঙ্গলবার, দিবা দ্বিপ্রহর সময়, বীরসিংহ গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমি জনক-জননীর প্রথম সন্তান।

বীরসিংহের আধ ক্রোশ অন্তরে কোমরগঞ্জ নামে এক গ্রাম আছে; ঐ গ্রামে মঙ্গলবার ও শনিবারে, মধ্যাহ্ন সময় হাট বসিয়া থাকে। আমার জন্ম সময় পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না; কোমরগঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে,

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, "একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে"। এই সময়, আমাদের বাটীতে, একটি গাই গর্ভিনী ছিল ; তাহারও আজকাল প্রসব হইবার সম্ভাবনা। এজন্য পিতামহদেবের কথা শুনিয়া, পিতৃদেব মনে করিলেন, গাইটি প্রসব হইয়াছে। উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব এঁড়ে বাছুর দেখিবার জন্য, গোয়ালের দিকে চলিলেন। তখন পিতামহদেব হাস্যমুখে বলিলেন, "ওদিকে নয়, এদিকে এস ; আমি তোমার এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া, সূতিকা গৃহে লইয়া গিয়া, তিনি এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।

এই অকিঞ্চিৎকর কথার উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, আমি বাল্যকালে, মধ্যে মধ্যে অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা, পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। এই সময় তিনি, সন্নিহিত ব্যক্তিদিগের নিকট, পিতামহদেবের পূর্বোক্ত পরিহাস বাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "ইনি সেই এঁড়েবাছুর। বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন ; তাঁহার পরিহাস বাক্যও বিফল হইবার নহে ; বাবাজি আমার, ক্রমে, এঁড়ে গরুর অপেক্ষাও একগুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন।" জন্ম সময়, পিতামহদেব, পরিহাস করিয়া, আমায় এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন ; জ্যোতিষ-শাস্ত্রের গণনা অনুসারে, বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল ; আর, সময় সময়, কার্যদ্বারাও, এঁড়ে গরুর পূর্বোক্ত লক্ষণ, আমার আচরণে, বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।

প্রপিতামহদেব ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পাঁচ সন্তান। জ্যেষ্ঠ নৃসিংহরাম, মধ্যম গঙ্গাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম রামচরণ। তৃতীয় রামজয় তর্কভূষণ আমার পিতামহ। তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন ; কোন অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনোপ্রকার অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সকল স্থলে, সকল বিষয়ে স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তন তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার প্রত্যাশায় অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। তিনি নিতান্ত নিস্পৃহ ছিলেন,

এজন্য অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য তাঁহার পক্ষে, কস্মিনকালেও আবশ্যক হয় নাই।

তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন। কি ছোট কি বড়, সর্ববিধ লোকের সহিত সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটাচারী মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না; তিনি যেমন স্পষ্টবাদী ছিলেন, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহার ভয়ে বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনও কারণে তিনি, কখনও কোনও বিষয়ে অযথা নির্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকে ভদ্র বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান, ধনবান ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন বটে, কিন্তু তদীয় আকারে, আলাপে বা কার্যপরম্পরায়, তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছে বলিয়া কেহ বোধ করিতে পারিতেন না। তিনি, ক্রোধের বশীভূত হইয়া ক্রোধবিষয়ীভূত ব্যক্তির উপর প্রতি কটূক্তি প্রয়োগে, অথবা তদীয় অনিষ্ট চিন্তনে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। নিজে যে কর্ম সম্পন্ন করিতে পারা যায়, তাহাতে তিনি অন্যদীয় সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না; এবং কোনও বিষয়ে, সাধ্যপক্ষে পরাধীন বা পরপ্রত্যাশী হইতে চাহিতেন না। তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এজন্য সকলেই তাঁহাকে, সাক্ষাৎ ঋষি বলিয়া নির্দেশ করিতেন।

তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় বলবান, নিরতিশয় সাহসী এবং সর্বতোভাবে অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন। এক লৌহদণ্ড তাঁহার চিরসহচর ছিল; উহা হস্তে না করিয়া তিনি কখনও বাটীর বাহির হইতেন না। তৎকালে অতিশয় দস্যুভয় ছিল। স্থানান্তরে যাইতে হইলে, অতিশয় সাবধান হইতে হইত। অনেক স্থলে, কি প্রত্যূষে, কি মধ্যাহ্নে, অল্পসংখ্যক লোকের প্রাণনাশ অবধারিত ছিল। এজন্য, অনেকে সমবেত না হইয়া ঐসকল স্থান দিয়া যাতায়াত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়, অসাধারণ বল,

সাহস ও চিরসহায় লৌহদণ্ডের সহায়তায়, সকল সময়ে, ঐ সকল স্থান দিয়া, একাকী নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেন। দস্যুরা দুই-চারিবার আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্তরূপে আক্কেলসেলামী পাইয়া, আর তাহাদের তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস হইত না। মানুষের কথা দূরে থাকুক, বন্য হিংস্রজন্তুকেও তিনি ভয়ানক জ্ঞান করিতেন না। একুশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে একবার তিনি এক ভালুকের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন। ভালুক নখপ্রহারে তাঁহার সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি তদীয় উদরে উপর্যুপরি পদাঘাত করিয়া, তাঁহার প্রাণসংহার করিলেন।

বীরসিংহ গ্রামে উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে এক অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ এই উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গাদেবীর পাণি-গ্রহণ করেন। দুর্গাদেবীর গর্ভে তর্কভূষণ মহাশয়ের দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ কালিদাস, জ্যেষ্ঠা মঙ্গলা, মধ্যমা কমলা, তৃতীয় গোবিন্দমণি, চতুর্থী অন্নপূর্ণা। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জনক। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের (প্রপিতামহ) দেহত্যাগের পর, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র সংসারে কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। সামান্য বিষয় উপলক্ষে, তাঁহাদের সহিত তর্কভূষণের (পিতামহ) কথান্তর উপস্থিত হইয়া, ক্রমে বিলক্ষণ মনান্তর ঘটিয়া উঠিল। তাঁহার শ্যালক রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় গর্বিত ও উদ্ধত স্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা বুঝিতে পারিলে, তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত হইয়া না চলিলে, রামসুন্দর নানা প্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু রামজয় কোনও কারণে ভয় পাইবার লোক ছিলেন না; তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাস ত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে, তাঁহাকে সময়ে সময়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে, একঘরিয়া হইয়া থাকিতে হইত ও নানাপ্রকার অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে

ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত হইতেন না। অবশেষে আর এখানে অবস্থিতি করা কোনও ক্রমে বিধেয় নহে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া পিতামহদেব কাহাকেও কিছু না বলিয়া, একবারে দেশত্যাগী হইলেন। বনমালীপুর হইতে প্রস্থান করিয়া, যে আট বৎসর অনুদ্দেশপ্রায় হইয়াছিলেন, ঐ আট বৎসরকাল কেবল তীর্থ পর্যটনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি দ্বারকা, জ্বালামুখী বদরিকাশ্রম পর্যন্ত পর্যটন করিয়াছিলেন।

রামজয় তর্কভূষণ দেশত্যাগী হইলেন ; দুর্গাদেবী পুত্রকন্যা লইয়া বনমালিপুরের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই দুর্গাদেবীর লাঞ্ছনা-ভোগ ও তদীয় পুত্রকন্যাদের উপর কর্তৃপক্ষের অযত্ন ও অনাদর এতদূর পর্যন্ত হইয়া উঠিল যে, দুর্গাদেবীকে পুত্রদ্বয় ও কন্যাচতুষ্টয় লইয়া, পিত্রালয় বীরসিংহ গ্রামে যাইতে হইল। কতিপয় দিবস অতি সমাদরে অতিবাহিত হইল। দুর্গাদেবীর পিতা, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এজন্য সংসারের কর্তৃত্ব তদীয় পুত্র রামসুন্দর বিদ্যাভূষণের হস্তে ছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই, পুত্রকন্যা লইয়া পিত্রালয়ে কালযাপন করা দুর্গাদেবীর পক্ষে বিলক্ষণ অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। সেখানেও তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্যা, অনিয়ত কালের জন্য, সাতজনের ভরণপোষণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা তাঁহার উপর অতিশয় বিরূপ। অবশেষে দুর্গাদেবীকে পুত্রকন্যা লইয়া, পিত্রালয় হইতে বহির্গত হইতে হইল। তর্ক-সিদ্ধান্ত মহাশয় অতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন এবং স্বীয় বাটীর অনতিদূরে এক কুটীর নির্মিত করিয়া দিলেন। দুর্গাদেবী পুত্রকন্যা লইয়া, সেই কুটীরে অবস্থিত ও অতিকষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে, টেকুয়া ও চরকায় সূতা কাটিয়া, সেই সূতা বেচিয়া অনেক নিঃসহায় নিরুপায় স্ত্রীলোক আপনাদের দিন গুজরান করিতেন। দুর্গাদেবী সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তাদৃশ স্বল্প আয়দ্বারা নিজের, দুই পুত্রের ও চারি কন্যার ভরণপোষণ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার পিতা সময়ে সময়ে, যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন, তথাপি তাঁহাদের আহারাদি সর্ববিষয়ে ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। এই সময়ে জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম ১৪।১৫ বৎসর। তিনি মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া, উপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।

ঠাকুরদাস, প্রথমতঃ বনমালিপুরে, তৎপরে বীরসিংহে, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি, ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের* চতুষ্পাঠীতে, রীতিমত সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন করিবেন, প্রথমতঃ এই ব্যবস্থা স্থির হইয়াছিল এবং তিনিও তাদৃশ অধ্যয়ন-বিষয়ে সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন; কিন্তু, যে উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সংস্কৃতপাঠে নিযুক্ত হইলে, তাহা সম্পন্ন হয় না। তিনি সংস্কৃত পড়িবার জন্য সবিশেষ ব্যগ্র ছিলেন, যথার্থ বটে, এবং সর্বদাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেন, যত কষ্ট, যত অসুবিধা হউক না কেন, সংস্কৃতপাঠে প্রাণপণে যত্ন করিব। কিন্তু জননীকে ও ভাই-ভগিনীগুলিকে কি অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছেন, যখন তাহা মনে হইত, তখন সে ব্যগ্রতা ও সে প্রতিজ্ঞা, তদীয় অন্তঃকরণ হইতে একেবারে অপসারিত হইত। যাহা হউক, অনেক বিবেচনার পর অবশেষে ইহাই অবধারিত হইল, যাহাতে তিনি শীঘ্র উপার্জনক্ষম হন, সেরূপ পড়াশুনা করাই কর্তব্য।

এই সময়ে, মোটামুটি ইংরেজি জানিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে অনায়াসে কর্ম হইত। এজন্য সংস্কৃত না পড়িয়া, ইংরেজি পড়াই তাঁহার পক্ষে পরামর্শ সিদ্ধ হইল। কিন্তু, সে সময়ে, ইংরেজি পড়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন, এখনকার মত, প্রতি পল্লীতে ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল না। তাদৃশ বিদ্যালয় থাকিলেও তাঁহার ন্যায় নিরুপায় দীন বালকের তথায় অধ্যয়নের সুবিধা ঘটিত না। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কার্যোপযোগী ইংরেজি জানিতেন। তাঁহার অনুরোধে, ঐ ব্যক্তি ঠাকুরদাসকে ইংরেজি পড়াইতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে, ঠাকুরদাস প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তাঁহার নিকটে গিয়া ইংরেজি পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কিছুদিন পরে ঠাকুরদাস, আশ্রয়দাতার সহায়তায় মাসিক দুই টাকা বেতনে কোন স্থানে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম পাইয়া তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। পূর্ববৎ আশ্রয়দাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের ক্লেশ সহ্য করিয়াও বেতনের দুইটি টাকা, যথানিয়মে জননীর নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও যার-পর-নাই পরিশ্রমী ছিলেন, এবং কখনও কোনও ওজর না করিয়া সকল কর্মই সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেন। এজন্য,

* বিদ্যাসাগরের নিকটআত্মীয় সভারাম বাচস্পতির পুত্র জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার; ঠাকুরদাস কলকাতায় এসে প্রথমে এই জ্ঞাতিপুত্রের আশ্রয়েই ছিলেন।

ঠাকুরদাস যখন যাঁহার নিকট কর্ম করিতেন, তাঁহারা সকলেই তাহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। দুই তিন বৎসর পরেই ঠাকুরদাস মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জননীর ও ভাই-ভগিনীগুলির অপেক্ষাকৃত অনেকাংশে কষ্ট দূর হইল। এই সময়ে, পিতামহদেবও দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ বনমালিপুরে গিয়াছিলেন; তথায় স্ত্রী-পুত্র কন্যা দেখিতে না পাইয়া বীরসিংহ আসিয়া পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। সাত আট বৎসরের পর, তাঁহার সমাগমলাভে, সকলেই আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন। শ্বশুরালয়ে বা শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে বাস করা তিনি অবমাননা জ্ঞান করিতেন; এজন্য কিছুদিন পরেই, পরিবার লইয়া বনমালিপুরে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গাদেবীর মুখে ভ্রাতাদের আচরণের পরিচয় পাইয়া সে উদ্যম হইতে বিরত হইলেন, এবং নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক বীরসিংহে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। এইরূপে, বীরসিংহ গ্রামে আমাদের বাস হইয়াছিল।

ঠাকুরদাসের আট টাকা মাহিনা হইয়াছে শুনিয়া তদীয় জননী দুর্গাদেবীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। এই সময়ে ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ চব্বিশ বৎসর হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তর্কভূষণ মহাশয় গোঘাট-নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই ভগবতী দেবীর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভগবতী দেবী, শৈশবকালে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। মাতামহ পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অবর্তমানে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিদ্যাভূষণ অন্যান্য সহোদর ও সহোদরাদের লালন-পালনের ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া পিতার সুনাম রক্ষার জন্য নিয়ত যত্নবান থাকিতেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, একান্নবর্তী ভ্রাতাদের অধিক দিন পরস্পর সদ্ভাব থাকে না; যিনি সংসারের কর্তৃত্ব করেন, তাঁহার পরিবার যেরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকেন, অন্য অন্য ভ্রাতাদের পরিবারের পক্ষে সেরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকা কোনও মতে ঘটিয়া উঠে না, এজন্য অল্প দিনেই ভ্রাতাদের পরস্পর মনান্তর ঘটে; অবশেষে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া পৃথক হইতে হয়। কিন্তু সৌজন্য ও মনুষ্যত্ব বিষয়ে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের চারিপুত্র সমান ছিলেন, এজন্য কেহ কখনও ইহাদের চারিজনের মধ্যে মনান্তর বা কথান্তর দেখিতে পান

নাই। স্বীয় পরিবারের কথা দূরে থাকুক, ভগিনী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ীদের পুত্রকন্যাদের উপরও তাহাদের অনুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ভাগিনেয়ীরা পুত্রকন্যাসহ মাতুলালয়ে গিয়া যেরূপ সুখে সমাদরে কালযাপন করিতেন; কন্যারা পুত্রকন্যা লইয়া পিত্রালয়ে গিয়া সচরাচর সেরূপ সুখ ও সমাদর প্রাপ্ত হইতে পারে না।

অতিথির সেবা, অভ্যাগতের পরিচর্যা এই পরিবারে যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ ঐ অঞ্চলের কোন পরিবার এ বিষয়ে এই পরিবারের ন্যায় প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ফল কথা এই, অন্ন প্রার্থনায় রাধামোহন বিদ্যাভূষণের দ্বারস্থ হইয়া কেহ কখনও প্রত্যাগত হইয়াছেন, ইহা কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে অবস্থার লোক হউক, লোকের সংখ্যা যতই হউক, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আবাসে আসিয়া সকলেই পরম সমাদর, অতিথি-সেবা ও অভ্যাগত পরিচর্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও তদীয় পরিবারবর্গের নিকট আমরা অশেষ প্রকারে যে প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পরিশোধ হইতে পারে না। আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছিল, মাতৃদেবী পুত্র-কন্যা লইয়া মাতুলালয়ে যাইতেন, এবং এক যাত্রায়, ক্রমান্বয়ে পাঁচ-ছয়মাস বাস করিতেন, কিন্তু একদিনের জন্যেও স্নেহ, যত্ন ও সমাদরের ক্রটি হইত না। বস্তুতঃ ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয়ীর পুত্র-কন্যাদের উপর এরূপ স্নেহ প্রদর্শন অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার।

প্রথমবার কলিকাতা আসিবার সময় সিয়াখালার সালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলের মত একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোতা দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, "বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন?" তিনি আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, "ও শিল নয়, উহার নাম মাইল ষ্টোন।" আমি বলিলাম, "বাবা, মাইল ষ্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।" তখন তিনি বলিলেন, "এটি ইংরেজি কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ, ষ্টোন শব্দের অর্থ পাথর। এই রাস্তায় আধ আধ ক্রোশ অন্তরে, এক একটি পাথর পোতা

আছে, উহাতে এক দুই তিন প্রভৃতি অঙ্ক খোদা রহিয়াছে। এই পাথরের অঙ্ক উনিশ, ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে, এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল, অর্থাৎ সাড়ে নয় ক্রোশ।” এই বলিয়া তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন।

নামতায় ‘একের পিঠে নয় উনিশ’ ইহা শিখিয়াছিলাম। দেখিবামাত্র আমি প্রথমে এক অঙ্কের, তৎপর নয় অঙ্কের উপর হাত দিয়া বলিলাম, তবে এইটি ইংরেজির এক, আর এইটি ইংরেজির নয়। অনন্তর বলিলাম, “তবে বাবা, ইহার পর যে পাথরটি আছে, তাহাতে আঠার, তাহার পর হইতে সতর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক পর্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইব। আজ পথে যাইতে যাইতে আমি ইংরেজির অঙ্কগুলি চিনিয়া ফেলিব।”

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রথম মাইল ষ্টোনের নিকট গিয়া, আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও চিনিতে আরম্ভ করিলাম। মনবেড় চটীতে দশম মাইল ষ্টোন দেখিয়া, পিতৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম, “বাবা, আমার ইংরেজি অঙ্ক চেনা হইল।” পিতৃদেব বলিলেন, “কেমন চিনিয়াছ, তাহার পরীক্ষা করিতেছি।” এই বলিয়া তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম এই তিনটি মাইল ষ্টোন ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলে, আমি এটি নয়, এটি আট, এটি সাত, এইরূপ বলিলাম। পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অঙ্কগুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের পর আট, আটের পর সাত, অবধারিত আছে, ইহা জানিয়া, চালাকি করিয়া নয়, আট, সাত বলিতেছি। যাহা হউক তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইল ষ্টোনটি দেখিতে দিলেন না, অনন্তর পঞ্চম মাইল ষ্টোনটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এটি কোন্ মাইল ষ্টোন বল দেখি?” আমি দেখিয়া বলিলাম, “বাবা, এই মাইল ষ্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে; এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।”

এই কথা শুনিয়া পিতৃদেব ও তাঁহারা সমভিব্যাহারীরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বীরসিংহের গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন, তিনি আমার চিবুক ধরিয়া, “বেশ বাবা বেশ” এই কথা বলিয়া, অনেক আশীর্বাদ করিলেন, এবং পিতৃদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, “দাদা মহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখাপড়া বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে, মানুষ হইতে পারিবেক।”

পরিশিষ্ট (খ)

বাংলার নবজাগরণের যুগরেখা

১৭৭০ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (বাংলা ১১৭৬ সনে এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে ইহা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ)।

১৭৭৩ বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত।

১৭৭৪ রামমোহন রায়।

১৭৭৬ পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (বঙ্গবিখ্যাত পণ্ডিত, কেরীর শিক্ষক ও কৃত্তিবাস-রামায়ণের সংস্কর্তা)।

১৭৭৮ ছেনি-কাটা বাংলা অক্ষরের সৃষ্টি (পুঁথি থেকে ছাপার যুগ)। পঞ্চানন কর্মকার ও চার্লস উইলকিন্স-এর যুগ্ম প্রয়াস।

১৭৭৯ কলিকাতায় স্যর চার্লস উইলকিন্স-এর তত্ত্বাবধানে প্রথম সরকারী ছাপাখানা। হলহেডের বাংলাভাষার ব্যাকরণ এই প্রেসে প্রথম ছাপা হয়।

১৭৮০ কলিকাতায় প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র—'হিকিস্ গেজেট'। (প্রকৃত নাম 'বেঙ্গল গেজেট বা ক্যালকাটা জেনারেল এ্যাডভার্টাইজার') প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক: জেমস্ অগষ্টাস হিকি।

১৭৮১ হেষ্টিংস কর্তৃক কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' (উইলিয়ম মরিস)।

১৭৮৪ প্রথম সরকারী সংবাদপত্র—'ক্যালকাটা গেজেট'। এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল।

১৭৮৫ 'বেঙ্গল জার্নাল'।

১৭৮৬ 'ক্যালকাটা ক্রনিকল্'।

১৭৯১ মতিলাল শীল।

১৭৯২ ভারত-হিতৈষী ইংরেজ রাজপুরুষ জোনাথান ডানকান কর্তৃক কাশীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত।

১৭৯৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। রাধাকান্ত দেব। (উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট সমাজপতি ও 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধান-প্রণেতা)। বহুভাষাবিদ্ খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ডাঃ উইলিয়ম কেরীর কলিকাতায় আগমন। (জন্ম: ইংলণ্ড, ১৭৬১)।

১৭৯৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর।

১৭৯৫ রামকমল সেন। (বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রথম ইংরেজি-বাংলা অভিধান প্রণেতা)।

১৭৯৯ মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ব্রান্সডন, গ্রাণ্ট প্রভৃতি মিশনরিদের বাংলায় আগমন ও শ্রীরামপুরে বসবাস।

১৮০০ উইলিয়ম কেরীর শ্রীরামপুরে আগমন। (শ্রীরামপুর তখন ডেনমার্কের রাজার অধীন)। কৃষ্ণচন্দ্র পাল—প্রথম বাঙালি খৃষ্টান। শ্রীরামপুরের মিশনারিদের প্রচার-কার্যের প্রথম ফল। ডেভিড হেয়ারের কলিকাতা আগমন (নব্যবঙ্গের প্রথম দীক্ষাগুরু)। (জন্ম—স্কটল্যাণ্ড, ১৭৭৫)। শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত। বাইবেলের প্রথম বাংলা অনুবাদ (কেরী ও রামরাম বসুর যুগ্ম প্রচেষ্টা)। রামরাম বসু রচিত বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম গদ্য গ্রন্থ: 'প্রতাপাদিত্য-চরিত'।

১৮০১ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রথম শিক্ষকবৃন্দ: উইলিয়ম কেরী, (বাংলা ভাষার অধ্যাপক)। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। রামরাম বসু, গোলকনাথ শর্মা। চণ্ডীচরণ মুন্সী।

১৮০১ বাংলা গদ্যের আদিপর্বের (১৮০১-১৮১৮) লেখকবৃন্দের কয়েকজন: মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (বত্রিস সিংহাসন), রামমোহন রায়, রামরাম বসু (প্রতাপাদিত্য-চরিত), চণ্ডীচরণ মুন্সী (তোতা ইতিহাস), হরপ্রসাদ রায় (পুরুষ-পরীক্ষা), উইলিয়ম কেরী (বাংলা ব্যাকরণ)। ইংরেজি শিক্ষার অভ্যুদয়।

১৮০২ শারবোর্ণ, মার্টিন বাউল, এ্যারাটুন পিটার্স ও ডেভিড ড্রামণ্ড কর্তৃক চিৎপুর কলুটোলা, আমড়াতলা ও ধর্মতলায় ইংরেজি স্কুল স্থাপন।

১৮০৩ প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

১৮০৪ তারাচাঁদ চক্রবর্তী (ইংরেজি ও বাংলা অভিধান প্রণেতা এবং মনুসংহিতার ইংরেজি অনুবাদক। 'দি কুইল' নামক ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রকাশক ও সম্পাদক)।

১৮০৮ হরচন্দ্র ঘোষ (ছোট আদালতের প্রথম বাঙালি জজ)। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা)। হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (কলিকাতায় জন্ম—জাতিতে পোর্তুগীজ)। নব্যবঙ্গের দ্বিতীয় দীক্ষাগুরু।

১৮১০ রসিককৃষ্ণ মল্লিক।

১৮১১ শিবচন্দ্র দেব।

১৮১২ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (প্রাচীন ও নবীন বাংলা সাহিত্যের সেতু)।

১৮১৩ রামতনু লাহিড়ী। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা গদ্যের আদিপর্বের অন্যতম লেখক এবং ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলায় সুপণ্ডিত)। রাধানাথ সিকদার। সেন্সরসিপ (সংবাদপত্র পরীক্ষার রীতি) আইন বিধিবদ্ধ।

রামমোহনের যুগ

১৮১৪ রামমোহন রায়ের কলিকাতায় স্থায়িভাবে বসবাস।
প্যারীচাঁদ মিত্র। কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন স্থাপিত। ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য জয়নারায়ণ ঘোষাল কর্তৃক লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির হাতে ২০ হাজার টাকা দান এবং উক্ত সোসাইটির রবার্ট মে কর্তৃক চুঁচুড়ায় প্রথম ইংরেজি স্কুল স্থাপন।
গঙ্গাধর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট'।

১৮১৫ মদনমোহন তর্কালঙ্কার (সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থের আদি লেখক)।
রামগোপাল ঘোষ (সম্পাদক: 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'; প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও দেশপ্রেমিক)।
রামমোহন রায় কর্তৃক 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ ও 'আত্মীয় সভা' স্থাপন।

১৮১৬ ডেভিড হেয়ার ও রামমোহন রায়ের যুগ্ম প্রয়াসে হিন্দুকলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
হেয়ার কর্তৃক নিজ ব্যয়ে ঠনঠনিয়া কালীতলার নিকট অবৈতনিক ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮১৭ গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে হিন্দু কলেজ স্থাপিত।
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দিগম্বর মিত্র।
রামমোহন কর্তৃক 'বেদান্ত কলেজ' স্থাপিত।
স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত।
ডেভিড হেয়ার ও রামমোহনের যুগ্ম প্রচেষ্টায় নূতন ধরণের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন।
রামমোহন কর্তৃক সতীদাহ নিবারণ সম্পর্কে পুস্তিকা প্রণয়ন।

১৮১৮ শ্রীরামপুরে কেরী ও মার্শম্যানের প্রচেষ্টায় প্রথম মিশনারি কলেজ-স্থাপিত।
" " " " বাংলা মাসিকপত্র 'দিগ্‌দর্শন'।
" " " " বাংলা সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ'।
" " " " ইংরেজি পত্র 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'।
হেয়ার ও রাধাকান্ত দেবের যুগ্মপ্রয়াসে স্কুল সোসাইটি স্থাপিত।
হেষ্টিংস কর্তৃক সেন্সরসিপ আইন রহিত।
রামমোহনের বিশিষ্ট বন্ধু জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম কর্তৃক 'ক্যালকাটা জার্ণাল' স্থাপিত।
রাজেন্দ্র দত্ত (হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠাতা)। রিচার্ডসন এই কলেজের অধ্যক্ষ হন।

১৮১৯ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
রামমোহন রায়ের সহিত বিখ্যাত তামিল পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর শাস্ত্রীয় বিচার ও শাস্ত্রীয় পরাজয়।
কলিকাতা ব্যাপটিষ্ট মিশনের উদ্যোগে ইংরেজ মহিলাগণ কর্তৃক বাঙালি মেয়েদের শিক্ষার জন্য ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি স্থাপিত।
রামমোহন কর্তৃক 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকার পরিকল্পনা।

১৮২০ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
অক্ষয়কুমার দত্ত।
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ('রোম ও গ্রীসের ইতিহাস' প্রণেতা ও 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক)।
শম্ভুনাথ পণ্ডিত (কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম বাঙালি জজ ; আদি নিবাস কাশ্মীর, জন্ম, শিক্ষা ও কর্মস্থল কলিকাতা)।
রামমোহন রায় কর্তৃক হরিহর দত্তের সম্পাদনায় 'সংবাদ কৌমুদী' স্থাপিত। দেশীয় লোকদের মধ্যে কৃষি-বিষয়ে জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে উইলিয়াম কেরী কর্তৃক এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত।

১৮২১ মিস কুকের কলিকাতা আগমন (ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে বিশিষ্ট ইংরেজ মহিলা)।
ব্যাপটিষ্ট মিশনারি উইলিয়াম এ্যাডামের খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ ও রামমোহনের শিষ্যত্ব গ্রহণ।
রামমোহন কর্তৃক ইউনিটেরিয়ান প্রেস ও ফার্সী ভাষার 'মিরাট্-উল্-আকবর' স্থাপিত।

১৮২২ রামমোহন কর্তৃক এ্যাংলো হিন্দুস্কুল স্থাপিত।
কিশোরীচাঁদ মিত্র ('ইণ্ডিয়ান ফিল্ড')।
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'সমাচার চন্দ্রিকা' স্থাপিত।
রাজেন্দ্রলাল মিত্র (সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ও বিবিধার্থ সংগ্রহ' পুস্তকের লেখক)।
ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি কর্তৃক রাধাকান্ত দেবের উদ্যোগে গৌরীমোহন বিদ্যালঙ্কার লিখিত 'স্ত্রী-শিক্ষা বিধায়ক' বই প্রকাশিত।

১৮২৩ সরকারী কার্যের সমালোচনা করার অপরাধে 'ক্যালকাটা জার্নালে'র সম্পাদক জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত।
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে লর্ড আমহার্স্টকে রামমোহনের ঐতিহাসিক পত্র।
প্রথম প্রেস অর্ডিনান্স ও রামমোহনের নেতৃত্বে ইহার প্রত্যাহারের দাবী করিয়া বহু লোকের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি প্রেরণ। প্রতিবাদে 'সংবাদ কৌমুদী'র প্রকাশ বন্ধ।
হেয়ার স্কুল স্থাপিত। কমিটি অব্ পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন।
প্যারীচরণ সরকার (ইংরেজি 'ফার্ষ্ট বুক'-এর অমর লেখক, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সমাজ-সংস্কারক)।

১৮২৪ সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের নিজস্ব ভবনের ভিত্তিস্থাপন এবং এই উদ্দেশ্যে ডেভিড হেয়ারের জমি দান। সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের প্রথম অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনের গুরু)।
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (প্রসিদ্ধ সাংবাদিক, দেশপ্রেমিক ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর অন্যতম সম্পাদক)।
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ('হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' পত্রিকার প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক।
চার্চ মিশনারি সোসাইটির উদ্যোগে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য দ্বিতীয় একটি সমিতি স্থাপিত।

১৮২৫ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।
বঙ্গদূত।
রামমোহনের সতীদাহ নিবারণ প্রয়াস—দ্বিতীয় পর্যায়।

১৮২৬ মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
রাজনারায়ণ বসু।
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮২৭ বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তাবাদী কবিতার প্রবর্তক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮২৮ ডিরোজিও হিন্দুকলেজের শিক্ষক নিযুক্ত।
নবাব আব্দুল লতিফ (বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের অগ্রনায়ক)।
রামমোহন রায় কর্তৃক কমললোচন বসুর বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত।
হিন্দুকলেজের ছাত্রদের সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা—মাসিক ইংরেজি পত্রিকা 'এথিনিয়ম'।
ডিরোজিও কর্তৃক একাডেমিক এসোসিয়েসন স্থাপিত।
রাধাকান্ত দেবের পৃষ্ঠপোষকতায় সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুল স্থাপিত।

১৮২৯ সতীদাহ নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ। আইনের বাংলা অনুবাদ করেন উইলিয়াম কেরী এবং তাঁহারই ছাপাখানায় উহা মুদ্রিত হয়।
দীনবন্ধু মিত্র ('নীলদর্পণ')।
দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্তৃক ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপিত।

১৮৩০ নবনির্মিত ভবনে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত।
রাধাকান্তদেব কর্তৃক ধর্মসভা স্থাপিত, এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচারে উৎসাহ।
এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হিন্দু এসোসিয়েসন (হিন্দু কলেজ, হেয়ার স্কুল ও রামমোহনের স্কুলের ছাত্রদের মিলিত প্রয়াস)।
আলেকজাণ্ডার ডাফের কলিকাতা আগমন ও ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়িতে রামমোহন রায়ের সাহায্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা।
কালীপ্রসন্ন সিংহ।
দিল্লীর মুঘল সম্রাটের দৌত্য লইয়া রামমোহনের ইংলণ্ড যাত্রা।

১৮৩১ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাংলা সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকর'-এর আবির্ভাব।
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মার' প্রকাশিত।
ডিরোজিওর হিন্দু কলেজ ত্যাগ, 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ান' নামে পত্রিকা সম্পাদন ও মৃত্যু।
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইনকোয়ারার' প্রকাশিত।
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।
'জ্ঞানান্বেষণ'। (ইয়ং বেঙ্গলদের মুখপত্র)

১৮৩২ আলেকজাণ্ডার ডফের নিকট কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ।

সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা স্থাপিত { সভাপতি—রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়। সম্পাদক—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮৩৩ বৃষ্টলে রামমোহনের মৃত্যু।
রামকৃষ্ণ পরমহংস।
মহেন্দ্রলাল সরকার।

১৮৩৪–১৮৪৫ ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠাকাল। বেণ্টিঙ্কের নির্দেশে উইলিয়ম এ্যাডাম কর্তৃক দেশীয় শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত।
নব্য বঙ্গের তৃতীয় দীক্ষাগুরু লর্ড মেকলের (টমাস ব্যাবিংটন মেকলে) ব্যবস্থা-সচিব হিসাবে ভারতে আগমন এবং ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারকল্পে তাঁহার ঐতিহাসিক মন্তব্য।
ইংরেজী শিক্ষায় মেকলের যুগ আরম্ভ।

১৮৩৪ বাঙালির প্রথম অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা। দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্তৃক কার টেগোর এণ্ড কোম্পানী স্থাপিত। উইলিয়ম কেরীর মৃত্যু।

১৮৩৫ কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত (সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্ত প্রথম বাঙালি যিনি ছুরি দিয়া মরা কাটেন)।
মেটকাফ ও মেকলের যুগ্ম প্রচেষ্টায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাপ্রদ আইন।
সংবাদপত্রের বিকাশ ও জনমত প্রকাশের যুগ।

১৮৩৬ কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন হিন্দু কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত। (মধুসূদনের কাব্য-প্রেরণায় ইঁহারই প্রভাব ছিল)।
গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী (বর্তমান নাম—ন্যাশনাল লাইব্রেরী) স্থাপিত।

১৮৩৮ কেশবচন্দ্র সেন।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
কৃষ্ণদাস পাল।
হিন্দু কলেজের ছাত্রদের 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা'। (যুগ্ম-সম্পাদক প্যারীচাঁদ ও রামতনু)।

১৮৩৯ ইংলণ্ডে এ্যাডাম কর্তৃক বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত।
কলিকাতায় শিশুশিক্ষার জন্য বাংলা পাঠশালা স্থাপিত।
কলিকাতায় শ্রমজাত শিল্প শিক্ষার জন্য মেকানিকাল ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপিত।
কালাচাঁদ শেঠ এ্যাণ্ড কোম্পানী (আমদানী-রপ্তানী ব্যবসায় বাঙালির দ্বিতীয় উদ্যম)
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপিত।

তত্ত্ববোধিনীর যুগ

১৮৪০ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। শিক্ষক—অক্ষয়কুমার দত্ত।
রমেশচন্দ্র মিত্র। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।
শিশিরকুমার ঘোষ।

১৮৪১ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।
দুর্গামোহন দাস। কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ।

১৮৪২ জ্ঞানোপার্জিকা সভার মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'—(প্রথম দ্বিভাষী সাপ্তাহিক। রাম গোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্রের যুগ্ম প্রয়াস)।
ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু।
দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রথমবার বিলাত যাত্রা।
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ। ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশ্যে বেদপাঠ।

১৮৪৩ মধুসূদন দত্তের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ।
বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত।
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। সম্পাদক—অক্ষয়কুমার দত্ত।

১৮৪৪ গিরিশচন্দ্র ঘোষ (নট, নাট্যকার ও সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম)।
মনোমোহন ঘোষ।
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৪৫ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। রাসবিহারী ঘোষ।
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু।
মতিলাল শীল কর্তৃক অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত।
দ্বারকানাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা।

১৮৪৬ অক্ষয়চন্দ্র সরকার (বাংলা ভাষায় বিশিষ্ট লেখক)।
নবীনচন্দ্র সেন
নরেন্দ্রনাথ সেন ('ইণ্ডিয়ান মিরর')।
রাজনারায়ণ বসুর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ।
ইংলণ্ডে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু।

১৮৪৭ আনন্দমোহন বসু।
রেঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি রেজিষ্ট্রার)
শিবনাথ শাস্ত্রী।
মতিলাল ঘোষ।
বারাসতে প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত।

১৮৪৮ রমেশচন্দ্র দত্ত।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মীর মোশারফ্ হোসেন ('বিষাদ সিন্ধুর' অমর লেখক)।

ভারত-বন্ধু ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের কলিকাতা আগমন।

১৮৪৯ রজনীকান্ত গুপ্ত ('সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' প্রণেতা)। ফৌজদারী আইনের সংস্কার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা-সচিব বেথুন কর্তৃক চারটি নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও ইহার বিরুদ্ধে কোম্পানীর ইংরেজদের প্রবল আন্দোলন। ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'সংবাদ রসসাগর'। সৈয়দ আমির আলি।

১৮৫১ সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের উদ্যোগে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েসন ও জন টমসন্ প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি একত্র করিয়া বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপিত। সভাপতি—রাধাকান্ত দেব; সম্পাদক—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সূচনা। বেথুন সোসাইটি। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উদ্যোগে ভার্ণাকিউলার লিটারেচার কমিটি (বঙ্গভাষানুবাদক সমিতি) প্রতিষ্ঠিত।

১৮৫২ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতির উদ্যোগে 'জ্ঞানপ্রকাশিকা' সভা স্থাপিত। পরবর্তীকালে এই সভা 'ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে' পরিণত হয়।

অক্ষয়কুমার দত্তের উদ্যোগে দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠিত।

পরিশিষ্ট (গ)

বিদ্যাসাগরের জীবন ও যুগের ঘটনাপঞ্জী

১৮২৯ } কলিকাতায় বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন।
১৮৪১ } সংস্কৃত কলেজে বার বৎসর অধ্যয়ন।

১৮৩৪ ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ।

১৮৪১ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরী। তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগদান।

১৮৪৩ বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি।

১৮৪৪ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৪৬ সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটারি।

১৮৪৭ সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি প্রতিষ্ঠা। প্রথম গ্রন্থ: 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। সংস্কৃত কলেজের চাকরী ত্যাগ।

১৮৪৯ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পুনরায় চাকরী গ্রহণ। বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত।

১৮৫০ সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক। পুত্র নারায়ণচন্দ্রের জন্ম। বেথুন বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক।

১৮৫১ সাহিত্যের অধ্যাপক ও সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সেক্রেটারি এবং পরে অধ্যক্ষ। বেথুনের মৃত্যু। বিদ্যাসাগর কর্তৃক বেথুন সোসাইটি স্থাপন।

বিদ্যাসাগরের যুগ

১৮৫১ } সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত।
১৮৫৮ } অধ্যক্ষ জীবন। সংস্কৃত-শিক্ষার বিবিধ সংস্কার ও সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন।

১৮৫৩ বীরসিংহে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর আবির্ভাব। গিরিশচন্দ্র বসু (বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

১৮৫৪ বোর্ড অব একজামিনার্স-এর সদস্য। বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত প্রথম পুস্তিকা। প্রথম স্ত্রী-পাঠ্য মাসিকপত্র-'মাসিক পত্রিকা' (প্যারীচাঁদ ও রাধানাথ সিকদারের যুগ্ম প্রয়াস)। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুলসর্বস্ব নাটক'। হিন্দু কলেজের প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপিত। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় প্রথম সচিত্র বাংলা মাসিক পত্রিকা 'বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকা'।

১৮৫৫ স্বর্ণকুমারী দেবী।

অধ্যক্ষ পদ ছাড়া দক্ষিণ বাংলা স্কুল ইনস্পেক্টরের পদ লাভ। তত্ত্বোধিনী পত্রিকার সম্পাদক। বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত দ্বিতীয় বই রচনা ও ইংরেজিতে অনুবাদ। নর্মাল স্কুল স্থাপন। পাঁচ মাসে নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুরে ১৯টি মডেল স্কুল স্থাপন। বিধবাবিবাহ আইনের জন্য সরকারের নিকট আবেদন পত্র। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদক। কালীপ্রসন্ন সিংহের অর্থানুকুল্য ও বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় 'সর্বশুভকরী' মাসিক পত্রিকা।

১৮৫৬-১৮৫৮ বেথুন বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি।

১৮৫৬ বিধবাবিবাহ আইন। আইন পাশ হইবার চার মাস পরেই কলিকাতায় প্রথম বিধবা-বিবাহ (৭ই ডিসেম্বর, বাংলা ২৩ অগ্রহায়ণ, ১২৬৩)।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের প্রয়াস: 'সোমপ্রকাশ'-এর আবির্ভাব; সম্পাদক—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

অশ্বিনীকুমার দত্ত।

বঙ্গমহিলা-রচিত সর্বপ্রথম পুস্তক 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্য প্রকাশিত। লেখিকা—কৃষ্ণকামিনী দাসী।

১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহ।

কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত; বিদ্যাসাগর সিনেটের অন্যতম সভ্য নিযুক্ত।

বিপিনচন্দ্র পাল।

১৮৫৮ স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর। হুগলীতে ২০টি, বর্ধমানে ১০টি, মেদিনীপুরে ৩টি ও নদীয়ায় ১টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। 'কুলীন-কুলসর্বস্ব নাটকের' প্রথম অভিনয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। বিদ্যাসাগর তত্ত্বোধিনী সভার সম্পাদক নিযুক্ত। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদত্যাগ এবং ঐ পদে ডাঃ ই, বি, কাউয়েল নিযুক্ত হন।

নীলকর আন্দোলন।

জগদীশচন্দ্র বসু।

১৮৫৯ কালীপ্রসন্ন সিংহের অক্ষয় কীর্তি বাংলাভাষায় মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ।

১৮৬০ 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত। ইণ্ডিগো কমিশন। জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামীর সম্পাদনায় প্রথম বাংলা দৈনিক 'পরিদর্শক'।

১৮৬১ বিদ্যাসাগর কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের সেক্রেটারি নিযুক্ত। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু ও বিদ্যাসাগর কর্তৃক 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর পরিচালন ভার গ্রহণ। 'মেঘনাদ বধ' কাব্য প্রকাশিত। 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর আবির্ভাব (কেশবচন্দ্র সেন ও মনোমোহন ঘোষের

যুগ্ম প্রয়াস)। কালীপ্রসন্ন সিংহের অর্থানুকূল্যে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন' প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

কেশবচন্দ্র সেন ও উমেশচন্দ্র দত্তের উদ্যোগে অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার জন্য 'বামাবোধিনী সভা ও পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত।

১৮৬২ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (লেখক—কালীপ্রসন্ন সিংহ)।

১৮৬৩ বিদ্যাসাগর ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউসনের পরিদর্শক নিযুক্ত। প্যারীচরণ সরকার কর্তৃক 'বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি' (সুরাপান নিবারণী সভা) প্রতিষ্ঠিত।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ)।

হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'।

১৮৬৪ বিদ্যাসাগর কর্তৃক মেট্রোপলিটান বিদ্যালয় স্থাপিত। বিদ্যাসাগর বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

সংস্কৃত কলেজের তৃতীয় অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী।

১৮৬৬ বহু বিবাহ রহিত করার জন্য দ্বিতীয় বার আবেদন। মিস কার্পেন্টারের কলিকাতা আগমন। 'মহাভারতের' অনুবাদ সম্পূর্ণ। দুর্ভিক্ষে বিদ্যাসাগরের সেবা ও দান।

১৮৬৭ বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভা (দি বেঙ্গল সোসাল সায়ান্স এসোসিয়েসন)—প্যারীচাঁদ ও বেভারলির যুগ্ম প্রয়াস। নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে চৈত্র মেলা (পরবর্তী কালে হিন্দু মেলা নামে পরিচিত) ও বাংলা ভাষায় জাতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি।

১৮৬৮ সাপ্তাহিক বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকার আবির্ভাব।

১৮৬৯ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক 'অবলাবান্ধব' পত্রিকা স্থাপিত। আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ। বিদ্যাসাগরের দেশত্যাগ। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব।

১৮৭০ পুত্রের বিবাহ। কালীপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যু। কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত এক পয়সা দামের প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক 'সুলভ সমাচার'। ভারতবাসীর সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য কেশবচন্দ্র কর্তৃক ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এ্যাসোসিয়েসন স্থাপিত।

১৮৭১ কাশীতে মায়ের মৃত্যু।

কলিকাতার প্রথম শিক্ষিকা-শিক্ষণ বিদ্যালয় 'ফিমেল নর্মাল য্যাণ্ড য্যাডল্ট স্কুল'।

১৮৭২ অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর। 'হিন্দু ফ্যামিলি এন্যুইটি ফণ্ড' প্রতিষ্ঠিত। ডাঃ আলেকজান্দার ডাফের প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন সিনেট হল নির্মিত। জোড়াসাঁকোয় মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত। নীলদর্পণ-নাটকের প্রথম অভিনয়। 'বঙ্গদর্শন'-এর আবির্ভাব। (বাঙালির ইতিহাস বোধ, জাতীয়তাবোধ ও নব-হিন্দুধর্মবাদের যুগ—১৮৭২-১৮৯১)। কেশব সেনের প্রচেষ্টায় বিশেষ বিবাহ আইন। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের জন্ম।

১৮৭৩ মেট্রোপলিটান কলেজ। মেট্রোপলিটান স্কুলের শ্যামবাজার শাখা। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাসাগরের বড় জামাতার মৃত্যু। দীনবন্ধু মিত্র ও মাইকেলের মৃত্যু।

১৮৭৪ মেট্রোপলিটান কলেজের প্রথম কৃতী ছাত্রকে ('হিতবাদী'-সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ বসু) স্কটের গ্রন্থাবলী উপহার প্রদান।

১৮৭৫ সম্পত্তির উইল করণ।

১৮৭৬ কাশীতে পিতার মৃত্যু। সংস্কৃত কলেজের চতুর্থ অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। কলিকাতায় বাদুড়বাগানে বাটীনির্মাণ। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর "দীপনির্বাণ" উপন্যাস প্রকাশিত। বাঙালি মেয়ের লেখা প্রথম সার্থক উপন্যাস।

১৮৭৮ ভার্নাকিউলার প্রেস আইন। বাংলা অমৃতবাজার ইংরেজিতে রূপান্তরিত।

১৮৭৯ আর্যনারী সমাজ স্থাপিত।

১৮৮০ সি. আই. ই উপাধি লাভ।

১৮৮২ ইনষ্টিটিউট অব হায়ার এডুকেশন ফর নেটিভ লেডিজ স্থাপিত। (বর্তমান নাম ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন)।

১৮৮৩ বেথুন কলেজ হইতে উত্তীর্ণ প্রথম দুইজন গ্রাজুয়েট মহিলার অন্যতমা চন্দ্রমুখী বসুকে সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী উপহার।

১৮৮৪ বৈদ্যনাথ বসু মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত।
প্যারীচাঁদ মিত্রের মৃত্যু।
কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু।

১৮৮৫ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম।

১৮৮৬ রামকৃষ্ণ পরমহংসের মৃত্যু।
রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

১৮৮৮ স্ত্রী দীনময়ী দেবীর মৃত্যু।

১৮৯০ বীরসিংহে ভগবতী বিদ্যালয় স্থাপন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইস-চ্যান্সেলার স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৯১ জামাতা সূর্যকুমার অধিকারী মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। সহবাস সম্মতি আইনের বিপক্ষে মত দান। সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকা দৈনিকে রূপান্তরিত।
কলিকাতায় মৃত্যু (১৩ই শ্রাবণ, ১২৯৮, ইং ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯১; রাত্রি ২টা ১৮ মিনিট)।

পরিশিষ্ট (ঘ)

বিদ্যাসাগরের গ্রন্থপঞ্জী

(১) রচিত ও সংকলিত

১। বাসুদেব-চরিত (শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্যগ্রন্থ)। ১৮৪২।

২। বেতালপঞ্চবিংশতি ('বৈতাল পচীসী' নামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বনে রচিত; ইহাই বিদ্যাসাগরের সাহিত্যবিষয়ক প্রথম পুস্তক। ১৮৪৭।

৩। বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ (মার্শম্যান সাহেবের 'হিষ্ট্রী অব বেঙ্গল' পুস্তকের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বনে রচিত)। ১৮৪৮।

৪। জীবনচরিত (চেম্বার্স বায়োগ্রাফি পুস্তকের অনুবাদ)। ১৮৪৯।

৫। বোধোদয়, চতুর্থ ভাগ। (নানা ইংরেজি পুস্তক হইতে সংকলিত)। ১৮৫১।

৬। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা। ১৮৫১।

৭। ঋজুপাঠ, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটী উপাখ্যান)। ১৮৫১।

৮। ঋজুপাঠ, তৃতীয় ভাগ। ১৮৫১। নীতিবোধ (আংশিক বিদ্যাসাগরের রচনা, বাকী রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের)। ১৮৫১।

৯। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব। (বেথুন সোসাইটিতে পঠিত প্রবন্ধ) ১৮৫৩।

১০। ব্যাকরণ কৌমুদী ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ। ১৮৫৩।

১১। ব্যাকরণ কৌমুদী, ৩য় ভাগ। ১৮৫৪।

১২। শকুন্তলা। (কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের উপাখ্যান ভাগ)। ১৮৫৪।

১৩। বিধবা বিবাহ, প্রথম পুস্তিকা। ১৮৫৫।

১৪। বর্ণপরিচয়, ১ম ভাগ। ১৮৫৫।

১৫। বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ। ১৮৫৫

১৬। বিধবা বিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক। ১৮৫৫ (ইংরাজি অনুবাদ ১৮৫৬, মারাঠী অনুবাদ ১৮৬৫।

১৭। কথামালা (ইসপস্ ফেবলস্. পুস্তকের অংশবিশেষের অনুবাদ)। ১৮৫৬।

১৮। চরিতাবলী (বিদেশী স্বনামধন্য লোকদের জীবনচরিত)। ১৮৫৬।

১৯। পাঠমালা (জীবনচরিত, শকুন্তলা ও মহাভারতের অংশবিশেষ লইয়া সংকলিত)। ১৮৫৯।

২০। মহাভারত (উপক্রমণিকাভাগ)। তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত অসম্পূর্ণ রচনা। ১৮৬০

২১। সীতার বনবাস (ভবভূতির 'উত্তরচরিত' ও রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে সংকলিত) ১৮৬১।

২২। ব্যাকরণ কৌমুদী ৪র্থ ভাগ। ১৮৬২।

২৩। আখ্যানমঞ্জরী, ১ম ভাগ। (কতকগুলি ইংরেজি পুস্তক অবলম্বনে রচিত) ১৮৬৩।

২৪। প্রভাবতী সম্ভাষণ। ১৮৬৪। শব্দমঞ্জরী (বাংলা-অভিধান), ১৮৬৪।

২৫। আখ্যানমঞ্জরী, ২য় ও ৩য় ভাগ। ১৮৬৮।

২৬। রামের রাজ্যাভিষেক (অসমাপ্ত) ১৮৬৯।

২৭। ভ্রান্তিবিলাস (সেক্সপীয়রের 'কমেডি অব এররস্' নাটকের আখ্যানভাগ)। ১৮৬৯।

২৮। বহুবিবাহ, ১ম পুস্তক। ১৮৭১।

২৯। বহুবিবাহ, ২য় পুস্তক। ১৮৭২। ব্রজবিলাস (রম্যরচনা), ১৮৮৪।

৩০। সংস্কৃত রচনা (ছেলেবেলার কতকগুলি সংস্কৃত রচনা)। ১৮৮৫।

৩১। নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস। ১৮৮৮। রত্নপরীক্ষা, ১৮৮৬।

৩২। পদ্যসংগ্রহ, ১ম ভাগ। ১৮৮৮।

৩৩। পদ্যসংগ্রহ, ২য় ভাগ। ১৮৯০।

৩৪। শ্লোকমঞ্জরী (কতকগুলি উদ্ভটশ্লোক সংগ্রহ)। ১৮৯০।

৩৫। স্বরচিত বিদ্যাসাগর-রচিত। (আত্মজীবনী) ১৮৯১। (মৃত্যুর পর প্রকাশিত)।

৩৬। ভূগোলখগোল বর্ণনম্। ১৮৯২। (মৃত্যুর পর প্রকাশিত)।

৩৭। *Selections from the Writings of Goldsmith.*

৩৮। *Selections from English Literature.*

৩৯। *Poetical Selections.*

(২) সম্পাদিত

১। অন্নদামঙ্গল (দুই খণ্ড)। ১৮৪৭।

২। সর্বদর্শন-সংগ্রহঃ। ১৮৪৮।

৩। বিদ্যাসুন্দর। ১৮৫৩।

৪। কিরাতার্জুনীয়ম্। ১৮৫৩।

৫। রঘুবংশ। ১৮৫৩।

৬। শিশুপাল-বধম্। ১৮৫৭।

৭। কুমারসম্ভবম্। ১৮৬১।

৮। মেঘদূতম্। ১৮৬৯।

৯। উত্তরচরিতম্। ১৮৭০।

১০। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। ১৮৭১।

১১। হর্ষচরিতম্। ১৮৮২।

১২। কাদম্বরী।

॥ প্রমাণ-পঞ্জী ॥

এই বই লিখতে যেসব পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ নেওয়া হয়েছে এবং স্থান-বিশেষে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, নীচে সেগুলির নাম উল্লেখ করা হলো। গ্রন্থের অঙ্গ-সৌষ্ঠবের খাতিরে পৃষ্ঠা-বিশেষে ফুট-নোট ব্যবহার করা হয় নি।

১। স্বরচিত জীবন-চরিত—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
২। বিদ্যাসাগর—শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
৩। বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। বিদ্যাসাগর—বিহারীলাল সরকার।
৫। বিদ্যাসাগর—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬। আশুতোষ-স্মৃতিকথা—দীনেশচন্দ্র সেন।
৭। আত্মচরিত—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮। আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী।
৯। আমার জীবন—নবীনচন্দ্র সেন।
১০। আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু।
১১। হিন্দু-কলেজের ইতিবৃত্ত—রাজনারায়ণ বসু।
১২। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী।
১৩। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন।
১৪। মদনমোহন তর্কালঙ্কার—যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
১৫। অক্ষয়কুমার দত্ত—মহেন্দ্রনাথ রায় (বিদ্যানিধি)।
১৬। মাইকেল মধুসূদন—যোগীন্দ্রনাথ বসু।
১৭। বাংলার ইতিহাস—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
১৮। চরিত-কথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
১৯। চারিত্র পূজা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২০। উনবিংশ শতাব্দীর পথিক—অরবিন্দ পোদ্দার।
২১। ভারতবন্ধু উইলিয়ম কেরী—ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস।
২২। বঙ্কিম-জীবনী—শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২৩। বঙ্কিমবাবুর জীবন-কথা—তারকনাথ বিশ্বাস।
২৪। বাংলা ভাষার ইতিহাস—মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
২৫। প্রতিভা—রজনীকান্ত গুপ্ত।
২৬। পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিন বিহারী গুপ্ত।
২৭। জীবন-স্মৃতি—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৮। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—মন্মথনাথ ঘোষ।
২৯। *A Nation in Making*—Surendra Nath Banerjee
৩০। *Bengal Under the Lieutenant Governor*—Buckland
৩১। *Men and Events of My Life in India*—Sir Richard Temple
৩২। *Kristodas Paul, A Study*—N. N. Ghosh
৩৩। *Life and Teachings of Keshab Chandra Sen*—Pratap Chandra Majumder
৩৪। *Henry De'Rozeo*—Thomas Edwards
৩৫। *David Hare*—Peary Chand Mitra
৩৬। *Men I Have Seen*—Siva Nath Sastri
৩৭। *History of the Brahmo Samaj*—Siva Nath Sastri
৩৮। *The Indian Press*—Margarita Barns
৩৯। *Biography of a New Faith*—P. K. Sen
৪০। *Fifteen Years in India*—Miss Mary Carpenter.

সাময়িক পত্রিকা—তত্ত্ববোধিনী, সোমপ্রকাশ, নবজীবন, সাহিত্য, নব্যভারত, হিতবাদী, বান্ধব, সঞ্জীবনী, দৈনিক, *Hindu Patriot, Indian Mirror, The Bengal Harkara and Indian Gazette, Christian Observer, Bethune College Centenary volume & The Englishman.*

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

'বিদ্যাসাগর'-এর পাণ্ডুলিপি শেষ হয় ১৯৫৫-৫৬ সালে। তারপর কয়েকজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও সমালোচককে পাণ্ডুলিপি পড়তে দিই। তাঁদের কারো কারো প্রস্তাব ও পরামর্শ মতো পাণ্ডুলিপিতে কিছু সংযোজন ও পরিবর্জন করি। আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ছাপার ভুল রয়ে গেল। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় সংগৃহীত উপাদান থেকে কিছু বাদ দিতে হলো। এই গ্রন্থ-রচনায় যাঁদের কাছ থেকে নানা বিষয়ে সাহায্য ও উপদেশ পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী, শ্রীযোগানন্দ দাস, শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ ও শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
এই গ্রন্থের ডকুমেণ্টারি ছবিগুলির জন্য শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকল্যাণ সেন ও কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ভদ্রের নিকট লেখক কৃতজ্ঞ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার এবং স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও গিরিশচন্দ্র বসুর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকেও লেখক অনেক সাহায্য পেয়েছেন।

॥ ভ্রম সংশোধন ॥

২৮ পৃষ্ঠায় ॥ **চার** ॥ পরিচ্ছেদটি ॥ **তিন** ॥ এবং ৪২ পৃষ্ঠায় ॥ **পাঁচ** ॥ পরিচ্ছেদটি ॥ **চার** ॥ হবে। ৩৭ পৃষ্ঠায় ৮ম লাইনে 'ভাবপ্রাণ' কথাটি 'ভাবপ্রবণ' হবে। ৩০০ পৃষ্ঠায় শেষ লাইনে 'সূতো' কথাটি 'হতো' হবে। ৩১৮ পৃষ্ঠায় ১৭ লাইনের শেষ কথাটি 'বল' না হয়ে 'ফল' হবে।

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী • কলিকাতা